রাহে বেলায়াত

ও রাসূলুল্লাহর (ﷺ) যিক্‌র-ওযীফা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ
www.assunnahtrust.com

الطريق إلى ولاية الله والأذكار النبوية
تأليف د. خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير

রাহে বেলায়াত

ও রাসূলুল্লাহর (ﷺ) যিক্‌র-ওযীফা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রাপ্তিস্থান:
১. দারুশ শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩ ঈসায়ী
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ: আগস্ট ২০০৬ ঈসায়ী
পঞ্চম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী

হাদিয়া
২২০ (দুই শত বিশ) টাকা মাত্র ।

RAHE BELAYAT (The way to Friendship of Allah) by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. March 2006. Price TK 220.00 only.

সিদ্দিক বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র শেরে ফুরফুরা
মাও. আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী আল-কুরাইশী সাহেবের
বাণী ও নসীহত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ, আমার নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় "রাহে বেলায়াত" নামের এই বইটি লিখেছে আমার জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে বইটি লেখা হয়েছে। আমার সকল মুরীদ এবং যারা আমাকে ভালবাসেন, আমার পরামর্শকে গুরুত্ব দেন বা আমার নিকট থেকে শিক্ষা নিতে আগ্রহী তাঁদের সকলের প্রতি আমার আবেদন যে, এই বইটিকে নিজের আমলের জন্য সদা সর্বদা পাঠ করবেন ও পালন করবেন।

সকলের কাছে আমার অনুরোধ যে, যদি আল্লাহর পথের পথিক হতে চান, আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, রহমত, বরকত ও নাজাত লাভের আগ্রহ মনে থাকে তাহলে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখুন:

প্রথমত, বিশুদ্ধভাবে তাওহীদ ও রিসালতের উপর ঈমান আনুন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের আকীদা বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা যা ইমাম আবু হানীফার (রহ) "ফিকহুল আকবার", ইমাম তাহাবীর (রহ) "আকীদায়ে তাহাবীয়া" ও অন্যান্য প্রাচীন ইমামগণের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেই অনুসারে নিজেদের আকীদা গঠন করুন। পরবর্তী যুগের বিদ'আত ও বানোয়াট আকীদা বর্জন করুন। সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক, কুফর, বিদ'আত ও ইলহাদ থেকে আত্মরক্ষা করুন।

দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার হারাম উপার্জন পরিহার করুন। ফরয ইবাদত বিশুদ্ধভাবে পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। সকল কবীরা গোনাহ ও হারাম বর্জন করুন। কোনো মানুষ অথবা প্রাণীর হক বা অধিকার নষ্ট করা বা ক্ষতি করা বিষবৎ পরিত্যাগ করুন।

তৃতীয়ত, মনকে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মতৃপ্তি, জাগতিক সম্মান, প্রতিপত্তি বা টাকা-পয়সার লোভ থেকে যথাসম্ভব পবিত্র রাখার জন্য সর্বদা সতর্কতার সাথে চেষ্টা করুন। এজন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওফীক চেয়ে কাতরভাবে দু'আ করুন। প্রয়োজন ছাড়া মানুষের সাথে হাশি তামাশা বা গল্পগুজব যথাসম্ভব কম করুন।

চতুর্থত, নফল ইবাদত বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করুন। মানুষের সেবা, উপকার ও সাহায্য জাতীয় কাজ যথাসম্ভব বেশি করুন। নফল সালাত যথাসম্ভব বেশি আদায়ের চেষ্টা করবেন। বিশেষত তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও মাগরিবের পরে কিছু নফল সালাত (আওয়াবীন নামে পরিচিত) সর্বদা পালন করবেন।

নফল সিয়াম বেশি পালনের চেষ্টা করুন। বিশেষত প্রত্যেক সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার, প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথমে, শেষে এবং ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সিয়াম নিয়মিত পালন করবেন। এছাড়া আরাফাতের দিনের সিয়াম ও আশুরার সিয়াম পালন করবেন। নফল দান বেশি করার চেষ্টা করবেন। দান করতে সক্ষম না হলে মানুষের বেশি বেশি সেবা ও উপকার করবেন, যা আল্লাহর নিকট দান হিসাবে গণ্য হবে। সকলেই কুরআন কারীম তিলাওয়াত শিখে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবেন। সাথে সাথে অর্থ বুঝার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। তাহাজ্জুদের পরে বা ফজরের পরে নিয়মিত কয়েক পৃষ্টা তিলাওয়াতের অভ্যাস বজায় রাখবেন।

পঞ্চমত, এই গ্রন্থে বর্ণিত সকল যিক্‌র-ওযীফা নিয়মিত পালন করবেন। সকল দু'আ, মুনাজাত ও যিক্‌র বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করে তা নিয়মিতভাবে পালন করবেন। যারা সকল দু'আ ও ওযীফা মুখস্থ ও পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন না বা মুখস্থ করতে দেরি হবে বলে মনে করছেন, তাদের জন্য আমি নিম্নরূপ ওযীফা পালনের নসীহত করছি :

(ক). ফজরের সালাতের পরে এবং মাগরিবের সালাতের পরে এই বইয়ের ৭১, ৭২, ৭০, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ১০০, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১২ ও ১১৬ নং যিক্‌র পালন করবেন। অর্থাৎ, ৩ বার 'আসতাগফিরুল্লাহ' , ১ বার 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম', ১ বার 'লা ইলাহা ... কাদীর', ১ বার 'আয়াতুল কুরসী', ১ বার করে তিন (ক্বুল), ১০০ বার করে ৪ তাসবীহ, ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী', ৩ বার 'সুবহানাল্লাহি ... কালিমাতিহী', ১০ বার সালাত (দরুদ), ৩ বার 'বিসমিল্লাহি ... ', ৭ বার 'হাসবিয়াল্লাহ ... ' , ৩ বার 'রাদীতু ... ', ১ বার 'ইয়া হাইউ ... ', ১ বার 'আল্লাহুম্মা ইন্নী ... '। এরপর যতক্ষণ সম্ভব বসে নফী ইসবাতের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিক্‌র করবেন। শেষে আল্লাহর দরবারে সকাতরে নিজের ও সকল মুসলিমের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও বরকত চেয়ে মুনাজাত করবেন। সকল মুসলিম মুর্দা, বিশেষত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আখিরাতের উন্নতি চেয়ে দু'আ করবেন।

(খ). কর্মময় দিনের ব্যস্ততার মধ্যে সর্বদা বেশি বেশি ১, ৪, ৯, ১০, ১৩, ১৭, ১৮ ও ১১৭ নং যিক্‌র পালন করবেন।

(গ). যোহর ও আসর সালাতের পরে : ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ নং যিক্‌রগুলি পালন করবেন। অর্থাৎ, ৩ বার 'আসতাগফিরুল্লাহ', ১ বার 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ... ', ১ বার 'লা-ইলাহা ... কাদীর', ১ বার 'আয়াতুল কুরসী', ১ বার করে তিন (ক্বুল), ১০০ বার করে ৪ তাসবীহ।

(ঘ). ইশা'র সালাতের পরে যোহর ও আসরের সালাতের অনুরূপ ওযীফা পালন করবেন। ইশার সালাতের পরে বা তাহাজ্জুদের পরে যথাসম্ভব বেশি করে সালাত (দরুদ) পাঠ করবেন। সম্ভব হলে অন্তত ১০০ বার সালাত শরীফ পাঠ করবেন। শেষে আল্লাহর দরবারে সকাতরে নিজের, সকল জীবিত, মৃত মুসলমান ও মুরব্বিগণের জন্য দোওয়া করবেন।

(ঙ). বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর আগে ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১৩১, ১৩৯ ও ১৪০ পালন করবেন। অর্থাৎ, ১০০ তাসবীহ, ১ বার 'আয়াতুল কুরসী', ১ বার 'সূরা বাকারার' শেষ দুই আয়াত, ১ বার সূরা কাফিরূন, ৩ বার করে 'তিন ক্বুল', ৩ বার 'আসতাগফিরুল্লাহা', ১ বার 'আসলামতু নাফসী ... '।

এই ওযীফা প্রথম পর্যায়ের জন্য। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য সকল যিক্‌র ও দু'আ মুখস্থ করে তা উপরের অযীফার অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন।

মাসনূন পদ্ধতিতে নিয়মিত যিক্‌রের মাজলিস কায়েম করুন। যিক্‌রের মাজলিসে যথাসম্ভব আল্লাহর ভয়ে কাঁদাকাটা ও তওবা বেশি করে করবেন, আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) মহব্বত এবং কুরআন-হাদীসের সহীহ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবেন। আল্লাহর দরবারে দু'আ করি – তিনি যেন এই ওযীফার দ্বারা সকল যাকিরের পরিপূর্ণ উন্নতি, বরকত ও মর্যাদা প্রদান করেন এবং কবুল করে নেন।

আহকারুল এবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দিকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর ও তাঁর মহান রাসূলের উপর দরুদ ও সালাম।

ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য 'তাযকিয়া' বা আত্মশুদ্ধি। শিরক, কুফর, বিশ্বাসের দুর্বলতা, হিংসা, অহংকার, আত্মমুখিতা, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা, লোভ, ক্রোধ, প্রদর্শনেচ্ছা, জগৎমুখিতা ইত্যাদি ব্যাধি থেকে মানবীয় আত্মাকে পবিত্র করে বিশ্বাসের গভীরতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রতি গভীর প্রেম, সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা, আখিরাতমুখিতা, বিনয়, উদারতা, দানশীলতা, দয়াদ্রতা, সদাচারণ ইত্যাদি পবিত্র গুণাবলি অর্জন করে আল্লাহর বেলায়াত বা বন্ধুত্ব অর্জন করাই মুমিনের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। স্বভাবতই সকল মুসলিম ঈমান ও তাকওয়ার পর্যায় অনুসারে এই লক্ষ্য কমবেশি অর্জন করেন।

এই লক্ষ্য অর্জনের পরিপূর্ণতম আদর্শ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তাঁর আদর্শের পূর্ণতম অনুসরণ করে 'তাযকিয়া' ও 'বেলায়াতের' সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন তাঁর সহচরগণ। তাঁদের অনুকরণ-অনুসরণের পূর্ণতার উপরেই নির্ভর করে মুমিনের বেলায়াতের পূর্ণতা। অনুকরণ-অনুসরণ আংশিক হলে তাযকিয়া ও বেলায়াতের লক্ষ্য অর্জনও আংশিক ও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

সুন্নাতের বাইরে ইবাদত বন্দেগি কবুল হবে না বলে অনেক হাদীসে বলা হয়েছে। যদিও পরবর্তী অনেক আলিম আশ্বাস দিয়েছেন যে, খেলাফে সুন্নাত অনেক কর্মই আল্লাহ কবুল করে বিশেষ সাওয়াব দিবেন, কিন্তু অনেক মুমিনের মন এতে স্বস্তি পায় না। তাঁরা সুন্নাতের বাইরে যেতে চান না।

ক্ষণস্থায়ী এই জীবন। ইবাদত বন্দেগি কতটুকুই বা করতে পারি। এই সামান্য কাজও যদি আবার বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো তা সীমাহীন দুর্ভাগ্য। এজন্য তাঁরা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত সম্মত আমল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাঁদের উদ্দেশ্যেই কুরআন কারীম, সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) ও সুন্নাতে সাহাবার আলোকে বেলায়াত ও তাযকিয়ার পরিচয়, কর্ম, পদ্ধতি ও পর্যায় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালে 'রাহে বেলায়াত' বইটি লিখেছিলাম। প্রথম প্রকাশের পরে দু'বার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। গত কয়েক মাস যাবৎ বইটি বাজারে নেই। অনেক আগ্রহী পাঠক টেলিফোনে ও মুখে বারংবার বইটি সম্পর্কে তাগাদা দিয়েছেন। তাঁদের অনুরোধের ভিত্তিতে এবার সম্পূর্ণ নতুনভাবে বইটি ছাপা হলো। বেশ কিছু বিষয় নতুন সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া সামগ্রিক বিন্যাসে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

বইটির সংশোধনে যারা পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন এবং আমাদের নগণ্য কর্ম কবুল করে নিন।

আল্লাহর মহান রাসূলের উপর, তাঁর পরিবার-বংশধর এবং তাঁর সঙ্গীগণের উপর অগণিত সালাত ও সালাম। শুরুতে ও শেষে সকল সময়ে সকল প্রশংসা জগতসমূহের পালনকর্তা মহান আল্লাহর নিমিত্ত।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

গ্রন্থকার রচিত কয়েকটি বই

১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
২. এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
৪. মুসলমানী নেসাব: আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)
৫. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৬. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
৭. মুনাজাত ও নামায
৮. সহীহ মাসনূন ওযীফা
৯. আল্লাহর পথে দাওয়াত
১০. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা
১১. ইসলামের নামে জাঙ্গিবাদ
১২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল
১৩. بُحُوثٌ فِي عُلُومِ الْحَدِيْث (বুহূসুন ফী উলুমিল হাদীস)
14. A Woman From Desert
১৫. খুতবাতুল ইসলাম: জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
১৬. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক
১৭. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
১৮. ইযহারুল হক্ক (আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ
১৯. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ
২০. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
21. Jihad of the Holy Bible and Jihad of Muhammad ﷺ
২২. বাইবেল থেকে কুরআন
২৩. কী নতুন নিয়ে এলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)

২৪. ফুরফুরার পীর আবূ জাফর সিদ্দিকী রচিত জাল হাদীস সংকলন: আল-মাউযূআত
২৫. বাংলাদেশে ইসলামী জাগরণ: পীর-মাশাইখ, শিক্ষা-বিস্তার, দাওয়াত ও রাজনীতি

সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:

মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি. বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়). ঝিনাইদহ-৭৩০০। মোবাইল নং ০১৭১১-১৫২৯৫৪, ০১৯২২-১৩৭৯২১।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

জড়বাদী ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী চাপে প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন বিশ্বাসী মানুষেরাও। একদিকে যেমন অসংখ্য ভোগবাদী জড়বাদী মানুষ ভোগের অসারতা ও আত্মার শূন্যতার পীড়নে ফিরে আসছেন বিশ্বাসের পথে, অপরদিকে বিশ্বাসীদের জীবনে পড়েছে জড়বাদের ছায়া। বিশ্বাসের আধ্যাত্মিকতা, আন্তরিকতা, মহান স্রষ্টা ও তাঁর প্রিয়তমের (ﷺ) প্রেমের আকুলতা থেকে আমরা অনেকেই বঞ্চিত। আমরা অনেকেই কিছু কিছু ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললেও এগুলোর আত্মিক প্রভাব আমরা পুরোপুরি লাভ করতে পারছি না। আমাদের ইসলামী জ্ঞানচর্চা অনেক সময় তর্কে পরিণত হয়ে যায়, আমাদের আধ্যাত্মিকতা হয়ে পড়ে ভণ্ডামী ও বিভ্রান্তি প্রদ। এ সময়ে দরকার এমন কিছু কর্ম যা আমাদের হৃদয়গুলিকে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ-এর ভালবাসায় আকুল করবে। হৃদয়কে ভরে দেবে প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতায়। যা আমাদের আত্মিক বিকাশকে সুমহান করবে, সত্যিকারের তাকওয়া অর্জনে সহায়ক হবে। মহামহিম প্রভুর সন্তুষ্টি, প্রেম, ভালবাসা, নৈকট্যে বা বেলায়াতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাঁর বান্দাকে। ধন্য হবে নগণ্য সৃষ্টি তাঁর মহান প্রভুর প্রেমের পরশে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে বিশুদ্ধ ঈমান ও পরিপূর্ণ তাকওয়া বা মহান আল্লাহর নিষেধকৃত সকল বিষয় বর্জনই তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি এবং বেলায়াত বা আল্লাহর নৈকট্য ও প্রেমের পথ। হাদীস শরীফে আল্লাহর বেলায়াত বা নৈকট্যের পথের কর্মকে দুইভাগ করা হয়েছে : ফরয ও নফল। ফরয পালনের পরে অবিরত নফল ইবাদত করার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর নৈকট্য ও প্রেম অর্জন করে। এই বইটিতে সংক্ষেপে আত্মশুদ্ধি ও বেলায়াতের এই পথ সম্পর্কে ও বিস্তারিতভাবে নফল ইবাদত ও আল্লাহর যিক্র, দু'আ-মুনাজাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে আমরা দেখি যে, আল্লাহর পথে চলতে ফরয ইবাদতগুলিও আল্লাহর যিক্র হিসাবে গণ্য। এছাড়া আল্লাহর পথে চলার নফল ইবাদতের অন্যতম ইবাদত মহান রাব্বুল আলামীনের যিক্র করা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা, তাঁর বাণী পাঠ করা, তাঁর মহান হাবীব, মানবতার মুক্তির দূত, সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর সালাম ও সালাত প্রেরণ করা। এ সবই 'আল্লাহর যিক্র'-এর অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে, 'আল্লাহর যিক্র' বিশ্বাসীর জীবনের মহাসম্পদ। মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের অন্যতম পথ। মহা শত্রু শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হৃদয়কে রক্ষা করার অন্যতম উপায় আল্লাহর যিক্র। চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম আল্লাহর যিক্র। ভারাক্রান্ত মানব হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ, বিরক্তি, অস্থিরতা ইত্যাদির মহাভার থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় আল্লাহর যিক্র। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের কামনা ও তাকওয়াকে হৃদয়ে সঞ্চারিত, সঞ্জীবিত, দৃঢ়তর ও স্থায়ী করার অন্যতম উপায় আল্লাহর যিক্র। পার্থিব লোভ ও ভণ্ডামী থেকে হৃদয়কে মুক্ত করার মাধ্যম আল্লাহর যিক্র। জাগতিক ভয়ভীতি ও লোভলালসা তুচ্ছ করে আল্লাহর পথে নিজেকে বিলিয়ে দিতে, তাঁর কালেমাকে উচ্চ করতে মুমিনের অন্যতম বাহন আল্লাহর যিক্র।

অথচ আল্লাহর যিক্র সম্পর্কে আজকাল মুসলিম সমাজে দ্বিবিধ অনুভূতি বিরাজমান। এক শ্রেণীর ইসলাম-প্রিয় ধার্মিক মুসলিম 'যিক্র-আযকার' বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করেন না। বরং অনেকটা অবহেলাই করেন। অনেকে আন্দাজের উপর বলেন, যিক্রের ফযীলতের হাদীস সব যয়ীফ, এর কোনো গুরুত্ব নেই। কেউ বা বলেন, কর্মই তো যিক্র, মুখে বারবার আউড়ালে কী হয়? কেউ বা বলেন – আগে কালেমার প্রতিষ্ঠা, ইসলামের প্রতিষ্ঠা, এরপর কালেমার যিক্র। সমাজে ইসলাম নেই এখন যিক্র করে কী হবে? এভাবে বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে অবহেলা প্রকাশ করা হয়।

যিক্র সম্পর্কে আলোচনা করছি বা বই লিখছি শুনলে তারা বিরক্ত হন। তারা মনে করেন, যেখানে সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ মার খাচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে চলছে গভীর ষড়যন্ত্র, সেই সময়ে এ সকল অস্তিত্ব রক্ষাকারী বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে এসকল সেকেলে বা একান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখার কী প্রয়োজন?

আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের আদর্শকে সামনে না রেখে কুরআন ও হাদীসের সামান্য-কিছু কথা শিখে তার সাথে মনের আবেগ ও মাধুরী মিশিয়ে নিজ নিজ মস্তিষ্কে ইসলাম তৈরির ফল এগুলি। মুমিনের জীবনে ঈমান বৃদ্ধি, তাকওয়া বৃদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি যদি অস্তিত্ব রক্ষাকারী বিষয় না হয় তা হলে কি শুধু গরম অন্তঃসারশূন্য বুলি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? যদি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন ও কর্মকে আমাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে দেখতে পেতাম – পরিবারে, সমাজে, দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে-মধ্যে-পরে, কর্মের যিক্রের সাথে সর্বদা তাঁদের জিহ্বা আল্লাহর যিক্রে আর্দ্র থাকত। প্রতিদিন সকল ইবাদত ও কর্মের পাশাপাশি হাজার হাজার বার তাসবীহ, তাহলীল ও অন্যান্য যিক্র তাঁরা পালন করতেন।

অপর দিকে অন্য কিছু ধার্মিক ইসলাম-প্রিয় মানুষ যিক্রকে ভালবাসেন, যিক্র করেন এবং নিজেদেরকে যাকির বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের যিক্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যিক্রের সাথে মিলে না। যিক্রের শব্দ আলাদা, পদ্ধতি আলাদা ও নিয়ম

আলাদা। এদের সমস্যাও একই – রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে পরিপূর্ণ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করে, তাঁদের যিক্‌র ও যিক্‌র পদ্ধতির দিকে না তাকিয়ে, যিক্‌র সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত ও হাদীসের উপর নির্ভর করে, তাতে নিজ নিজ বিদ্যা, যুক্তি, প্রজ্ঞা ও রঙ মিশিয়ে তা পালন করছেন তারা। তারা ভাবছেন এভাবেই তারা এ সকল আয়াত ও হাদীসের উপর সর্বোত্তমভাবে আমল করছেন। 'যিক্‌র' শব্দটিই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কী শব্দে, কী-ভাবে, কখন, কোন্ পদ্ধতিতে যিক্‌র করলেন বা করতে বললেন সে বিষয়টি তাদের কাছে ধর্তব্য নয়। তাদের যিক্‌রের ধরন-পদ্ধতি এবং যিকিরে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যগুলো অধিকাংশই সুন্নাত বিরোধী।

যিক্‌র শব্দটির যত্রতত্র অপপ্রয়োগ হচ্ছে। যিক্‌রের নামে এমন শব্দ ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে যা কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ করেননি। বড় কষ্ট লাগে যখন আমরা দেখি – যিক্‌রের নামে, দু'আর নামে, দরুদের নামে ও ওযীফার নামে বিভিন্ন বুজুর্গের বানানো শব্দ, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি অতি যত্ন সহকারে পালিত হচ্ছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো শব্দ, বাক্য, নিয়ম, পদ্ধতি এ সকল ক্ষেত্রে একেবারেই অবহেলিত।

আরো দুঃখ ও বেদনার বিষয় যে, আমাদের দেশের প্রচলিত ইসলামী শিক্ষামূলক গ্রন্থগুলিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যা কিছু যিক্‌র, ওযীফা বা দু'আ-দরুদের উল্লেখ আছে তার অধিকাংশই জঘন্য মিথ্যা ও বানোয়াট বিষয়। বড় আশ্চর্য লাগে যে, বুখারী ও মুসলিম-সহ সিহাহ সিত্তা ও মিশকাতুল মাসাবীহ তো আমাদের দেশে অনেক যুগ ধরেই পরিচিত ও প্রচলিত। এ সকল গ্রন্থে সংকলিত সহীহ সালাত, সালাম, যিক্‌র, দু'আ ও ওযীফাগুলি সাধারণত আমাদের দেশের কোনো ওযীফার বইয়েই পাবেন না। পেলেও সামান্য অংশ। বাকি সব বানোয়াট, মিথ্যা ও আজগুবি কথা দিয়ে ভরা। শুধুমাত্র চটকদার সাওয়াবের কথা, উদ্ভট ফযীলতের কথা ও মিথ্যা কল্পকাহিনীর ফলে বিভ্রান্ত হয়ে এগুলির পিছনে ছুটছেন সরলপ্রাণ মানুষেরা। আশ্চর্য বিষয় যে, যা শুনছেন বা দেখছেন তাই গ্রহণ করছেন, বলছেন ও লিখছেন। কোথায় কথাটি পাওয়া গেল, সত্য না মিথ্যা তা নিয়ে কেউ চিন্তা করছেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলার একমাত্র অবধারিত পরিণতি জাহান্নাম।

আরো অবাক লাগে, কোনো কোনো ওযীফা বা যিক্‌র-আযকার গ্রন্থের লেখক ভূমিকায় দাবি করেছেন, তিনি বানোয়াট যিক্‌র, দু'আ ইত্যাদি পরিহার করেছেন। শুধুমাত্র হাদীসের যিক্‌র আযকার ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের যিক্‌র আযাকার ও ওযীফা লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ বই খুলে দেখি যা কিছু যিক্‌র ওযীফা লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই বানোয়াট; হাদীস ও সাহাবীগণের আমলের বাইরে। আর কুরআন ও হাদীস থেকে যা লেখা হয়েছে তারও সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ অধিকাংশ যয়ীফ ও দুর্বল। যেমন, কুরআন করীমের কতিপয় সূরার ফযীলতে অনেক বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

'হাফত হাইকাল', 'দু'আ গঞ্জল আরশ', 'দু'আ আহাদ নামা', 'দু'আ হাবীবী', 'হিযবুল বাহার', 'দু'আ কাদাহ', 'দু'আ জামীলা', 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুবারাক নামসমূহের ওযীফা', 'দরুদে আকবার', 'দরুদে লাখী', 'দরুদে হাজারী', 'দরুদে তাজ', 'দরুদে তুনাজ্জিনা', 'দরুদে রুহী', 'দরুদে শেফা', 'দরুদে নারীয়া', 'দরুদে গাওসিয়া', 'দরুদে মুহাম্মাদী' ইত্যাদি হাজারো নামে হাজারো বানোয়াট চটকদার কাহিনীসমৃদ্ধ কিতাব পড়ে অগণিত সরলপ্রাণ মুমিন এ সকল দু'আ, সালাত ও যিক্‌র পালন করছেন। এ সকল যিক্‌র ও দু'আর মধ্যে অনেক মাসনূন শব্দ বা বাক্য সংকলিত রয়েছে। তবে এগুলির সংকলিত রূপের যে সকল ফযীলত বলা হয়েছে সবই বানোয়াট। এছাড়া এগুলির মধ্যে অনেক বানোয়াট বাক্য রয়েছে, যা পরবর্তী যুগের বুজুর্গ বা অ-বুজুর্গ মানুষদের তৈরি। এ সকল শব্দের মধ্যে কোনো নবুয়তের নূর নেই। এছাড়া এ জাতীয় অনেক দু'আর মধ্যে আপত্তিকর, আদবের খেলাফ বা শিরকমূলক শব্দও রয়েছে। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো বা পালিত শব্দ বাদ দিয়ে এগুলির নিয়মিত আমল নিঃসন্দেহে সুন্নাতের প্রতি অবহেলা।

যিক্‌র-আযকারকে অবহেলা করা এবং বানোয়াট শব্দে বা পদ্ধতিতে যিক্‌র করা উভয়ই সুন্নাতের পরিপন্থী। আমরা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, জীবনের সকল কর্মে ও সকল ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ আমাদের আলোর দিশারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, তিনি আমাদেরকে প্রয়োগহীন আদর্শ শিখিয়ে যাননি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার, জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির যত পথের কথা বলেছেন তার সবই নিজের জীবনে কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁর সাহাবীগণও তাঁর সকল ইবাদত পালনের পূর্ণতম আদর্শ। সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যাকাত, যিক্‌র, দু'আ, ইতিকাফ, কুরবানি ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদত তাঁরা যেভাবে পালন করেছেন সেভাবে পালনই আমাদের জন্য নাজাতের পথ।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমি "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে করেছি। সেখানে যিক্‌রের নামে সুন্নাত বিরোধী বিভিন্ন যিক্‌র ও পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছি। কিন্তু সুন্নাত বিরোধী কর্ম বাদ দিয়ে সুন্নাত-সম্মত কর্ম তো করতে হবে; নইলে তো কোনো লাভ হলো না। এজন্য আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর ফুরফুরার পীর সাহেব আমাকে নির্দেশ দিলেন সুন্নাতের আলোকে বেলায়াতের পথ ও সুন্নাত-সম্মত যিক্‌র আযকারের উপরে একটি বই লিখতে।

এছাড়া অনেক আবিদ ও যাকির মানুষ আমাকে মুখে ও টেলিফোনে বলেছেন, জাহাঙ্গীর সাহেব, আপনার "এহ্ইয়াউস সুনান" বই পড়ার পরে তো কোনো বইয়ের উপরেই আস্থা রাখতে পারছি না। মিথ্যা, বানোয়াট বা যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করে পণ্ডশ্রম হবে বলে সর্বদা ভয়ে আছি। আবার কিছু আমল তো করা দরকার। আপনি সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে মুমিনের জীবনের যিক্‌র-ওযীফা ও পালনীয় নেক আমল সম্পর্কে লিখুন, যা আমরা নিশ্চিতভাবে পালন করতে পারব।

কিন্তু লিখতে বললে তো হলো না। লেখকের পুঁজি তো দেখতে হবে। আমার বিদ্যা তো কিতাবে মুখস্থ করা। কিতাব না ঘেটে কিছু লিখতে পারি না। সময়-সুযোগের অভাব। সর্বোপরি নিজের আমলের অভাব। তা সত্ত্বেও কিছু লিখার চেষ্টা করলাম।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাত বা রীতি ও পদ্ধতিই আমাদের এই বইয়ের একমাত্র ভিত্তি। আমি বেলায়াত, তায্‌কিয়া, যিক্‌র ইত্যাদির ফযীলত আলোচনা করেই শেষ করিনি। উপরন্তু সেগুলির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা

করেছি। কারণ এ সকল বিষয় সর্বোত্তমভাবে পালন ও অর্জন করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ। কাজেই, তাঁদের বিস্তারিত সুন্নাত আমাদের জানা দরকার। তাঁরা কী-ভাবে, কখন কখন, কী পরিমাণে, কতবার করে, কী কী বাক্য দ্বারা যিক্‌র করেছেন তা বিস্তারিতভাবে জানার ও লেখার চেষ্টা করেছি।

সহীহ বা নির্ভরযোগ্য হাদীসই হচ্ছে সুন্নাতের একমাত্র উৎস। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামে বানোয়াট কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এই অন্যায়ের একমাত্র শাস্তি জাহান্নাম বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে, বিশেষকরে পরবর্তী যুগগুলিতে, অনেকে তাঁর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলবে। তিনি উম্মতকে এদের থেকে সাবধান থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে সাহাবীগণ পূর্ণ মুখস্থ না থাকলে কোনো হাদীস বলতেন না। অন্য কারো নিকট থেকে শুনা হাদীস গ্রহণ করতে তাঁরা খুবই সতর্ক ছিলেন। কারো সম্পর্কে সন্দেহ হলে তার হাদীস তাঁরা শুনতেনই না। এমনকি অনিচ্ছাকৃত ভুলের সম্ভাবনা দূর করার জন্য কোনো সাহাবী আরেক সাহাবীকে হাদীস বললে তিনি অনেক সময় তাঁকে শপথ করাতেন যে, সত্যিই আপনি এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন কিনা? এছাড়া আপনার কোনো সাক্ষী আছে কিনা? অর্থাৎ, আপনি ছাড়া এই কথাটি তাঁর মুখ থেকে আর কেউ শুনেছেন কিনা? ইত্যাদি।

তাবেয়ীগণও একইভাবে সনদ ছাড়া কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না। সনদের বর্ণনাকারীগণের হাদীস বর্ণনায় ভুল হয় কিনা বা তারা মিথ্যা বলেন কিনা – সে বিষয়ে তাঁরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। সকল এলাকা থেকে হাদীস সংগ্রহ করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসকে মিথ্যা থেকে পবিত্র রাখাই ছিল তাঁদের অন্যতম কাজ। পববর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন।

আমি আমার সাধ্যমত শুধু সহীহ ও হাসান হাদীসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার মধ্যে কোনো যয়ীফ হাদীসের প্রসঙ্গত উল্লেখ হলে সে সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছি। অনেক সময় যয়ীফ হাদীস শুধু এজন্য উল্লেখ করেছি যে, হাদীসটি আমাদের দেশে প্রচলিত। হাদীসটি যে যয়ীফ তা অনেকের অজানা। হয়ত কোনো সুন্নাত-প্রেমিক পাঠক হাদীসটির সনদের দুর্বলতা জানতে পারলে তিনি উপকৃত হবেন। পরে হয়ত তিনি তার পরিবর্তে সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করবেন। অথবা অন্তত হাদীসটির সনদের দুর্বলতা প্রকাশ করে তা বর্ণনা করবেন।

কোনো হাদীস যয়ীফ হওয়ার অর্থ উক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ১০০, ২০০ বা ৩০০ বৎসর পরে একজন দুর্বল, অপরিচিতি বা উল্টোপাল্টা কথা বলেন এমন ব্যক্তি দাবি করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কথা বলেছেন বলে অমুক ব্যক্তি তাকে জানিয়েছেন। অন্য কোনো মুহাদ্দিস এই হাদীসটি জানেন না বা কারো কাছে শুনেননি। মুহাদ্দিসগণ বিশাল মুসলিম বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও আর একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ পেলেন না, যে এই হাদীসটি শুনেছেন বা জানেন। এ ধরনের সন্দেহযুক্ত কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলা উচিত নয়।

হাদীসের সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করেছেন যা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক। কোনো মুহাদ্দিস এক্ষেত্রে ভুল করলে অন্যান্য মুহাদ্দিস তা সংশোধন করেছেন। যেমন, ইমাম হাকিম তার "মুসতাদরাক" গ্রন্থে অনেক মিথ্যা বা দুর্বল হাদীসকেও সহীহ বলেছেন। অপরদিকে ইমাম ইবনুল জাওযী তার "মাওযূআত" গ্রন্থে অনেক সহীহ বা হাসান হাদীসকে মিথ্যা বা মাউযূ বলেছেন। এজন্য আমি সহীহ, যয়ীফ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এজমায়ী বা সম্মিলিত মতামতের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। বিশেষত প্রাচীন ও পরবর্তী মুহাদ্দিস ও ইমামগণের মতামতের উপর নির্ভর করেছি; যেমন, ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাঈন, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমা, মুনযিরী, হাইসামী, যাহাবী, যাইলায়ী, ইবনু হাজার ও অন্যান্য ইমাম, রাহিমাহুমুল্লাহ। এছাড়া বর্তমান যুগের মুহাদ্দিসগণের আলোচনার সাহায্য গ্রহণ করেছি।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো মতামত দেওয়া বেয়াদবী। এছাড় সকল গ্রন্থের হাদীস উদ্ধৃত করে সাথে সাথে হাদীসটির অবস্থা লেখার চেষ্টা করেছি। যে হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ যয়ীফ বলেছেন তা এ গ্রন্থে উল্লেখ না করার চেষ্টা করেছি। কখনো উল্লেখ করলে তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছি। প্রথমদিকে আমি চিন্তা করেছিলাম, যয়ীফ হাদীসকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করব, বাকি সহীহ বা হাসান হাদীস সম্পর্কে কিছুই লিখব না। কারণ প্রথমেই তো বলে দিয়েছি, যে সকল হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ সহীহ বা হাসান বলে গণ্য করেছেন সেগুলির উপরেরই নির্ভর করার চেষ্টা করব। কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সহীহ ও হাসান হাদীসের ক্ষেত্রেও মুহাদ্দিসগণের মতামত উল্লেখ করব। যাতে পাঠক নিশ্চয়তা অনুভব করতে পারেন যে, তিনি সহীহ হাদীস অনুসারে কর্ম করছেন। তাঁর কর্মটি অনির্ভরযোগ্য কথার উপর নির্ভরশীল নয়।

উল্লেখ্য যে, হাদীসের সনদের অবস্থা, অর্থাৎ তা সহীহ, হাসান বা যয়ীফ কোন্ পর্যায়ের তা আমি কখনো মূল বইয়ে হাদীসের পরেই উল্লেখ করেছি। কখনো পাদটীকায় উল্লেখ করেছি। পাঠককে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করছি। হাদীসের পরেই সনদের বিষয়ে কিছু উল্লেখ না থাকলে পাদটীকায় তা দেখতে পাবেন ইনশা আল্লাহ। হাদীসের পাদটীকায় এক বা একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ করেছি, যে সকল গ্রন্থে হাদীসটি সংকলিত বা আলোচিত হয়েছে। টীকায় উল্লেখিত গ্রন্থাবলীর কোনো কোনো গ্রন্থে হাদীসটির সনদ ও সহীহ-যয়ীফ বিষয়ক আলোচনা আছে। আগ্রহী পাঠক খুঁজে দেখতে পারেন।

সুত্রপ্রদানের সুবিধার জন্য আমি যিক্‌রগুলিতে নম্বর প্রদান করেছি। ব্যাপক অর্থে দু'আ, মুনাজাত, ইসতিগফার ইত্যাদি সবই যিক্‌র। এজন্য আমি সবগুলিকেই যিক্‌র হিসেবে নম্মর প্রদান করেছি।

যিক্‌রের ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম সমস্যা উচ্চারণ ও অর্থ বুঝা। সাধারণ বাঙালি মুসলিমের জন্য বিশুদ্ধভাবে আরবী উচ্চারণ করতে খুবই অসুবিধা হয়। অথচ বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থ অনুধাবন যিক্‌রের সাওয়াব অর্জনের অন্যতম শর্ত। এজন্য প্রত্যেক যাকিরের দায়িত্ব যে, সম্ভব হলে নিজে আরবী দেখে অথবা যিনি বিশুদ্ধ আরবী জানেন এরূপ অন্য কারো সাহায্য নিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণে যিক্‌রগুলি

মুখস্থ করা। আমি সকল যিক্‌রের বাংলা অনুবাদ (অর্থ) লিখেছি। পাঠককে অনুরোধ করব অনুবাদসহ যিক্‌রগুলি মুখস্থ করতে ও যিক্‌রের সময় মনকে অর্থের সাথে আলোড়িত করতে।

এছাড়া যিক্‌রের নিচে আমি তার বাংলা উচ্চারণ লিখেছি। এই উচ্চারণ একেবারেই অসম্পূর্ণ। এই উচ্চারণ শুধুমাত্র সহযোগিতার জন্য। প্রত্যেক যাকিরের দায়িত্ব সম্ভব হলে নিজে আরবী দেখে অথবা অন্য কারো সাহায্য নিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণে যিক্‌রগুলি মুখস্থ করা।

ইসলাম সম্পর্কে বাঙালি ধার্মিক মুসলিমের চরম অবহেলার অন্যতম প্রকাশ যে অগণিত ধার্মিক মুসলিম কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন না বা আরবী উচ্চারণ জানেন না। আরবী উচ্চারণ সঠিকভাবে না জানলে কোনোভাবেই প্রতিবর্ণায়ন বা বাংলা উচ্চারণ প্রদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে যিক্‌র বা আয়াত উচ্চারণ সম্ভব নয়। কোনো যিক্‌র বা দু'আর বাংলা উচ্চারণ প্রদান সাধারণত ক্ষতিকর। কারণ বাংলা উচ্চারণের উপর নির্ভরতা সাধারণত ভুল উচ্চারণ স্থায়ী করে দেয়। তা সত্ত্বেও আমি যিক্‌র ও দু'আগুলির বাংলা উচ্চারণ লিখেছি, শুধুমাত্র অক্ষম পাঠকের সাময়িক সহযোগিতার জন্য। এক্ষেত্রে উচ্চারণকে যথাসম্ভব কম ভুলের মধ্যে রাখার জন্য নিম্নের বিষয়গুলি অনুধাবন প্রয়োজন :

প্রথমত, আরবী উচ্চারণে বাঙালির মূল সমস্যা দ্বিবিধ – প্রথম সমস্যা: আরবী ভাষায় এমন অনেকগুলি বর্ণ বা ধ্বনি আছে যা বাংলা ভাষায় নেই। বাঙালি পাঠক আরবী ধ্বনির নিকটবর্তী বাংলা ধ্বনি দিয়ে আরবী উচ্চারণ করেন। দ্বিতীয় সমস্যা : আরবী ও অন্যান্য অনেক ভাষায় দীর্ঘ স্বরধ্বনি আছে। বাংলায় কোনো দীর্ঘ স্বর ধ্বনি নেই। এজন্য অন্য ভাষার দীর্ঘ স্বর উচ্চারণে বাঙালি ভুল করেন।

প্রথম সমস্যা ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা :

(১). আরবীতে (স) বা (S) এর কাছাকাছি তিনট ধ্বনি : (س) (ص) ও (ث)। (س)-এর জন্য আমি সর্বদা (স) ব্যবহার করেছি। (স্কুল), (স্পষ্ট), (ব্যস্ত) ইত্যাদি শব্দের মধ্যে (স)-র যে উচ্চারণ সেই উচ্চারণ করতে হবে। যেমন : (সুব'হা-নাল্লাহ), (সালা-ম)

(ص) ধ্বনি বাংলায় নেই। কোনোভাবেই অনুশীলন ছাড়া বাঙালি এই ধ্বনি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন না। আমি সাধারণত (ص)-এর উচ্চারণের জন্য (স্ব) ব্যবহার করছি। অপারগ পাঠক (স্ব)-কে যথাসম্ভব মোটা (স) হিসাবে উচ্চারণ করবেন।

(ث) বাঙালির জন্য অত্যন্ত কঠিন ধ্বনি। জিহ্বাকে দাতের অগ্রভাগের নিচে দাঁত থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে দাঁত ও জিহ্বার মাঝখান দিয়ে বাতাস ছেড়ে দিলে এর উচ্চারণ হয়। এই বর্ণের জন্য আমি (স়) ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি।

(২). বাংলায় (জ) ধ্বনির জন্য দুটি বর্ণ: (জ) ও (য) বাঙালি এই দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। আরবীতে এর কাছাকাছি চারিটি ধ্বনি (ج), (ز), (ذ), (ظ)। বাঙালি এই চারিটি ধ্বনিই ভুল উচ্চারণ করেন। আমি (ج)-এর জন্য (জ) ব্যবহার করেছি। এই উচ্চারণ ইংরেজি (J)-এর মতো, কড়া ও শক্ত ভাবে জিহ্বাকে মুখের মাঝখানে উপরের তালুর কাছে নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে।

(ز، ذ، ظ) তিনটি ধ্বনির জন্য (য) ব্যবহার করেছি, ইংরাজি (Z)- এর মতো। জিহ্বা দাঁতের কাছে নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। এতে আরবী (ز)- উচ্চারণ ঠিক হবে। বাকি দুটি ধ্বনির উচ্চারণ অনুশীলন ছাড়া ঠিক করা যায় না।

(৩). বাংলায় (ত) একটি, আরবীতে দুটি (ت، ط)। আমি দুটির জন্যই (ত) ব্যবহার করেছি। (ط)-র জন্য (ত)-এর নিচে দাগ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

(৪). বাংলায় (দ) একটি। আরবীতে (د) বাংলা (দ) এর মতো। এছাড়া (ض) ধ্বনিটিও অনেকটা মোটা (দ)-এর মতো উচ্চারণ করা হয়। আমি (د) এর জন্য (দ) ও (ض) এর জন্য (দ্ব) ব্যবহার করেছি।

(৫). আরবীতে দু'টি (ক)। (ق)-এর জন্য (ক্ব) ব্যবহার করেছি। পাঠক (ক্ব)-কে যথাসম্ভব গলার ভিতর থেকে উচ্চারণ করবেন।

(৬). আরবীর কঠিন উচ্চারণগুলির অন্যতম গলার ভিতর থেকে উচ্চারিত ধ্বনিগুলি। যেমন, –(ح، ع، غ) এগুলির জন্য আমি (ح)-এর জন্য ('হ), (ع) এর জন্য 'আ/'ই/ বা 'উ ব্যবহার করছি। পাঠক যদি দেখেন কোনো বর্ণের পূর্বে উল্টা কমা তাহলে বর্ণটিকে যথাসম্ভব গলার মধ্যে নিয়ে উচ্চারণ করবেন। সর্বাবস্থায় অনুশীলন ছাড়া সঠিক উচ্চারণ সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় সমস্যা ও সমাধানের চেষ্টা :

দীর্ঘ (ই) বুঝাতে (ঈ) বা (ী), দীর্ঘ-উ বুঝাতে (ঊ) অথবা (ূ) এবং দীর্ঘ (আ) বুঝাতে (-) ব্যবহার করেছি। পাঠক এদিকে খুবই খেয়াল রাখবেন। আপনার মাতৃভাষা যেন আরবীর উচ্চারণে বাধা না দেয়। বাংলা দীর্ঘ কারের কোনো উচ্চারণ নেই। কিন্তু আরবী উচ্চারণের সময় অবশ্যই খেলায় রাখবেন। যেমন,– (আল্লা-হ), (সালা-ম) (সুব'হা-ন)উচ্চারণে (-) এর স্থলে অবশ্যই একটু টানবেন। (সুব্বূহুন কুদ্দূসুন) উচ্চারণে (বূ) ও (দূ) এর (উ)-কে দীর্ঘ করতে হবে : (সুব,বুউউহুন) (কুদদুউউসুন)। (লা- শারীকা লাহু) উচ্চারণের সময় (লা-) এর আ ও (রী)-এর (ই)-কে দীর্ঘায়িত করতে হবে। (শারিইইকা)।

এই জাতীয় আরেকটি সমস্যা 'হসন্ত'। বাংলায় আমরা 'কাল' শব্দটির (ল) ধ্বনি দুইভাবে পড়তে পারি : কাল্ – আজকাল, অথবা কালো – কাল রঙ। আরবী শব্দের বাংলা উচ্চারণ লিখলে বিষয়টি সমস্যা সৃষ্টি করে। আমি অনেক সময় হসন্ত ব্যবহার করেছি। তবে সাধারণভাবে মনে রাখতে হবে কোনো অক্ষর আকার, ওকার, ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকলে তা অবশ্যই হসন্ত হবে, হসন্ত দেওয়া থাক বা না থাক। কারণ আরবীতে (অ-কার নেই)। কাজেই (সুব'হা-নাল্লাহ) লেখা থাকলে (সুব্'হা-নাল্লাহ) পড়তে হবে, (ব)-এর নিচে হসন্ত থাক অথবা না থাক।

সর্বাবস্থায় এ সকল প্রচেষ্টা সহায়ক মাত্র। যাকির যদি আরবী উচ্চারণ না জানেন তাহলে অবশ্যই একজন আরবী জানা মানুষের

সাহায্য নিয়ে নিজের উচ্চারণগুলি ঠিক করে নিবেন। একবার ভুল মুখস্থ করলে পরে ঠিক করতে কষ্ট হয়।

আগেই বলেছি, বইটি লিখতে প্রথম প্রেরণা দিয়েছেন আমার মুহতারাম শ্বশুর ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব। আল্লাহ দয়া করে তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন, তাঁকে হেফাযত করুন, তাঁকে সুস্থ থেকে সঠিকভাবে ইসলামের খেদমতের সুযোগ দান করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের পরিপূর্ণ নিয়ামত দান করুন। বইটি লিখতে যারা সহযোগিতা করেছেন বা উৎসাহ প্রদান করেছেন সকলকেই আল্লাহ উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। বই লিখতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছি ও অধিকার নষ্ট করেছি আমার পরিবারের সদস্যদের। আল্লাহ তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।

সীমিত সময় এবং তার চেয়েও বেশি সীমিত যোগ্যতা নিয়ে লেখা বইয়ে ভুলভ্রান্তি থাকবেই। সকল ভুলভ্রান্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পাঠককে সবিনয় অনুরোধ করছি, যে কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি চোখে পড়লে আমাকে জাননোর জন্য। তার এই সহৃদয় উপকার আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করব এবং আল্লাহ তাঁকে প্রতিদান দিবেন।

মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করছি, তিনি দয়া করে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নেন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ও পরিজন ও পাঠকবর্গের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
বেলায়াত ও যিক্‌র

ক. বেলায়াত ও ওলী

আরবী (الـوِلايَــــة، والــوَلايَــــة بكســر الــواو وفتحهــا) বিলায়াত, বেলায়াত বা ওয়ালায়াত অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব (closeness, friendship, guardianship)। 'বেলায়াত' অর্জনকারীকে 'ওলী' বা 'ওয়ালী' (الولي) বলা হয়। ওলী অর্থ নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহার্যকারী, অভিভাবক ইত্যাদি। বেলায়াত ধাতু থেকে নির্গত 'ওলী' অর্থেরই আরেকটি সুপরিচিত শব্দ 'মাওলা' (مــولى)। 'মাওলা' অর্থও অভিভাবক, বন্ধু, সঙ্গী ইত্যাদি (master, protector, friend, companion)।

ইসলামী পরিভাষায় 'বেলায়াত' 'ওলী' ও 'মাওলা' শব্দের বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার রয়েছে। উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় ও রাজনৈতিক পরিভাষায় এ সকল শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। তবে বেলায়াত বা ওলী শব্দদ্বয় সর্বাধিক ব্যবহৃত (ولاية الله) 'আল্লাহর বন্ধুত্ব' ও (ولي الله) 'আল্লাহর বন্ধু' অর্থে। এই পুস্তকে আমরা 'বেলায়াত' বলতে এই অর্থই বুঝাচ্ছি।

আরবী 'তরীক', 'তরীকাহ' ব 'তরিকত' শব্দের অর্থ 'রাস্তা বা পথ। ফার্সীতে এই অর্থে 'রাহ' শব্দটি ব্যবহৃত। আমরা এই পুস্তকে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

ওলীদের পরিচয় প্রদান করে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে :

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون

"জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবেন না- যারা ঈমান এনেছেন এবং যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলেন বা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করেন।"[১]

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত বিশ্বাস। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়।

- এখানে আমরা দেখছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এই দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ইমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি) ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসূফ (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বা বিশ্বাস বর্ণনা করে বলেন:

المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن

"সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি বেলায়াতের অধিকারী)।[২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওলীর বা বেলায়াতের পথের কর্মকে দুইভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের পরে অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন , আল্লাহ বলেছেন :

"مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ.

"যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয কাজ পালন করাই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্দ্বার সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।"[৩]

তাহলে ওলী ও বেলায়েতের মানদণ্ড ঈমান ও তাকওয়া। আর 'তরিকতে বেলায়াত' বা 'রাহে বেলায়াত' অর্থাৎ বেলায়াতের রাস্তা সকল ফরয কাজ আদায় এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। যদি কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ

করেন, সকল প্রকারের হারাম ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেন, তাঁর উপর ফরয যাবতীয় দায়িত্ব তিনি আদায় করেন এবং সর্বশেষে যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা প্রিয় মানুষ। এ পথে যিনি যতুটুকু অগ্রসর হবেন তিনি ততটুকু আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন।

আল্লাহর নিষেধ বর্জনকে মূলত তাকওয়া বলা হয়। এজন্য বেলায়াতের পথে নফল মুস্তাহাব পালনের চেয়ে হারাম-মাকরূহ বর্জনের গুরুত্ব বেশি। এ বিষয়ে মুজাদ্দিদ- ই- আলফি সানী বলেন: আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ফরয কার্যসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্যাবলী। নফল আমলসমূহের ফরযের সহিত কোনোই তুলনা হয় না। নামায, রোযা, যাকাত, যিক্র, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোনো নফল ইবাদত হউক না কেন এবং তাহা খালেছ বা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হউক না কেন, একটি ফরয ইবাদত তাহার সময় মতো যদি সম্পাদিত হয়, তবে সহস্র বৎসরের উক্তরূপ নফল ইবাদত হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর। বরং ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সুন্নাত, নফল ইত্যাদি আছে, অন্য নফলাদির তুলনায় উহারাও উক্ত প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে।... অতএব, মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাকরূহ যদিও উহা 'তানজিহী' হয় তাহা হইতে বিরত থাকা যিক্র মোরাকাবা ইত্যাদি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মাকরূহে তাহরীমির কথা কী আর বলিব! অবশ্য উক্ত কার্যসমূহ (যিক্র মোরাকাবা) যদি উক্ত আমলসমূহের (ফরয, মুস্তাহাব পালন ও সকল মাকরূহ বর্জনের) সহিত একত্রিত করা যায়, তবে তাহার উচ্চ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, অন্যথায় মেহনত বরবাদ।"[১]

এভাবে কুরআন-সুন্নাহের আলোকে আমরা দেখি যে, বেলায়াতের পথের কর্মগুলির পর্যায়, তথা মুমিন জীবনের সকল কর্মের গুরুত্ব ও পর্যায়গুলি নিম্নরূপ:

প্রথমত, ঈমান: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবকিছুর মূল বিশুদ্ধ ঈমান। ঈমানের ক্ষেত্রে ত্রুটিসহ পরবর্তী সকল নেক কর্ম ও ধার্মিকতা পণ্ডশ্রম ও বাতুলতা মাত্র।

দ্বিতীয়ত, বৈধ উপার্জন: ঈমানের পরে সর্বপ্রথম দায়িত্ব বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। সুদ, ঘুষ, ফাঁকি, ধোঁকা, জুলুম ইত্যাদি সকল প্রকার উপার্জন অবৈধ। অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

তৃতীয়ত, বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন: কর্মের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফরয কর্ম। ফরয কর্ম দুই প্রকার: প্রথম প্রকার যা করা ফরয ও দ্বিতীয় প্রকার যা বর্জন করা ফরয, যা "হারাম" নামে অভিহিত। হারাম দুই প্রকার: এক প্রকার পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলি বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, আল্লাহর অন্যান্য আদেশ নিষেধ বিষয়ক হারাম বর্জন।

পঞ্চমত, ফরয কর্মগুলি পালন।

ষষ্ঠত, মাকরূহ তাহরীমি বর্জন ও সুন্নাতে মু'আক্কাদা কর্ম পালন।

সপ্তমত, মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

অষ্টমত, ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

আমি এই বইয়ে কিছু ফরয-ওয়াজিব বিষয়ের আলোচনা করলেও, মূলত অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতই এই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয়। উপরের সাতটি পর্যায়ের কর্ম যদি আমাদের জীবনে না থাকে তাহলে এই অষ্টম পর্যায়ের কর্ম অর্থহীন হতে পারে বা ভণ্ডামীতে পরিণত হতে পারে। আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, আমাদের সমাজের ধার্মিক মানুষেরা প্রায়শ এই অষ্টম পর্যায়ের কাজগুলিকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেন, অথচ পূর্ববর্তী বিষয়গুলির প্রকৃত গুরুত্ব আলোচনা বা অনুধাবনে ব্যর্থ হন। মহান রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল ﷺ যে কর্মের যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছেন তাকে তার চেয়ে কম গুরুত্ব প্রদান করা যেমন কঠিন অপরাধ ও তাঁদের শিক্ষার বিরোধিতা, বেশি গুরুত্ব প্রদানও একই প্রকার অপরাধ।

এক্ষেত্রে আমরা কয়েক প্রকারের কঠিন ভুল ও অপরাধে লিপ্ত হচ্ছি:

প্রথমত, ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মু'আক্কাদা ছেড়ে অন্যান্য সুন্নাত- নফলের গুরুত্ব দেওয়া। নফল ইবাদতের ফযীলত বলতে যেয়ে আমরা ফরযের কথা অবহেলা করে ফেলি। ফলে সমাজের অনেক ধার্মিক মানুষ অনেক ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে নফলে লিপ্ত হন। যেমন, ফরয যাকাত না দিয়ে নফল দান, ফরয হজ্ব না করে নফল ইবাদত, ফরয ইল্ম অর্জন না করে নফল তাহাজ্জুদ, ফরয সৎকাজে আদেশ প্রদান না করে নফল যিক্র, ফরয স্ত্রী-সন্তান প্রতিপালন বাদ দিয়ে নফল ইবাদত ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, হারাম বর্জন ও হালাল উপার্জন থেকে সুন্নাত-নফল পালনকে গুরুত্ব দেওয়া। ফরয পালনের চেয়ে হারাম বর্জন বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যদিও দুটিই একইভাবে ফরয। কিন্তু আমরা সুন্নাত ও নফল বা সপ্তম ও অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতের গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে অনেক সময় উপরের বিষয়গুলি ভুলে যায়। ফলে অগণিত মানুষকে আমরা দেখি হারাম উপার্জন, হারাম কর্ম ইত্যাদিতে লিপ্ত রয়েছেন, অথচ বিভিন্ন সুন্নাত-নফল ইবাদত আগ্রহের সাথে পালন করছেন। বিশেষত, অনেকে বান্দার হক সংক্রান্ত হারামে লিপ্ত থেকে নফল ইবাদত পালন করছেন অতীব আগ্রহের সাথে।

তৃতীয়ত, নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির সেবার চেয়ে ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। কুরআন ও হাদীসে মানুষের বা যে কোনো প্রাণীর উপকার করা, সাহায্য করা, সেবা করা, চিকিৎসা করা, কারো সাহায্যের উদ্দেশ্যে সামান্য একটু পথচলা, এমনকি শুধুমাত্র নিজেকে অন্য কারো ক্ষতি করা বা কষ্ট প্রদান থেকে বিরত রাখাকে অন্য সকল প্রকার সুন্নাত-নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি সাওয়াব ও মর্যাদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর রহমত, বরকত, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সৃষ্টির সেবাকে

সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমরা কুরআনও হাদীসের এই স্পষ্টতম বিষয়টি একেবারেই অবহেলা করছি। একজন ধার্মিক মানুষ যিক্র ওযীফাকে যতটুকু গুরুত্ব দেন মানুষের সাহায্য, উপকার বা সেবাকে সেই গুরত্ব দেন না, বরং এগুলিকে ইবাদতই মনে করেন না।

চতুর্থত, অষ্টম পর্যায়ের কর্মসমূহের মধ্যেও পর্যায় রয়েছে। সাধারণত সে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন বা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন কিন্তু না করলে কোনো আপত্তি করেননি সেই কাজগুলিই অষ্টম পর্যায়ের। এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে গুরুত্বের কম-বেশি হয় সুন্নাতের আলোকে। যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা করেছেন বা অধিকাংশ সময় করেছেন তবে না করলে আপত্তি করেননি তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে যা তিনি মাঝে মধ্যে করেছেন তার গুরুত্ব তার চেয়ে কম। অপরদিকে যা তিনি করেছেন ও করতে উৎসাহ দিয়েছেন তার গুরুত্ব যা তিনি করেছেন কিন্তু করতে উৎসাহ দেননি তার চেয়ে বেশি।

আমরা এই পর্যায়ের কাজগুলিকেও উল্টাভাবে গ্রহণ করি। একটিমাত্র উদাহরণ দেব। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা কম খাদ্য খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কম খেতে, খুধার্ত থাকতে ও মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করতেন ও উৎসাহ দিতেন। এছাড়া তিনি খাওয়ার সময় দস্তরখান ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। তবে সর্বদা তা ব্যবহার করতেন না বলেই বুঝা যায়। এছাড়া দস্তরখান ব্যবহার করতে তিনি উৎসাহ প্রদান করেননি। সাহাবীগণ হেঁটে হেঁটে, দাঁড়িয়ে বা পাত্রে রেখেও খেয়েছেন। এখন আমরা দ্বিতীয় কর্মটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করি, অথচ প্রথম কাজটিকে গুরুত্ব প্রদান করি না।

এছাড়া অনেকেই এক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতে যেয়ে সুন্নাতের বিরোধিতা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করলে তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা হয়। কারণ, তিনি মাঝে মাঝে অন্য যে কাজটি করতেন তা বর্জিত হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রঙের পোশাক পরতেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্নভাবে গ্রহণ করতেন। কখনো পাগড়ি পরতেন, কখনো রুমাল পরতেন, কখনো শুধু টুপি পরতেন। কখনো জামা পরতেন, কখনো লুঙ্গি ও চাদর পরতেন ... ইত্যাদি। এখন শুধুমাত্র এক প্রকারকে সর্বদা পালন করা তাঁর রীতির বিরুদ্ধতা করা।

পঞ্চমত, বেলায়াত ও তাকওয়ার ধারণার বিকৃতি। উপরের বিষয়গুলি আমাদের মনে এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে যে, প্রকৃত মুসলিমের ব্যক্তিত্ব, তাকওয়া, বেলায়েত ও বুজুর্গী সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারেই উল্টো হয়ে গিয়েছে। আমরা পাগড়ি, টুপি, যিক্র, দস্তরখান ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু ঈমান, বান্দার হক, হালাল উপার্জন, মানব সেবা সম্পর্কে উদাসীন। কেউ হয়ত গীবত, অহঙ্কার, বান্দার হক নষ্ট, হারাম উপার্জন ইত্যাদিতে লিপ্ত, কিন্তু টুপি, পাগড়ি, তাহাজ্জুদ, যিক্র ইত্যাদি অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আমরা এই ব্যক্তিকে মুত্তাকী পরহেযগার বা ধার্মিক মুসলিম বলে মনে করি। এমনকি আল্লাহর ওলী বা পীর মাশায়েখ বলেও বিশ্বাস করি। অপর দিকে যদি কেউ মানব সেবা, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন তাকে আমরা আল্লাহর ওলী বলা তো দূরের কথা ধার্মিক বলেই মানতে রাজি হব না।

অনেক ধার্মিক মানুষ দস্তরখান বা পাগড়ী নিয়ে অতি ব্যস্ত হলেও হালাল মালের খাদ্য ও পোশাক কি-না তা বিবেচনা করছেন না। লোকটির টুপি, পাগড়ি বা জামা কোন্ কাটিংএর তা খুব যত্ন সহকারে বিবেচনা করলেও তিনি বান্দার হক নষ্ট করছেন কিনা, ফরযসমূহ পালন করছেন কিনা, মানুষের ক্ষতি বা অকল্যাণ থেকে বিরত আছেন কিনা, কবীরা গোনাহগুলি থেকে বিরত আছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় আমরা বিবেচনায় আনছি না।

ষষ্ঠত, আমরা সর্বশেষ পর্যায়ের নফল মুস্তাহাব কাজগুলিকে দলাদলি ও ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। মূলত সকল মুমিন মুসলমান একে অপরকে ভালবাসবেন। বিশেষত যাঁদের মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্যায় পাওয়া যায় তাঁদেরকে আমরা আল্লাহর ওলী ও মুত্তাকী বান্দা হিসাবে আল্লাহর ওয়াস্তে বিশেষভাবে ভালবাসব। নফল মুস্তাহাব বিষয় কম-বেশি যে যেভাবে পারেন করবেন। এ সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে, কিন্তু দলাদলি হবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা টুপি, জামা, পাগড়ি, দস্তরখান ইত্যাদির আকৃতি, প্রকৃতি রঙ, যিক্র, দু'আ, সালাত, সালাম ইত্যাদির পদ্ধতি ও প্রকরণ ইত্যাদিকেই দলাদলির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি। ফলে প্রথম ছয়টি পর্যায় যার মধ্যে সঠিকভাবে বিরাজমান নেই, অথচ অষ্টম পর্যায়ে আমাদের সাথে মিল রাখেন তাকে আমরা আপন মনে করে দ্বীনি ভাই বা মহব্বতের ভাই বলে মনে করি। আর যার মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্যায় বিরাজমান, অথচ অষ্টম পর্যায়ে আমার সাথে ভিন্নতা রয়েছে তাকে আমরা কাফির মুশরিকের মতো ঘৃণা করি বা বর্জন করি। এভাবে আমরা ইসলামের মূল মানদণ্ড উল্টে ফেলেছি। আমরা ইসলামের জামা উল্টে পরেছি।

খ. বেলায়াত ও আত্মশুদ্ধি

কুরআন কারীমে বারংবার ইরশাদ করা হয়েছে যে, উম্মাতের 'তাযকিয়া'ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মূল মিশন এবং 'তাযকিয়ায়ে নাফস'-ই সফলতার মূল। মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে 'তাযকিয়া' (পরিশোধন) করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা (সুন্নাত) শিক্ষা দেন।"[১]

অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্থানে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে উম্মাতকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা, কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া ও 'তাযকিয়া' বা পরিশোধন করাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মূল মিশন। অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে: "সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে 'তাযকিয়া' (পবিত্র) করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"[২] আরো বলা হয়েছে: "নিশ্চয় সাফল্য লাভ

করবে যে 'যাকাত' (পবিত্রতা) অর্জন করে। এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।"[১]

'তাযকিয়া'-র ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, তাযকিয়া শব্দটি 'যাকাত' থেকে গৃহীত। যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এ সকল আয়াতে 'তাযকিয়া' অর্থও পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুমিনগণকে শিরক ও গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণও এভাবেই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আনুগত্য, ইখলাসা ও নির্ভেজাল তাওহীদের মাধ্যমে তাদের তাযকিয়া করেন। তাবিয়ী ইবনু জুরাইজ বলেন, তিনি তাদেরকে শিরক থেকে পবিত্র করেন।[২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দীনের সকল কর্মই 'তাযকিয়া'-র অন্তর্ভুক্ত; কারণ সকল কর্মই মুমিনকে কোনো না কোনোভাবে পবিত্র করে এবং তার সাওয়াব, মর্যাদা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। তবে এক্ষেত্রে হার্দিক বা মানসিক বিষয়গুলির প্রতি কুরআন ও হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআনকে সকল মনোরোগের চিকিৎসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: "হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার চিকিৎসা।"[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "জেনে রাখ! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি সংশোধিত হয় তবে পুরো দেহই সংশোধিত হয় আর যদি তা নষ্ট হয় তবে পুরো দেহই নষ্ট হয়। জেনে রাখ তা অন্তঃকরণ।"[৪]

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, উপরে বেলায়াতের পথের যে ৮ পর্যায়ের কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পর্যায় ও কর্ম। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও ফরয ও নফল এবং করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম রয়েছে। মনকে শিরক, কুফর, আত্মপ্রেম, কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে নিজের পছন্দকে গুরুত্ব প্রদান, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। এগুলি বর্জনীয় মানসিক কর্ম। মনকে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহর রহমতের আশা, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি, নির্লোভতা, সকলের প্রতি ভালবাসা, কল্যাণকামনা ইত্যাদি বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। এগুলি করণীয় মানসিক কর্ম। এগুলির ফরয ও নফল পর্যায় আছে। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শিরক, আত্মপ্রেম ইত্যাদিতে মন ভরে রেখে পাশাপাশি সবর, শোকর, ক্রন্দন ইত্যাদি গুণ অর্জনের চেষ্টা করা বিভ্রান্তি ও ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

গ. যিক্‌র, বেলায়াত ও আত্মশুদ্ধি

যিক্‌র আরবী শব্দ। বাংলায় এর অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাব যে, যে কোনো প্রকারে মনে, মুখে, অন্তরে, কর্মের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, আদেশ পালন করে বা নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর নাম, গুণাবলী, বিধিবিধান, তাঁর পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি স্মরণ করা বা করানোকে ইসলামের পরিভাষায় যিক্‌র বা আল্লাহর যিক্‌র বলা হয়। তবে কুরআন ও সুন্নাহে 'যিক্‌র' বলতে সাধারণভাবে কোনো না কোনোভাবে মুখের ভাষায় 'আল্লাহর স্মরণ' করাকে বুঝানো হয়। মুখের সাথে মনের ও কর্মের স্মরণ থাকতে হবে। শুধু কর্মের স্মরণ বা শুধু মনের স্মরণও যিক্‌র। তবে কুরআন ও হাদীসে যিক্‌রের নির্দেশের ক্ষেত্রে, যিক্‌রের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিক্‌র বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বত্র মূলত মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ বুঝানো হয়েছে। আমরা পরবর্তী আলোচনায় তা বিস্তারিত দেখতে পাব।

উপর্যুক্ত ব্যাপক অর্থে ঈমান ও নেককর্ম সবই 'যিক্‌র' বলে গণ্য। এ জন্য প্রশস্ত অর্থে বেলায়াতের পথের উপরোল্লিখিত আট পর্যায়ের সকল কর্মকেই এক কথায় 'যিক্‌র' বলে অভিহিত করা যায়। এভাবে যিক্‌র ও বেলায়াত পরস্পরে অবিচ্ছেদ্য বা প্রায় সমার্থক।

উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, বেলায়াতের পথের কর্ম দুই পর্যায়েরঃ ফরয ও নফল। নফল পর্যায়ের যিক্‌রকে বেলায়াতের পথে অন্য সকল নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে হাদীস শরীফে। সর্বোপরি, আত্মশুদ্ধির জন্য কুরআন-হাদীসে যিক্‌রের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য আমরা এই গ্রন্থে বেলায়াতের পথের বর্ণনায় 'যিক্‌র' বিষয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা করব। আল্লাহর কাছে তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রার্থনা করছি।

ঘ. যিক্‌রের পরিচয়ে অস্পষ্টতা

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণের সুন্নাতের উপর নির্ভর না করে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থ বা ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা, অভিরুচি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কুরআনের আয়াত বা হাদীসের অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হই। এধরনের অজ্ঞতা বা মনগড়া ব্যাখ্যার কারণে আমরা যিক্‌রের ক্ষেত্রে তিন প্রকার বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হই :

প্রথমত, অনেক সময় অনেক আবেগী ধার্মিক মানুষ তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি শাব্দিক যিক্‌রের প্রতি অবজ্ঞা করে বলেন যে, 'আল্লাহর হুকুম মানাই তো বড় যিক্‌র ... ' ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় অনেক ধার্মিক মানুষ যিক্‌র বলতে শুধুমাত্র তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি শাব্দিক যিক্‌রই বুঝেন। তিনি মনে করেন এ সকল যিক্‌র না করে যিনি আল্লাহর বিধানাবলী সাধ্যমত পালন করেন তিনি কখনই যাকির নন। উপরন্তু অনেকে আল্লাহর ফরয বিধানাবলী – সালাত, সিয়াম, যাকাত, ইত্যাদি যথাযথ পালন না করে শুধুমাত্র কিছু সুন্নাত-সম্মত অথবা বিদ'আত পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত 'যিক্‌র' নামক কর্ম করে নিজেকে যাকির বলে দাবি করেন বা মনে করেন।

তৃতীয়ত, অনেক ধার্মিক ও যাকির মানুষ 'আল্লাহর যিক্‌র' বা 'আল্লাহর নামের যিক্‌র' বলতে সুন্নাত সম্মত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের আচরিত যিক্‌র না বুঝে সমাজে প্রচিলত বিভিন্ন বানোয়াট পদ্ধতির বানোয়াট যিক্‌র বুঝেন। তাঁরা আল্লাহর যিকরের ফযীলতের আয়াত ও হাদীসগুলি গ্রহণ করেন। কিন্তু এগুলির পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত নিয়ে মাথা ঘামান না।

এসকল বিভ্রান্তির মূল কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের শিক্ষা, কর্ম ও ব্যবহার না জেনে, দুই একটি আয়াত বা হাদীস পড়ে মনোমতো ব্যাখ্যা করা। ইসলামের অন্যতম রুকন 'সালাত'। 'সালাত' অর্থ প্রার্থনা। আমরা বাংলা ভাষায় ফারসি 'নামায' শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু ইংরেজিতে সালাতকে প্রার্থনা বা prayer-ই বলা হয়। এখন কল্পনা করুন, একজন নতুন ইংরেজি ভাষাভাষী মুসলিম আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে prayer বা প্রার্থনা কায়েম করতে চায়। এজন্য সে দাঁড়িয়ে বা বসে আবেগের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে বলে যে, আল্লাহর নির্দেশমতো সে prayer বা প্রার্থনা প্রতিষ্ঠা করছে বা সালাত কায়েম করছে। আপনি তাকে এভাবে প্রার্থনা বা সালাত কায়েম করতে নিষেধ করলে বিরক্ত হয়ে আপনাকে ইসলাম বিরোধী ও সালাত বা প্রার্থনা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করল।

জাপানি ও অন্যান্য বিদেশী সাক্ষাৎ হলে তাদের 'সালাম' হিসাবে Bow (বাউ) করে বা মাথা নিচু করে সম্ভাষণ জানায়। এখন একজন জাপানি ইসলাম গ্রহণ করে 'ইসলামী সালাম' শিখেছেন। তিনি অনুরূপ Bow (বাউ) করে বা মাথা ঝুঁকিয়ে আপনাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বললেন। আপনি তাকে Bow (বাউ) করতে নিষেধ করলে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি আমাকে সালাম করতে নিষেধ করছেন? সালাম সুন্নাত, সালামে এত ফযীলত, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি কী করবেন ? আপনি কি তাকে বুঝাতে পারবেন যে, আপনি সালাম করতে নিষেধ করছেন না, আপনি শুধুমাত্র Bow (বাউ) করে সালাম করতে নিষেধ করছেন। আপনি কি তাকে বুঝাতে পারবেন যে, আপনি তাকে সুন্নাত শব্দে ও সুন্নাত পদ্ধতিতে সালাম করতে বলছেন?

আমাদের দেশের যাকিরগণ অবিকল একই সমস্যায় নিপতিত। আল্লাহর যিক্‌র, যিক্‌র, আল্লাহর নামের যিক্‌র ইত্যাদি শব্দ বিকৃত ও সুন্নাত বিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আপনি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে যিক্‌র করতে অনুরোধ করেন তাহলে তারা আপনার কথাকে ভুল অর্থ করে আপনি যিক্‌র করতে নিষেধ করছেন বলে আপনার বিরোধিতা করবেন।

এজন্য আমরা শুরুতে দুটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। **প্রথমত,** কুরআন ও হাদীসের আলোকে যিক্‌র শব্দের অর্থ ও ব্যবহার জানতে চাই। **দ্বিতীয়ত,** কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে আল্লাহর যিক্‌রের যে অগণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং যিক্‌রের যে অতুলনীয় পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে সেই নির্দেশনা পালনের জন্য পুরস্কার অর্জনের জন্য আমরা কি মনগড়াভাবে প্রয়োজন, ইচ্ছা বা রুচি অভিরুচিমতো যিক্‌র বানিয়ে নিতে পারব? নাকি আমাদের এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের অনুসরণ করতে হবে? যিক্‌র মানেই তো স্মরণ। আমরা কি তাহলে দেশ, যুগ, ভাষা, রুচি, প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে ইচ্ছামতো শব্দে ও ইচ্ছামতো পদ্ধতিতে যিক্‌র বা স্মরণ করতে পারব ? না শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যখন, যেভাবে, যে শব্দে ও যে পদ্ধতিতে যিক্‌র করেছেন অবিকল সেভাবেই আমাদের যিক্‌র করতে হবে?

ঙ. কুরআন-হাদীসের আলোকে যিক্‌রের পরিচয়

কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর যিক্‌র বা মহান রাব্বুল আ'লামীনের স্মরণই মূলত ইসলাম। মুমিনের সকল কর্মই তো তার প্রতিপালক রাব্বুল আ'লামীনকে কেন্দ্র করে ও তাঁকেই স্মরণ করে। কাজেই, তার সকল কর্মই যিক্‌র। কুরআন ও হাদীসে এভাবে আমরা যিক্‌রকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত দেখতে পাই। ঈমান, কুরআন, সালাত, সিয়াম, হজ্ব ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদতকেই যিক্‌র বলা হয়েছে। আবার এগুলির অতিরিক্ত তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, দু'আ ইত্যাদিকেও যিক্‌র নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের এ সকল ব্যবহারের আলোকে আমরা যিক্‌রকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি: **১.** যে সকল ফরয বা নফল ইবাদতের ইসলামে অন্য ব্যবহারিক নাম রয়েছে, তবে যেহেতু সকল ইবাদতের মূলই আল্লাহর স্মরণ, এজন্য সেগুলিকেও যিক্‌র নামে অভিহিত করা হয়েছে। **২.** যে সকল ফরয বা নফল ইবাদত শুধুমাত্র যিক্‌র নামেই অভিহিত এবং অন্যান্য সকল ইবাদতের অতিরিক্ত শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণের জন্য পালন করা হয়। নিম্নে যিক্‌র শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার আলোচনা করা হলো :

(১) আল্লাহর আনুগত্যমূলক সকল কর্ম ও বর্জনই যিক্‌র

মহান আল্লাহ বলেন: **فاذكروني أذكركم**

"তোমরা আমার যিক্‌র (স্মরণ) কর, আমি তোমাদের যিক্‌র (স্মরণ) করব"।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী-তাবেয়ীগণ বলেছেন: এখানে যিক্‌র বলতে সকল প্রকার ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজকে বুঝান হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য করাই বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর যিক্‌র করা। আর বান্দাকে প্রতিদানে পুরস্কার, করুণা, শান্তি ও বরকত প্রদানই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে যিক্‌র করা।[২]

ইমাম তাবারী এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: "হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে সকল আদেশ প্রদান করেছি তা পালন করে এবং যা নিষেধ করেছি তা বর্জন করে তোমরা আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমার যিক্‌র কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার রহমত, দয়া ও ক্ষমা প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের যিক্‌র করব।"[৩]

তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু রাবীয়াহ সাহাবী ইবনু আব্বাসকে বলেন: "আল্লাহর যিক্‌র তাঁর তাসবীহ, তাহলীল, প্রশংসা জ্ঞাপন, কুরআন তিলাওয়াত, তিনি যা নিষেধ করেছেন তাঁর কথা স্মরণ করে তা থেকে বিরত থাকা – এ সবই আল্লাহর যিক্‌র।" ইবনু আব্বাস (রা) বলেন: "সালাত, সিয়াম ইত্যাদি সবই আল্লাহর যিক্‌র।"[১]

প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে দারদা (রা) বলেন :

فإن صليت فهو من ذكر الله وإن صمت فهو من ذكر الله وكل خير تعمله فهو من ذكر الله وكل شر تجتـــنبه فهو من ذكر الله وأفضل ذلك تسبيح الله

"তুমি যদি সলাত আদায় কর তাও আল্লাহর যিক্‌র, তুমি যদি সিয়াম পালন কর তবে তাও আল্লাহর যিক্‌র। তুমি যা কিছু ভালো কাজ কর সবই আল্লাহর যিক্‌র। যত প্রকার মন্দ কাজ তুমি পরিত্যাগ করবে সবই আল্লাহর যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। তবে সবচেয়ে উত্তম যিক্‌র আল্লাহর তাসবীহ ('সুবহানাল্লাহ' বলা)।"[২]

কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে :

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

"(আল্লার ঘরে আল্লাহর যিক্‌রকারী মানুষগণকে) কোনো ব্যবসা বা কেনাবেচা আল্লাহর যিক্‌র থেকে অমনোযোগী করতে পারে না।"[৩]

এই আয়াতে 'আল্লাহর যিক্‌রের' ব্যাখ্যায় তাবেয়ী কাতাদা বলেন : "এ সকল যাকির বান্দাগণ বেচাকেনা ও ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু যখনই আল্লাহর কোনো পাওনা বা তাঁর প্রদত্ত কোনো দায়িত্ব এসে যেত তাঁরা তৎক্ষণাৎ তা আদায় করতেন। কোনো ব্যবসা বা বেচাকেনা তাঁদেরকে আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত রাখত না।"[৪]

তাবেয়ীগণ মুখের যিক্‌রের গুরুত্ব দিতেন। তাসবীহ, তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিকে তাঁরা মুখের যিক্‌র হিসাবে পালন করতেন। তবে এগুলি নফল যিক্‌র। যদি কেউ কর্মে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে না চলে তাহলে তার এসকল যিক্‌রের কোনো মূল্য নেই বলে তাঁরা বলতেন। তাবেয়ী সাঈদ বিন জুবাঈর (৯৫ হি) বলেন :

والذكر طاعة الله، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر الله، وإن أكثر التسبيح وقراءة القرآن

"আল্লাহর আনুগত্যই আল্লাহর যিক্‌র। যে তাঁর আনুগত্য করল সে তাঁর যিক্‌র করল। আর যে আল্লাহর আনুগত্য করল না বা তাঁর বিধিনিষেধ পালন করল না, সে যত বেশিই তাসবীহ পাঠ করুক আর কুরআন তিলাওয়াত করুক সে 'যাকির' হিসাবে গণ্য হবে না।"[৫]

এই অর্থে মুরাসাল সনদে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তাবেয়ী খালিদ ইবনু আবী ঈমরান (১২৫ হি) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوة القرآن ومن عــصى الله فقد نـــسي الله وإن كـــثرت صلاتـــه وصيامه وتلاوتـــه القرآن

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করল সেই আল্লাহর যিক্‌র করল, যদিও তার সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলওয়াত কম হয়। আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করল সেই আল্লাহকে ভুলে গেল, যদিও তার সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলাওয়াত বেশি হয়।"[৬]

তাবেয়ী খালিদ পর্যন্ত সনদ সহীহ। কিন্তু তিনি কার নিকট থেকে হাদীসটি শুনলেন তা বলেননি। বিশেষত তিনি শেষ যুগের তাবেয়ী। তিনি সাধারণত তাবেয়ীগণের থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন। এতে মনে হয় অন্তত দুইজন রাবী তার পরে বাদ পড়েছেন, একজন সাহাবী ও একজন তাবেয়ী। যেহেতু তাবেয়ীর পরিচয় জানা যাচ্ছে না, সেহেতু হাদীসটি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল বলে গণ্য হয়। তবে ঠিক এই শব্দে ও অর্থে অন্য সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম ওয়াকিদ থেকে একটি হাদীস ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এই সনদটিতে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই, কিন্তু সনদটি দুর্বল। তবে দুটি পৃথক সনদে একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হওয়াতে হাদীসটির নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত এ কারণে ইমাম সুয়ূতী হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যয়ীফ বা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৭]

আল্লামা আব্দুর রাউফ মুনাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : 'এ থেকে বুঝা যায় যে, যিক্‌রের হাকীকত আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করা ও নিষেধ বর্জন করা।' এজন্য কোনো কোনো ওলী বলেছেন : 'যিক্‌রের মূল আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া। যে ব্যক্তি

আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকেও মুখে আল্লাহর যিক্‌র করে সে মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে মসকরায় লিপ্ত এবং আল্লাহর আয়াত ও বিধানকে তামাশার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে।[১]

তাবেয়ী হাসান বসরী বলেন : 'আল্লাহর যিক্‌র দুই প্রকার । প্রথম প্রকার যিক্‌র– তোমার নিজের ও তোমার প্রভুর মাঝে মুখে জপের মাধ্যমে তাঁর যিক্‌র করবে। এই যিক্‌র খুবই ভালো এবং এর সাওয়াবও সীমাহীন। দ্বিতীয় প্রকার যিক্‌র আরো উত্তম ; আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তার কাছে তাঁর যিক্‌র করা। অর্থাৎ, আল্লাহর কথা স্মরণ করে তাঁর নিষেধ করা কর্ম থেকে বিরত থাকা।'[২]

তাবেয়ী বিলাল ইবনু সা'দ বলেন : 'যিক্‌র দুই প্রকার । প্রথম প্রকার জিহ্বার যিক্‌র – এই যিক্‌র ভালো। দ্বিতীয় প্রকার যিক্‌র – হালাল-হারাম ও বিধিনিষেধের যিক্‌র। সকল কর্মের সময় আল্লাহর আদেশ নিষেধ মনে রাখা। এই যিক্‌র সর্বোত্তম।'[৩]

তাবেয়ী মাসরূক বলেন : 'যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির ক্বলব আল্লাহর স্মরণে রত আছে, ততক্ষণ সে মূলত সালাতের মধ্যে রয়েছে, যদিও সে বাজারের মধ্যে থাকে।'[৪] অন্য তাবেয়ী আবু উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন : 'যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির অন্তর আল্লাহর স্মরণে রত থাকে, ততক্ষণ সে মূলত সালাতের মধ্যেই রয়েছে। যদি এর সাথে তার জিহ্বা ও দুই ঠোঁট নড়াচড়া করে (অর্থাৎ, মনের স্মরণের সাথে সাথে যদি মুখেও উচ্চারণ করে) তাহলে তা হবে খুবই ভালো, বেশি কল্যাণময়।'[৫]

(২) সালাত আল্লাহর যিক্‌র

সকল প্রকার ইবাদতের মধ্য থেকে সালাতকে বিশেষভাবে যিক্‌র হিসাবে কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وأقــم الصـــلاة لـــذكـــري

"এবং আমার যিক্‌রের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।"[৬]

হজ্বের কর্মকাণ্ডের বর্ণনার সময় কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে :

فإذا أفضـــتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

"তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসার পরে মাশআরুল হারামের নিকট (মুযদালিফায়) আল্লাহর যিক্‌র করবে।"[৭]

আমরা জানি, মুযদালিফায় হাজীগণের জন্য প্রচলিত তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি কোনো যিক্‌র করা ফরয-ওয়াজিব নয়। শুধুমাত্র মাগরিব ও ঈশা'র সালাত একত্রে আদায় করা ও ফজরের সালাত আদায় করাই হাজীগণের হজ্ব সংক্রান্ত বিধান। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে 'আল্লাহর যিক্‌র' বলতে সালাত বুঝান হয়েছে। ইমাম তাবারী বলেন : "তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে মুযদালিফায় চলে আসবে তখন আল্লাহর যিক্‌র করবে, এখানে যিক্‌র বলতে মাশআরুল হারামের নিকট সালাত ও দু'আ করাকে বুঝান হয়েছে।"[৮]

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنِ اسْتَــيْــقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَــلَّــيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُــتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَــثِــيرًا وَالذَّاكِــرَاتِ

"যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তার স্ত্রীকে জাগাবে এবং দু'জনেই দুই রাক'আত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করবে আল্লাহর দরবারে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যাকিরীন বা সর্বাধিক যিক্‌রকারী ও যিক্‌রকারিণীগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"[৯]

তাহলে দেখুন তাহাজ্জুদের সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। দুই রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায়কারী কিভাবে আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ যাকির হওয়ার মর্যাদা পেলেন।

(৩) সকাল-বিকালে আল্লাহর নামের যিক্‌র অর্থ সালাত আদায় করা

কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে :

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً

"এবং সকালে ও বিকালে তোমার প্রভুর নাম যিক্‌র কর।"[১০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু যাইদ বলেন : "সকালের যিক্‌র ফজরের সালাত এবং বিকালের যিক্‌র যোহরের সালাত।[১১] ইমাম তাবারী এর ব্যাখ্যায় বলেন : 'হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার প্রভুর নামের যিক্‌র করুন। সকালে ফজরের সালাতে এবং বিকালে যোহর ও

আসরের সালাতের মধ্যে আপনি তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকুন ।”[১]

আল্লামা কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীরে বলেন : ‘সকালে ও বিকালে আপনার প্রভুর নামের যিক্‌র করুন, অর্থাৎ দিনের প্রথমে ফজরের সালাত ও দিনের শেষে যোহর ও আসরের সালাত আপনার প্রভুর জন্য আদায় করুন । আর রাত্রে তাঁর জন্য সাজদা করুন অর্থ মাগরিব ও ঈশা'র সালাত আদায় করুন । আর দীর্ঘ রাত্র তাঁর তাসবীহ করুন অর্থ রাত্রে নফল সালাত আদায় করুন ।’[২]

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে : “আপনি আপনার প্রভুর নাম যিক্‌র করুন সালাতের মধ্যে সকালে ও বিকালে অর্থাৎ ফজর, যোহর ও আসরের সালাতে ।”[৩]

(৪) হজ্বও আল্লাহর যিক্‌র

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

“জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার বিধান দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর যিক্‌র প্রতিষ্ঠার জন্য ।”[৪]

(৫) ওয়ায-নসীহত আল্লাহর যিক্‌র

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, যিক্‌র শব্দের অর্থ স্মরণ করা বা করানো । কাউকে কোনোভাবে আল্লাহর নাম, গুণাবলী, বিধান বা আল্লাহর সহিত সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় স্মরণ করানোকে বিশেষভাবে কুরআন করীম ও হাদীস শরীফে যিক্‌র নামে অভিহিত করা হয়েছে । আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون

“যখনই তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো নতুন যিক্‌র আসে, তখনই তারা খেলাচ্ছলে তা শ্রবণ করে ।”[৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين

“যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট থেকে কোনো নতুন যিক্‌র আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ।”[৬] এই দুই স্থানে এবং এরূপ আরো অনেক স্থানে যিক্‌র বলতে ওয়ায ও উপদেশ বুঝানো হয়েছে ।

মহান আল্লাহ বলেছেন :

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله

“যখন শুক্রবারের দিন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের দিকে ধাবিত হও ।”[৭]

এখানে আল্লাহর যিক্‌র বলতে জুমু'আর সালাতের খুত্‌বা বা ওয়াযকে বুঝান হয়েছে বলে অধিকাংশ মুফাসসির ও ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন । ইমাম আবু হানীফা (রহ) এই মতের উপরেই নির্ভর করেছেন । কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, এখানে ‘আল্লাহর যিক্‌র’ অর্থ জুমু'আর সালাত । ইমাম তাবারী (রহ) বলেন : ‘আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাগণকে যে যিক্‌রের দিকে দৌড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন সেই যিক্‌র খুত্‌বার মধ্যে ইমামের ওয়ায নসীহত ... ।’ ইমাম মুজাহিদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইইব প্রমুখ তাবেয়ী মুফাসসির এইরূপ বলেছেন ।[৮]

আল্লামা কুরতুবী বলেন : ‘আল্লাহর যিক্‌র অর্থাৎ সালাত ।’ সাঈদ ইবনু জুবাইর প্রমুখ বলেছেন : ‘আল্লাহর যিক্‌র অর্থ খুত্‌বা ও ওয়ায ।’[৯]

হানাফী মযহাবের অন্যতম ফকীহ ও মুফাসসির আল্লামা আবু বকর আহমদ ইবনু আলী আল-জাসসাস (৩৭০ হি) বলেন : ‘এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর যিক্‌র অর্থাৎ ইমামের খুত্‌বা ও ওয়ায শোনার জন্য গমন করা ফরয ।’[১০]

সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে বিশেষভাবে ওয়ায নসীহতকে যিক্‌র হিসাবে চিহ্নিত করা হতো । ওয়ায নসীহতের মাজলিসকে যিক্‌রের মাজলিস বলা হতো ।[১১]

(৬) কুরআন ‘আল্লাহর যিক্‌র’ ও ‘আল্লাহর নামের যিক্‌র’

কুরআন কারীমের অন্যতম নাম 'যিক্র' ও 'আল্লাহর যিক্র'। কুরআনই যিক্র, কুরআনই ওয়ায, কুরআনই উপদেশ। ইরশাদ করা হয়েছেঃ

ذلــك نــتــلوه علــيــك من القــرآن والــذكــر الحــكــيم

"ইহা প্রজ্ঞাময় কুরআন ও যিক্র যা আমি আপনার উপর তিলাওয়াত করি।"[১]

إنــا نــحــن نــزلــنا الذكــر وإنا لــه لحــافــظــون

"নিশ্চয় আমিই যিক্র নাযিল করেছি এবং আমিই তাকে রক্ষা করব।"[২]

وأنــزلــنا إليــك الذكــر لــتــبــين للنــاس ما نــزل علــيهم

"এবং আমি আপনার প্রতি যিক্র নাযিল করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে।"[৩]

وهــذا ذكــر مــبــارك أنــزلــناه

"এবং ইহা একটি বরকতময় যিক্র যা আমি নাযিল করেছি।"[৪]

এভাবে আরো অনেক স্থানে কুরআন কারীমকে যিক্র ও আল্লাহর যিক্র বা উপদেশ ও ওয়ায হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে :

ووبــل للــقــاسيــة قــلــوبــهم عــن ذكــر الله

"ধ্বংস ও ক্ষতি তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর যিক্র থেকে শক্ত হয়ে গিয়েছে।"[৫]

এখানেও যিক্র বলতে কুরআন বুঝানো হয়েছে। ইমাম তাবারী বলেন: আল্লাহর যিক্র অর্থ কুরআন, যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং তার দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়েছেন ও উপদেশ প্রদান করেছেন।'[৬]

কুরআন কারীমের একাধিক স্থানে মসজিদগুলিকে "আল্লাহর নামের যিক্রের স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ইরশাদ করা হয়েছে :

فــي بــيــوت أذن الله أن تــرفــع ويــذكــر فــيــها اســمــه

"সেই গৃহসমূহে (মসজিদসমূহে) যেগুলিকে উচ্চ করার ও যেগুলির মধ্যে আল্লাহর নামের যিক্র করার অনুমতি (নির্দেশ) আল্লাহ প্রদান করেছেন ...।"[৭]

এর তাফসীরে হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন : "আল্লাহর নামের যিক্র করা হয় অর্থ আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা হয়।"[৮]

(৭) আল্লাহর নাম জপ করার যিক্র

এতক্ষণের আলোচনায় আমার দেখেছি যে, আল্লাহর সকল প্রকার স্মরণই আল্লাহর যিক্র ও আল্লাহর নামের যিক্র। এ কারণেই সকল ইবাদতকেই কুরআন ও সুন্নাহে আল্লাহর যিক্র হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তবে সকল ইবাদত যিক্র হলেও এ সকল ইবাদতের পৃথক পৃথক নাম আছে। এছাড়া আল্লাহর নামের গুণগান বারংবার উচ্চারণ বা 'জপ' করাকে বিশেষভাবে কুরআন ও সুন্নাহে "আল্লাহর যিক্র" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন, হাদীস, উসূলুল ফিকহ, ফিকহ, তাসাউফ সকল ক্ষেত্রে বা এককথায় ইসলামী পরিভাষায় সাধারণভাবে 'যিক্র', 'আল্লাহর যিক্র', 'আল্লাহর নামের যিক্র' ইত্যাদি বলতে এই প্রকারের যিক্র বুঝানো হয়।

(৮). যিক্র বনাম মাসনূন যিক্র

আমরা এই গ্রন্থে মূলত এই 'আল্লাহর নাম জপ' জাতীয় যিক্রের বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্শা আল্লাহ। সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা আল্লাহর যিক্র, আল্লাহর নামের যিক্র ইত্যাদির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মর্যাদা ও অফুরন্ত সাওয়াবের বিষয়ে আলোচনা করব। তবে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, আমরা মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত যিক্র আলোচনা করব।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা আল্লাহর যিক্রের অফুরন্ত সাওয়াব ও মর্যাদার কথা জানতে পারব। কেউ যদি মনে করেন যে, যিক্র মানে তো স্মরণ করা বা জপ করা। আমি ইচ্ছামতো যেভাবে পারি আল্লাহর স্মরণ করব বা তাঁর নাম জপ করব। এখানে আবার মাসনূন শব্দ বা পদ্ধতি শিক্ষার প্রয়োজন কি। তাহলে তার জন্য এই গ্রন্থ বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না। আর যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য সকল ইবাদতের মতো যিক্রও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এক্ষেত্রে নিজেদের মনগড়াভাবে কিছু না করে অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের অনুকরণে, তাঁদের আচরিত ও প্রচারিত শব্দে ও পদ্ধতিতে ও তাঁদের সুন্নাত অনুসারে যিক্র করব তাহলে তাকে বিশেষভাবে এই

বইটি পড়তে অনুরোধ করব।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে কোনো ভাষায়, যে কোনোভাবে, যে কোনো নামে ও যে কোনো শব্দে আল্লাহর কথা মুখে বা মনে স্মরণ করলে তা ভাষাগতভাবে 'যিক্‌র' বলে গণ্য হবে। এভাবে স্মরণকারী হয়ত যিক্‌রের জন্য উল্লেখিত কিছু সাওয়াবের অধিকারীও হতে পারেন। এতে তার "যিক্‌রের" দায়িত্ব নূন্যতমভাবে পালিত হতেও পারে অথবা নাও হতে পারে।

কেউ যদি মুখে বা মনে আল্লাহ আল্লাহ, রাব, রাব, মালিক, মালিক, দয়াল, প্রভু, Lord, Creator, ইত্যাদি শব্দ আউড়ায় তাহলে ভাষাগত দিক থেকে একে যিক্‌র বলা হবে। এতে আল্লাহর স্মরণ করার কিছু সাওয়াব মিলতেও পারে। এতে তার যিক্‌রের ইবাদত পালিত হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে সুন্নাত পালিত হবে না। এজন্য ভাষাগত বা সাধারণ যিক্‌র (স্মরণ বা জপ) ও মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত যিক্‌রের মধ্যে পার্থক্য বুঝা আমাদের জন্য খুবই জরুরি। এখানে কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করছি :

(ক) পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নামের যিক্‌র

কুরআন কারীমে প্রায় দশ স্থানে পশু জবাই করার সময় আল্লাহর নামের যিক্‌র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, ইরশাদ করা হয়েছে :

ويــذكــروا اسم الله عــلى ما رزقــهم من بهــيمة الأنــعام

"এবং তাদেরকে আল্লাহ যে সকল পশু রিযিক হিসাবে প্রদান করেছেন সেগুলির উপরে আল্লাহর নামের যিক্‌র করবে।"[১]

আরো ইরশাদ করা হয়েছে :

فــكــلوا مــما ذكــر اســم الله عــلــيه

"যার উপর আল্লার নাম যিক্‌র করা হয়েছে তা থেকে ভক্ষণ কর।"[২]

ولا تــأكــلوا مــما لــم يــذكــر اســم الله عــلــيه

"যার উপর আল্লাহর নামের যিক্‌র করা হয়নি তা ভক্ষণ করবে না।"[৩]

এভাবে কুরআন ও হাদীসে অগণিত স্থানে পশু জবাইয়ের সময় পশুর উপর আল্লাহর নামের যিক্‌র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন যদি কেউ পশু জবাই করার সময় যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো বাক্যে বা শব্দে আল্লাহর যে কোনো গুণবাচক নাম - আল্লাহ, রাহীম, দয়াবান, স্রষ্টা, রব্ব, প্রতিপালক বা যে কোনো ভাষায় যে কোনো নাম উচ্চারণ করে জবাই করেন তাহলে তার যিক্‌রের নূন্যতম দায়িত্ব পালিত হবে বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন।[৪] তবে সুন্নাত-সম্মত যিক্‌রের দায়িত্ব পালিত হবে না। সুন্নাত "বিসমিল্লাহ" বলা।

(খ) বাড়িতে প্রবেশ ও খাদ্য গ্রহণের সময়ে আল্লাহর যিক্‌র

হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

إذا دخل الرجل بيته فذكــر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلــم يذكــر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيــت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركــتم المبيت والعشاء

"যখন কেউ তার বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিক্‌র করে এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিক্‌র করে, তখন শয়তান বলে : এখানে তোমাদের (শয়তানদের) কোনো খাবার নেই রাত্রি যাপনের জায়গাও নেই। আর যখন কেউ আল্লাহর যিক্‌র না করে তার বাড়ি প্রবেশ করে, তখন শয়তান বলে : তোমরা রাত্রি যাপনের জায়গা পেয়ে গিয়েছ। আর যদি কেউ খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিক্‌র না করে, তাহলে শয়তান বলে : এখানে তোমরা খাবার ও রাত্রি যাপনের জায়গা সবই পেয়েছ।"[৫]

বাড়িতে প্রবেশের সময় ও খাদ্য গ্রহণের সময় কোন্ শব্দ দ্বারা আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন। কেউ যদি এখানে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে বা অন্য কোনো ভাষায় ও শব্দে আল্লাহর কোনো নাম বা গুণবাচক নামের জপ বা উচ্চারণ করে তাহলে হয়ত আল্লাহর স্মরণের মূল ফযীলত কিছু তার অর্জিত হলেও মাসনূন যিক্‌রের মর্যাদা থেকে সে বঞ্চিত হবে।

(গ) সালাতের শুরুতে আল্লাহর নামের যিক্‌র

আল্লাহ তাঁর নামের যিক্‌র করে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

وذكــر اســم ربــه فــصــلى

"এবং তাঁর রবের নামের যিক্র করে সালাত আদায় করল ।"[১]

এখানে যদি কেউ উপরের মতো একবার বা অনেকবার "আল্লাহ" বলে বা আরবী বা অন্য কোনো ভাষায় আল্লাহর কোনো নাম পাঠ করে সালাত শুরু করেন তাহলে ভাষাগতভাবে তার কাজকে 'আল্লার নাম যিক্র করে সালাত পড়ল' বলা হবে । কিন্তু ইসলামের বিধানে তাঁর যিক্রের ইবাদত পালন হবে না । তার সালাত হবে না । এখানে "আল্লাহর নামের মাসনূন যিক্র" অর্থ "আল্লাহু আকবার" । ইমাম আবু ইউসূফ ও অন্য তিন ইমামের মতে এখানে অন্য কোনো যিক্র, এমনকি আফযালুয যিকর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলে সালাত শুরু করলেও তার যিক্রের দায়িত্ব পালন হবে না । ইমাম আবু হানীফা বলেছেন যে, 'আররাহমান আ'যম', 'আররহীমু আ'জম', 'আররাহমানু আজাল্ল', 'আর-রাহীমু আজাল্ল' ইত্যাদি আল্লাহর মর্যাদা প্রকাশক বাক্যের যিক্র দ্বারা সালাতের তাহরীমা বাঁধা জায়েয । কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর নাম যিক্র করলে এক্ষেত্রে যিক্রের দায়িত্ব কোনোভাবেই পলিত হবে না ।[২]

<u>(ঘ) আইয়ামে তাশরীকে আল্লাহর যিক্র</u>

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً

"যখন তোমরা হজ্বের আহকাম পালন সম্পন্ন করবে তখন আল্লাহর যিক্র করবে, যেরূপভাবে তোমাদের পিতা পিতামহদের যিক্র করতে বা তার চেয়েও বেশি ।"[৩]

আমরা জানি যে, হাজীগণের জন্য হজ্বের শেষে বিশেষ কিছু তাকবীর ও তাহলীল করতে হয়

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد

বলে । এজন্য মুফাসসির ও ফকীহগণ বলেছেন যে, এখানে আল্লাহর যিক্র বলতে এ সকল যিক্রকে বুঝান হয়েছে ।[৪]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

واذكروا الله في أيام معدودات

"তোমরা সুনির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর যিক্র কর ।"[৫]

এখানেও যিক্র বলতে উপরের সুনির্দিষ্ট তাকবীর তাহলীল বুঝানো হয়েছে । এই আয়াতের উপর নির্ভর করেই ঈদুল আযহার আগে পরে ৩/৪ দিন সালাতের পরে আমরা তাকবীর বলে থাকি । এখানে যদি কেউ আল্লাহর যিক্র বলতে শুধুমাত্র তাঁর নাম যিক্র বা জপ করেন তাহলে তাঁর ইবাদত পলিত হবে না ।

(৯). জায়েয বনাম সুন্নাত

এভাবে আমরা ভাষাগত বা উন্মুক্ত যিক্র ও মাসনূন যিক্রের পার্থক্য বুঝতে পারছি । এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা দরকার । আমরা দেখেছি যে, শুধুমাত্র আল্লাহর মহান নাম "আল্লাহ" বা অন্য কোনো গুণবাচক নাম বা অন্য কোনো ভাষায় বা শব্দে তাঁর নাম জপ বা স্মরণ করলে হয়ত যিক্রের নূন্যতম পর্যায় পলিত হতে পারে । কিন্তু এই প্রকারের গাইর মাসনূন বা সুন্নাত বিরোধী যিক্র, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ শেখাননি বা তিনি বা তাঁর সাহাবীগণ পালন করেননি সেসকল যিক্রকে আমরা কখনো রীতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারব না । সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে নিয়মিত পালনের রীতি হিসাবে বা নিয়মিত ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করলে তা 'বিদ'আতে' পারিণত হবে এবং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকে অপছন্দ ও অবজ্ঞা করা হবে ।

উপরের উদাহরণগুলি চিন্তা করুন । কেউ যদি পশু জবাই করার সময় যিক্র হিসাবে শুধুমাত্র "আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ ... ", "রহমান", "দয়ালু" ইত্যাদি নাম বা গুণবাচক নাম বলে যিক্র করে তাহলে হয়ত তার যিক্রের দায়িত্ব সর্বনিম্ন পর্যায়ে পলিত হতে পারে, তবে তা খেলাফে সুন্নাত হবে । আর যদি তিনি মাননূন যিক্র 'বিসমিল্লাহ' বাদ দিয়ে সর্বদা এ সকল 'জায়েয' যিক্র করতে থাকেন তাহলে বুঝা যাবে যে তিনি এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে যিক্র শিখিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট নন বা তাঁকে পছন্দ করছেন না ।

অনুরূপভাবে বাড়িতে প্রবেশের সময়, খাদ্য গ্রহণের সময়, সকাল, বিকাল, সন্ধ্যায়, রাত্রে, সারাদিন, বাজারে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে ও এরূপ সকল স্থানে কেউ যদি মাসনূন যিক্র বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম, নামের অর্থ, গুণবাচক নাম ইত্যাদি জপ করে বা এক স্থানের যিক্র অন্য স্থানে করেন তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জায়েয হলেও সুন্নাতের খেলাফ হবে । আর এ সকল খেলাফে সুন্নাত যিক্র নিয়মিত করলে বা রীতি হিসাবে গ্রহণ করলে সুন্নাতকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও অপছন্দ করা হবে ।

<u>(ক) সুন্নাত বনাম উদ্ভাবন</u>

অনেক সময় আমরা ইচ্ছাপূর্বক বা না বুঝে সুন্নাত ও বিদ'আত এবং অনুসরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে পার্থক্য নষ্ট করে ফেলি । এগুলির মধ্যে পার্থক্য বুঝা সুন্নাত অনুসরণ ও আকড়ে ধরে চলার জন্য অতি প্রয়োজনীয় :

<u>(খ). সুন্নাত, ইত্তিবায়ে সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত</u>

সুন্নাত শব্দের অর্থ, ব্যবহার, সুন্নাতের গুরুত্ব, মর্যাদা, সুন্নাতের খেলাফ চলার ভয়াবহ পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এখানে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয হিসাবে করেছেন তা ফরয হিসাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা নফল হিসাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা সর্বদা নিয়মিতভাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি কখনো করেননি, অর্থাৎ সর্বদা বর্জন করেছেন তা সর্বদা বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে বর্জন করেছেন তা মাঝে মাঝে বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত।

যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বা উৎসাহ প্রদান করেছেন তা পালনের ক্ষেত্রে তাঁর পালনপদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ তিনি করতে নিরুৎসাহিত করেছেন বা বর্জন করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন তা তাঁর কর্মপদ্ধতির আলোকে বর্জন করাই সুন্নাত।

যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্তসাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে ঐসব শর্তসাপেক্ষে বা নির্দেশনা সাপেক্ষে পালন করাই সুন্নাত। যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তাকে কোনোরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ ব্যতিরেকে উন্মুক্তভাবে পালন করাই সুন্নাত।

কোনো কর্ম পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব, পদ্ধতি, ক্ষেত্র, সময়, স্থান ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে সুন্নাতের বেশি বা কম হলে বা সুন্নাতের বাইরে গেলে তা 'খেলাফে সুন্নাত' হবে। অর্থাৎ, যা তিনি ফরয হিসাবে করেছেন তা নফল মনে করে পালন করা, যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করা, যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা মাঝেমধ্যে করা, যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করা, যা তিনি কখনই করেননি তা সর্বদা বা মাঝেমাঝে করা, যা তিনি কোনো শর্তসাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে শর্তহীন উন্মুক্তভাবে পালন করা, যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তা পালনের জন্য কোনরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ করা বা যা তিনি বর্জন করেছেন তা পালন করা সবই 'খেলাফে সুন্নাত'। 'খেলাফে সুন্নাত' সুন্নাতের নির্দেশনার আলোকে মুবাহ, জায়েয, হারাম, মাকরুহ বা বিদ'আত হতে পারে।

(গ). উদ্ভাবন ও বিদ'আত বনাম কিয়াস ও ইজতিহাদ

বিদ'আতের পরিচয়, পরিণতি, প্রকরণ ও কারণ সম্পর্কে পূর্বোক্ত বইয়ে আলোচনা করেছি। কোনো বিদ'আতই কুরআন-হাদীসের দলিল ছাড়া বানানো হয় না। সুন্নাত থেকেই বিদ'আতের উদ্ভাবন হয়। উদ্ভাবনের এই প্রক্রিয়া ও উদ্ভাবন ও অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝার জন্য কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা যায়।

মনে করুন আমি একজন পীর সাহেবের মুরীদ। আমি দেখতে পেলাম যে আমার পীর মাঝে মাঝে কালো পাগড়ি ও মাঝে মাঝে সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন। আমি ভালোকরে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, তিনি শুক্রবারে জুম'আর সালাতের জন্য সাদা পাগড়ী ব্যবহার করেন। অন্যান্য দিনে তিনি কালো পাগড়ি ব্যবহার করেন। এখন একজন ভক্ত অনুসারী হিসাবে যদি আমিও হুবহু তাঁর মতো শুক্রবারে সাদা পাগড়ি ও অন্যান্য দিনে কালো পাগড়ি ব্যবহার করি তাহলে আমাকে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ অনুসারী বলা হবে। কিন্তু আমি যদি এখানে নিজের বিবেক ও বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে সর্বদা সাদা পাগড়ি ব্যবহার করি তাহলে আমার অন্যান্য পীরভাই স্বভাবতই আমাকে পূর্ণ অনুসারী বলবেন না এবং আমাকে পীরের কর্মের বিরোধিতার জন্য প্রশ্ন করবেন। তাদের প্রশ্নের জবাবে আমি বলতে পারব, শুক্রবার হচ্ছে সর্বোত্তম দিন এবং এই দিনে আমার পীর সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন। এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কালো পাগড়ি ব্যবহারের চেয়ে সাদা পাগড়ি ব্যবহারই উত্তম। যদিও পীর নিজে অন্যান্য দিনে কালো পাগড়ি ব্যবহার করেন, তবে তিনি নিজের কর্ম দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সর্বদা সাদা পাগড়ি ব্যবহারই উত্তম। তাই আমি সকল দিনেই সাদা পাগড়ি ব্যবহার করি। আমার যুক্তি ও দলিল যতই অকাট্য হোক আমার পীর ভাইয়েরা আমাকে পূর্ণ অনুসারী বলে মানবেন না, বরং যিনি পীরের হুবহু অনুকরণ করে শুক্রবারে সাদা পাগড়ি ও অন্য দিনে কালো পাগড়ি পরেন তাকেই হুবহু অনুসরণকারী বলবেন। আমাকে উদ্ভাবনকারী বলবেন। হয়ত কেউ বলেও বসবেন, তুমি এভাবে সাদা পাগড়ির ফযীলত আবিষ্কার করলে, অথচ তোমার পীর তা বুঝতে পারলেন না, তুমি কি তাঁর চেয়েও বেশি বুঝ?

সুন্নাতের আলোকে একটি উদাহরণ বিবেচনা করুন। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় বিশেষ নিয়ামত লাভ করলে বা সুসংবাদ পেলে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য শুকরানা সাজদা করতেন। এখন যদি কেউ এসকল হাদীসের আলোকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে নিয়মিত একটি করে শুকরানা সাজদা দেওয়ার প্রচলন করেন তাহলে তাকে কখনোই অনুসারী বলা যাবে না। তাকে উদ্ভাবক বলতে হবে। তিনি হয়ত অনেক অকাট্য দলিল পেশ করবেন। তিনি বলবেন, যে কোনো নিয়ামত লাভের পরেই শুকরিয়া সাজদা করা সুন্নাত । মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামত সালাত আদায় করতে পারা। কাজেই, এই নিয়ামত লাভের পরে যে শুকরানা সাজদা করে না সে অকৃতজ্ঞ বান্দা। যে বান্দা সন্তান লাভের সংবাদে শুকরিয়া সাজদা করে অথবা চাকরি পাওয়ার সংবাদে শুকরিয়া করে অথচ জীবনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত সালাত আদায়ে তৌফিক পেয়ে সাজদা করে না সে কেমন বান্দা!

তিনি হয়ত বলবেন, এই সাজদা যে নিষেধ করে সে বেয়াকুফ, তাকে আবু জাহল বলা উচিত। কারণ সে, আল্লাহর দরবরে শুকরিয়া জানাতে বান্দাকে নিষেধ করছে। কোথাও কি আছে যে, বিশেষ কোনো নিয়ামতের জন্য সাজদায়ে শুকর আদায় করা যাবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কখনো সালাতের পরে শুকরানা সাজদা করতে নিষেধ করেছেন? নিয়ামতের জন্য সাজদা হাদীসে প্রমাণিত। সালাত মুমিনের জীবনের অন্যতম নিয়ামত। এছাড়া সাজাদার সময়ে দু'আ কবুল হয় তাও প্রমাণিত। সালাতের পরে দু'আ কবুল হয় তাও প্রমাণিত। কাজেই, প্রত্যেক সালাতের পরে সাজদা করা ও সাজদার মধ্যে দু'আ করা সুন্নাত।

এরূপ অনেক কথাই তিনি বলতে পারবেন। অগণিত 'অকাট্য' প্রমাণ তিনি প্রদান করবেন। কিন্তু কখনই আমরা তাঁকে সুন্নাতে নববীর অনুসারী বলতে পারব না। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন আদায় করেছেন, তাঁর সাহাবীগণও করেছেন, কিন্তু কেউ কখনোই সালাত আদায়ের নিয়ামত লাভের পর শুকরিয়ার সাজদা করেননি। কাজেই, সালাতের পরে শুকরানা সাজদা না করাই তাঁদের সুন্নাত। আর সাজদার প্রথা এই সুন্নাতকে মেরে ফেলবে। অনুকরণপ্রিয় সুন্নাত প্রেমিকের প্রশ্ন: আমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়েও বেশি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাই? এ সকল অকাট্য দলিলের মাধ্যমে আমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকেই অকৃতজ্ঞ ও হেয় বলে প্রমাণিত করছি না?

এখানে পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে, সুন্নাতই কি সব? তাহলে ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ ইত্যাদির অবস্থান কোথায়? বস্তুত সুন্নাতের ক্ষেত্র ও ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে সুন্নাত নেই সেখানেই ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদ প্রয়োজন। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বিধান দেওয়া হয় নি কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সেগুলির বিধান নির্ধারণ করতে হয়। যেমন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কোন কাজটি ফরয, কোনটি মুস্তাহাব ইত্যাদি বিস্তারিত বলেন নি। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মুজতাহিদ তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। কোনো কোনো বিষয়ে সুন্নাতে একাধিক পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে, সেগুলির সমন্বয়ের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সুন্নাতের মধ্যে নেই। যেমন সালাতের রুকুর সময় হাত উঠানো অথবা না উঠানো, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অথবা না করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও মুজতাহিদ প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি ও কিয়াসের ভিত্তিতে এগুলির সমন্বয় দেওয়ার চেষ্টা করেন। অনুরূপভাবে মাইক, টেলিফোন, প্লেন ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কিছু বলা হয় নি। কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলির আলোকে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে এগুলির বিধান অবগত হওয়ার চেষ্টা করেন মুজতাহিদ। কোনো ইজতিহাদী বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকলেই একমত হলে তাকে 'ইজমা' বা ঐকমত্য বলা হয়।

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, কুরআন বা সুন্নাতে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে সে বিষয়ে কোনো কিয়াস বা ইজতিহাদের সুযোগ নেই। আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ) যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন সে বিষয়ে আবার ইজতিহাদ, কিয়াস বা ইজমার কোনো প্রয়োজনের কথা কোনো মুমিন চিন্তাও করতে পারেন না।

আর এজন্যই কিয়াস, ইজমা বা ইজতিহাদ দ্বারা কোনো ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতি তৈরি, উদ্ভাবন, পরিবর্তন বা সংযোজন করা যায় না। যেমন ইজতিহাদ বা কিয়াসের মাধ্যমে জোরে বা আস্তে 'আমীন' বলার বিষয়ে বিধান, গমের উপর কিয়াস করে চাউলের বিধান, প্লেন, মাইক ইত্যাদির বিধান প্রদান করা যায়। কিন্তু সালাতের মধ্যে আস্তে আমীন বলার উপর কিয়াস করে ঈদুল আযহার দিনগুলিতে সালাতের পরের তাকবীর 'আস্তে' বলার বিধান দেওয়া যায় না, সালাতের মধ্যে জোরে আমীন বলার উপর কিয়াস করে সালাতের পরে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি জোরে পড়ার বিধান দেওয়া যায় না, সফরে সালাত কসর করার উপর কিয়াস করে সিয়াম কসর বা অর্ধেক করার বিধান দেওয়া যায় না, হজ্জের সময় ইহরাম পরিধানের উপর কিয়াস করে সালাতের মধ্যে ইহরাম পরিধানের বিধান দেওয়া যায় না...। প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হুবহু অনুকরণ করতে হবে। এমনকি রামাদান মাসে জামাতে সালাতুল বিতর আদায়ের উপর কিয়াস করে কেউ অন্য সময়ে জামাতে সালাতুল বিত্‌র আদায়ের বিধান দিতে পারেন না। বিতরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু'আ করার উপর কিয়াস করে সালাতের পরের দু'আ করার সময় দাঁড়ানোর বিধান দিতে পারেন না। দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের উপর কিয়াস করে দাঁড়িয়ে যিক্‌র করা বা কুরআন তিলাওয়াত করাকে উত্তম বলতে পারেন না।

অনুরূপভাবে ইজমা, কিয়াস বা ইজতিহাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে ছিল না এমন কোনো কিছুকে দীনের অংশ বানানো যায় না। যেমন ইজহিতাদের মাধ্যমে প্লেনে চড়ে হজ্জে গমন, মাইকে আযান দেওয়া ইত্যাদির বিষয়ে জায়েয বা না-জায়েয বিধান দেওয়া যায়, কিন্তু প্লেনে চড়ে হজ্জে গমন বা মাইকে আযান দেওয়াকে দীনের অংশ বানানো যায় না। কেউ বলতে পারেন না যে, প্লেন ছাড়া অন্য বাহনে হজ্জে গমন করলে সাওয়াব বা বরকত কম হবে বা বাইতুল্লাহর সাথে আদবের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা থাকবে। অনুরূপভাবে কেউ বলতে পারেন না যে, মাইকে আযান না দিলে আযানের ইবাদত অপূর্ণ থাকবে। সকল ইজতিহাদী বিষয়ই এরূপ।

সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ইজমা-কিয়াস এবং উদ্ভাবন-বিদআতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রক্ষা করেছেন। সালাতুল বিতরের রাক'আত, সালাতের মধ্যে হাত উঠানো, আমীন বলা, সূরা ফাতিহা পাঠ, ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন পদ্ধতির বিধান ইত্যাদি অগণিত বিষয়ে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ কিয়াস ও ইজতিহাদ করেছেন এবং মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ক মতভেদের কারণে তাঁরা কাউকে নিন্দা করেন নি বা বিদ'আতী বলেন নি। পক্ষান্তরে ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম করলে তাতে আপত্তি করেছেন এবং বিদ'আত বলেছেন। এ জাতীয় অনেক ঘটনা বিস্তারিত তথ্যসূত্র সহ 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, দলবদ্ধভাবে গণনা করে যিক্‌র করতে দেখে কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন ইবনু মাসঊদ (রা)। আযানের পরে মিনারায় উঠে ডাকাডাকি করতে দেখে কঠিন আপত্তি করেছেন ইবনু উমার (রা)। হাঁচির পরে দু'আর মধ্যে 'আল-হামদু লিল্লাহ'-এর সাথে 'দরূদ শরীফ' পাঠ করতে আপত্তি করেছেন ইবনু উমার (রা)। সালাতের পরে সশব্দে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বলতে দেখে আপত্তি করেছেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী- হাসান বসরী, ইবনু সিরীন প্রমুখ তাবিয়ীর উস্তাদ- আবীদাহ ইবনু আমর কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন। এরূপ অগণিত ঘটনা আমরা হাদীসের গ্রন্থগুলিতে দেখতে পাই।

এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, ইবাদত পালনের পদ্ধতির সাথে ইজমা, কিয়াস বা ইজতিহাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে সুন্নাতের পরিপূর্ণ ও হুবহু অনুসরণই ইবাদত কবুল হওয়ার ও সাওয়াব বেশি হওয়ার মূল পথ। এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসসমূহ 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের আগ্রহেই আমরা এই পুস্তক রচনা করছি। বেলায়াতের পথে তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধির কর্মে এবং বিশেষ করে যিক্‌র-আযকারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুসরণই আমাদের এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য। তিনি কখন কোন যিক্‌র কী-ভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন তা জানতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করব এবং

হুবহু তার অনুসরণের চেষ্টা করব। তাঁর সুন্নাতকে কেন্দ্র করে উদ্ভাবনা থেকে বিরত থাকব।

আমরা দেখেছি যে, জ্ঞান যেরূপ সুন্নাতের অনুসরণের দিকে ধাবিত করে, অনুরূপভাবে সুন্নাতের জ্ঞান অনেক সময় সুন্নাত পরিত্যাগ করে নতুন উদ্ভাবনার দিকেও ধাবিত করে। মুসলিম বিশ্বে সকল সুন্নাত-বিরোধী বা সুন্নাত-অতিরিক্ত-উদ্ভাবনার পিছনে সমর্থন যুগিয়েছেন কিছু প্রাজ্ঞ আলিম ও পণ্ডিত। উদ্ভাবনমুখী জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞানের উপর আস্থাশীল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তিনি সুন্নাতকে এত বেশি গভীরভাবে বুঝেছেন যে, এখন এর উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করার ক্ষমতা তাঁর অর্জিত হয়েছে। অপর দিকে অনুসরণকারী সরল প্রেমিক। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সমগ্র হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন। ভালবাসেন তাঁর সুন্নাতকে। তাঁর সুন্নাতকেই একমাত্র নাজাত, বেলায়াত, কামালাত ও সকল নিয়ামতের উৎস মনে করেন। তাই হুবহু তাঁর অনুসরণ করতে চান। তিনি তাঁর জ্ঞানের উপর অতবেশি আস্থাশীল নন। তাই তিনি উদ্ভাবনের চেয়ে অনুসরণকে নিরাপদ মনে করেন।

মুহতারাম পাঠক, আমিও আমার জ্ঞানের উপর বা অন্য কারো জ্ঞানের উপর অতবেশি আস্থাশীল নই, যেরূপ আস্থাশীল আমি রাসূলে আকরাম (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের উপর। আমিও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল সুন্নাতের কর্ম ও বর্জনের অবিকল ও হুবহু অনুসরণকেই নিরাপদ পথ বলে মনে করি। একেই আমি নাজাত, কামালাত ও সকল নিয়ামতের একমাত্র পথ বলে বিশ্বাস করি। এই পুস্তকটিও এই ধরনের সরল অনুসারীদের জন্য লেখা, যারা উদ্ভাবনের চেয়ে হুবহু অনুসরণ করাকেই নিরাপদ মনে করেন।

সুন্নাতের বাইরে ইবাদত বন্দেগি কবুল হবে না বলে অনেক হাদীসে বলা হয়েছে। যদিও পরবর্তী অনেক প্রাজ্ঞ আলিম আশ্বাস দিয়েছেন যে, খেলাফে সুন্নাত অনেক কর্মই আল্লাহ কবুল করে বিশেষ সাওয়াব দিবেন, কিন্তু অনেক মুমিনের মন এতে স্বস্তি পায় না। তাঁরা সুন্নাতের বাইরে যেতে চান না। ক্ষণস্থায়ী এই জীবন। ইবাদত বন্দেগি কতটুকুই বা করতে পারি। এই সামান্য কাজও যদি আবার বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো তা সীমাহীন দুর্ভাগ্য। এজন্য তাঁরা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত সম্মত আমল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাঁদের উদ্দেশ্যেই এই পুস্তক লেখা।

(১০) শব্দ বনাম বাক্য

আমরা বুঝতে পারছি যে, আল্লাহর যিক্র একটি ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্তারিতভাবে এই ইবাদতের সকল পদ্ধতি ও বাক্য শিখিয়েছেন। তিনি যেখানে যে বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন সেখানে তা বললেই প্রকৃত আল্লাহর যিক্রের ইবাদত আদায় হবে। হজ্বের মাঠের আল্লাহর যিক্র, ঈদের দিনগুলির আল্লাহর যিক্র, ঘরে প্রবেশের আল্লাহর যিক্র, খাবার গ্রহণের আল্লাহর যিক্র, সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্র, ... ইত্যাদি সবই আল্লাহর যিক্র। কিন্তু প্রত্যেক প্রকার যিক্রের জন্য পৃথক পৃথক মাসনূন বাক্য রয়েছে। মনগড়াভাবে বানানো যিক্র করলে, বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে মহান আল্লাহর নাম জপ করলে, অথবা এক স্থান বা সময়ের যিক্র অন্য স্থানে ব্যবহার করলে সুন্নাতের বিরোধিতা করা হবে। আমরা সদা সর্বদা তাঁর সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের চেষ্টা করব।

এখানে উল্লেখ্য যে, অগণিত হাদীসে ও সাহাবীগণের জীবনের অগণিত ঘটনায় আমরা অসংখ্য যিক্র আযকার দেখতে পাই। এ সকল যিক্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এগুলি সবই 'বাক্য' যা একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। অগণিত হাদীসের একটিতেও এবং সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবনে আচরিত অগণিত ঘটনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই না যে, শুধুমাত্র একটি শব্দ বা শুধুমাত্র আল্লাহর নাম জপ করে যিক্র করতে বলা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর নামের স্তুতিকেই যিক্র বলা হয়েছে। মাসনূন যিক্রের মূল বৈশিষ্ট্য শুধু আল্লাহর নাম জপ নয়, আল্লাহর নামের স্তুতি, প্রশংসা, মহিমা ও মর্যাদা বারংবার উচ্চারণ করা বা জপ করা।

মহান মহাপবিত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমীনের মহান নামের প্রশংসা, মর্যাদা, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, একত্ব ইত্যাদি প্রকাশক বাক্য বারবার জপ করার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করাকে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যিক্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত এ সকল জপমূলক বাক্যাদির মূল চারিটি বাক্য : 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। পঞ্চম বাক্য - 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। এছাড়া এগুলির সমন্বয় ও প্রাসঙ্গিক আরো অনেক বাক্য কুরআন ও হাদীসে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা পরবর্তী সময়ে মাসনূন জপমূলক যিক্রের প্রকার ও শব্দাবলী আলোচনা করব। এ সকল বাক্যাদি বারবার নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা অনির্দিষ্টভাবে অগণিতবার জপ করা বা আওড়ানোকে বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসে যিক্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অগণিত হাদীস আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করছি – যে হাদীসে 'আল্লাহর যিক্র' অর্থ কী তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الذين يذكرون الله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن

"যারা আল্লাহর যিক্র করেন অর্থাৎ তাঁর তাসবীহ 'সুবহানাল্লাহ', তাহমীদ 'আল-হামদু লিল্লাহ', তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' ও তাহলীল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জপ করেন তাঁদের এ সকল যিক্র আরশের পাশে জড়িয়ে থাকে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো যাকিরকে স্মরণ করতে থাকে।"[১]

চ. আল্লাহর যিক্রের সাধারণ ফযীলত

আমরা উপরে যিক্রের প্রকার ও প্রকরণ জেনেছি। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যিক্রের ফযীলতের মধ্যে সকল প্রকারের যিক্রই

এসে যায়। তবে হাদীস শরীফে সাধারণত বিশেষ যিক্‌র বা তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে যিক্‌রের ফযীলত বিষয়ক অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন: "باب فضل ذكر الله" "আল্লাহর যিক্‌রের ফযীলতের অধ্যায়"। আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী এই নামের ব্যাখ্যায় বলেন: "আল্লাহর যিক্‌রের ফযীলত" – এখানে যিক্‌র অর্থ ঐ সকল শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা যা বললে সাওয়াব হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে; যেমন – 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুল্লিাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' বলা। এসকল বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বাক্য, যেমন: 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', 'বিসমিল্লাহ', 'হাসবুনাল্লাহ', 'ইস্তিগফার' ইত্যাদি বলা, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করা, সবই যিক্‌র। এছাড়া যে কোনো ফরয বা নফল কাজ নিয়মিত করাকেও যিক্‌র বলে গণ্য করা হয়। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত করা, হাদীস পাঠ করা, জ্ঞান চর্চা করা, নফল সালাত আদায় করা।

অপরদিকে যিক্‌র শুধুমাত্র জিহ্বার দ্বারাও হতে পারে। জিহ্বার উচ্চারণের কারণে উচ্চারণকারী সাওয়াব পাবেন। উচ্চারণের সময় উচ্চারিত বাক্যের অর্থ মনের মধ্যে উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। তবে শর্ত যে, উক্ত উচ্চারিত বাক্যের বিপরীত কোনো অর্থ তার উদ্দেশ্য হবে না। মুখের উচ্চারণের সাথে সাথে যদি অন্তরের স্মরণ (ক্বলবী যিক্‌র) সংযুক্ত হয় তাহলে তা হবে উত্তম ও পরিপূর্ণতর। আর যদি এর সাথে যিক্‌রের বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণরূপে মনের মধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহলে তা আরো পূর্ণতা পাবে। সালাত, জিহাদ বা যে কোনো ফরয ইবাদতে যদি এরূপ অবস্থা উপস্থিত থাকে তাহলে তাও পূর্ণতা পাবে। সর্বোপরি পরিপূর্ণ ইখলাস, আন্তরিকতা ও অন্তরের পরিপূর্ণ তাওয়াজ্জুহ যদি আল্লাহর প্রতি হয় তাহলে তা হবে সর্বোত্তম কামালাত ও সর্বোচ্চ পূর্ণতা।

ফাখরুদ্দীন রাযী (রহ) যিক্‌রকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। মুখের বা জিহ্বার যিক্‌র 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুল্লিাহ', 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ করা। ক্বালবের বা মনের যিক্‌র আল্লাহর জাত, গুণাবলী, বিধানাবলী, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যিক্‌র সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সদা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে রত থাকা। আর এজন্যই সালাতকে কুরআনে যিক্‌র বলা হয়েছে।

কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন: যিক্‌র ৭ ভাবে করা হয় – চোখের যিক্‌র ক্রন্দন, কানের যিক্‌র মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর কথা শ্রবণ করা, মুখের যিক্‌র আল্লাহর প্রশংসা করা, হাতের যিক্‌র দান করা, দেহের যিক্‌র আল্লাহর বিধান পালন করা, ক্বলবের যিক্‌র আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া ও আল্লাহর রহমতের আশা করা এবং আত্মার যিক্‌র আল্লাহর তাকদীর ও ফয়সালার উপর পরিপূর্ণ রাজি ও সন্তুষ্ট হওয়া।[১]

মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) বলেন: আল্লামা ইবনুল জাযারী (৮০৮ হি) বলেছেন: "যিক্‌রের ফযীলত শুধু তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যিনিই আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত বা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোনো কর্মে লিপ্ত আছেন তিনিই যিক্‌রে লিপ্ত আছেন বা তিনিই যাকির। সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র কুরআন কারীম, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে যিক্‌রের বিধান দিয়েছেন সেখানে সেই যিক্‌রই উত্তম, যেমন রুকু ও সাজদার অবস্থায়। অন্য সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ যিক্‌র কুরআন।"[২]

মুল্লা আলী কারী অন্যত্র বলেন: "আল্লাহর যিক্‌র অর্থ ঐ সকল যিক্‌র যা জপ করলে বা পাঠ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত পাঠ, তাসবীহ, তাহলীল, পিতামাতার জন্য দু'আ বা অনুরূপ যিক্‌রাদি। আর আল্লাহর যিক্‌রকারী বা যাকির বলতে তাঁকে বুঝান হয় যিনি হাদীস শরীফে বর্ণিত মাসনূন যিক্‌রগুলি সকল সময়ে ও অবস্থায় পালন করেন।"[৩]

এ বিষয়ে অন্যান্য উলামায়ে কেরামও অনুরূপ অনেক কথা বলেছেন। তাঁদের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যিক্‌রের ফযীলত-জ্ঞাপক হাদীসসমূহে সাধারণত যিক্‌র বলতে তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি আযকার বুঝানো হয়েছে। এছাড়া সকল প্রকারের ইবাদত ও আনুগত্যই যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা এখানে এ যিক্‌রের ফযীলত-জ্ঞাপক কিছু সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস আলোচনা করব। দুই একটি যয়ীফ হাদীসের আলোচনা প্রসঙ্গত আসলে আমি তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করব, ইন্‌শা আল্লাহ। আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

হাদীস শরীফে কয়েকভাবে যিক্‌রের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে : (১). সাধারণভাবে যিক্‌রের ফযীলত, (২). প্রত্যেক প্রকার যিক্‌রের জন্য বিশেষ ফযীলত এবং (৩). বিশেষ সময়ের বিশেষ যিক্‌রের ফযীলত। প্রথমে আমরা যিক্‌রের সাধারণ ফযীলত বিষয়ক কিছু হাদীস আলোচনা করব।

(১). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ

"নিঃসঙ্গ একাকী মানুষেরা এগিয়ে গেল।"

সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল, মুফাররাদ বা একাকী মানুষেরা কারা?" তিনি বলেন:

الذَّاكِرونَ اللهَ كثيراً

"আল্লাহর বেশি বেশি যিক্‌রকারীগণ ।"[১]

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন :

المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون إليه يوم القيامة خفافاً

"একাকী অগ্রগামীগণ হলেন ঐ সকল মানুষ, যারা আল্লাহর যিক্‌রে মত্ত ও সর্বদা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর যিক্‌র করেন। যিক্‌রের কারণে তাঁদের (গোনাহের) বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁরা হাল্কা হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবেন।"[২]

(২). হযরত মুআয ইবনু জাবাল (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার সর্বশেষ যে কথাটি হয়েছিল, যে কথাটি বলে আমি তাঁর থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিলাম তা হলো, আমি প্রশ্ন করেছিলাম : হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয় আমল (কর্ম) কোনটি ? তিনি বলেছিলেন :

أحـب الأعـمال إلى الله أن تـمـوت ولـسانك رطـب من ذكـر الله

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম যে, তুমি যখন মৃত্যু বরণ করবে তখনো তোমরা জিহ্বা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকবে।"[৩]

অর্থাৎ, সদা সর্বদা মুমিন মুখে আল্লাহর যিক্‌র করবে। আল্লাহর যিক্‌রে তাঁর জবান সর্বদা আর্দ্র থাকবে। এরূপ হলে তাঁর যখন মৃত্যু হবে তখনো তাঁর জবান যিক্‌রেই ব্যস্ত থাকবে।

(৩). হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) বলেন : একব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের বিধানাবলী আমার জন্য বেশি হয়ে গিয়েছে। আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকব। তিনি বলেন :

لا يَـزَالُ لِـسَـانُـكَ رَطْـبًا مِـنْ ذِكْـرِ اللَّهِ

"তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকে।"[৪]

(৪). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ৭ শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের কঠিন দিনে তাঁর বিশেষ ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ :

رَجُـلٌ ذَكَـرَ اللَّهَ خَـالِـيًا فَـفَـاضَـتْ عَـيْـنَاهُ

"ঐ মানুষ যিনি একাকী আল্লাহর যিক্‌র করেছেন আর তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমেছে।"[৫]

(৫). হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র হয় না তাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"[৬]

(৬). হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ صَلَّى الْغَـدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَـعَدَ يَـذْكُـرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْـلُـعَ الشَّمْـسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْـعَـتَـيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْـرِ حَجَّـةٍ وَعُمْـرَةٍ...تَامَّـةٍ تَامَّةٍ تَامَّـةٍ

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে, এরপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্‌রে রত থাকবে। অতঃপর সে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব পাবে, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব)।"[৭]

এই অর্থে আরো অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট অধ্যায়ে আমারা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার করব, ইন্‌শা আল্লাহ।

(৭). হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন :

ألا أنـبئكم بخيـر أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهـب والورق وأن تلقوا عدوكم فتـضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله قال: ذكـر الله. وقال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكـر الله عز وجل

"আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্ম কোন্‌টি? তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের জন্য

সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়েও উত্তম, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রু নিধন করতে করতে শাহাদত বরণ করার থেকেও উত্তম কর্ম কি তা-কি তোমাদেরকে বলব? সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, সেই কর্মটি কী? তিনি বললেন : 'আল্লাহর যিক্‌র।' মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন : আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিক্‌রের চেয়ে উত্তম ইবাদত আর কিছুই নেই।" হাদীসটির সনদ হাসান।[১]

(৮). একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন :

أكــثــروا ذكــر الله حــتــى يــقــولوا مجــنــون

"তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র কর যেন মানুষেরা তোমাদেরকে পাগল বলে।" হাদীসটিকে কোনো কোনো মুহাদ্দিসগণ সহীহ বা হাসান অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অপরদিকে অন্যান্য মুহাদ্দিস বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে হাদীসটির সনদের দুর্বলতা প্রমাণ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনায় বুঝা যায় যে হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়, যয়ীফ বা দুর্বল।[২]

(৯). এই অর্থে অন্য একটি অত্যন্ত যয়ীফ হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

اذكروا الله ذكــرا حتى يقول المنافقون إنكــم مــراؤون

"তোমরা এমনভাবে আল্লাহর যিক্‌র করবে যেন মুনাফিকরা বলে যে, তোমরা রিয়াকারী।"[৩]

(১০). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন:

أنا مع عبــدي ما ذكــرني وتحركــت بي شفــتاه

"আমার বান্দা যতক্ষণ যতক্ষণ আমাকে স্মরণ করেছে (আমার যিক্‌র করেছে) এবং আমার জন্য তার দুই ঠোঁট নড়াচড়া করেছে ততক্ষণ আমি তাঁর সঙ্গে আছি।"[৪]

(১১). আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ليذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلا

"অনেক মানুষ দুনিয়াতে সুন্দর পরিপাটি বিছানায় আল্লাহর যিক্‌র করবেন, যিক্‌র তাঁদেরকে উচ্চ মর্যাদার মধ্যে প্রবেশ করাবে।" হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। তবে হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন।[৫]

(১২). হযরত মু'আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا ان يضرب بسيفه حتى ينقطع ثلاث مرات

"আযাব থেকে রক্ষার জন্য কোনো মানুষ আল্লাহর যিক্‌রের চেয়ে উত্তম কোনো আমল কখনো করতে পারেনি (আযাব থেকে রক্ষার জন্য যিক্‌রের চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই)। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি যিক্‌রের চেয়ে উত্তম নয়? তিনি বলেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও যিক্‌রের চেয়ে উত্তম নয়, তবে যদি সে তাঁর তরবারি দ্বারা আঘাত করতে করতে তিন বার শেষ হয়ে যায় (তাহলে তা যিক্‌রের চেয়ে উত্তম হতে পারে)।"[৬] জাবির (রা) থেকেও একই অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে।[৭]

(১৩). হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل

"যদি কোনো ব্যক্তির কোলে কিছু টাকা থাকে এবং সে তা দান করতে থাকে আর অপর ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌র করে, তাহলে আল্লাহর যিক্‌রকারীই উত্তম বলে গণ্য হবে।"[৮]

(১৪). হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما من صــدقــة أفــضــل من ذكــر الله

"আল্লাহর যিক্‌রের চেয়ে উত্তম কোনো সাদকাহ বা দান নেই।"[৯]

(১৫). হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, আমাকে ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন :

عليك بتقوى الله ما استطعت واذكر الله عند كل حجر وشجر وما عملت من ســوء فأحــدث لله فيه تــوبة الســر بالسر والعلانــية بالعلانــية

"তুমি যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া আঁকড়ে ধরে) চলবে। প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিক্‌র করবে।

কোনো পাপ বা অন্যায় করলে নতুন করে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে। গোপনের জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যের জন্য প্রকাশ্যে।"[১]

(১৬). হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من عجـز منكم عن الليل أن يكابده وبـخل بالمال أن يـنفـقه وجـبن عن العـدو أن يجاهده فليـكثر ذكر الله

"তোমাদের মধ্যে যে রাত জেগে ইবাদত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, কৃপণতার কারণে সম্পদ দান করতে পারে না, কাপুরুষতার কারণে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে অক্ষম হয়, সে যেন বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করে।"
হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল।[২]

(১৭). আনাসের আম্মা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে ওসীয়ত করুন। তিনি বলেন :

اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره

"তুমি সকল পাপ ত্যগ করবে ; কারণ পাপত্যগই সর্বোত্তম হিজরত। সকল ফরয ইবাদত নিয়মিত পরিপূর্ণভাবে পালন করবে ; কারণ এটিই সর্বোত্তম জিহাদ। বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করবে ; কারণ তুমি আল্লাহর বেশি বেশি যিক্‌র করার চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো বস্তু নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারবে না।" হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে।[৩]

(১৮). হযরত মু'আয ইবনু আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল: "কোন্ মুজাহিদের পুরস্কার সবচেয়ে বেশি ?" তিনি বললেন:

أكـثـرهـم لله تـبـارك وتعـالى ذكـرا

"তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিক্‌র করে।"

তখন সে প্রশ্ন করল : "তাহলে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী নেককার মানুষ কে ?" তিনি বললেন : "তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিক্‌র করে।" এরপর সে সালাত, যাকাত, হজ্ব, দান ইত্যাদি ইবাদতের কথা জিজ্ঞাসা করে। সকল ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أكـثـرهـم لله تـبـارك وتعـالى ذكـرا

"তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিক্‌র করে।" তখন হযরত আবু বকর (রা) ওমরকে (রা) বলেন : "যাকিরগণ সকল সাওয়াব নিয়ে গেলেন।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "হাঁ।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৪]

(১৯). হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لم يتحسـر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكـروا الله تعالى فيها

"জান্নাতের অধিবাসীগণ দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করবেন না, শুধুমাত্র যে মুহূর্তগুলি আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে সেগুলির জন্য তাঁরা আফসোস করবেন।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[৫]

(২০). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة وما مشى أحد ممشى (ما من أحد مشى طريقاً) لم يذكر الله فيه إلا كان عليه تـرة وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه تـرة

"যদি কয়েকজন মানুষ কোথাও একত্রে বসে কিন্তু সেই বৈঠকে তারা আল্লাহর যিক্‌র না করে তবে তা তাদের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। যদি কোনো মানুষ সামান্য পরিমাণও হাঁটে এবং সেই হাঁটার মধ্যে সে আল্লাহর যিক্‌র না করে, তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। যদি কোনো মানুষ বিছানায় শোয় এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র না করে তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে।" হাইসামী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬]

(২১). হযরত হারিস আল-আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেন, যেগুলি তিনি পালন করবেন এবং বনী ইসরাঈলকে সেগুলি পালনের শিক্ষা দিবেন : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, সালাত (নামায) আদায়কালে মন বা চোখকে এদিক সেদিক না নেওয়া, সিয়াম পালন করা, দান করা এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করা। যিক্‌র সম্পর্কে তিনি বলেন :

وأمـركم بذكـر الله كثيرا ومثـل ذكر الله كمثل رجل طـلـبه العـدو سراعا في أثـره حتى أتى حصنا حصـينا فأحـرز نفـسه فيه وكذلك العـبد لا يـنجو من الشيطان إلا بذكـر الله

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করার। আর আল্লাহর যিক্‌রের উদাহরণ এমন যে, এক

ব্যক্তিকে শত্রুগণ ধাওয়া করে তার পিছে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় লোকটি একটি সুসংরক্ষিত দুর্গে এসে পৌছাল এবং সে দুর্গের মধ্যে আত্মরক্ষা করল। অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পায় না।" হাদীসটি সহীহ।[১]

(২২). উপরের সহীহ হাদীসটির অর্থবোধক দুটি যয়ীফ হাদীস আমাদের সমাজে প্রচলিত। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে :

إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه

"শয়তান তার মুখ আদম সন্তানের ক্বলবের উপর রেখে দেয়। যদি আদম সন্তান আল্লাহর যিক্‌র করে, তাহলে শয়তান পিছিয়ে যায়। আর যদি সে আল্লাহর কথা ভুলে যায়, তাহলে শয়তান তার ক্বলবকে গিলে ফেলে।" হাদীসটি যয়ীফ।[২]

এই অর্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন :

الشيطان جاثـم على قـلـب ابن آدم فاذا سـها وغـفـل وسـوس وإذا [عـقـل و] ذكـر الله خـنـس

"শয়তান আদম সন্তানের ক্বলবের উপর আসন গেড়ে বসে। যখন সে ভুলে যায় ও বেখেয়াল হয়, তখন সে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। আর যখন সে সচেতন হয় এবং আল্লাহর যিক্‌র করে তখন শয়তান পিছিয়ে সংকুচিত হয়ে যায়।"[৩]

(২৩). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে:

إن لـكل شيء صـقالة وإن صـقالة القـلوب ذكـر الله

"নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর সাফাই ও পরিচ্ছন্নতা আছে। আর ক্বলব বা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা বা ছাফাই আল্লাহর যিক্‌র।" হাদীসটির সনদ যয়ীফ।[৪]

দু'টি ভুল ধারণা :

এই যয়ীফ হাদীসটি সমাজে অতি পরিচিত। এখানে দুটি বিষয় ভুল বুঝা হয়:

প্রথমত, 'আল্লাহর যিক্‌র' বলতে ' আল্লাহ, আল্লাহ,... ' যিক্‌র বুঝা।

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে কখনোই আল্লাহর যিক্‌র বলতে শুধু আল্লাহর নাম জপ করা বা 'আল্লাহ আল্লাহ' যিক্‌র করা বুঝানো হয় নি। বরং আল্লাহর নামের মর্যাদা জপ করা বুঝানো হয়েছে। শুধু আল্লাহ নামটি জপ করলে আভিধানিকভাবে তা 'যিক্‌র' বলে গণ্য হতে পারে, তবে তা মাননূন বা সুন্নাত পদ্ধতি নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই সকালে, সন্ধ্যায়, অন্য কোনো সময়ে, নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা বেশি বেশি করে শুধু 'আল্লাহ' নামটি জপ করেন নি বা করতে শিক্ষা দেন নি। সাহাবীগণও অনুরূপ কিছু করেন নি। এখন যদি কেউ মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর যিক্‌রের জন্য যে সকল বাক্যাদি শেখালেন ও পালন করলেন সেসকল যিক্‌রে ক্বলব সাফ হবে না, আল্লাহর নামের মহিমা, মর্যাদা, গুণগান, স্তুতি প্রকাশক বাক্যাদি জপ করে তাঁর যিক্‌র করলে ক্বলব সাফ হবে না বরং সকল মর্যাদা, প্রশংসা, স্তুতি, মহিমা ও গুণগান জ্ঞাপক শব্দ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাঁর মহান নামটি জপ করলেই ক্বলব সাফ হবে, তবে ধারণাটি ঠিক হবে না।

মহা মহিমান্বিত আল্লাহর পবিত্র নাম মুমিনের হৃদয়ে সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাঁর নামেরই যিক্‌র করতে হবে। তাঁর মহান "আল্লাহ" নামে বা যে কোনো নামে যে কোনো ভাষায় তাঁর স্মরণ করলেই তাঁর যিক্‌রের সাওয়াব মিলবে, ইন্‌শা আল্লাহ। তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে মাসনূন-ভাবে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর যিক্‌র করার। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পরি যে, শুধু নাম জপ করে নয়, বরং তাঁর নামের মহিমা প্রকাশ করে যিক্‌র করতে হবে। তিনি উম্মতকে শত শত প্রকারের যিক্‌র শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজেও পালন করেছেন। কিন্তু শুধু "আল্লাহ" নাম জপ করতে হবে একথা তিনি কোথাও শেখাননি। তাঁর শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দু'আর ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম ধরে তাঁকে ডাকতে হবে, দু'আ করতে হবে, তাঁর সকল মহান নাম ও বিশেষ করে 'ইসমে আযম' ধরে তাঁর কাছে দু'আ করতে হবে। আর যিক্‌রে তাঁর নামের মহিমা, মর্যাদা, গুণগান, স্তুতি প্রকাশক বাক্যাদি জপ করে তাঁর যিক্‌র করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করেন, ক্বলব সাফ করতে হলে যিক্‌রের শব্দ দিয়ে জোরে জোরে ক্বলবে ধাক্কা মারা বা আঘাত করার কল্পনা করতে হবে।

এই ধারণাটিও ভুল ও সুন্নাত পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে অগণিত যিক্‌র শিক্ষা দিয়েছেন। কখনো কোথাও যিক্‌রের সময় এ ধরনের শব্দ করতে বা আঘাত করতে শেখাননি। বরং নীরবে ও অনুচ্চস্বরে যিক্‌র করতে শিখিয়েছেন। একেবারে শেষ যুগের কোনো কোনো যাকির মনোযোগ অর্জনের জন্য এ সকল পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। আবার অনেকে তার বিরোধিতা করেছেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী কোনো প্রকার যিক্‌রের সময় কোনো প্রকার শব্দ করতে বা শরীর, মাথা ইত্যাদি নাড়াতে নিষেধ করেছেন। সর্বাবস্থায় এ সকল কাজের সাথে যিক্‌রের কোনো সম্পর্ক নেই। যে কোনো মাসনূন পদ্ধতিতে আল্লাহর স্মরণ করলে মুমিন আল্লাহর যিক্‌রের উপরে বর্ণিত মর্যাদা, ফযীলত, উপকার সবই অর্জন করবেন।

ছ. বিশেষ যিক্‌রের বিশেষ ফযীলত

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা সাধারণভাবে যিক্‌রের গুরুত্ব ও ফযীলত জানতে পারলাম। কোনো মুমিন যেকোনো-ভাবে মুখে, মনে বা কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করলে উপরের হাদীসগুলিতে বর্ণিত অপরিমেয় ফযীলত লাভ করবেন বলে আমরা আশা করি। যিক্‌রের ফযীলতের উপর আরো অগণিত হাদীস রয়েছে, যেগুলিতে যিক্‌রের বিশেষ বিশেষ শব্দ ও বাক্য উল্লেখ করে সেই বাক্য দ্বারা যিক্‌র করলে মুমিন কিভাবে ও কী পরিমাণ মর্যাদা, রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জন করবেন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেছেন। এ সকল হাদীসগুলিকে আমরা দুই প্রকারে ভাগ করতে পারি। প্রথম প্রকারের হাদীসে সর্বদা বেশি বেশি পালন করার জন্য কিছু যিক্‌র ও তার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসে বিশেষ সময়ে পালনের জন্য কিছু যিক্‌রের কথা উল্লেখ করে তার ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসগুলি আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে সময় নির্ধারিত যিক্‌রের আলোচনার সময় উল্লেখ করব, ইন্‌শা আল্লাহ। সেখানে আমরা দেখব সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা, ফরয সালাতের পর, ঘুমানোর সময়, শেষ রাত্রে ইত্যাদি সময়ে পালনের জন্য বিশেষ বিশেষ যিক্‌র মহানবী ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। সাথে সাথে সেসকল যিক্‌র পালনের ফলে মুমিন জাগতিক, দৈহিক, পারিবারিক, মানসিক, আত্মিক ও পারলৌকিক দিক দিয়ে কিভাবে লাভবান হবেন ও কী মহান মর্যাদা, উন্নতি অর্জন করবেন তার বিবরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্তারিতভাবে উম্মতকে জানিয়েছেন।

জ. মাসনূন যিক্‌রের শ্রেণীবিভাগ

'মাসনূন' অর্থ সুন্নাত-সম্মত বা সুন্নাত নির্দেশিত। রাসূলে আকরাম ﷺ আমাদেরকে কেবলমাত্র শুধু যিক্‌রের উৎসাহ দিয়েছেন তাই নয়, কিভাবে কখন কোন্ কোন্ শব্দ উচ্চারণ করে আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে তাও বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি উম্মতকে আলোকিত রাজপথের উপর রেখে গিয়েছেন। উম্মতের কাজ শুধু তার অনুসরণ করা।

আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মাসনূন যিক্‌র সবই বাক্য, শুধুমাত্র নাম বা শব্দ জপ করে কোনো যিক্‌র সুন্নাতে বর্ণিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের আচরিত বা নির্দেশিত এ জাতীয় যিক্‌রসমূহকে আমরা নিম্নরূপে বিভক্ত করতে পারি :

১. আল্লাহর একত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি ;
২. আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;
৩. আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;
৪. আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি ;
৫. আল্লাহর উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;
৬. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি ;
৭. আল্লাহর নিকট সাধারণ প্রার্থনা, দু'আ বা জাগতিক ও পারলৌকিক যে কোনো কল্যাণ যাচ্ঞা করা বিষয়ক বাক্যাদি;
৮. আল্লাহর নিকট তাঁর মহান রাসূল ﷺ-এর জন্য সালাত ও সালাম প্রার্থনা জ্ঞাপক বাক্যাদি;
৯. আল্লাহর কালাম বা কুরআন করীম পাঠের মাধ্যমে যিক্‌র। কুরআন কারীম তিলাওয়াত সকল যিক্‌রের মূল। এর বাইরের মাসনূন যিক্‌রের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর স্তুতি, প্রশংসা, ক্ষমতা বা পবিত্রতা জপ করেন অথবা সাথে সাথে কিছু প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা নিজের ক্ষমার জন্য, প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা অন্য কারে জন্য, বিশেষত মহানবী ﷺ-এর মর্যাদার জন্য। আমি ৯ প্রকার যিক্‌র সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

১.আল্লাহর একত্ব প্রকাশক বাক্যাদি

<u>যিক্‌র নং ১ :</u> **لا إله إلا الله**

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)।

এটি এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম যিক্‌র। লক্ষণীয় যে, হাদীস শরীফে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিক্‌রের জন্য কোনো সময় বা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। সর্বদা বেশি বেশি করে এই যিক্‌র করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে অনেক আবেগী ইসলাম-প্রিয় সাধারণ মানুষ ও আলিম 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে যিক্‌র হিসাবে পালন করাকে অযৌক্তিক বলে মনে করেন বা করতে চান। তারা বলেন, এই কালেমাই ঈমান। একবার সর্বান্তকরণে বললেই হলো। এরপরের কাজ নিজের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এই কালেমাকে প্রতিষ্ঠা করা। বারবার আউড়ে কী হবে? বিবাহের কালেমা ও ইজাব কবুল তো একবারই বলা হয়। এতেই আজীবন স্বামীর ঘর করতে হয়। বারবার আউড়ানোর কোনো প্রয়োজন হয় না।

কথাটি শুনতে খুব যৌক্তিক মনে হলেও কিছুটা বিভ্রান্তিকর ও ইসলাম বিরোধী। কালেমার ঘোষণার মাধ্যমে ঈমান আনার পর আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে একথা অবশ্যই ঠিক। কেউ যদি তার উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব পালন না করে নফল যিক্‌রে রত থাকেন তাহলে তার এই কর্ম বাতুলতা ও ইসলামের শিক্ষা বিরোধী। কিন্তু এজন্য এই কালেমার যিক্‌রকে অর্থহীন বললে মহানবী ﷺ-কেই অবমাননা করা হয়। কারণ, তিনি নিজেই এই কালেমাকে বেশি বেশি পাঠ করে যিক্‌র করতে বলেছেন।

'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বাক্যটি বারবার জপ করার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র করার নির্দেশনায় এবং এই যিক্‌রের অচিন্ত্যনীয়

ফযীলতের ঘোষণায় অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১] আসলে ঈমান আনার পরে ঈমানকে মজবুত করতে ও নবায়ন করতে এই যিক্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি। হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أفـــضـــل الـــذكـــر لا إله إلا الله وأفــضـــل الـــدعـــاء الـــحـــمد لله

"সর্বোত্তম যিক্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দু'আ আলহামদুলিল্লাহ।" হাদীসটি সহীহ।[২]

তবে যতবারই বলতে হবে ততবারই অন্তরের ভালবাসা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে বলতে হবে। যিক্রের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্তরকে যিক্রের সাথে সাথে আলোড়িত করতে হবে। বারবার উচ্চারণের সাথে সাথে নতুন করে ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে হবে। যাকির অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিবার যিক্র উচ্চারণের সাথে সাথে নিজের ক্বলব বা মন থেকে আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্য ও সকল আরাধ্যকে দূর করে দেবে। আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুর অস্তিত্বই সে তাঁর মন থেকে সরিয়ে দেবে। একমাত্র আল্লাহ, তাঁরই ভয়, তাঁরই ভালবাসা, তাঁরই উপর নির্ভরতা, তাঁরই উপাসনা, তাঁর কাছেই চাওয়া, তাঁকেই চাওয়া হবে মুমিনের অন্তরের একমাত্র অনুভূতি। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে এই যিক্র উচ্চারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এই যিক্রের মাধ্যমে ঈমানকে নবায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন :

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه

"কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আমার শাফা'আত লাভ করবে, যে তাঁর অন্তরের পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।"[৩]

আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار: لا إله إلا الله

"আমি এমন একটি বাক্য জানি, যে বাক্যটি যদি কেউ তাঁর অন্তর থেকে সত্যিকারভাবে বলে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে জাহান্নাম তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। বাক্যটি: 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

কাজেই মুমিন সর্বান্তকরণে অন্তরের সকল আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে বারবার এই বাক্যটি বলবেন, যেন মৃত্যুর আগে এই বাক্যটি তাঁর শেষ বাক্য হয়। বারবার বলে তিনি তাঁর ঈমানকে নবায়ন করবেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

جـــددوا إيـــمـــانـــكـــم

"তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর।" তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিভাবে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়িত করবো?" তিনি বললেন :

أكـــثـــروا مـــن قـــول لا إلـــه إلا الله

"তোমরা বেশি বেশি করে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।" হাদীসটির সনদ হাসান অর্থাৎ সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য।[৫]

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من كان آخـــر كلامـــه لا إله إلا الله دخـــل الجـــنـــة

"যার সর্বশেষ কথা 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৬]

আমরা জানি যে, যে ব্যক্তি সর্বদা এই যিক্রে তাঁর জিহ্বাকে রত রাখবেন, নিজের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই কালেমার যিক্র করবেন, ইন্‌শা আল্লাহ এই বাক্য তাঁর জীবনের শেষ বাক্য হবে।

আরো অনেক হাদীসে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যিক্র হিসাবে পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেগুলি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ।

<u>যিক্র নং ২ :</u>

আল্লাহর একত্ব জ্ঞাপক যিক্রের দ্বিতীয় বাক্য :

لا إله إلا الله وحـــده لا شـــريـــك له له المـــلك وله الـــحـــمد وهو على كل شـــيء قـــديـــر

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ : "নেই কোন মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

এই যিক্রটির ফযীলতে অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সকালে সন্ধ্যায় ১ বার, ১০ বার, ১০০ বার বা ২০০ বার বলতে, প্রতি

ওয়াক্ত সালাতের পরে বলতে ও সাধারণভাবে এই যিক্‌রটি বলতে নির্দেশ দিয়ে অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু হাদীস আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখতে পাব। এখানে দু'একটি হাদীস উল্লেখ করছি।

হযরত আবু আইউব (রা) নবীয়ে আকরাম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كعَدْلِ مُحَرَّرٍ أو محررين

"যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ... কাদীর' যিক্‌রটি একবার বলবে, সে একজন বা দুইজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।" হাদীসটি হাসান।[১] এই অর্থে হযরত বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[২]

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই যিক্‌রটি ১০ বার বলবে, সে ৪ জন ইসমাঈল বংশীয় ক্রীতদাসকে মুক্ত করার সাওয়াব অর্জন করবে।[৩]

এখানে আবারো আমাদের মনে করা দরকার যে, এই মহান সাওয়াব, অশেষ মর্যাদা ও সীমাহীন রহমত অর্জন করতে হলে অবশ্যই অর্থ বুঝে, আন্তরিকতার সাথে হৃদয়কে অর্থের সাথে আলোড়িত করে যিক্‌র আদায় করতে হবে। ইয়াকুব ইবনু আসিম বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুইজন সাহাবী বলেছেন, তাঁরা নবীজী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন :

ما قال عبد قط ... مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ناطقا بها لسانه إلا فتق الله عز وجل له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله

"যদি কোনো ব্যক্তি কখনো এই বাক্যগুলি বলে এবং বলার সময় তাঁর আত্মা এই বাক্যগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তাঁর অন্তর এগুলির সত্যতায় আস্থা রাখে এবং তাঁর জিহ্বা তা উচ্চারণ করে, তাহলে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ছেদ করে জমিনের এই যাকিরের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। আর মহান আল্লাহ যাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাঁর জন্য হক ও সুনিশ্চিত যে আল্লাহ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেনই।" হাদীসটি হাসান।[৪]

যিক্‌র নং ৩ :

উপরের এই যিক্‌রটি মাসনূন যিক্‌রগুলির মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অন্য যিক্‌রের সাথে বা শুধামাত্র এই যিক্‌রটি আমরা বারবার দেখতে পাব। কোনো কোনো হাদীসে এই যিক্‌রের মধ্যে তিনটি বাক্য বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد [يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير] وهو على كل شيء قدير

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, [**ইউ'হয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুআ হাইয়ুন লা ইয়ামুত, বিইয়াদিহিল খাইরু**] ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থ : "নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। (**তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব অমর। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ)** এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" অনেক বর্ণনায় শুধুমাত্র প্রথম বাক্যটি (ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু) সংযুক্ত করে বলা হয়েছে।

২, ৩, ৪. আল্লাহর পবিত্রতা, প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি

দ্বিতীয় প্রকার যিক্‌র আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক বাক্যাবলী। এই যিক্‌রের মূল বাক্য (সুব'হা-নাল্লাহ)। এছাড়াও হাদীসে এই প্রকার যিক্‌রের জন্য বিভিন্ন বাক্য শিক্ষা দান করা হয়েছে। আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক যিক্‌রের মাসনূন পাঁচটি বাক্য নিম্নরূপ:

যিক্‌র নং ৪ : **سُبْحَانَ اللهِ**

উচ্চারণ : 'সুব'হা-নাল্লা-হ', **অর্থ :** আল্লাহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

যিক্‌র নং ৫ : **سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ**

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী।

অর্থ : "আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা (বা প্রশংসাময় পবিত্রতা) ঘোষণা করছি।"

যিক্‌র নং ৬ : **سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ**

উচ্চারণ : সুবা'হা-নাল্লা-হিল আযীম।

অর্থ : "মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

যিক্‌র নং ৭ : **سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ**

উচ্চারণ : সুবাহা-নাল্লা-হিল আযীম ওয়া বি'হামদিহী।

অর্থ : "মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি ।"

যিক্‌র নং ৮ : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

উচ্চারণ : সুব্বূ'হুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূ'হ ।

অর্থ : "মহাপবিত্র, মহামহিম, ফিরিশতাগণের এবং পবিত্রাত্মার প্রভু ।"

আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক যিক্‌রের মাসনূন বাক্য মূলত একটি :

যিক্‌র নং ৯ : اَلْحَمْدُ لله

উচ্চারণ : আল 'হামদু লিল্লাহ । **অর্থ :** "প্রশংসা আল্লহর জন্য ।"

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক যিক্‌রের মূল মাসনূন বাক্য একটি :

যিক্‌র নং ১০ : اَللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার । **অর্থ :** "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ।"

উপরের ৪ প্রকার যিক্‌রের মূল বাক্য চারটি : ১, ৪, ৯ ও ১০ নং যিক্‌র । ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, হাদীস শরীফে "আল্লাহর যিক্‌র" বলতে এগুলিকেই বুঝানো হয়েছে । আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, এই চারিটি অর্থ এবং এই বাক্যগুলিই অধিকাংশ মাসনূন যিক্‌রের মূল । পৃথকভাবে বা একত্রে এগুলির সাথে অন্যান্য বাক্য সংযুক্ত হয়েছে ।

(ক) মানব জীবনে এ সকল যিক্‌রের কল্যাণ ও প্রভাব :

আমরা একটু চিন্তা করলেই অফুরন্ত সাওয়াবের পাশাপাশি এ সকল যিক্‌রের বিশেষ প্রভাব আমাদের জাগতিক জীবনে অনুভব করতে পারি ।

প্রতিটি মানুষের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামত রয়েছে, যা তার জীবনকে ধন্য করেছে । এর পাশাপাশি প্রত্যেকের জীবনেই কিছু কষ্ট, বেদনা ও সমস্যা আছে । যেগুলি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের তুলনায় অতি নগণ্য । কিন্তু সাধারণত মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা এসকল কষ্ট ও বেদনার অনুভূতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হই । শত নিয়ামতের বিপরীতে দুই চারিটি কষ্ট আমাদের পুরো মনকে ব্যথিত করে তোলে । ব্যর্থতা, কষ্ট, বেদনা, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতি আমরা লালন করি । এসকল অনুভূতির স্থায়িত্ব আমাদের মনকে কলুষিত ও অপবিত্র করে, মানসিক শক্তি ও প্রেরণাকে ব্যহত করে, আমাদের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে, আমাদের জীবনকে গ্লানিময় করে এবং সর্বোপরি আল্লাহর রহমত ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের পথ থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায় ।

আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে যেভাবে মনে করবে, সেভাবেই তাঁকে তার পাশে পাবে । জীবনের প্রতি না-বোধক অনুভূতি আল্লাহর রহমত থেকে বান্দাকে নিরাশ করে, যা কঠিনতম পাপ ও অবিশ্বাস । অপরদিকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন ।

এজন্য মুমিনকে নিজের মন কৃতজ্ঞতা দিয়ে আবাদ করতে হবে । সকল কষ্ট, বেদনা, ব্যর্থতা ও উৎকণ্ঠা থেকে মনকে সাফ করে আল্লাহর অশেষ নিয়ামতের কথা স্মরণ করে এগুলির জন্য কৃতজ্ঞতার অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে ভরতে হবে । আর অবিরত সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলতে হবে : 'আল-হামদু লিল্লাহ ।' এই যিক্‌র যাকিরের মনকে ভারমুক্ত করবে, গ্লানিমুক্ত করবে, শক্তিশালী করবে এবং আল্লাহর রহমত, নিয়ামত ও বরকত তাঁর জীবন ভরে তুলবে ।

অনুরূপভাবে 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', ইত্যাদি যিক্‌র যাকিরের হৃদয়কে আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিতে ভরে দেবে । পৃথিবীতে অন্য কারোর মহত্ত্ব, শক্তি বা বড়ত্ব তাঁকে প্রভাবিত করবে না । সকল ভয় ও হীনমন্যতার অনুভূতি থেকে এই হৃদয় পবিত্র হবে ।

'সুব'হা-নাল্লাহ' বাক্যটি আরবী ভাষার বাক্য-বিন্যাসের ফলে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ , যা অনেকটা জয়ধ্বনি বা জিন্দাবাদ ঘোষণার মতো । দেশ প্রেমিক যেমন বারবার নিজের দেশের জিন্দাবাদ বলে নিজের মনে দেশপ্রেমের আবেগ জাগিয়ে তোলে তেমনি আবেগে আল্লাহ প্রেমিক বান্দা বারবার তাঁর প্রভুর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ প্রেমের আবেগে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে ।

বিভিন্ন হাদীসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও এসকল বাক্যে বেশি বেশি যিক্‌রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার অপরিমেয় ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে । এখানে উল্লেখ্য যে এ বিষয়ে এত বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র এ বিষয়ক সহীহ হাদীস সংকলিত করলেই একটি বড় বই হয়ে যাবে । এ সকল অগণিত হাদীস থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত গুরুত্বের সাথে এ সকল যিক্‌র সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ফযীলত বর্ণনা করেছেন । আমি নিম্নে এসকল যিক্‌রের ফযীলত বিষয়ক কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি ।

(খ) এ সকল যিক্‌রের ফযীলত ও বেশি বেশি পালনের নির্দেশ

উপরের চার প্রকার যিক্‌রের মূল চারটি বাক্য : ১, ৪, ৯ ও ১০ নং যিক্‌রের একত্রে উল্লেখ করে এগুলির বেশি বেশি জপ করার নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করে ও তার অপরিমেয় সাওয়াব বর্ণনা করে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি : 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার'। তুমি ইচ্ছামতো এই বাক্য চারিটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলতে পার। (বাক্যগুলির সাজানোর ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বা ফযীলত নেই।)"[১]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لأن أقــول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحــب إلـــي مـــما طــلــعــت عــلــيه الشــمــس

"আমি 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতে এত বেশি পছন্দ করি যে, এগুলি বলা আমার কাছে পৃথিবীর বুকে সূর্যের নিচে যা কিছু আসে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়।"[২]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت يا رسول الله وما رياض الجنة قال المساجد. قلت وما الرتع قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

"তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহে যাবে বা তা অতিক্রম করবে তখন তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ভক্ষণ করবে। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি বললেনঃ মসজিদসমূহ। আমি বললামঃ বিচরণ ও ভক্ষণ কি? তিনি বললেনঃ 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'।" হাদীসটি হাসান।[৩]

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু বকরকে (রা) বলেন :

ألا تــرتــع فـــي روضـــة الجـنـــة

"তুমি কি জান্নাতের বাগানে তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ফল ভক্ষণ করবে না?" তিনি প্রশ্ন করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানের ফল ভক্ষণ কি?" তিনি বলেনঃ "'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'।"[৪]

এভাবে বিভিন্ন সহীহ ও হাসান হাদীসে এই বাক্যগুলির অপরিমেয় সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু মাস'উদ (রা), সালমান ফারিসী (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, এই বাক্য চারিটির প্রতিটি বাক্য একবার বললে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হয়।[৫]

আবু যার (রা) ও আয়েশা (রা) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "এই বাক্যগুলির প্রত্যেক বাক্য একবার যিক্‌র করা একবার আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার সমতুল্য।"[৬]

আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "এই বাক্যগুলি কিয়ামতের দিনে বান্দার আমল নামায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে।"[৭]

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "এই বাক্যগুলিই জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল।"[৮]

আনাস বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলি ঝরে যায় অনুরূপভাবে এই যিক্‌রগুলি বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়।"[৯]

আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আবু সাঈদ (রা) উভয়ে নবীয়ে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : "আল্লাহ এই চারটি বাক্যকে বেছে পছন্দ করে নিয়েছেন। এই বাক্যগুলির যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ ২০ টি সাওয়াব প্রদান করতেন এবং ২০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। আর এভাবে যে বেশি বেশি যিক্‌র করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে।"[১০]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كُـتِـبَـتْ لَـهُ بِـكُلِّ حَـرْفٍ عَشْـرُ حَـسَـنَـات

"এই চারিটি বাক্য যিক্‌রকারী প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে সাওয়াব লাভ করবেন।"[১১]

অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "হযরত নূহ (আ) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্রকে যে ওসীয়ত

করেন তা তোমাদেরকে বলছি। তিনি বলেন :

آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله الا الله في كفة رجحت بهن لا إله الا الله ... وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شـــيء وبها يــرزق الخـــلــق وأنهاك عن الشـــرك والكـــبـــر

"আমি তোমাকে দুটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি এবং দুটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর আদেশ প্রদান করছি। কারণ সাত আসমান ও জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লহু' অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ভারী হবে ... এবং আমি তোমাকে 'সুব'হা-নাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহী' -এর নির্দেশ দিচ্ছি (অর্থাৎ, এই দুটি যিক্‌র বেশি বেশি আদায় করতে নির্দেশ প্রদান করছি।) এই যিক্‌র সকল সৃষ্টির দু'আ, সালাত ও তাসবীহ এবং এর ওসীলাতেই সকল সৃষ্টি রিযিক প্রাপ্ত হয়। আর আমি তোমাকে শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি।"[১]

সাহাবীগণও এ সকল বাক্য বেশি বেশি করে যিক্‌র করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন :

لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أتــصـــدق بعـــددها دنـــانـــيـــر في سبيل الله

"সুব'হা-নাল্লাহ, আল-'হামদু লিল্লাহ, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার – বলা আমার নিকট আল্লাহর রাস্তায় সমসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার চেয়ে বেশি প্রিয়।"[২]

তিনি আরো বলেন : "মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যেরূপভাবে মাল-সম্পদের রিযিক বণ্টন করেছেন তেমনভাবে তোমাদের আচরণ ও স্বভাব বণ্টন করেছেন। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন ও যাকে পছন্দ করেন না সকলকেই সম্পদ দেন। তবে ঈমান তিনি শুধু তাকেই প্রদান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা বোধ করে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ভয় পায় এবং রাত জেগে ইবাদত করতে আলসেমি অনুভব করে, সে যেন বেশি বেশি করে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু', 'আল্লাহু আকবার', 'আল-'হামদু লিল্লাহ' ও 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলতে থাকে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩]

<u>(গ) বিশেষ তাসবীহ-তাহলীল</u>

উপরের চারটি বাক্য মহান আল্লাহর একত্ব, পবিত্রতা, মর্যাদা ও প্রশংসা জ্ঞাপক সাধারণ যিক্‌র যা সর্বদা ও বেশি বেশি করে আদায়ের জন্য এভাবে অসংখ্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে এই বাক্যগুলির এক বা একাধিক বাক্যের অর্থ একত্রে বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যে যিক্‌র করতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। উপরে ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং যিক্‌রে পবিত্রতা জ্ঞাপক কয়েকটি অতিরিক্ত যিক্‌রের উল্লেখ করেছি। ৫ ও ৬ নং যিক্‌রের মর্যাদার বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

"দুটি বাক্য জিহ্বায় উচ্চারণের জন্য খুবই হালকা, আর কিয়ামতের দিন কর্ম পরিমাপের পাল্লায় খুবই ভারী এবং আল্লাহর নিকট প্রিয় : সুব'হা-নাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহী, সুবহানাল্লাহিল 'আযীম।"[৪]

<u>**যিক্‌র নং ১১ :**</u>

الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد ما أحصى خلقه والحمد لله ملء ما في خلقه والحمد لله ملء سمواته وأرضه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله على كل شيء

উচ্চারণ : (১) আল-'হামদু লিল্লা-হি 'আদাদা মা- আ'হসা কিতাবুহু, (২) ওয়া আল-'হামদু লিল্লা-হি মিলআ মা- আ'হসা কিতাবুহু, (৩) ওয়া আল-'হামদু লিল্লা-হি 'আদাদা মা- আ'হসা খালকুহু, (৪) ওয়া আল-হামদু লিল্লাহি মিলআ মা- ফী খালকিহী, (৫) ওয়া আল-হামদু লিল্লা-হি মিলআ সামাওয়া-তিহী ওয়া আর্‌দিহী, (৬) ওয়া আল-হামদু লিল্লা-হি 'আদাদা কুল্লি শাইয়িন, (৭) ওয়াল'হাম্‌দু লিল্লা-হি 'আলা- কুল্লি শাইয়িন।

অর্থ : "(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, (২) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তা সব পূর্ণ করে, (৩) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর সৃষ্টি যা গণনা করে সেই পরিমাণ, (৪) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকিছু আছে তা পূর্ণ করে, (৫) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর আসমন ও জমিন পূর্ণ করে, (৬) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, (৭) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সব কিছুর উপর।"

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন :

رآني النبي ﷺ وأنا أحرك شفتي فقال لي بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة فقلت أذكر الله يا رسول الله فقال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكــرك بالليــل والنهار قلت بلى يا رسول الله؟ قال تقول، فذكر.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে দেখেন যে আমি আমার ঠোঁট নাড়াচ্ছি। তিনি আমাকে বলেন : হে আবু উমামাহ, তুমি কী বলে তোমার ঠোঁট নাড়াচ্ছ ? আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহর যিক্র করছি। তিনি বললেন : আমি কি তোমার রাতদিন যিক্রের চেয়েও উত্তম (যিক্র) তোমাকে শিখিয়ে দেব? আমি বললাম: হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তিন বলেন: তুমি বলবে ... (উপরের যিক্রগুলি তিনি শিখিয়ে দিলেন)। এরপর বললেন:

وتـــسبـــح مـــثـــل ذلـــك وتـــكـــبـــر مـــثـــل ذلـــك

"উপরে যেভাবে (আল-হামদু লিল্লাহ) বলেছ ঠিক অনুরূপভাবে অনুরূপভাষায় তাসবীহ 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলবে এবং অনুরূপভাবে তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' বলবে।" অর্থাৎ, উপরের ৭ টি বাক্যে 'আল-হামদু লিল্লাহ'- স্থলে 'সুব'হা-নাল্লাহ' দ্বারা ও 'আল্লাহু আকবার' দ্বারা ৭ বার করে বলতে হবে। হাদীসটি হাসান।"[১]

আমরা সকাল সন্ধ্যার যিক্রের আলোচনায় এই ধরনের আরো ব্যাপক অর্থবোধক তাসবীহ তাহলীলের আলোচনা করব, ইন্শা আল্লাহ।

যিক্র নং ১২ :

الحــمد لله حــمــداً كــثيــراً طيــباً مباركاً فيه

উচ্চারণ : আল-হামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবা-রাকান ফীহি। **অর্থ :** "সকল প্রশংসা আল্লাহর, অনেক অনেক প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা"।

হযরত আবু আইউব (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসে এই বাক্যটি বলে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: 'এই বাক্যটি কে বলল?' লোকটি ভাবল যে, সে হয়ত কোনো বেয়াদবি করেছে এজন্য সে চুপ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারো প্রশ্ন করলে সে বলে : 'হে আল্লাহর রাসূল, আমিই বলেছি। আর আমি ভালো উদ্দেশ্যেই বলেছি।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

والذي نفسي بيده لقد رأيت ثلاثة عشر ملكا يبتدرون كلمتك أيهم يرفعها إلى الله

"যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি দেখেছি তের জন ফিরিশতা দ্রুত এগিয়ে এসেছেন, কে আগে এই বাক্যটিকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন সে জন্য।"

হাদীসটির সনদ হাসান। হযরত আনাস (রা) থেকেও এই অর্থে আরেকটি হাদীস নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।[২]

যাকিরকে বুঝতে হবে, বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন এই যিক্রগুলি বলেন তখন আল্লাহও তার সাথে সাথে সাড়া দেন। কাজেই, সেভাবে আদব ও মনোযোগের সাথে আল্লাহর সাথে কথা বলার অনুভূতি নিয়ে যিক্র করতে হবে।[৩]

<u>(ঘ) এ সকল যিক্র নির্দিষ্ট সংখ্যায় আদায়ের নির্ধারিত সাওয়াব</u>

উপরের হাদীসগুলি থেকে যিক্রের মহান চারিটি বাক্য বা উক্ত বাক্যগুলির অর্থের সমন্বয়ে ব্যপকার্থক বিভিন্ন বাক্য দ্বারা যিক্রের অপরিমেয় সাওয়াব, বরকত ও মর্যাদার কথা আমরা জানতে পেরেছি। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুমিন সর্বদা সুযোগ মতো যত বেশি পারবেন এসকল বাক্যের যিক্র করবেন। যত বেশি তিনি যিক্র করবেন তত বেশি সাওয়াব, বরকত ও মর্যাদা তিনি লাভ করবেন।

তবে মুমিন হয়ত সর্বদা যিক্র করতে অপারগ হয়ে পড়েন। সে ক্ষেত্রে অন্তত নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিক্র করলে তিনি বিশেষ মর্যাদা ও সাওয়াব অর্জন করবেন। আমরা বিভিন্ন হাদীসে উপরের বাক্যগুলির নির্দিষ্ট সংখ্যয় জপ করলে বিশেষ সাওয়াবের উল্লেখ দেখতে পাই। কোনো কোনো হাদীসে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক যিক্রের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা সে সকল হাদীস পরবর্তী অধ্যায়ে সকাল সন্ধ্যার যিক্র বা সময় নির্ধারিত যিক্রের আলোচনায় উল্লেখ করব। কোনো কোনো হাদীসে সাধারণভাবে রাতদিনে যে কোনো সময়ে এসকল যিক্র নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করলে বিশেষ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

(১). 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' ১০০ বার বলা :

আবু তালহা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة كتب الله له مائة ألف حسنة وأربعا وعشرين ألف حسنة. قالوا يا رسول الله إذا لا يهلك منا أحد قال بلى إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجيء النعم فتذهب بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته

"যদি কেউ ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লহি ওয়া বি'হামদিহী' বলে, তাহলে আল্লাহ তাঁর জন্য ১,২৪,০০০ (একলক্ষ চব্বিশ হাজার) সাওয়াব লিখবেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আমাদের কেউই বিপদে পড়বে না (জাহান্নামে কাউকেই যেতে হবে না।) তিনি বলেন : হাঁ। তোমাদের অনেকেই এত বেশি সাওয়াব নিয়ে কিয়ামতের দিন হাজির হবে যে, পাহাড়ের উপরে দিলেও পাহাড় ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু এরপর আল্লাহ তাঁকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তা এসে সব সাওয়াব নিয়ে চলে যাবে। এরপর মহাপ্রভু রহমত নিয়ে এগিয়ে আসবেন।" হাদীসটি সহীহ।[১]

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, যার উপর আল্লাহর নিয়ামত যত বেশি তার তত বেশি সাওয়াবের কাজ করা প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশের তাওফিক প্রদান করুন এবং সকল অবহেলা ও পাপ ক্ষমা করে দিন।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر

"যদি কেউ এক দিনের মধ্যে ১০০ বার 'সুব্'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী' বলে তাঁর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।"[২]

(২). ১০০ বার 'সুব'হানাল্লাহ', ১০০ বার 'আল-'হামদু লিল্লাহ', ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' ও ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা :

হযরত উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে পালন করতে পারব। তিনি বলেন : "তুমি ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলবে, তাহলে ১০০ টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে। তুমি ১০০ বার 'আল হামদু লিল্লাহ' বলবে, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ১০০ টি সাজানো ঘোড়ায় মুজাহিদ প্রেরণের সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে। তুমি ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তাহলে ১০০ টি মাকবুল উট কুরবানির সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। তুমি ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে, তাহলে তোমার সাওয়াবে আসমান ও জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে [এবং তোমার কোনো পাপই বাকি থাকবে না : দ্বিতীয় বর্ণনায়]। যে ব্যক্তি তোমার এই যিক্রগুলির সমপরিমাণ যিক্র করবে সে ছাড়া কেউই ঐ দিনে তোমার চেয়ে বেশি বা উত্তম আমল আল্লাহর দরবারে পাঠাতে পারবে না।" হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সনদগুলি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[৩]

আবু উমামা (রা) থেকে এই অর্থে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে ১০০ বার করে উক্ত যিক্রগুলি আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনুরূপ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। হাদীসটি হাসান।[৪]

৫. আল্লাহর উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক বাক্য

<u>যিক্র নং ১৩ :</u> **لا حــول ولا قــوة إلا بالله**

উচ্চারণ : লা- 'হাওলা ওয়া লা- ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ : "কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।"

আল্লার উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক শ্রেষ্ঠ যিক্র এই বাক্যটি। এই বাক্যের বেশি বেশি যিক্র বা জপ করার নির্দেশে অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

استكثروا من الباقيات الصالحات ... التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله

"তোমরা বেশি বেশি বেশি করে 'চিরস্থায়ী নেককর্মগুলি' কর। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন : এগুলি কি? তিনি বললেন : তাকবীর 'আল্লাহু আকবার', তাহলীল 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু', তাসবীহ 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-'হামদু লিল্লাহ' এবং 'লা-হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৫]

আবু মুসা (রা), আবু হুরাইরা (রা), আবু যার (রা), মু'আয ইবনু জাবাল (রা), সা'দ ইবনু উবাদাহ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত অনেকগুলি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে, কারণ এ বাক্যটি জান্নাতের ভাণ্ডারগুলির মধ্যে একটি ভাণ্ডার ও জান্নাতের একটি দরজা।[৬]

হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মে'রাজের রাত্রিতে হযরত ইবরাহীম (আ) আমাকে বলেন : আপনার উম্মতকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন বেশি করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করে ...। জান্নাতের বৃক্ষ রোপণ লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفــرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبــد البحر

"পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি যদি বলে : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ মহান, কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া), তবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।" হাদীসটি হাসান।[১]

৬. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা জ্ঞাপক বাক্যাদি

উপরের ৫ প্রকারের যিক্রে বান্দা তার মহান প্রভুর মহত্ব, একত্ব, পবিত্রতা, ক্ষমতা ইত্যাদি জপ করে মহান স্রষ্টার প্রতি তার মনের আবেগ, আকুলতা ও নির্ভরতা প্রকাশ করে ও তাঁকে স্মরণ করে নিজের হৃদয় মনকে পবিত্র ও উদ্ভাসিত করে। এগুলিতে সে প্রভুর কাছে সরাসরি বা স্পষ্টভাবে কিছু চায় না।

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, আল্লাহর কাছে চাওয়াও আল্লাহর যিক্র। মহান প্রতিপালকের নিকট তাঁর করুণা, বরকত, ক্ষমা, জাগতিক, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক কল্যাণ চাওয়া আল্লাহর যিক্রের অন্যতম প্রকরণ।

আল্লাহর নিকট বান্দা সবই চাইবে। নিজের জন্য চাইবে এবং অন্যদের জন্যও চাইবে। সব চাওয়াই যিক্র। তবে প্রথমে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহর ক্ষমা লাভের উপরেই নির্ভর করছে বান্দার ইহকালীন ও পরকালীন সকল উন্নতি ও কল্যাণ। দ্বিতীয় প্রকার চাওয়া জাগতিক বা বা পারলৌকিক কোনো কিছু তাঁর কাছে চাওয়া। তৃতীয় প্রকার চাওয়া অন্যের জন্য চাওয়া।

মানব প্রকৃতির অন্যতম দিক যে, সে কোনো না কোনোভাবে নিয়মভঙ্গ করবে। তার মহান স্রষ্টা তার জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য যে নির্ধারিত নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রদান করেছেন তার বাইরে সে প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে চলে যায়। এভাবে প্রতিনিয়ত মানুষ পাপ করতে থাকে। একদিকে তার মানবীয় দুর্বলতা ও প্রবৃত্তির টান ও পারিপার্শিক পরিবেশ অপরদিকে শয়তানের প্রতিনিয়ত প্ররোচনা।

তাওবা অর্থ ফিরে আসা এবং ইসতিগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। যে কোনো পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা করা ও সেই পাপ আর করব না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করার নাম তাওবা। আর আল্লাহর নিকট পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম ইসতিগফার। সাধারণবাবে তাওবা ও ইসতিগফার এক সাথে ক্ষমা চাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাওবা-ইসতিগফারির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় মুমিনের আন্তরিক অনুশোচনা, অনুতাপ ও পুনরায় পাপ আর না করার আন্তরিক ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত।

পাপ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে। তাকে তার মহান স্রষ্টার করুণার পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়। মহান রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত ভালবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন এবং সম্মানিত করেছেন। পাপ যেন মানুষকে কলুষিত করতে না পারে সে জন্য তিনি ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাওবা ও ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার ফলে বান্দা শুধু পাপমুক্তই হয় না, উপরন্তু সে অশেষ সাওয়াব ও মহান মর্যাদার অধিকারী হয়। যে কোনো মানুষ যখন পাপের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বান্তকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে আল্লাহর ক্ষমা লাভে সক্ষম হয়। উপরন্তু এই ক্ষমা প্রার্থনা, অনুতাপ ও ক্রন্দনের কারণে তার হৃদয় আরো পবিত্র ও মুক্ত হয়। সে আল্লাহর আরো বেশি নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জন করে।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বান্দাকে যে কোনো পাপের পরেই ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণের জন্য নিশ্চিত ক্ষমা, অফুরন্ত সাওয়াব ও জান্নাতের অনন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন শতাধিকবার ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি উম্মতকে সদা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন।

(ক) ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

(১). সৃষ্টির প্রতি অন্যায় ক্ষমা হয় না

ইস্তিগফারের মাধ্যমে সকল গোনাহ ক্ষমা হয়, কিন্তু সৃষ্টির প্রতি অন্যায় ক্ষমা হয় না। আল্লাহ যা কিছু বিধানাবলী প্রদান করেছেন তা তাঁর নিজের জন্য নয়, সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। এ সকল বিধান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার বিধান মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ ও উন্নতির জন্য। এগুলিকে সাধারণত হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার বিধান মানুষের সামাজিক জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য। এগুলিকে হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টিজগতের অধিকার বলা হয়।

প্রথম প্রকার বিধান লঙ্ঘন করলে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর জাগতিক, মানসিক, আত্মিক ও পারলৌকিক উন্নতি ব্যাহত বা ধ্বংস হয়। যেমন,- সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যিক্র ইত্যাদি নির্দেশিত কর্মে অবহেলা করা অথবা শিরক, মদপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার বিধান লঙ্ঘন করলে মানুষ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও তার আশপাশের কোনো মানুষ, জীব জানোয়ার বা কোনো প্রকার সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, কাউকে গালি, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া, কারো সম্পদ, অর্থ, সম্মান বা জীবনের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা। ফাঁকি, ধোঁকা, সূদ, ঘুষ, জুলুম, খুন, ধর্ষণ সবই এই জাতীয় পাপ। কেউ যদি অন্য কাউকে কোনো ব্যক্তিগত পাপে প্ররোচিত করে, যেমন সালাত ত্যাগ, মদপান ইত্যাদি কর্মে অন্য কাউকে প্ররোচিত করে তাহলে তাও এই প্রকারের পাপে পরিণত হবে। এছাড়া আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি অন্য মানুষের কিছু দায়িত্ব নির্ধারিত করেছেন। স্বামীর প্রতি দায়িত্ব, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, কর্মদাতার দায়িত্ব, কর্মচারীর দায়িত্ব, সহকর্মীর দায়িত্ব, দরিদ্রের প্রতি দায়িত্ব, অসহায়ের প্রতি দায়িত্ব, বিধবা ও এতিমদের প্রতি দায়িত্ব, পালিত পশুর প্রতি দায়িত্ব ও অন্যান সকল দায়িত্ব। এগুলি পূর্ণভাবে পালন না করলে তা হক্কুল ইবাদ বা

সৃষ্টির অধিকার নষ্টের পাপ হবে।

প্রথম প্রকারের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকারের পাপের মধ্যে দুটি দিক রয়েছে : **প্রথমত,** আল্লাহর বিধানের অবমাননা এবং **দ্বিতীয়ত,** আল্লাহর কোনো সৃষ্টির অধিকার নষ্ট করা। এ সকল পাপে নিজেকে কলুষিত করার পরে বান্দা যখন আন্তরিকতার সাথে অনুতপ্ত হয়ে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তাঁর বিধান অবমাননার দিকটি ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু চূড়ান্ত বিচার দিনের মহান ন্যায়বিচারক তাঁর কোনো সৃষ্টির প্রাপ্য ক্ষমা করেন না। তার পাওনা তিনি বুঝে নেবেন ও তাকে বুঝে দেবেন। এজন্য এই জাতীয় পাপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যাদের অধিকার নষ্ট বা সংকুচিত হয়েছে তাদের নিকট থেকে ক্ষমা না নিলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সালাত-সিয়াম পরিত্যাগকারী, মদ্যপ, শূকরের মাংস ভক্ষণকারী বা এধরনের যে কোনো পাপীর জন্য ক্ষমালাভ সহজ। কিন্তু ভেজালদাতা, ফাঁকি দাতা, ধোঁকাপ্রদানকারী, যৌতুক গ্রহণকারী, এতিম, দুর্বল ও বিধবাদের সম্পদ দখলকারী, ঘুষ, সুদ ও জুলুম, চাঁদাবাজি ইত্যাদি দুর্নীতির মাধ্যমে কারো সম্পদ গ্রহণ বা অধিকার হরণকারীগণের ক্ষমালাভ খুবই কষ্টকর। এজন্য প্রতিটি যাকিরকে সদা সর্বদা চেষ্ট করতে হবে, দ্বিতীয় প্রকার পাপ থেকে সর্বদা দূরে থাকার। যদি কোনো মুসলিমের পূর্ব জীবনে এধরনের পাপ সংঘঠিত হয়ে থাকে, তাহলে যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির থেকে ক্ষমা গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে বেশি করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি, ক্ষমা ও সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে, যেন তিনি এগুলি থেকে ক্ষমা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

(২). সকল পাপই বড়

ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় মুমিন-মনের উপলব্ধি। মানব মনের একটি অতি আকর্ষণীয় কাজ অন্যের ভুলক্রটি ও অন্যায়গুলি বড় করে দেখা ও নিজের অন্যায়কে খুব ছোট ও যুক্তি বা কারণসঙ্গত বলে মনকে প্রবোধ দেওয়া। আমরা একাকী বা একত্রে যখনই চিন্তাভাবনা বা গল্প করি, তখনই সাধারণত অন্যের দোষক্রটি ও অন্যায়গুলি আলোচনা করি। মুমিনের আত্মিক জীবন ধ্বংসে এটি অন্যতম কারণ। মুমিনকে সদা সর্বদা নিজের পাপের কথা চিন্তা করতে হবে। এমনকি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের বিপরীতে তাঁর ইবাদতের দুর্বলতাকেও পাপ হিসাবে গণ্য করে সকাতরে সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সকল প্রকার পাপকে খুবই কঠিন, ভয়াবহ ও নিজের জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে বারবার ক্ষমা চাইতে হবে। এই পাপবোধ নিজেকে সংকুচিত করার জন্য নয়। এই পাপবোধ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেকে ভারমুক্ত, পবিত্র, উদ্ভাসিত ও আল্লাহর নৈকট্যের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেছেন :

إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا [فطار]

মুমিন ব্যক্তি তাঁর পাপকে খুব বড় করে দেখেন, যেন তিনি পাহাড়ের নিচে বসে আছেন, ভয় পাচ্ছেন, যে কোনো সময় পাহাড়টি ভেঙ্গে তাঁর উপর পড়ে যাবে। আরা পাপী মানুষ তার পাপকে খুবই হালকাভাবে দেখেন, যেন একটি উড়ন্ত মাছি তার নাকের ডগায় বসেছে, হাত নাড়ালেই উড়ে যাবে।"[১]

(খ) ইস্তিগফার বিষয়ক কতিপয় মাসনূন যিক্র

মুমিন যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো বাক্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন। ভাষা বা বাক্যের চেয়ে মনের অনুতাপ, অনুশোচনা ও আবেগ বেশি প্রয়োজনীয়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরিত বা শেখানো বাক্য ব্যবহার করা উত্তম। বিশেষত যে সকল বাক্যের বিশেষ মর্যাদা তিনি বর্ণনা করেছেন। সাধারণভাবে বিভিন্ন হাদীসে 'আসতাগফিরুল্লাহ' (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) – এই বাক্যটি ইস্তিগফারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময় এর সাথে 'ওয়া আতূবু ইলাইহি' (এবং আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি) বাক্যটি সংযুক্ত করা হয়েছে। ইস্তিগফারের ফযীলত ও নির্দেশনা আলোচনা কালে আমরা এগুলি বিস্তারিত দেখতে পাব। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি মাসনূন বাক্য উল্লেখ করছি :

যিক্‌র নং ১৪ :

(সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার) সকাল সন্ধ্যার যিক্‌র দ্রষ্টব্য।

যিক্‌র নং ১৫ : **أَسْتَغْفِرُ اللهَ**

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হ। **অর্থ :** আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যিক্‌র নং ১৬ : **أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর দিকে তাওবা করছি।

যিক্‌র নং ১৭ :

رب اغفر لي وتب علي إنك [أنت] التواب الغفور

উচ্চারণ : রাব্বিগ্‌ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুল গাফূর।

অর্থ : "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী।"

যিক্‌র নং ১৮ : (৩ বার)

أستغفر الله (العظيم) الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্ (‘আযীমাল্) লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুআল ‘হাইউল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ : "আমি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।"

(গ) ইস্তিগফারের ফযীলত ও নির্দেশনা

কুরআন কারীমে মুমিনগণকে বারংবার তাওবা ও ইসতিগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাওবা ও ইসতিগফারের জন্য ক্ষমা, পুরস্কার ও মর্যাদা ছাড়াও জাগতিক উন্নতি ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসে ইসতিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ইসতিগফার আল্লাহর অন্যতম যিক্‌র। যিক্‌রের সাধারণ ফযীলত ইস্তিগফারকারী লাভ করবেন। এ ছাড়াও ইস্তিগফারের অতিরিক্ত মর্যাদা ও সাওয়াব রয়েছে। এ বিষয়ক কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি :

(১). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

"আল্লাহর কসম! আমি দিনের মধ্যে ৭০ বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি।"[১]

(২). হযরত আগার আল-মুযানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يا أيها الناس، تـوبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله [أستغفر الله] في اليوم مائة مرة

"হে মানুষেরা তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমি একদিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহর নিকট তাওবা করি বা ইস্তিগফার করি।"[২]

(৩). হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, আমরা গুণে দেখতাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক মাজলিসেই (একবারের যে কোনো বৈঠকের মধ্যে) মাজলিস ত্যাগ করে উঠে যাওয়ার আগে ১০০ বার উপরের ১৭ নং যিক্‌রে বর্ণিত বাক্যটি (রাব্বিগ্ ফিরলী ... গাফূর) বলতেন।[৩]

(৪). হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’উদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা আল্লাহর নিকট তাওবা করলে (পাপ থেকে ফিরে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে) সীমাহীন খুশি হন। তার খুশির তুলনা, এক ব্যক্তি বিশাল জনবানবশূন্য ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে থেমেছে। তার সাথে তার বাহন, যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সে একটু বিশ্রাম করতে যেয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখে যে, তার বাহন হারিয়ে গিয়েছে। মরুভূমির প্রচণ্ড রোদ্র ও পিপাসায় সে ক্লান্ত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে মেনে নিয়ে একসময় অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পায় যে তার উট তার পাশে দাড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে এত খুশি হয় যে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার দাস, আমি আপনার প্রভু।’ আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলে। উট ফিরে আসাতে এই ব্যক্তি যত আনন্দিত হয়েছে কোনো পাপী বান্দা পাপ থেকে ফিরে আসলে বা তাওবা করলে আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।[৪]

সুব‘হা-নাল্লাহ! কত ভালবাসেন আল্লাহ তাঁর পাপী বান্দাকে!! এ সুযোগ শুধু পাপীদের জন্যই। আমাদের কি আগ্রহ হয় না যে মহান প্রভুকে এভাবে আনন্দিত করব!

(৫). হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন : হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে ও আমার করুণার আশা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তুমি যাই কর না কেন, কোনো কিছুই পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, যদি তোমার পাপ আসমান স্পর্শ করে এরপরও তুমি ইস্তিগফার কর বা ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে হাজির হও, কিন্তু শির্‌ক থেকে মুক্ত থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা তোমাকে প্রদান করব।[৫]

(৬). আবদ ইবনু বুসর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

طـوبى لـمن وجـد في صحـيـفـته استغـفار كـثـيـر

"সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যার আমলনামায় অনেক ইস্তিগফার পাওয়া গিয়েছে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬]

(৭). অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’উদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যদি কেউ উপরে লিখিত ১৮ নং যিক্‌রের বাক্যগুলি:

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

তিন বার বলে, তাহলে তার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে, যদি সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার মতো কঠিন পাপও করে থাকে।" হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।[১]

(ঘ) পিতামাতা ও সকল মুসলিমের জন্য ইস্তিগফার

মুমিন যেমন নিজের জন্য আল্লাহর ক্ষমা ভিক্ষা করবেন, তেমনি মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। বিশেষত নিজের পিতামাতা, আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্য ও পূর্ববর্তী মুসলিমগণের জন্য যাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দ্বীনকে পেয়েছি। অন্যান্য সকল মুসলিমের জন্য ইস্তিগফার করা আল্লাহর নির্দেশ। কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে যে, পরবর্তী যগের মুসলিম প্রজন্মরা বলে :

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

"হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আপনি মহা করুণাময় ও পরম দয়ার্দ্র।"[২]

এভাবে সকল মুসলিমের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা ফিরিশতা ও নবীগণের সুন্নাত। কুরআন কারীমে এ ধরনের অনেক দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতামাতার জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফারের ফযীলতে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك

"জান্নাতে কোনো কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে : কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? তখন তাকে বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, এজন্য তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"[৩]

৭. দু'আ বা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা আল্লাহর যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রকার প্রার্থনা বা ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে কিছু জানলাম। এখন দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা বা দু'আ সম্পর্কে আলোচনা করব।

(ক) দু'আর পরিচয় ও ফযীলত

দু'আ বলতে আমরা সাধারণভাবে বাংলায় প্রার্থনা করা বুঝি। এই অর্থে আরবীতে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয় : (১). **سؤال** অর্থাৎ চাওয়া বা যাচ্ঞা করা (ask, pray, beg) ও (২). **دعاء** অর্থাৎ আহ্বান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা (call, pray, invoke)। এছাড়া আরেকটি শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়: **مناجاة** 'মুনাজাত' বা চুপেচুপে কথা বলা (whisper to each other, carry on a whispered conversation, converse intimately)।

আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, যিক্‌র ও প্রার্থনাকেই 'মুনাজাত' বলা হয়। হাদীসে সালাতকে মুনাজাত বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه

"যখন কেউ সালাতে থাকে তখন সে তার প্রভুর সাথে 'মুনাজাতে' (গোপন কথাবার্তায়) রত থাকে।"[৪]

অন্য বর্ণনায় :

إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه [فلينظر ما يناجيه به]

"যখন কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন যে তার প্রভুর সাথে মুনাজাতে রত থাকে ; অতএব তার ভেবে দেখা উচিত কিভাবে এবং কী বলে সে তাঁর সাথে মুনাজাত করছে।"[৫]

অর্থাৎ, ভেবেচিন্তে পরিপূর্ণ আদবের সাথেই সালাত আদায় করা উচিত, কারণ সালাত তার মহান প্রভুর সাথে কথাবার্তা।

আল্লাহর সাথে কথাবার্তা, প্রার্থনা ও দু'আকে মুনাজাত বলা হয়, কারণ তিনি বান্দার সবচেয়ে কাছে। তাঁর সাথে বান্দার কথা গোপনে ও চুপেচুপে হয়। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে :

أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه

"আমাদের প্রভু কি আমাদের কাছে, না দূরে? যদি কাছে হন তাহলে আমরা তাঁর সাথে মুনাজাত করব বা চুপেচুপে কথা বলব। আর যদি তিন দূরে হন তাহলে আমরা জোরে জোরে তাঁকে ডাকব।" জবাবে আল্লাহ কুরআন কারীমের সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াত নাযিল করেন : "এবং যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার বিষয়ে প্রশ্ন করে, (তখন তাদের বলুন) আমি তাদের নিকটবর্তী।"[৬]

আমরা দেখেছি যে, দু'আ বা প্রার্থনা করা যিক্‌রের অন্যতম প্রকরণ। সকল দু'আই যিক্‌র ; তবে সকল যিক্‌র দু'আ নয়। কারণ

দু'আর মধ্যে বান্দা আল্লাহর স্মরণ করার সাথে সাথে নিজের দুনিয়া বা আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। আর শুধু যিক্‌রে বান্দা আল্লাহর গুণাবলী, মর্যাদা, প্রশংসা ইত্যাদি স্মরণ করেন।

মুমিন আল্লাহর দরবারে যে কোনো বিষয়ে কোনো প্রার্থনা করলে তিনি আল্লাহর যিক্‌রের ফযীলত ও সাওয়াব অর্জন করবেন। কাজেই, সাধারণ যিক্‌রের ফযীলতের মধ্যে দু'আও রয়েছে। তবে কুরআন ও হাদীসে দোওয়ার জন্য বিশেষ ফযীলত, মর্যাদা ও নির্দেশ ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তার কিছু উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি। আল্লাহর তাওফীক ও কবুলিয়ত প্রার্থনা করছি।

(১). সহীহ মুসলিমে সংকলিত হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন :

يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ... يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ...

"হে আমার বান্দাগণ, আমি যাকে পথ দেখাই সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ঠ। অতএব, তোমরা আমার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করব। হে আমার বান্দাগণ, শুধুমাত্র আমি যাকে খাইয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। অতত্রব, তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ, আমি যাকে কাপড় পরিধান করিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই উলঙ্গ। অতএব, তোমরা আমরা কাছে বস্ত্র প্রার্থনা কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা রাতদিন অন্যায় ও পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ছ আর আমি সকল গোনাহ ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার কাছে গোনাহের ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব। ... হে আমার বান্দাগণ, যদি সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বিন একত্রে দাঁড়িয়ে আমার কাছে (তাদের সকল প্রয়োজন) প্রার্থনা করে এবং আমি প্রত্যেককে তার প্রার্থনা পূর্ণভাবে দান করি, তাহলেও আমার ভাণ্ডার থেকে অতটুকুই কমবে, মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি সূতা ভিজালে সমুদ্রের পানি যতটুকু কমবে (অর্থাৎ, কিছুই কমবে না)।"[১]

(২). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন :

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني

"আমি আমার বান্দার ধারণা ও বিশ্বাসের নিকট থাকি। আমার বান্দা যখন আমাকে ডাকে ও আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার সাথে থাকি।"[২]

(৩). নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী ﷺ বলেছেন :

الدعاء هو العبادة

"দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত।" একথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন :

قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين

তোমাদের প্রভু বলেনঃ "তোমরা আমার কাছে দু'আ কর, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে (আমার কাছে প্রার্থনা না করে) তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৩] হাদীসটি সহীহ।[৪]

সুনানে তিরমিযীতে এই মর্মে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

الدعاء مخ العبادة

"দু'আ ইবাদতের মগজ।"

এই হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইমাম তিরমিযী নিজেই হাদীসটি বর্ণনা করেই উল্লেখ করেছেন যে, তা যয়ীফ। এবং তারপরেই তিনি উপরের "দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত" হাদীসটি বর্ণনা করে তাকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] তিরমিযী ছাড়াও আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে "দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত" এই সহীহ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

(৪). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لـــيـــس شـــيء أكـــرم على الله مـــن الـــدعـــاء

"আল্লাহর কাছে দু'আ বা প্রার্থনার চেয়ে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই।" হাদীসটি সহীহ।[১]

(৫). হযরত উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صـــرف عنه من السوء مثـــلها ما لم يـــدع بإثـــم أو قـــطـــيعة رحم

"জমিনের বুকে যে কোনো মুমিন আল্লাহর কাছে কোনো দু'আ করলে - যে দু'আয় কোনো পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতিকারক কিছু চায় না - আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করবেনই। তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু দিবেন। অথবা তদানুযায়ী তাঁর কোনো বিপদ কাটিয়ে দিবেন।" হাদীসটি সহীহ।[২]

(৬). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له في الآخرة

"যে কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে মুখ তুলে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাঁকে তা দিবেনই। তাঁকে তা সঙ্গে সঙ্গে দিবেন অথবা আখেরাতের জন্য তা জমা করে রাখবেন।" হাফিয মুনযিরী ও হাইসামী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[৩]

(৭). হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر. قال : الله أكثر

"যখনই কোনো মুসলিম পাপ ও আত্মীয়তা নষ্ট করা ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তখনই আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করে তাঁকে তিনটি বিষয়ের একটি দান করেন : হয় তাঁর প্রার্থিত বস্তুই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করেন, অথবা তাঁর প্রার্থনাকে (প্রার্থনার সাওয়াব) তাঁর আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা দু'আর পরিমাণে তাঁর অন্য কোনো বিপদ তিনি দূর করে দেন।" একথা শুনে সাহাবীগণ বলেন : তাহলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করব। তিনি উত্তরে বলেন : আল্লাহ তা'আলা আরো বেশি (প্রার্থনা পূরণ করবেন)। হাদীসটি সহীহ।[৪]

কোনো কোনো যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন যখন বান্দা দু'আর বিনিময়ে সঞ্চিত সাওয়াবের পরিমাণ ও মর্যাদা দেখবে তখন কামনা করবে যে, যদি আল্লাহ তাঁর কোনো প্রার্থনাই দুনিয়াতে না দিয়ে সব প্রার্থনাই আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন তাহলে কতই না ভালো হতো![৫]

(৮). হযরত সালমান ফারিসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراخائبتين

"আল্লাহ লাজুক দয়াবান। যখন কোনো মানুষ তাঁর দিকে দু'খানা হাত উঠায় (দু'আ করতে) তাহলে তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।"[৬]

(৯). হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا يـــرد القـــضاء إلا الـــدعاء، ولا يـــزيـــد في العـــمر إلا البـــر، وإن الرجل لـــيـــحرم الـــرزق بالـــذنـــب يصـــيـــبه

"দু'আ ছাড়া আর কিছুই তকদীর উল্টাতে পারে না। মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় মানুষ গোনাহ করার ফলে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।" হাদীসটি সহীহ।[৭]

(১০). হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا يغـــني حـــذر من قدر والدعاء ينـــفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيـــلقاه الدعاء

فيعــتــلجان إلى يوم القيامة

“সাবধানতার দ্বারা তকদীর বা ভাগ্য পরিবর্তিত হয় না। যে বিপদ বা মুসিবত নাযিল হয়ে গিয়েছে এবং যা এখনো নাযিল হয়নি (ভবিষ্যতের ভাগ্যে আছে কিন্তু এখনো বাস্তবে আসেনি) এরূপ সকল বিপদ কাটাতে প্রার্থনা উপকারী। আসমান থেকে বালা-মুসিবত নাযিল হওয়ার অবস্থায় প্রার্থনা তাকে বাধা দেয় এবং তারা উভয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। (কোনো অবস্থাতেই দু'আ বিপদকে নিচে নেমে আসতে দেয় না। ফলে প্রার্থনাকারী নির্ধারিত বিপদ থেকে মুক্তি পান।)”[১]

(১১). হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

أعجــز الناس من عجــز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام

“সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি যে দু'আ করতেও অক্ষম। আর সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি যে সালাম দিতেও কৃপণতা করে।”[২]

(১২). হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বিপদগ্রস্ত মানুষের নিকট দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি বলেন :

أما كان هــؤلاء يســألون الله الــعــافــيـــة

“এরা কি আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করত না?”[৩]

(খ) দু'আর সুন্নাত-সম্মত নিয়ম ও আদব

১. হালাল ভক্ষণ ও হারাম বর্জন

দু'আ, যিক্‌র ও সকল প্রকার ইবাদত বন্দেগি কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত এ সকল ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল উপার্জন নির্ভর হতে হবে এবং সকল প্রকার হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকতে হবে। যে ব্যক্তি হারাম বা অবৈধ সম্পদ উপার্জন করেন এবং তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তার কোনো ইবাদত ও দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন না বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে।

এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك

“হে মানুষেরা, আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র (বৈধ) ছাড়া কোনো কিছুই কবুল করেন না। আল্লাহ মুমিনগণকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি নবী ও রাসূলগণকে দিয়েছেন (বৈধ ও পবিত্র উপার্জন ভক্ষণ করা)। তিনি (রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়ে) বলেছেন : ﴿হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর তা আমি জানি।﴾[৪] (আর তিনি মুমিনগণকে একই নির্দেশ দিয়ে বলেছেন) : ﴿হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে রিযিক প্রদান করেছি তা থেকে পবিত্র রিযিক ভক্ষণ কর﴾[৫]।” এরপর তিনি একজন মানুষের কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি (হজ্ব, উমরা ইত্যাদি পালনের জন্য, আল্লাহর পথে) দীর্ঘ সফরে রত থাকে, ধূলি ধূসরিত দেহ ও এলোমেলো চুল, তার হাত দু'টি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে দু'আ করতে থাকে, হে পভু! হে প্রভু !! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার পানীয় হারাম এবং হারাম উপার্জনের জীবিকাতেই তার রক্তমাংস গড়ে উঠেছে। তার দু'আ কিভাবে কবুল হবে! ”[৬]

প্রিয় পাঠক, পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, এই ব্যক্তি দু'আ কবুল হওয়ার অনেকগুলি আদব ও নিয়ম পালন করেছে। সে মুসাফির অবস্থায় দু'আ করেছে এবং বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসাফিরের দু'আ কবুল হয়। সে ধূলি ধূসরিত ও অসহায় অবস্থায় দু'আ করেছে এবং বিনয়, আকুতি ও অসহায়ত্ব প্রকাশকারীর দু'আ কবুল করা হয়। সে হাত তুলে দু'আ করেছে, যা দু'আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। এত কিছু সত্ত্বেও তার দু'আ কবুল হবে না। কারণ তার উপার্জন হারাম। সে হারাম উপার্জন থেকে খেয়েছে, পান করেছে ও পরিধান করেছে। হারাম জীবিকার উপর নির্ভরকারীর কোনো প্রার্থনা কবুল করা হয় না।

এই হাদীসে আমরা দেখি যে, – হালাল, বৈধ ও পবিত্র জীবিকার উপর নির্ভর করা সকল যুগের সকল নবী, রাসূল ও বিশ্বাসীগণের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সকল যুগের সকল নবী ও তাঁদের উম্মতগণের জন্য তাওহীদের পরেই ইসলামের যে মৌলিক বিধান অপরিবর্তনীয় রয়েছে তা হচ্ছে হালাল ও বৈধ উপার্জনের উপর নির্ভর করা।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখতে পাই যে, সৎকর্ম করার নির্দেশ বৈধ জীবিকা অর্জনের নির্দেশের পরে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, উপার্জন ও জীবিকা বৈধ না হলে কোনো সৎকর্মই কবুল হবে না। উপরের হাদীসে বিশেষভাবে দু'আর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য অনেক হাদীসে সকল ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। একটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا يـــصـــعـــد إلى الله إلا الـــطـــيـــب

"বৈধ ও হালাল জীবিকার ইবাদত ছাড়া কোনো প্রকার ইবাদত আল্লাহর নিকট উঠানো হয় না।"[১]

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বসরার প্রশাসক ও আমীর আব্দুল্লাহ ইবনু আমিরকে তার অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান। ইবনু আমির বলেন : ইবনু উমার, আপনি আমার জন্য একটু দু'আ করুন না ! ইবনু উমার তার জন্য দু'আ করতে অসম্মত হন। কারণ তিনি ছিলেন আঞ্চলিক প্রশাসক। আর এ ধরনের মানুষের জন্য হারাম, অবৈধ, জুলুম, অতিরিক্ত কর, সরকারি সম্পদের অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে নিপতিত হওয়া সম্ভব। একারণে ইবনু উমার (রা) উক্ত আমীরের জন্য দু'আ করতে অস্বীকার করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة

"ওযু-গোসল ছাড়া কোনো সালাত কবুল হয় না, আর ফাঁকি, ধোঁকা ও অবৈধ সম্পদের কোনো দান কবুল হয় না।" আর আপনি তো বসরার গভর্নর ছিলেন।[২]

কত কঠিন সিদ্ধান্ত! অবৈধ ও দুর্নীতিযুক্ত উপার্জনে লিপ্ত মানুষের জন্য তাঁরা দু'আ করতেও রাজি ছিলেন না! এ বিষয়ে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অগণিত মতামত আমরা দেখতে পাই। তাঁরা একবাক্যে বলেছেন যে, জুলুম, অত্যাচার, দুর্নীতি, ফাঁকি বা অন্য কোনো প্রকার অবৈধ উপার্জনের অর্থ দিয়ে বা বৈধ সম্পদের মধ্যে এরূপ অবৈধ সম্পদ সংমিশ্রিত করে তা দিয়ে যদি কেউ হজ্ব, উমরা, দান, মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসা নির্মাণ, জনকল্যাণমূলক কর্ম, আত্মীয়স্বজন ও অভাবী মানুষদের সাহায্য, ইত্যাদি নেক কর্ম করে তাহলে তাতে তার পাপই বৃদ্ধি হবে, কোনো প্রকার সাওয়াবের অধিকারী সে হবে না। এমনকি এ ধরনের জুলুম, প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি বা অবৈধ উপার্জনের অর্থে তৈরি কোনো মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা ব্যবহার করতেও তাঁরা নিষেধ করেছেন।[৩]

হারাম বা নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করা দুই প্রকারে হতে পারে। প্রথমত এরূপ কিছু ভক্ষণ করা যা আল্লাহ স্থায়ীভাবে মুমিনের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন ; যেমন, শূকরের মাংস, মৃত জীবের মাংস, মদ, প্রবাহিত রক্ত, ইত্যাদি। এগুলি ইসলামে স্থায়ী হারাম। কেউ এগুলিকে হালাল ভাবলে তার ঈমান নষ্ট হবে এবং সে অমুসলিম বলে বিবেচিত হবে। আর হারাম জেনেও কোনো মানবীয় দুর্বলতার কারণে খেলে গোনাহ হবে। তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে জীবন রক্ষার জন্য খেলে কোনো গোনাহ হবে না। এ ধরনের হারাম দ্রব্য 'হারাম উপার্জনের' মধ্যে ধরা হয় না। এগুলি 'কবীরা গোনাহ' ও আল্লাহর অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত, বান্দা অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। দ্বিতীয় প্রকারের হারাম ভক্ষণ হলো অবৈধ ও নিষিদ্ধ পন্থায় উপার্জন করে তা ভক্ষণ করা। এই প্রকারের হারাম ভক্ষণে অনেক মুসলিম লিপ্ত হন। এতে তার ধর্মজীবন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

হারাম থেকে দূরে থাকার চেষ্টা অন্যতম যিক্র। অপর পক্ষে যদি যাকির হারাম সম্পদ বর্জন করতে না পারেন তাহলে তার সকল যিক্র ও সকল ইবাদত অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্য এখানে আমি আমাদের সমাজের হারাম উপার্জনগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাচ্ছি। ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম উপার্জনের মূল উৎসগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(ক) সুদ : কুরআন করীমে বারংবার সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উপরন্তু আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহর বিধান প্রদানের পরেও সুদের মধ্যে লিপ্ত থাকবে তাদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের অনন্ত যুদ্ধ ঘোষিত থাকবে।[৪] হাদীস শরীফে সকল প্রকার সুদকে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুদভিত্তিক উপার্জনের সাথে জড়িত সকলকে: সুদ গ্রহিতা, দাতা, লেখক ও সুদি লেনদেনের সাক্ষী সবাইকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ বা লা'নত প্রদান করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[৫]

এভাবে ইসলামী শরীয়তে সুদের মাধ্যমে উপার্জিত সকল সম্পদ কঠিনতম হারাম উপার্জন। সুদখোর, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঋণ, বিনিয়োগ বা অনুদান ইত্যাদির নামে নগদ অর্থ ঋণ প্রদান করে এবং গ্রহীতার নিকট থেকে উক্ত অর্থের জন্য সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে তার উপার্জন যেমন হারাম, তেমনি সুদ-দাতা, অর্থাৎ যিনি সুদে ঋণ গ্রহণ করেন এবং সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেন তিনিও কঠিন হারাম কর্মে লিপ্ত।

সুদের বিভিন্ন প্রকার আছে। প্রধান প্রকার – ঋণ বা অর্থ প্রদান করে সময়ের উপর অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ। আমাদের দেশের ব্যাংকগুলির সকল প্রকার লেনদেন ও লাভ, বিভিন্ন বন্ড, সঞ্চয় পত্র ইত্যাদির লাভ সবই সুদ। ব্যাংক, এন.জি.ও., সমিতি ইত্যাদির ঋণও সুদভিত্তিক। বীমা কোম্পানীগুলির দেওয়া লাভ ও বীমাও সুদ। ইসলামী শরীয়ত ভিত্তিক ব্যাংক, এন. জি. ও. ও বীমা পরিচালনার চেষ্টা করা হচ্ছে। যথাযথ ইসলামী শরীয়ত মত চলছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে মুমিন এরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করতে পারেন।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: "আল্লাহ বেচাকেনা বা ব্যবসা বৈধ করেছেন এবং সুদ অবৈধ করেছেন।"[৬] ইসলামী শরীয়তে সুদ ও ব্যবসায়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের অন্যতম যে, সুদ অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ অথবা কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের

বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য গ্রহণ। আর ব্যবসা পণ্যের বিনিময়ে অর্থ বা অর্থের বিনিময়ে পণ্য গ্রহণ। বেচাকেনা বা ব্যবসায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ইসলামে বৈধ করা হয়েছে। যেমন নগদ ব্যবসা, বাকি ব্যবসা ও অগ্রিম ব্যবসা। নগদ ব্যবসায়ে পণ্য ও মূল্য হাতেহাতে লেনদেন হয়। বাকি ব্যবসায়ে পণ্য আগে গ্রহণ করে পরে মূল্য প্রদান করা হয়। আর অগ্রিম ব্যবসায়ে মূল্য আগে গ্রহণ করা হয় এবং পণ্য পরে প্রদান করা হয়। বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল বাজার দরের চেয়ে কিছু বেশি রাখা এবং অগ্রিম বিক্রয়ের জন্য পণ্যের মূল্য বাজার দর থেকে কিছু কম রাখা অবৈধ নয় বা সুদ নয়। তবে এরূপ ব্যবসায়ের জন্য অনেক শর্ত রয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই পণ্য, মূল্য, মূল্য প্রদানের সময় ইত্যাদি সুনির্ধারিত হতে হবে। নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রমের কারণে নির্ধারিত মূল্য বা পণ্যের মধ্যে আর কোনো কমবেশি বা হেরফের করা যাবে না। এ সকল শর্ত ও পার্থক্য হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থ থেকে বা আলিমদের নিকট থেকে ভালভাবে জেনে মুমিন এ জাতীয় লেনদেন করতে পারেন। সকল ক্ষেত্রে সুদ ও অবৈধ ক্রয়বিক্রয় থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

অনেক সময় ইসলামী বৈধ ব্যবসায় ও অবৈধ সুদি লেনদেনের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য মুমিনকে ধোঁকা দিতে পারে। ৫০০০ টাকা নগদ গ্রহণ করে দু-এক বৎসরের কিস্তিতে ৬০০০ টাকা প্রদান সুদ। পক্ষান্তরে ৫০০০ টাকা মূল্যের একটি সাইকেল বাকিতে ৬০০০ টাকায় বিক্রয় করা বৈধ। বাকির মেয়াদ এবং একবারে বা কিস্তিতে প্রদানের বিষয় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, উভয় বিষয় তো একই। কাজেই একটি বৈধ ও অন্যটি অবৈধ হওয়ার কারণ বা যুক্তি কি হতে পারে? বস্তুত একটি বৈধ ও অন্যটি অবৈধ হওয়ার অনেক যুক্তি ও কারণ রয়েছে, যেগুলির আলোচনা এই পুস্তকের পরিসরে সম্ভব নয়। তবে মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, বিলাল (রা) উন্নত মানের বুরনি খেজুর এনে দেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। তিনি বলেন, বেলাল, তুমি এ খেজুর কোথা থেকে পেলে? তিনি বলেন, আমাদের নিকট খারাপ খেজুর ছিল, আমি প্রতি দু সা' খারাপ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভাল খেজুর হিসেবে খারাপ খেজুর বিক্রয় করে এই ভাল খেজুর কিনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আহা! এই তো সুদ! তোমার প্রয়োজন হলে, তুমি খারাপ খেজুর নগদ টাকায় বিক্রয় করে সেই টাকায় ভাল খেজুর ক্রয় করবে।"[১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ২০ টাকা কেজি মূল্যের ৩ কেজি ভাল চাউলের বিনিময়ে ১৫ টাকা কেজি মূল্যের ৪ কেজি খারাপ চাউল প্রদান বা গ্রহণ করলে তা সুদ হবে। অথচ উক্ত চার কেজি কমা চাউল নগদ বিক্রয় করে ৩ কেজি ভাল চাউল নগদ ক্রয় করলে তা সুদ হবে না। এখন যদি কেউ লেনদেনের ফলাফল একই বলে দাবি করেন তবে মুমিন তা গ্রহণ করবেন না। বরং উভয়ের পার্থক্য অনুধাবনের চেষ্টা করবেন এবং সর্বাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ পালন করবেন।

আমাদের দেশের বন্ধকী ব্যবস্থাও মূলত সুদ নির্ভর। বন্ধকী ব্যবস্থায় ঋণদাতা ঋণের নিশ্চয়তার জন্য জমি বা দ্রব্য বন্ধক রাখতে পারেন। তবে সেই বন্ধকি জমি বা দ্রব্যের মালিকানা ঋণ গ্রহীতা মালিকেরই থাকবে। এই জমি বা দ্রব্য ঋণদাতা ব্যবহার করতে পারবেন না। শুধুমাত্র জামানত হিসাবে তার নিকট রক্ষিত থাকবে। মালিকের অনুমতিতে তা ব্যবহার করলে তাকে ব্যবহারের জন্য ভাড়া বা বিনিময় দিতে হবে। যদি প্রদত্ত ঋণ ঠিক থাকে আবার ঋণদাতা কোনো বিনিময় ছাড়া উক্ত জমি বা দ্রব্য ব্যবহার করেন তাহলে তা সুদ হবে।

<u>**(খ) ঘুষ :**</u> ঘুষকে হাদীসে কঠিনভাবে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঘুষদাতা, গ্রহীতা ও দালাল সবাইকে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কাজের জন্য যদি কর্মী, কর্মচারী বা কর্মকর্তা সরকার বা কর্মদাতার নিকট থেকে বেতন বা ভাতা গ্রহণ করেন, তাহলে উক্ত কাজের জন্য সেবা-গ্রহণকারীর নিকট থেকে কোনোরূপ হাদিয়া, পুরস্কার, বখশিশ বা সাহায্য গ্রহণ করাই ঘুষ। চেয়ে অথবা না চেয়ে, আগে অথবা পরে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, খুশি হয়ে বা বাধ্য হয়ে, টাকায় অথবা দ্রব্যে অথবা সুযোগে যেভাবেই এই অর্থ, উপহার বা সুযোগ গ্রহণ করা হোক না কেন তা সন্দেহাতীতভাবে ঘুষ বলে গণ্য হবে এবং হারাম উপার্জন হিসাবে উক্ত গ্রহীতার সাথে তার প্রভুর সম্পর্ক ছিন্ন করবে। শিক্ষকগণ বেতনের বিনিময়ে যে শিক্ষা ও সেবা প্রদানে চুক্তিবদ্ধ, ডাক্তারগণ বেতনের বিনিময়ে যে চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ সেই শিক্ষা, চিকিৎসা বা সেবার বিনিময়ে ছাত্র বা রোগীর নিকট থেকে অতিরিক্ত কোনো সুবিধা, উপহার বা অর্থ গ্রহণও একই ধরনের ঘুষ। এছাড়া কর্মী, কর্মচারী, কর্মকর্তা বা প্রশাসককে পদের কারণে উপহার-হাদীয়া প্রদান করাকেও ঘুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে। এমনকি কারো জন্য কোনো বৈধ সুপারিশ বা সাহায্য করার পরে সে জন্য তার থেকে হাদীয়া, উপহার বা মিষ্টি গ্রহণ করাকেও হাদীস শরীফে অবৈধ উপার্জন বলে গণ্য করা হয়েছে।

<u>**(গ) জুয়া :**</u> ইসলামে জুয়াকে হারাম উপার্জনের অন্যতম উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সাধারণভাবে জুয়া আমাদের পরিচিত। সকল প্রকার প্রচলিত লটারি জুয়া। এছাড়া সকল প্রকার বাজি জুয়া, যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করে এবং বিজয়ী পক্ষ সকল অর্থ গ্রহণ করে। বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ খেলাধুলাও এভাবে জুয়ার মাধ্যমে আয়োজিত হচ্ছে। কিশোরগণও এখন জুয়া নির্ভর হয়ে গিয়েছে! খেলাধুলা বা বৈধ প্রতিযোগিতায় ৩য় পক্ষ পুরস্কার দিতে পারে।

<u>**(ঘ) জুলুম, জোর করা বা কেড়ে নেওয়া :**</u> কুরআন ও হাদীসে জোর বা অনিচ্ছার মাধ্যমে কারো অর্থ গ্রহণ করাকে হারাম উপার্জনের অন্যতম দিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোনো প্রকারে কারো নিকট থেকে কোনো প্রকারের অর্থ, উপহার, সুবিধা বা কোনোকিছু গ্রহণ করাই হারাম। এভাবে যা কিছু গ্রহণ করা হয় সবই অপবিত্র উপার্জন। সকল প্রকার চাঁদা, যৌতুক, জবরদস্তিমূলক উপহার, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি এই জাতীয় হারাম উপার্জন। কিছু ক্রয় করে প্রভাব দেখিয়ে মূল্য কম দেওয়া, শক্তি ও প্রভাবের কারণে রিকশা, গাড়ি, শ্রমিক ইত্যাদির ভাড়া বা পারিশ্রমিক কম দেওয়া একই শ্রেণীর জুলুম। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের প্রাপ্য টাকাপয়সা, সরকারি অনুদান, সম্পত্তি ইত্যাদি পুরো বা আংশিক চাপ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে গ্রহণ করাও এই পর্যায়ের উপার্জন। এ ধরনের সকল উপার্জনই হারাম, তবে সবচেয়ে নোংরা হারাম উপার্জন যৌতুক। এ জাতীয় অন্যতম আরেকটি জুলুম পিতার মৃত্যুর পরে পিতার

সম্পত্তির শরীয়তসম্মত অংশ বোনদেরকে, এতিম বা দুর্বল প্রাপকদেরকে না দিয়ে দখল করা। কুরআন করীমে এধরনের ব্যক্তিদেরকে স্পষ্টভাবে জাহান্নামী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

(ঙ) ফাঁকি, ধোঁকা, ওজনে কম-বেশি, ভেজাল, খেয়ানত বা দায়িত্বে অবহেলা ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ : এগুলি সবই কঠিনতম হারাম উপার্জন। কুরআন ও হাদীসে এ সকল বিষয়ে বারবার সাবধান করা হয়েছে। কর্মস্থলে ফাঁকি দেওয়া, কর্মচারী বা কর্মদাতাকে চুক্তির চেয়ে কম কর্ম প্রদান করাও এই শ্রেণীর হারাম উপার্জন। সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার সবাই নিজ নিজ কর্ম চুক্তি অনুসারে পূর্ণ কর্ম প্রদান করতে ইসলামী শরীয়ত মতে বাধ্য। যদি কারো অসুবিধা হয় তাহলে কর্ম ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু কর্মরত অবস্থায় কর্মে অবহেলা হারাম ও এভাবে উপার্জিত বেতন হারাম। যিক্র, ওয়ায, দাওয়াত, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অযুহাতে কর্মে অবহেলা করলেও একইরূপ হারাম হবে। চিকিৎসা ছুটি নিয়ে হজ্ব ,উমরা করাও হারাম উপার্জনের মধ্যে। হয় স্পষ্ট ও সঠিক কারণ দেখিয়ে ছুটি নিতে হবে, না হলে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলে বা নিজেকে উপস্থিত দেখিয়ে কর্মের বেতন গ্রহণ করা এবং সে সময়ে অন্য কর্ম করা জায়েয নয়। এভাবে উপার্জিত বেতন সন্দেহাতীতভাবে হারাম উপার্জন।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যলয়, মাদ্রাসা ইত্যাদির শিক্ষকগণ, ডাক্তারগণ নির্ধারিত সময় চাকুরি স্থলে অবস্থান করতে ও নির্ধারিত সেবা প্রদান করতে বাধ্য। যদি চাকুরির চুক্তি ও সুবিধাদি অপছন্দ হয় তাহলে বাদ দিতে পারেন। পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু চাকুরিরত অবস্থায় দায়িত্বে অবহেলা, কম পড়ানো, কম চিকিৎসা করা, ছাত্র বা রোগীকে অতিরিক্ত সেবা গ্রহণের জন্য নিজস্ব কোচিং বা ক্লিনিকে যেতে উৎসাহিত করা – সবই হারাম এবং এভাবে উপার্জিত অর্থ হারাম।

সকল প্রকার ভেজাল, ধোঁকামূলক ব্যবসা এই শ্রেণীর হারাম। কোনো দ্রব্যের কোম্পানির বা প্রস্তুতকারকের নাম, ক্রয়মূল্য ইত্যাদি মিথ্যা বলে বিক্রয় করাও একই পর্যায়ের হারাম।

মুহতারাম পাঠক, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের সমাজে ধার্মিক বা ধর্মপ্রাণ বলে কথিত সাধারণ মানুষ, আলিম, নেতা, দরবেশ, তালেবে ইল্‌ম (লেখকসহ), যাকির, মুজাহিদ অনেকেই নির্বিচারে হারাম জীবিকার উপর নির্ভর করছেন। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ভেজাল, ওজনে কম-বেশি ইত্যাদি হারামে লিপ্ত, চাকুরিজীবী কর্মে ফাঁকি, অবহেলা ইত্যাদি হারামে লিপ্ত।

আমরা প্রত্যেকে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আছে এমন সকল হারাম জীবিকা অর্জন করতে দ্বিধা করি না। তবে আমাদের সাধ্যের বাইরে যেসকল হারাম উপার্জন তা আমরা ঘৃণা করি। যেমন, স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মে ফাঁকি দিয়ে হারাম উপার্জন করেন, তবে তিনি মন্ত্রী, সচিব ও নেতাদের কর্মে অবহেলার নিন্দা করেন। সাধারণ ধার্মিক পিতা ও যুবক অতীব আগ্রহের সাথে যৌতুকের মাধ্যমে হারাম উপার্জন গ্রহণ করেন, তবে রাজনৈতিক নেতাদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, দুর্নীতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। সুযোগ পেলে নিজের বোন ও এতিম ভাতুষ্পুত্র, ভাগ্নে ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, অর্থ ইত্যাদি অনেকেই আত্মসাৎ করেন, অথবা স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ বা ছোটখাট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অর্থ কিছুটা এদিক সেদিক করে হজম করে নেন। তবে তিনি তার সাধ্যের বাইরে বড় বড় দুর্নীতি ও আত্মসাতের ঘটনায় বিচলিত হন।

অনেক সময় আমরা আবার এসকল হারাম উপার্জনকে যুক্তিসঙ্গত করতে চাই। সরকার আমাদের ঠিকমতো বেতন দেয় না, ঠিকমতো পড়াবো কেন ? ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করব কেন ? বেতনে পেট চলে না তাই মিথ্যা তথ্য দিয়ে কিছু ভাতা নিয়ে নিলাম, ইত্যাদি। হারামকে হারাম জেনে ও মেনে তাতে লিপ্ত হলে ঈমান কিছুটা বাকি থাকে ও তাওবার সুযোগ থাকে। কিন্তু এধরনের যুক্তি দিয়ে হারামকে হালাল করে নিলে তাও থাকে না। কর্মদাতা যদি চুক্তি অনুযায়ী বেতন দেন, তাহলে কর্মী চুক্তি অনুযায়ী পূর্ণ কর্ম প্রদানে বাধ্য। চুক্তিতে অন্যায় থাকলে তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, অথবা চুক্তির কর্ম ছেড়ে দিতে হবে। চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় চুক্তির কর্মে ফাঁকি দিয়ে যে বেতন গ্রহণ করা হবে তা নিঃসন্দেহে হারাম উপার্জন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের এই অধঃপতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন,

يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام

"মানুষের মধ্যে এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ নির্বিচারে যা পাবে তাই গ্রহণ করবে। হালাল সম্পদ গ্রহণ করছে না হারাম সম্পদ গ্রহণ করছে তা বিবেচনা করবে না।"[১]

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে :

فـإذ ذلـك لا تـجـاب لـهـم دعـوة

"যখন এই অবস্থা হবে, তখন তাদের কোনো দু'আ কবুল করা হবে না।"[২]

মুহতারাম পাঠক, এ সকল হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, হারাম জীবিকা বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। মানুষ যত পাপী হোক, যত অবাধ্য হোক মহান প্রভুর সাথে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঁধন দু'আর সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। যখনই প্রভুকে ভুলে প্রভুর অবাধ্যতায় লিপ্ত এই মানুষটি বিপদে আপদে বা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রভুর দরবারে হাত উঠায়, তখন তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। কিন্তু হারাম জীবিকা বান্দার সাথে প্রভুর এই ঘনিষ্টতম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। কী কঠিন পরিণতি!

প্রশ্ন হলো, সব পাপেরই তো ক্ষমা আছে, এ পাপের কি ক্ষমা নেই? উত্তর হলো, সকল পাপের ক্ষমাই তাওবার মাধ্যমে হয়। তবে সাধারণ যে কোনো কঠিন পাপের তাওবা যত সহজ হারাম উপার্জনের তাওবা তত সহজ নয়। একজন মদ্যপ, ব্যভিচারী, বে-নামাযী

এমনকি কাফির যে কোনো সময় তার পাপে অনুতপ্ত হয়ে তার প্রভুর কাছে বেদনার্ত ও ব্যথিত মনে অনুতাপ করে আর পাপ করব না বলে সিদ্ধান্ত নিলেই তার তাওবা হয়ে গেল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন বলে কুরআন করীমে ও অগণিত হাদীসে বলা হয়েছে।

কিন্তু যে পাপের সাথে কোনো বান্দার হক জড়িত সে পাপের ক্ষেত্রে তাওবার অন্যতম শর্ত অনুতাপ, ক্রন্দন ও পাপ পরিত্যাগের সিদ্ধান্তসহ যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তার নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করতে না পারলে তাদের অংশ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সকল হারাম উপার্জনের মূল কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী, সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করা। হারাম উপার্জন থেকে তাওবার জন্য **প্রথমে** গভীরভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। **দ্বিতীয়ত,** সকল প্রকার অবৈধ উপাজন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। **তৃতীয়ত,** যাদের নিকট থেকে অবৈধভাবে সম্পদ গ্রহণ করা হয়েছে তাদেরকে, বা তাদের উত্তরাধিকারীগণকে তা ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা নিতে হবে। – এই তৃতীয় শর্তটিই সবচেয়ে কঠিন। এতে অক্ষম হলে অবৈধভাবে উপার্জিত সকল অর্থ ও সম্পদ যাদের সম্পদ তাদের নামে বিলিয়ে দিতে হবে, বেশি করে তাদের জন্য দু'আ করতে হবে, বেশি করে আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে, যেন তাদের এই হক আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। সর্বোপরি খুব বেশি করে সাওয়াবের কাজ করতে হবে, যেন পাওনাদারদের দেওয়ার পরেও নিজের কিছু থাকে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর দরবারে নিজের অসহায়ত্ব, আকুতি ও বেদনা পেশ করে সদা সর্বদা তাওবা করতে হবে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেছেন, এসব কিছুর পরও তার আখেরাতের নিরাপত্তার বিষয়ে কিছুই বলা যাবে না।

মুহতারাম পাঠক, অবৈধ উপার্জনকারীর সকল কর্ম, সকল প্রার্থনা অর্থহীন হওয়ার পাশাপাশি তার অবৈধ উপার্জনের জন্য আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এক হাদীসে আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো মুসলিমের কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করবে তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম নিশ্চিত করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করা হবে।" এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : হে আল্লাহর রাসূল, যদি সামান্য কোনো জিনিস অবৈধভাবে গ্রহণ করে? তিনি উত্তরে বলেন : যদি 'আরাক' গাছের একটুকরো খণ্ডিত ডালও কেউ অবৈধভাবে গ্রহণ করে তাহলে তারও এই শাস্তি।"[১]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যদি কেউ কাউকে জুলুম করে থাক বা ক্ষতি করে থাক তাহলে জীবদ্দশায় তার নিকট থেকে ক্ষমা ও মুক্তি নেবে। কারণ আখেরাতে টাকাপয়সা থাকবে না, তখন অন্যায়কারীর নেক আমলগুলি ক্ষতিগ্রস্তকে প্রদান করা হবে। যখন নেক আমল থাকবে না তখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাপগুলি অন্যায়কারীর কাঁধে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে।"[২]

আরেক হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) বললেন : "তোমরা কি জান কপর্দকহীন অসহায় দরিদ্র কে ?" আমরা বললাম : "আমাদের মধ্যে যার কোনো অর্থ-সম্পদ নেই সেই কপর্দকহীন দরিদ্র।" তিনি বললেন: "সত্যিকারের কপর্দকহীন দরিদ্র আমার উম্মাতের ঐ ব্যক্তি যে, কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম, যাকাত, ইত্যাদি নেককর্ম নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ বা অর্থ অবৈধভাবে গ্রহণ করেছে, কাউকে আঘাত করেছে, কারো রক্তপাত করেছে। তখন তার সকল নেককর্ম এদেরকে দেওয়া হবে। যদি হক আদায়ের পূর্বেই নেককর্ম শেষ হয়ে যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তিদের পাপ তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৩] আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

২. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ

দু'আ কবুলের একটি বিশেষ আমল, সাধ্যমতো সমাজের মানুষদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কোনো মুসলিম সমাজের মানুষ এই ইবাদত পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ সেই সমাজের খারাপ মানুষদেরকে সমাজের কর্ণধার বানিয়ে দেবেন এবং ভালো ও নেককার মানুষদের দু'আও কবুল করবেন না। একটি হাদীসে হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, নবীয়ে আকরাম ﷺ বলেছেন:

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

"যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই ভালোকাজে মানুষদেরকে নির্দেশ প্রদান করবে এবং অবশ্যই অন্যায় থেকে মানুষদেরকে নিষেধ করবে। যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি প্রেরণ করবেন। এরপর তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করলেও তিনি তা কবুল করবেন না।"[৪]

এই অর্থে হযরত আয়েশা (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৫]

৩. সুন্নাতের অনুসরণ

সুন্নাতের গুরুত্ব ও বিদ'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে। আমরা দেখেছি যে, সুন্নাত অনুসারে সামান্য ইবাদত বিদ'আত মিশ্রিত অনেক ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আমরা আরো দেখেছি যে সুন্নাতের বাইরে বা সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না, ইবাদতকারী যত ইখলাস ও আবেগসহ তা পালন করুন না কেন। যিক্‌র, দু'আ

ইত্যাদিও এই সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তবে দু'আর ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা পাই আমরা হাদীসে। হযরত আনাস (রা) নবীয়ে আকরাম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন:

إن الله عز وجل يستحي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسددا لزوما للسنة أن يسأل الله فلا يعطيه

"কোনো বয়স্ক বা বৃদ্ধ মুসলিম যদি সৎকর্মশীল হন এবং সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকেন তাহলে তিনি কোনো কিছু আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ তাঁর প্রার্থিত বস্তু না দিতে লজ্জা পান (আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেন)।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[১]

৪. সদা সর্বদা দু'আ করা

মানব চরিত্রের একটি বিশেষ দিক, শান্তি ও আনন্দের সময়ে আল্লাহকে ভুলে থাকা, বা বিশেষ দু'আ, আকুতি ও প্রার্থনা না করা। বিপদে পড়লে বেশি বেশি দু'আ করা। নিঃসন্দেহে এই আচরণ মহান রাব্বুল আ'লামীনের প্রকৃত দাসত্বের অনুভূতি, তাঁর উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকার প্রকাশ। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এই স্বভাবের কথা উল্লেখ ও নিন্দা করা হয়েছে। এক স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে :

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض

"যখন আমি মানুষকে নিয়ামত প্রদান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন কোনো অমঙ্গল বা কষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে লম্বা চওড়া দু'আ শুরু করে।"[২]

প্রকৃত মুমিনের উচিত সকল অবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। নিয়ামতের মধ্যে থাকলে তার স্থায়িত্ব প্রার্থনা করা ও সকল অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। কোনো কষ্ট বা অসুবিধা থাকলে তার কাছে আশ্রয় ও মুক্তি চাওয়া। এ মুমিনের চরিত্র। মুমিনের অন্তর এভাবে শান্তি পায়। আর এই অন্তরের দু'আই আল্লাহ কবুল করেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء

"যে চায় যে, আল্লাহ বিপদের সময় তার প্রার্থনায় সাড়া দিবেন, সে যেন সুখশান্তির সময় বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দু'আ করে।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

৫. বেশি করে চাওয়া

দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুই আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং বেশি করে চাইতে হবে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه

"তোমাদের কেউ যখন কামনা করবে, আশা করবে বা প্রার্থনা করবে তখন বেশি করে চাইবে ; কারণ সে তো তার মালিকের কাছে চাচ্ছে (কাজেই, কম চাইবে কেন, তিনি তো অপারগ নন কৃপণও নন)।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪]

৬. কেবলমাত্র মঙ্গল কামনা

অনেক সময় আমরা আবেগ, বিরক্তি, রাগ, কষ্ট ইত্যাদির কারণে মনে মনে নিজের বা অন্যের ক্ষতিকর কোনো কিছু কামনা করি। বিষয়টি খুবই অন্যায়। অন্তরকে নিয়ন্ত্রিত করুন। সর্বদা কল্যাণময় বিষয় কামনা করুন। কষ্ট বা রাগের কারণে অকল্যাণজনক কিছু কামনা না করে এমন কল্যাণময় কিছু কামনা করুন যা কষ্ট, বেদনা বা রাগের কারণ চিরতরে দূরীভূত করবে।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمناه فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته

"যখন তোমাদের কেউ কামনা বা প্রার্থনা করে তখন সে যেন চিন্তা ভাবনা করে কামনা বা প্রার্থনা করে, কারণ তার কোন্ কামনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না। (কাজেই, এমন কিছু যেন কেউ কামনা বা প্রার্থনা না করে যার জন্য পরে আফসোস করতে হয়)।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫]

অন্য হাদীসে উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون

"তোমরা নিজেদের উপর কখনো বদদু'আ করবে না ; কারণ ফিরিশতাগণ তোমাদের দু'আর সাথে 'আমীন' বলেন।"[৬]

আরেক হাদীসে হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم

"তোমরা কখনো নিজেদের বা তোমাদের সন্তানদের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদদু'আ

করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবুল করে নেবেন।"[১]

৭. ফলাফলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া

দু'আর ক্ষেত্রে আমাদের বড় ক্ষতিকর একটি স্বভাব বা অভ্যাস দু'আর ফল লাভে ব্যস্ত হওয়া। বিশেষত বিপদে, সমস্যায় বা দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে আমরা যখন দু'আ করি তখন তৎক্ষণাৎ ফল আশা করি। দুই চার দিন দু'আ করে ফল না পেলে আমরা হতাশ হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দি। এই হতাশা ও ব্যস্ততা ক্ষতি ও গোনাহের কারণ। কখনোই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। আমাদের বুঝতে হবে যে, দু'আ করা একটি ইবাদত ও অপরিমেয় সাওয়াবের কর্ম। আমি যত দু'আ করব ততই লাভবান হব। আমার সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর সাথে আমার একান্ত রহমতের সম্পর্ক তৈরি হবে। সর্বোপরি আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করবেনই। তবে তিনিই ভালো জানেন কিভাবে ফল দিলে আমার বেশি লাভ হবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثـــم أو قطيعة رحم ما لـــم يستعـــجـــل

"বান্দা যতক্ষণ পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতিকারক কোনো কিছু প্রার্থনা না করে ততক্ষণ তার দু'আ কবুল করা হয়, যদি না সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।" বলা হলো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ব্যস্ততা কিরূপ?" তিনি বলেন : "প্রার্থনাকারী বলতে থাকে – দু'আ তো করলাম, দু'আ তো করলাম ; মনে হয় আমার দু'আ কবুল হলো না। এভাবে সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং তখন দু'আ করা ছেড়ে দেয়।"[২]

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا يـــزال العـــبد بخير ما لم يســـتعـــجـــل قالوا يا نبي الله وكيف يستـــعـــجـــل قال يقول قد دعوت ربي فلم يســـتجب لي

"বান্দা যতক্ষণ না ব্যস্ত ও অস্থির হয়ে পড়ে ততক্ষণ সে কল্যাণের মধ্যে থাকে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন : ব্যস্ত হওয়া কিরূপ ? তিনি বলেন : সে বলে – আমি তো অনেক দু'আ করলাম কিন্তু দু'আ কবুল হলো না।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৩]

৮. মনোযোগ ও কবুলের দৃঢ় আশা

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, বান্দা যেভাবে তার প্রভুর প্রতি ধারণা পোষণ করবে, তাঁকে ঠিক সেভাবেই পাবে। কাজেই প্রত্যেক মুমিনের উপর দায়িত্ব, আল্লাহর রহমত, ক্ষমা ও ভালবাসার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখা। আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং তিনি আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। এই দৃঢ় প্রত্যয় মুমিনের অন্যতম সম্বল ও মহোত্তম সম্পদ।

প্রার্থনার ক্ষেত্রেও এই প্রত্যয় রাখতে হবে। অন্তরের গভীর থেকে মনের আকুতি ও সমর্পণ মিশিয়ে নিজের সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। সাথে সাথে সুদৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, আল্লাহ অবশ্যই আমার প্রার্থনা শুনবেন এবং আমার ডাকে সাড়া দিবেন। তিনি অবশ্যই শুনবেন। ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فسلوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل

"তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করবে যে, আল্লাহ অবশ্যই তা কবুল করবেন ও পূরণ করবেন। কারণ কোনো বান্দা অমনোযোগী অন্তরে দু'আ করলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন না।"[৪]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يســـتـــجـــيب دعـــاء من قـــلـــب غافـــل لاه

"তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করার সময় দৃঢ়ভাবে (একীন) বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ নিশ্চয় কবুল করবেন। আর জেনে রাখ, আল্লাহ কোনো অমনোযোগী বা অন্য বাজে চিন্তায় রত মনের প্রার্থনা কবুল করেন না।"[৫]

৯. নিজের জন্য নিজে দু'আ করা

অনেক সাধারণ মুসলিম সাধারণত নিজের জন্য নিজে আল্লাহর দরবারে দু'আ চাওয়ার চেয়ে অন্য কোনো বুজুর্গের কাছে দু'আ চাওয়াকেই বেশি উপকারী বলে মনে করেন। পিতামাতা, উস্তাদ, আলিম বা নেককার কোনো জীবিত মানুষের কাছে দু'আ চাওয়া জায়েয। তবে নিজের দু'আ নিজে করাই সর্বোত্তম। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা গোনাহগার, আমাদের দু'আ কি আল্লাহ শুনবেন? আসলে গোনাহগারের দু'আই তো তিনি শুনেন। আমার মনের বেদনা, আকুতি আমি নিজে আমার প্রেমময় প্রভুর নিকট যেভাবে জানাতে পারব সেভাবে কি অন্য কেউ তা পারবেন। এছাড়া এই দু'আ আমার জন্য সাওয়াব বয়ে আনবে এবং আমাকে আল্লাহর প্রেম ও করুণার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আয়েশা (রা) বলেন : আমি প্রশ্ন করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম দু'আ কি?" তিনি উত্তরে বলেন :

دعــاء الــمــرء لــنــفــســه

"মানুষের নিজের জন্য নিজের দু'আ।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[১]

অন্যের জন্য দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করা

মুমিন সর্বদা নিজের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। অন্য কারো জন্য দু'আ করলে তখন সেই সুযোগে নিজের জন্য দু'আ করা উচিত। যেমন, কারো রোগমুক্তির জন্য দু'আ করতে হলে বলা উচিত : 'আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং তাঁকেও সুস্থতা দান করুন।' অথবা, কেউ বললেন : 'আমরা জন্য দু'আ করুন।' তখন বলা উচিত : 'আল্লাহ আমার কল্যাণ করুন ও আপনার কল্যাণ করুন।' **রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত কারো জন্য দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করা।** হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রা) বলেন :

إن رسول الله ﷺ كان إذا ذكــر أحــدا فدعا له بدأ بنــفــسه

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো কথা উল্লেখ করে দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন।" ইমাম তিরমিযী বলেন : 'হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।'[২]

কোনো নবীর কথা উল্লেখ করলে তিনি প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করে এরপর সেই নবীর জন্য দু'আ করতেন। বলতেন :

رحمة الله علينا وعلى أخي كذا.. رحمة الله علينا وعلى موسى

"আমাদের উপর আল্লাহর রহমত এবং আমাদের অমুক ভাইয়ের উপর।" যেমন, বলতেন :"আমাদের উপর আল্লাহর রহমত এবং মূসার উপর।" [৩]

আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন:

إن النبي ﷺ كان إذا دعا بدأ بنفسه

নবী ﷺ যখন দু'আ করতেন তখন নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন।"[৪]

১০. অনুপস্থিতদের জন্য দু'আ করা

প্রত্যেক মুমিনের উচিত, তিনি যখন আল্লাহর দরবাবে প্রার্থনা করবেন, তখন শুধুমাত্র নিজের জন্য দু'আ না করে অন্যান্য মুসলিম ভাইবোনের জন্যও দু'আ করবেন। বিশেষত যাদেরকে তিনি আল্লাহর জন্য মহব্বত করেন, যারা কোনো সমস্যা বা বিপদে আছে বলে তিনি জানেন বা যারা তার কাছে দু'আ চেয়েছে। সকল বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য দু'আ করা প্রয়োজন। কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে উক্ত দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন এবং প্রার্থনাকারীকেও উক্ত নিয়ামত দান করবেন বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।

তাবেয়ী সাফওয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে (আমার শ্বশুর) আবু দারদার (রা) বাসায় দেখা করতে গেলাম। তিনি বাসায় ছিলেন না। (আমার শাশুড়ি) উম্মু দারদা আমাকে বললেন : তুমি কি এ বছর হজ্ব করতে যাচ্ছ? আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : তাহলে আমাদের মঙ্গলের জন্য দু'আ করবে। একথা বলে তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل

"কোনো মুসলিম যখন তার কোনো অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন। তার মাথার কাছে একজন ফিরিশতা নিয়োজিত থাকেন। যখনই ঐ মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য কোনো কল্যাণ বা মঙ্গল চায়, তখনই ফিরিশতা বলেন : আমীন, এবং আপনার জন্যও অনুরূপ।"[৫]

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إذا دعا المرء لأخيه بظاهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثله

"যখন কোনো মানুষ যখন তার কোনো অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করে, তখন ফিরিশতাগণ বলেন : আমীন, এবং আপনাকেও আল্লাহ অনুরূপ বস্তু প্রদান করেন। (অর্থাৎ, আল্লাহ আপনার ভাইয়ের জন্য এই দু'আ কবুল করুন এবং আপনি আপনার ভাইয়ের জন্য যা চাচ্ছেন আল্লাহ আপনাকেও তা দান করুন)।"[৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য মাঝে মাঝে ফজর, মাগরিব বা অন্য সালাতের শেষ রাকাতের রুকুর পরে দু'আ করতেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন :

وكان رسول الله ﷺ حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من

المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ', 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলে নাম উল্লেখ করে করে অনেকের জন্য দু'আ করতেন। তিনি বলতেন : আল্লাহ, আপনি ওলীদ ইবনুল ওলীদ, সালামাহ ইবনু হিশাম, আইয়াশ ইবনু আবী রাবীআহ এবং দুর্বল মুমিনদেরকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ আপনি মুদার গোত্রকে কঠিনভাবে পাকড়াও করুন এবং ইউসূফ (আ)-এর দুভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষের মধ্যে নিপতিত করুন।"[১]

মুসনাদে বাযযারের বর্ণনায় হাদীসটি নিম্নরূপ :

إن رسول الله ﷺ رفع رأسه بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলামুখী বসা অবস্থায় মাথা উঠিয়ে বলেন : আল্লাহ সালামাহ ইবনু হিশাম, আইয়াশ ইবনু আবী রাবিয়াহ, ওলীদ ইবনু ওলীদ ও দুর্বল মুসলমানদেরকে (মক্কার কাফেরদের হাত থেকে) রক্ষা করুন, যারা তাদের হাত থেকে বেরিয়ে চলে আসার কোনো পথ পাচ্ছে না।"

বায্যারের সনদ মোটামুটি গ্রহণ যোগ্য।[২] উপরের বর্ণনাটি বেশি প্রসিদ্ধ। সম্ভবত, কখনো কখনো তিনি সালাতের পরেও এভাবে দু'আ করেছিলেন।

১১. সকল বিষয় শুধু আল্লাহর নিকটেই চাওয়া

প্রার্থনা দুই প্রকার : লৌকিক ও অলৌকিক

প্রার্থনা বা চাওয়ার বিষয়বস্তু দুই প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য-সহযোগিতা যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে করতে পারে। এ সকল বিষয় প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ আরেকজনের নিকট চেয়ে থাকে এবং মানুষ জাগতিকভাবে তা প্রদান করতে পারে। যেমন, কারো কাছে টাকাপয়সা চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, পানিতে পড়ে গেলে উঠানোর জন্য সাহায্য চাওয়া, মাথার বোঝা পড়ে গেলে উঠাতে সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি অগণিত। জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নির্বিশেষে সকলেই এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা অলৌকিক বা অপার্থিব। জাগতিক মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়া অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি প্রার্থনা করা। এ জাতীয় প্রার্থনা শুধুমাত্র কোনো "ধর্মের অনুসারী" বা "বিশ্বাসী" করেন। "বিশ্বাসী" শুধুমাত্র আল্লাহ, ঈশ্বর বা সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করেন, অথবা যার সাথে 'ইশ্বরের' বিশেষ সম্পর্ক ও যার মধ্যে 'ঐশ্বরিক' ক্ষমতা আছে, তার কাছেই প্রার্থনা করেন।

এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রার্থনা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে করার অর্থ - আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করা। কারণ, এতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী (অলৌকি সাহায্য, ক্ষমতা, ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বরিক শক্তি) কল্পনা করা হয়। আর আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুকে কোনো গুণ, ক্ষমতা বা কর্মে আল্লাহর মতো মনে করা বা কারো মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী আরোপ করাই শিরক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, মানুষ, প্রাকৃতিক বিষয়ের মধ্যে কোনো অলৌকিক বা অপার্থিব কল্যাণ বা অকল্যাণের বিশ্বাসই সকল প্রকার শিরকের মূল। এজন্য কুরআন কারীমে মুশরিকদের শিরকের প্রতিবাদ করতে যেয়ে বিভিন্ন স্থানে বারংবার, প্রায় ১৫/১৬ স্থানে, ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো প্রকার মঙ্গল, অমঙ্গল, কল্যাণ, অকল্যাণ, ক্ষতি বা উপকার করার কোনোরূপ ক্ষমতা নেই বা আল্লাহ কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা প্রদান করেননি।

বস্তুত, মুশরিকগণের দাবি ছিল যে, আল্লাহ এ সকল সৃষ্টিকে ভালবেসে এদেরকে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তাদের কাছে প্রার্থনা করলে তারা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতাবলে বা আল্লাহর নিকট থেকে প্রার্থনা করে ভক্তদের মনবাঞ্ছনা পূরণ করতে পারেন। তারা বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা বা কারামত ও মু'জিযাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত। এখানে ঈসা (আ)-এর বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের পূর্ব থেকেই খৃস্টানগণ ঈসা মসীহ বা 'যীশু খৃস্টের' মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবি করতে থাকে। তাদের দাবি ছিল, তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেছেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মধ্যে কল্যাণ-অকল্যাণের ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে। তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা করত, সাহায্য চাইত এবং তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। এছাড়া তাঁর মাতা মরিয়মকেও তারা সেন্ট বা সাধ্বী রমণী হিসেবে ঐশ্বরিক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত এবং তার কাছে প্রার্থনা করত, তাঁর মূর্তি বা সমাধিতে সাজদা করত এবং তাঁর নামে মানত, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদত করত।

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এই শির্কের প্রতিবাদ করা হয়েছে। মাসীহ বা তাঁর মাতার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না বা নেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে: "মরিয়ম-তনয় মসীহ তো কেবল একজন রাসূল; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করত। দেখ, তাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি! আরো দেখ, তারা কিভাবে সত্য-বিমুখ হয়! বল, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যার কোনোই ক্ষমতা নেই তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার?"[৩]

লৌকিক প্রার্থনা লোকের কাছে চাওয়া যায়

প্রথম প্রকার 'প্রার্থনা' জাগতিকভাবে যে কোনো মানুষের কাছে করা যায়। এগুলি একান্তই জাগতিক বা লৌকিক সাহায্য সহযোগিতা। কেউ এই জাতীয় সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করা উচিত ও দায়িত্ব। মনে করুন আমার গরুটি পালিয়ে যাচ্ছে। আমি সামনে কোনো মানুষের আভাস পেয়ে চিৎকার করে বললাম, ভাই, আমার গরুটি একটু ধরে দেবেন! অথবা আমি পথ চিনতে পারছি না, তাই কোনো মানুষকে দেখে অথবা কোনো বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে মানুষ আছে অনুমান করে চিৎকার করে বলছি, ভাই অমুক স্থানে কোন দিক দিয়ে যাব একটু বলবেন!

এখানে আমি লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি। ঐ মানুষের মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা ঐশ্বরিক গুণ কল্পনা করছি না। ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচয়ও আমার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। আমি জানি যে, স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ একটি গরু ধরতে পারে বা উক্ত স্থানের একজন বাসিন্দা স্বাভাবিকভাবে পথটি চিনবে বলে আশা করা যায়। এজন্য আমি তার থেকে এই লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি।

যদি কোথাও এই প্রকারের জাগতিক সমস্যা হয় এবং সেখানে কোনো মানুষজন না থাকে তাহলে উপস্থিত অদৃশ্য ফিরিশতাগণের নিকটও সাহায্য চাওয়া যায়। মুমিন জানেন যে, আল্লাহর অগণিত ফিরিশতাগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন। এছাড়া অদৃশ্য সৃষ্টি জীনেরাও বিভিন্ন স্থানে চলাচল করে। উপরের পরিস্থিতিতে যদি কোনো দৃশ্যমান মানুষকে না দেখে তিনি অদৃশ্য ফিরিশতা বা জ্বিনের কাছে লৌকিক সাহায্য চান তাহলে তা জায়েয হবে। কারণ তিনি কোনো নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা অলৌকিকত্ব কল্পনা করছেন না। তথায় কোন্ ফিরিশতা আছেন বা কোন্ জ্বিন রয়েছেন তাও তিনি জানেন না বা জানা তার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। তিনি জানেন যে, এখানে কোনো ফিরিশতা বা জ্বিন থাকতে পারেন। আল্লাহর অন্য কোনো বান্দাকে দেখছি না, কাজেই এখানে উপস্থিত আল্লাহর অদৃশ্য বান্দাদের কাছে একটু সাহায্য চেয়ে দেখি কী হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন :

إن لله عز وجل ملائكة سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوا عباد الله يرحمكم الله تعالى

"বান্দার সাথে তার সংরক্ষণে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ ছাড়াও আল্লাহর অনেক ফিরিশতা আছেন যারা সারা বিশ্বে কোথায় কোন গাছের পাতা পড়ছে তাও লিখেন। যদি তোমাদের কেউ কোনো নির্জন প্রান্তরে আটকে পড়ে বা অচল হয়ে পড়ে তাহলে সে ডেকে বলবে : হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের রহমত করুন।"[১]

অনুপস্থিতের কাছে অলৌকিকভাবে লৌকিক পার্থনা শিরক

এই প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে যদি কেউ অনুপস্থিত কাউকে ডাকেন বা অনুপস্থিত কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহলে তা শিরক হবে। যেমন, কারো রিকশা উল্টে গেছে বা গাড়িটি খাঁদে পড়েছে, তখন স্বাভাবিক লৌকিক কর্ম যে, সে কাউকে দেখতে পাক বা না পাক, সে চিৎকার করে সাহায্য চাইবে : কে আছ একটু সাহায্য কর। এখানে সে লৌকিক সাহায্য চাচ্ছে।

কিন্তু যদি সে এ সময়ে সেখানে অনুপস্থিত কোন সৃষ্টি, জীবিত বা মৃত মানুষকে ডাকতে থাকে তাহলে সে শিরকে লিপ্ত হবে। কারণ সে মনে করছে, অনুপস্থিত অমুক ব্যক্তি সদা সর্বদা সবত্র বিরাজমান বা সদা সর্বদা সকল স্থানের সবকিছু তার গোচরিভূত। কাজেই, তিনি দূরবর্তী স্থান থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন বা আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন এবং দূর থেকে অলৌকিকভাবে আমার বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার মতো "অলৌকিক" ক্ষমতা তার আছে। এভাবে সে একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে অলৌকেকত্ব, ঐশ্বরিক শক্তি বা মহান আল্লাহর গুণাবলী আরোপ করে শিরকে নিপতিত হয়েছে। এছাড়াও সে মহান আল্লাহর ক্ষমতাকে ছোট বলে মনে করেছে।

এই প্রার্থনাকারী বা আহ্বানকারী ঐ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা বা গুণ কল্পনা করেছে তা একান্তভাবেই মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত গুণাবলী। এই প্রাথনাকারী এই গুণাবলীকে শুধুমাত্র আল্লাহর বলে মনে করে না। সে বিশ্বাস করে যে, এই ক্ষমতার মধ্যে আল্লাহর শরীক আছে। এই ক্ষমতাটি যেমন আল্লাহর আছে, তেমনি অমুক ব্যক্তিরও আছে। তবে সে সম্ভবত তার কল্পনার মানুষটির ক্ষমতাকে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতার চেয়ে বেশি বা দ্রুত বলে বিশ্বাস করে। এজন্যই সে আল্লাহকে না ডেকে তাকে ডেকেছে।

এক্ষেত্রে মুশরিকদের দাবি যে, এসকল বাবা, মা, সান্তা, সেন্ট, ফিরিশতা বা জ্বিনদেরকে আল্লাহই ক্ষমতা প্রদান করেছেন। ক্ষমতা মূলত আল্লাহরই, তিনি এদেরকে কিছু বা সকল ক্ষমতা প্রদান করেছেন। মক্কার কাফিররাও এই দাবি করত বলে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কঠিনভাবে প্রতিবাদ করা হয়েছে।

আমাদের নেককার বা বুজর্গ মানুষদেরকে নিয়ে এজাতীয় অনেক মিথ্যা কাহিনী, কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি রয়েছে। সকল মুশরিক সমাজেই এই জাতীয় কিংবদন্তী আছে। "অমুক বিপদে পড়ে বাবা অমুক, মা অমুক, সেন্ট বা সান্তা অমুককে ডেকেছিল, অমনি সে তাকে উদ্ধার করে দিয়েছে।" আর এগুলির উপর ভিত্তি করে মানুষ আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত বা আল্লাহর মতো ক্ষমতাবান বা "ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী" বলে কল্পনা করে শিরকে লিপ্ত হয়।

লৌকিক-অলৌকিক সকল প্রার্থনা আল্লাহর কাছে করা

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জাগতিক ও লৌকিক সাহায্য সহযোগিতা আল্লাহর সৃষ্টির কাছে চাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও এ ধরনের বিষয়ও কারো কাছে না চেয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য উম্মতকে শিক্ষা প্রদান করেছেন উম্মতের রাহবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। জাগতিক ও সৃষ্টিজগতের সাধ্যাধীন বিষয়ে একে অপরের সাহায্য প্রর্থনা জায়েয আর আল্লাহর কাছে চাওয়া ইবাদত ও সাওয়াব। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকারের সাহায্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া হারাম ও শিরক আর আল্লাহর কাছে চাওয়া ইবাদত ও সাওয়াব।

কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে দু'আর অন্যতম দিক যে, বান্দা তার সকল বিষয় শুধুমাত্র তার প্রভু, প্রতিপালক, পরম করুণাময় আল্লাহর কাছেই চাইবেন। আমরা কুরআন কারীমের আয়াতে দেখেছি আল্লাহ বান্দাগণকে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাদের সকল প্রার্থনায় সাড়া দিবেন বলে জানিয়েছেন। যারা তাঁর কাছে দু'আ করবে না ,বা তাঁকে ডাকবে না ,তাদের জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জাগতিক ও ধর্মীয় সকল কাজে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। লবণের দরকার হলেও আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَه شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انقطعَ، وحتى يسأله الملح

"তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও তাঁর কাছেই চাইবে। এমনকি লবণও তাঁর কাছেই চাইবে।"[১]

আয়েশা (রা) বলেন:

سلوا الله كل شيء حتى الشسع فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر

"তোমরা সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইবে। এমনকি জুতার ফিতাও আল্লাহর কাছে চাইবে। কারণ আল্লাহ ব্যবস্থা না করলে জুতার ফিতাও মিলবে না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২]

হাদীস শরীফে আমরা দেখতে পাই যে, যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কিছু না চান, তা যত ক্ষুদ্র জাগতিক বিষয়ই হোক, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জান্নাতের জিম্মাদারী গ্রহণ করবেন। সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

من يكفل [يضمن] لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة

"কে আছে, যে দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, সে কারো কাছে কিছু চাইবে না, তাহলে আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব।" সাওবান বলেন : "আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি।" এরপর সাওবান (রা) কারো কাছে কিছুই চাইতেন না। অনেক সময় উটের পিঠে থাকা অবস্থায় তাঁর লাঠি পড়ে যেত। তিনি কাউকে বলতেন না যে, আমার লাঠিটি উঠিয়ে দিন। বরং তিনি নিজে উটের পিঠ থেকে নেমে নিজের হাতেই লাঠিটি উঠাতেন। হাদীসটি সহীহ।[৩]

আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "তুমি কি আমার কাছে বাই'আত (প্রতিজ্ঞা) গ্রহণ করবে, যদি কর তাহলে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত।" আমি বললাম : "হাঁ এবং আমি আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উপর শর্তারোপ করলেন :

لا تسأل الناس شيئا قلت نعم قال ولا سوطك أن يسقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه

"মানুষের কাছে কিছুই চাইতে পারবে না। আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : তোমার ছড়িও যদি হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে তা কারো কাছে চাইতে পারবে না। নিজে নেমে তা তুলে নেবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

হযরত আউফ ইবনু মালিক বলেন, আমরা ৭ জন বা ৮ জন বা ৯ জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে বসেছিলাম। আমরা কিছু পূর্বেই বাই'আত গ্রহণ করেছি। তখন তিনি বললেন : তোমরা বাই'আত গ্রহণ করবে না ? আমরা বললাম : আমরা তো ইতোমধ্যেই বাই'আত গ্রহণ করেছি। তিনি ৩ বার একই কথা বললেন। তখন আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমাদের মধ্য থেকে একজন বলল : আমরা কিসের উপর বাই'আত গ্রহণ করব? তিনি বললেন :

أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية قال ولا تسألوا الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدا أن يناوله إياه

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো শিরক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রাষ্ট্রের আনুগত্য করবে ... এবং মানুষের নিকট কিছুই চাইবে না।" হাদীসের রাবী বলেন : "ঐ মানুষগুলি তাঁদের ছড়িটি পড়ে গেলেও কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলতেন না।"[৫]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু চাইবে কেন মুমিন ? কেউ তো তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার নূন্যতম ক্ষমতা রাখে না। তিনিই তো সব ক্ষমতার মালিক। আমি কেন অন্যের কাছে চেয়ে নিজেকে হেয় ও আমার মহান দয়ময় প্রভুর প্রতি আমার আস্থাকে কমিয়ে ফেলব?

হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন :

يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت

فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف

"হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে (তাঁর বিধানাবলীকে) হেফাযত করবে, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে (তোমার অন্তরে সদা জাগরুক ও) সংরক্ষিত রাখবে, তাহলে তাঁকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে বা প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, যদি সকল মানুষ তোমার কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে একজোট হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই অকল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন। কলমগুলি উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে।" হাদীসটি সহীহ।[১]

সাধারণ বিপদ-আপদ, কষ্ট-দুঃখ বা সমস্যার কথা আমরা অনেক সময় অন্য কোনো মানুষকে বলে সহযোগিতা কামনা করি বা অন্তত মনকে হাল্কা করি। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের অভ্যাস যে, সে কোনো বান্দার কাছে কোনো ব্যথার কথা না বলে তার সকল ব্যথা, বেদনা, কষ্ট ও যাতনার কথা তাঁর মালিকের কাছে পেশ করা। একমাত্র তিনিই তো তা দূর করতে পারেন। আর তিনি না করলে তো কারো কিছু করার নেই। শতবার ফিরিয়ে দিলেও একমাত্র তাঁর দরজাই মুমিনের গন্তব্যস্থল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ

"যদি কোনো ব্যক্তি কষ্ট-অভাবে পতিত হয়ে তার অভাবে কথা মানুষের কাছে পেশ করে বা মানুষকে বলে তাহলে তার অভাব মিটবে না। আর যদি সে তার বিপদ বা অভাব আল্লাহর নিকট পেশ করে তাহলে অচিরেই আল্লাহ তাকে নিকটবর্তী বা দূরবতী রিযক প্রদান করবেন।" হাদীসটি সহীহ।[২]

<u>১২. আল্লাহর মহান নাম ও ইসমু আ'যম দ্বারা দু'আ</u>

সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মুমিনের উচিত যে কোনো দু'আর আগে বেশি বেশি করে আল্লাহর প্রশংসা ও হামদ-সানা করা, মহান আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ ধরে তাঁকে ডেকে ডেকে এবং তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলির ওসীলা দিয়ে দু'আ করা। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দু'আর আগে এভাবে হামদ সানা ও আল্লাহর মহান নামসমূহ ধরে দু'আ করলে একদিকে যেমন মনে আল্লাহর প্রতি আবেগ, ভালবাসা আসে, তেমনি দু'আতে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। এভাবে দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন :

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون

"এবং আল্লাহর আছে সুন্দরতম নামসমূহ ; কাজেই তোমরা তাঁকে সে সকল নামে ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে। তাদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই তাদেরকে প্রদান করা হবে।"[৩]

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة

"আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, ১০০'র একটি কম, যে ব্যক্তি এই নামগুলি সংরক্ষিত রাখবে বা হিসাব রাখবে (মুখস্থ রাখবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৪]

এই হাদীসে নামগুলির বিবরণ দেওয়া হয়নি। ৯৯ টি নাম সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও অন্য কয়েকজন মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন।[৫] কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস উক্ত বিবরণকে যয়ীফ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী নিজেই হাদীসটি হাদীসটি সংকলন করে তার সনদের দুর্বলতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন, ৯৯ টি নামের তালিকা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত নয়। পরবর্তী রাবী এগুলি কুরআনের আলোকে বিভিন্ন আলিমের মুখ থেকে সংকলিত করে হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কুরআন করীমে উল্লেখিত অনেক নামই এই তালিকায় নেই। কুরআন করীমে মহান আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ডাকা হয়েছে 'রাব্ব' নামে। এই নামটিও এই তালিকায় নেই।[৬]

এক্ষেত্রে আগ্রহী মুসলিম চিন্তা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৯৯ টি নাম হিসাব রাখতে নির্দেশনা দিলেন কিন্তু নামগুলির নির্ধারিত তালিকা দিলেন না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে কেরাম বলেন যে, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আংশিক গোপন রাখা হয়, মুমিনের কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য। যেমন, লাইলাতুল কদর, জুম'আর দিনের দু'আ কবুলের সময়, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে নামের নির্ধারিত তালিকা না বলে আল্লাহর নাম সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন বান্দা আগ্রহের সাথে কুরআনে

আল্লাহর যত নাম আছে সবই পাঠ করে, সংরক্ষণ করে এবং সেসকল নামে আল্লাহকে ডাকতে থাকে ও সেগুলির ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করে।[১]

কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযীর সংকলিত তালিকাটিকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।[২] সর্বাবস্থায় আগ্রহী যাকির এই নামগুলি মুখস্থ করতে পারেন। এছাড়া কুরআন করীমে উল্লেখিত আল্লাহর সকল মুবারাক নাম নিয়মিত কুরআন পাঠের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

যিক্‌র নং ১৯: আল্লাহর নামসমূহের ওসীলায় দুশ্চিন্তা মুক্তির দু'আ

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري [في روايات: نور صدري] وجلاء حزني وذهاب همي

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আবদুকা, ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়াবনু আমাতিকা, না-সিয়্যাতি বিইয়াদিকা, মা-দিন ফিইয়্যা হুকমুকা, 'আদলুন ফিইয়্যা 'কাদাউকা, আসআলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুআ লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা, আউ আনযালতাহু ফী কিতা-বিকা, আউ 'আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালকিকা, আউ ইসতা-সারতা বিহী ফী 'ইলমিল 'গাইবি 'ইনদাকা আন তাজ'আলাল কুরআ-না রাবী'আ কালবী, ওয়া নূরা বাসারী [সাদরী] , ওয়া জালা-আ হুযনী, ওয়া যাহা-বা হাম্মী।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা, আপনার (একজন) বান্দার পুত্র, (একজন) বান্দীর পুত্র। আমার কপাল আপনার হাতে। আমার বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কার্যকর। আমার বিষয়ে আপনার বিধান ন্যায়ানুগ। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার সকল নাম ধরে বা নামের ওসীলা দিয়ে, যে নামে আপনি নিজেকে ভূষিত করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কোনো সৃষ্টিকে শিখিয়েছেন, অথবা যে নাম আপনি গাইবী জ্ঞানে আপনার একান্ত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন (সকল নামের ওসীলায় আমি আপনার কাছে চাচ্ছি যে,) আপনি কুরআন কারীমকে আমার অন্তরের বসন্ত, চোখের আলো, বেদনার অপসারণ ও দুশ্চিন্তার অপসারণ বানিয়ে দিন। (কুরআনের ওসীলায় আমাকে এগুলি দান করুন)।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن ... إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن.

"যে কোনো ব্যক্তি যদি কখনো দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠাগ্রস্ত অবস্থায় বা দুঃখ বেদনার মধ্যে নিপতিত হয়ে উপরের বাক্যগুলি বলে দু'আ করে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করবেনই এবং তার বেদনাকে আনন্দে রূপান্তরিত করবেনই।" উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন : তাহলে আমাদের উচিত এই বাক্যগুলি শিক্ষা করা। তিনি বললেন : "হাঁ, অবশ্যই, যে এগুলি শুনবে তার উচিত এগুলি শিক্ষা করা।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৩]

মহান আল্লাহর ইসমু আ'যম :

বিশেষ করে আল্লাহর 'ইসমে আ'যম' বা শ্রেষ্ঠতম নাম ধরে দু'আ করতে হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ' ইসমে আ'যম '-এর ওসীলায় আল্লাহর নিকট দু'আ করলে আল্লাহ দু'আ কবুল করবেন। কিন্তু 'ইসমে আ'যম' কী সে বিষয়ে একাধিক সহীহ ও যয়ীফ রেওয়ায়েত রয়েছে। এখানে কয়েকটি সহীহ হাদীস এ বিষয়ে উল্লেখ করছি :

যিক্‌র নং ২০ : মহান আল্লাহর ইসমু আ'যম-১

(১). বুরাইদাহ আসলামী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় দু'আ করছে নিম্নের কথা দিয়ে :

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলূকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতালল্লা-হু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতাল আ'হাদুস সামাদুল লাযী লাম ইয়ালিদ, ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুআন আ'হাদ।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনিই একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্মদান করেননি ও জন্মগ্রহণ করেননি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

"যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমু আ'যম ধরে প্রার্থনা করেছে, যে

নাম ধরে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম ধরে চাইলে তিনি প্রদান করেন।" হাদীসটি সহীহ।[১]

যিক্‌র নং ২১ : মহান আল্লাহর ইসমু আ'যম-২

(২). হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বৃত্তাকারে বসে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছিল। সে সালাতের তাশাহহুদের পরে দু'আ করল এবং দু'আর মধ্যে বলল :

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت [المنان] [يا] بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদা, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, [আল-মান্নানু], [ইয়া-] বাদী'আস সামাওয়া-তি ওয়াল আরদি, ইয়া- যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম, ইয়া- হাইউ ইয়া- কাইউম।

অর্থ: "হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি (এই বলে) যে, সকল প্রশংসা আপনার, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, হে মহাদাতা, হে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক, হে মহত্ত্ব ও সম্মানের মালিক, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বকর্তৃত্বময় অভিভাবক।"

তখন নবীয়ে আকরাম ﷺ বললেন :

لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعـــي به أجاب وإذا ســـئــل به أعطى

"নিশ্চয় সে আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমে আ'যম ধরে দু'আ করেছে, যে নামে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নামে চাইলে তিনি প্রদান করেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২]

যিক্‌র নং ২২ : ইসমু আ'যম-৩ , দু'আ ইউনুস :

(৩). একটি হাদীসে দু'আ ইউনূসকে আল্লাহর 'ইসমু আ'যাম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইউনূস (আ) যে দু'আ বলে দু'আ করেছিলেন সেটি আল্লাহর ইসমু আ'যাম, যা দিয়ে ডাকলে আল্লাহ সাড়া দেন এবং যদ্দ্বারা চাইলে আল্লাহ প্রদান করেন।[৩]

অন্য হাদীসে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له

"যুন্নুন (ইউনূস আ) মাছের পেটে যে দু'আ বলে দু'আ করেছিলেন : **(লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা সুব'হা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যা-লিমীন) : (আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত)**, – এই দু'আ দ্বারা যে মুসলিমই যে কোনো বিষয়ে দু'আ করবে, আল্লাহ অবশ্যই তার দু'আয় সাড়া প্রদান করবেন (দু'আ কবুল করবেন)।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

আল্লাহর নামের ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া বিষয়ে অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মুমিন তাঁর নেক কর্ম ইত্যাদির ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাইতে পারে বলে ২/১ টি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। যেমন,– "হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমি অমুক কর্মটি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, সেই ওসীলায় আমার প্রার্থনা কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমার কোনো উল্লেখযোগ্য নেক আমল নেই যে, যার ওসীলা দিয়ে আমি আপনার পবিত্র দরবারে দু'আ চাইব। শুধুমাত্র আপনার হাবীব নবীয়ে মুসতাফা ﷺ-এর সামান্য মহব্বত হৃদয়ে ধারণ করেছি, এই মহব্বতটুকুর ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমার কিছুই নেই, শুধুমাত্র আপনার নবীয়ে আকরাম ﷺ-এর সুন্নাতের মহব্বতটুকু হৃদয়ে আছে, সেই ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করুন, আমার দু'আ কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমি কিছুই আমল করতে পারিনি, তবে আপনার পথে অগ্রসর ও আমলকারী নেককার বান্দাদেরকে আপনারই ওয়াস্তে মহব্বত করি, তাদের পথে চলতে চাই, আপনি সেই ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন ...।" ইত্যাদি।

১৩. দু'আর শুরুতে ও শেষে সালাত পাঠ

দু'আর অন্যতম আদব ও দু'আ কবুলের অন্যতম ওসীলা দু'আর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর উপর সালাত বা দরুদ পাঠ করা। আমরা এ বিষয়ে কিছু পরে আলোচনা করব ; ইন্‌শা আল্লাহ।

১৪. দু'আয় 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলা :

যিক্‌র নং ২৩ : يا ذا الجلال والإكرام

আল্লাহর নাম নিয়ে দু'আর ক্ষেত্রে বিশেষ একটি নাম 'যুল জালালি ওয়াল ইকরাম'। দু'আর মধ্যে এই নাম বেশি বেশি বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। রাবীয়া ইবনু আমের (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ألـــظـــوا بـــ[يـــا ذا الـــجـــلال والإكـــرام]

"তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'-কে [অর্থঃ হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী] সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকবে (দু'আয় বেশি

বেশি বলবে)।"[১]

১৫. মুনাজাত শেষে নির্দিষ্ট বাক্য সর্বদা বলা

এই হাদীস থেকে দু'আর মধ্যে বা শেষে 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলার ফযীলত জানতে পারছি। এছাড়া সালাতের পরে মুনাজাতের আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে 'আল্লাহুম্মা আন্‌তাস সালাম ... যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলতেন। এজন্য অনেকে সর্বদা দু'আ বা মুনাজাতের শেষে 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলেন।

এই বাক্যটি দ্বারা দু'আ বা মুনাজাত শেষ করা ভালো ও ফযীলতের কাজ। তবে 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ... ' ছাড়া অন্য সকল দু'আ ও মুনাজাতের শেষে সর্বদা উক্ত বাক্যটি বলা উচিৎ হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বদা এই বাক্য দিয়ে দু'আ শেষ করতেন না। সুন্নাতের নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুকে সর্বদা করণীয়-রীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

অনেকে সর্বদা 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন' বলে দু'আ শেষ করেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'আল-হামদু লিল্লাহ' সর্বোত্তম দু'আ। এছাড়া কুরআন করীমে জান্নাতের অধিবাসীগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদের শেষ দু'আ 'আল-হামদু লিল্লাহ'। এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে দু'আর মধ্যে ও শেষে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বা 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন' – বলা ভালো ও ফযীলতের। তবে সর্বদা বলা উচিত নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বদা এভাবে সকল দু'আ বা মুনাজাত এই বাক্য দ্বারা শেষ করেননি।

আমরা "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে আলোচনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা অধিকাংশ সময় করেছেন তাও সবসময় করতে নিষেধ করেছেন ইমাম আবু হানীফাসহ সাহাবী-তাবেয়ী যুগের ইমাম ও ফকীহগণ (রাহ)। কারণ, এতে খেলাফে সুন্নাত হবে এবং মাঝে মাঝে যা করেছেন সেই সুন্নাত বাদ দেওয়া হবে।

এজন্য আমাদের উচিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসনূন বাক্য, দু'আ ও মুনাজাত ব্যবহার করে দু'আ করা।

কালেমা তাইয়্যেবা দ্বারা দু'আ শেষ করা

আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রচলিত অভ্যাস দু'আর শেষে কালেমাহ তাইয়্যেবাহ "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলে দু'আ বা মুনাজাত শেষ করা। আমার জানা মতে দু'আর শেষে এই কালেমাহ পাঠের কোনো ভিত্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণের শিক্ষা বা কর্মের মধ্যে অর্থাৎ সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবার মধ্যে নেই। কালেমাহ তাইয়্যেবাহ আমাদের ঈমানের ভিত্তি। "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু" সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। দু'আ বা মুনাজাতের শেষে বা অন্য কোনো সময়ে এগুলি পাঠ করা কখনই না-জায়েয নয়। কিন্তু সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

কখন কোন্ কালেমা, যিক্‌র ও দু'আ পড়তে হবে তারও সুন্নাত রয়েছে। সাধারণ ফযীলত বিষয়ক হাদীসের উপর ভিত্তি করে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা রীতি তৈরি করলে তা সুন্নাত পরিত্যাগ বা সুন্নাত অবহেলা করার মতো অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে আমি "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে শুধু দু'আর বিষয়টি দেখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আজীবন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সর্বদা দু'আ ও মুনাজাত করেছেন। তাঁদের প্রার্থনা, দু'আ বা মুনাজাতের সকল খুঁটিনাটি শব্দ, বাক্য, সময়, অবস্থা ইত্যাদি আমরা জানতে পারছি। আমরা দেখছি যে, তাঁরা নিয়মিত তো দূরের কথা কখনো 'কালেমাহ তাইয়্যেবা' দিয়ে মুনাজাত শেষ করেননি। এর ফযীলতেও কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। 'কালেমাহ তাইয়্যেবা'-র ফযীলত তাঁদের চেয়ে বেশি কেউ জানত না। মুনাজাতের গুরুত্বও তাঁদের চেয়ে কেউ বেশি দেননি। তা সত্ত্বেও তাঁরা এভাবে মুনাজাত করেননি। আমাদের উচিত তাঁদের সুন্নাতের মধ্যে থাকা। তাঁদের সুন্নাতই আমাদের নিরাপত্তার উৎস ও সকল কামালাতের একমাত্র পথ।

আমার মনে হয়েছে হযরত আদম (আ) সম্পর্কে বর্ণিত একটি ঘটনা আমাদের এই রীতির কারণ। একটি অত্যন্ত যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "হযরত আদম (আ) যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে ভুল করে ফেলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন : হে প্রভু, আমি মুহাম্মাদের হক্ক (অধিকার) দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ বলেন : হে আদম, তুমি কিভাবে মুহাম্মাদকে (ﷺ) চিনলে, আমি তো এখনো তাঁকে সৃষ্টিই করিনি? তিনি বলেন : হে প্রভু, আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেন এবং আমার মধ্যে আপনার রুহ (আত্মা) ফুঁ দিয়ে প্রবেশ করান, তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম আরশের খুঁটিসমূহের উপর লিখা রয়েছে : 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এতে আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি বলেই আপনি আপনার নামের সাথে তাঁর নামকে সংযুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ বলেন: হে আদম, তুমি ঠিকই বলেছ। তিনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তুমি আমার কাছে তাঁর হক্ক (অধিকার) দিয়ে চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মাদ (ﷺ) না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।"

হাকিম নাইসাপুরী হাদীসটি সংকলন করে একে সহীহ বলেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস একমত যে হাদীসটি যয়ীফ। তবে মাউযূ কিনা তাতে তারা মতভেদ করেছেন।[২] হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' নামক গ্রন্থে।[৩] এখানে লক্ষণীয় যে, হাদীসটিতে 'কালেমা তাইয়্যেবা' দ্বারা মুনাজাত শেষ করার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা নেই। আমাদের

উচিত মাসনূন, মাশহুর হাদীসগুলির উপর নির্ভর করা। সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে রীতি বা নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করা কখনোই উচিত নয়।

তাবিয়ী আ'মাশ (১৪৮ হি) বলেন, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবরাহীম নাখ'য়ীকে (৯৬হি) জিজ্ঞাসা করা হলো, ইমাম যদি সালাতের সালাম ফেরানোর পরে বলে :

صلى الله على محمد لا إله إلا الله

"আল্লাহর সালাত মুহাম্মাদের উপর, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।" তবে তার বিধান কি ? তিনি বলেন :

ما كان مَنْ قبلهم يصنع هكذا

"এদের আগে যারা চলে গেছেন তাঁরা (নবী ﷺ ও সাহাবীগণ) এভাবে বলতেন না।"[১]

সুবহানাল্লাহ! মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠতম দুটি যিক্র – 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' ও সালাত পাঠ। এই দুটি যিক্রের ফযীলতের বিষয়ে ইবরাহীম নাখ'য়ী ও সকল তাবেয়ী একমত। কিন্তু সালতের সালামের পরে তা বলতে তাদের আপত্তি। কারণ সুন্নাতের বাইরে কোনো রীতি বা কাজে তাঁদের আগ্রহ ছিল না। তাঁদের একমাত্র আদর্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ। যেহেতু তাঁরা সালামের পরে এই যিক্র দুটি এভাবে বলতেন না এজন্য তিনি এতে আপত্তি করেছেন।

১৬. দু'আ কবুলের অবস্থাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা

যে সকল অবস্থায় দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে সে সকল অবস্থায় বেশি বেশি দোওয়া করা উচিত। যেমন,– সফর অবস্থায় দু'আ, হজ্ব পালন অবস্থায় দু'আ, সিয়াম অবস্থায় দু'আ, ইফতারের সময়ের দু'আ। ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক বা শাসক, মাজলুম, মুসাফির, সায়িম, পিতা-মাতা, প্রমুখের দু'আ কবুল হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

১৭. বারবার চাওয়া বা তিনবার চাওয়া

দু'আর একটি মাসনূন আদব আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইলে অনেকটা নাছোড়বান্দা করুণাপ্রার্থীর মতোই একই সময়ে বারবার চাওয়া, বিশেষত তিনবার চাওয়া। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন:

إن رسول ﷺ كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই পছন্দ করতেন যে, তিনি দু'আ করলে তিনবার করবেন, ইস্তিগফার করলে তিনবার করবেন।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ বলেন :

كان النبي ﷺ إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا

"নবীয়ে আকরাম (ﷺ) যখন দু'আ করতেন তখন তিনবার দু'আ করতেন এবং তিনি যখন চাইতেন বা প্রার্থনা করতেন তখন ৩ বার করতেন।"[৪]

১৮. দু'আর সময় কিবলামুখী হওয়া

মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করতে পারেন এবং আল্লাহর দরবারে তার আরজি পেশ করতে পারেন। ওযু বা ওযুহীন অবস্থায়, যে কোনো দিকে মুখ করে বা দাঁড়ানো, বসা বা শোয়া যে কোনো অবস্থায় মুমিন যিক্র ও দু'আ করতে পারেন। তবে কিবলার দিকে মুখ করে দোওয়া করা উত্তম, বিশেষত যখন বিশেষভাবে আগ্রহ সহকারে দু'আ করা হয়। হাদীস শরীফে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে দু'আর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়েছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বৃষ্টির জন্য দু'আর সময়, যুদ্ধের ময়দানের আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু'আর সময়, আরাফা, মুযাদালিফা ও অন্যান্য স্থানে দু'আর সময়, বিশেষ আবেগ ও বেদনার সময়, কখনো কখনো কোনো কোনো সাহাবীর জন্য দু'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য অবস্থা থেকে ঘুরে বিশেষভাবে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[৫]

এছাড়া সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় কিবলামুখী হয়ে বসার জন্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة

"প্রত্যেক বিষয়ের সাইয়্যেদ বা নেতা আছে। বসার নেতা কিবলামুখী হয়ে বসা।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৬]

এ সকল হাদীসের আলোকে যাকিরের জন্য সম্ভব হলে যিক্র ও দু'আর জন্য কিবলামুখী হওয়া উত্তম। আল্লাহর সাথে কথা বলার অনুভূতি নিয়ে মনকে একাগ্র করে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ করা উত্তম। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, যে কোনো ফযীলতের হাদীস পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কিভাবে পালন করেছেন তাঁর আলোকে পালন করতে হবে। ফযীলতের হাদীসের উপর ভিত্তি করে নিজেদের মনোমতো আমল করলে বা রীতি তৈরি করে নিলে কিভাবে নিন্দনীয় বিদ'আতে নিপতিত হতে হয় তার অনেক উদাহরণ আমি "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

দু'আর অন্যান্য আদব ও কিবলামুখী হয়ে দু'আর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা উত্তম হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা দু'আর সময় কিবলামুখী হতেন না। অনেক সময় যে অবস্থায় রয়েছেন ঐ অবস্থায় দু'আ করতেন। অনেক সময় তিনি ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করেছেন। এথেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি : **প্রথমত,** যে সকল দু'আর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেছেন, সে সময় কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা সুন্নাত। **দ্বিতীয়ত,** যে সময় ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে ঘুরে দু'আ করেছেন, সে সময়ে ঘুরে দু'আ সুন্নাত। অন্য সময়ে কিবলামুখী হওয়া উত্তম, কিন্তু মুস্তাহাব পর্যায়ের উত্তম।

এজন্য এ সকল সাধারণ ক্ষেত্রে একে বেশি গুরুত্ব দিলে, না করলে কিছুটা অন্যায় হবে বা খারাপ হবে মনে করলে বা সর্বদা পালনীয় রীতিতে পরিণত করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে আমরা এ জাতীয় অনেক উদাহরণ দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ মাঝে মাঝে করতেন তা মুস্তাহাব হলেও নিয়মিত রীতিতে পরিণত করতে ইমামগণ নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলা থেকে ঘুরে বা কিবলার দিকে পিছন ফিরে যিক্র ও দু'আ করতেন। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহ) সালাম ফেরানেরা পরে ইমামের কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বা দু'আ করা 'মাকরুহ' বা অপছন্দনীয় বলেছেন।[১] হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ আল্লামা সারাখসী লিখেছেন: যদিও কিবলামুখী হয়ে বসা শ্রেষ্ঠতম বসা বা সকল বৈঠকের নেতা, কিন্তু সালাতের সালাম ফেরনোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসা ইমামের জন্য মাকরুহ, কারণ সাহাবী-তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামের জন্য সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বিদ'আত।[২]

১৯. দু'আর সময় হাত উঠানো

আমরা দেখেছি যে, মুমিন বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে বা যে কোনো অবস্থায় দু'আ করতে পারেন। তবে দু'আর একটি বিশেষ আদব দুই হাত বুক পর্যন্ত বা আরো উপরে ও আরো বেশি এগিয়ে দিয়ে, হাতের তালু উপরের দিকে বা মুখের দিকে রেখে, অসহায় করুণাপ্রার্থীর ন্যায় কাকুতি মিনতির সাথে দু'আ করা।

দু'আর সময় হাত উঠানোর বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতগুলি হাদীস দু'আর জন্য হাত উঠানোর ফযীলত সম্পর্কিত। অন্য দু'একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (ﷺ) ও সাহাবীগণ কখনো কখনো দু'আর জন্য হাত উঠাতেন।

প্রথম প্রকারের একটি হাদীস ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো বান্দা হাত তুলে দু'আ করলে মহান আল্লাহ সেই হাত খালি ফিরিয়ে দিতে চান না। অন্য হাদীসে হযরত মালিক ইবনু ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها

"তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন হাতের পেট বা ভিতরের দিক দিয়ে চাইবে, হাতের পিঠ দিয়ে চাইবে না।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৩]

এছাড়া কয়েকটি হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কোনো কোনো সময়ে দু'আ করতে দুই হাত তুলে দু'আ করতেন।

হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما رفع قوم أكفهم إلى الله عز وجل يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا

"যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য তাদের হাতগুলিকে উঠাবে, তখনই আল্লাহর উপর হক্ক বা নির্ধারিত হয়ে যাবে যে তিনি তারা যা চেয়েছে তা তাদের হাতে প্রদান করবেন।" হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে শেখ আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন :

إن رسول الله ﷺ يرفع يديه يدعو حتى إني لأسأم له مما يرفعهما يدعو اللهم فإنما أنا بشر فلا تعذبني بشتم رجل شتمته أو آذيته

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মুবারক হাত দু'খানা উঠিয়ে দু'আ করতেন, এমনকি আমি তাঁর (বেশি বেশি) হাত উঠিয়ে দু'আ করাতে ক্লান্ত ও অস্থির হয়ে পড়তাম; তিনি এভাবে দু'আয় বলতেন : হে আল্লাহ, আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি কোনো মানুষকে গালি দিয়ে

ফেললে বা কষ্ট দিলে আপনি সেজন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১]

অনুরূপ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বৃষ্টির জন্য দু'আর সময়, আরাফাতের মাঠে দু'আর সময়, যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার সময় ও অন্যান্য কোনো কোনো সময়ে দু'আর জন্য তিনি হাত তুলেছেন।[২]

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা দু'আর সময় হাত তুলে দু'আ করার ফযীলত জানতে পারছি। তবে এক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই ফযীলত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণই পূর্ণতম আদর্শ। তাঁদের সুন্নাতের আলোকেই আমাদের এই ফযীলত পালন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে দু'আ করার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এই ফযীলত পালনের ক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম ছিল কখনো কখনো হাত তুলে দু'আ করা এবং সাধারণ ক্ষেত্রে হাত না তুলে শুধুমাত্র মুখে দু'আ করা। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, হাত উঠানো দু'আর আদব এবং একান্ত মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত, অর্থাৎ পালন করলে ভালো, না করলে কোনো দোষ নেই। একে বেশি গুরুত্ব দিলে, হাত না উঠালে 'কিছু খারাপ হলো' মনে করলে – তা খেলাফে সুন্নাত হবে।

যেখানে ও যে দু'আয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত উঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত উঠানো সুন্নাত। যেখানে উঠাননি বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত না উঠানো সুন্নাত। চলাফেরা, উঠাবসা, খাওয়াদাওয়া, মসজিদে প্রবেশ, মসজিদ থেকে বের হওয়া, ওযুর পরে, খাওয়ার পরে, আযানের পরে, সালাতের পরে ইত্যাদি দৈনন্দিন মাসনূন দু'আর ক্ষেত্রে হাত না তুলে স্বাভাবিক অবস্থায় মুখে দু'আ করাই সুন্নাত। যে সকল দু'আ মাসনূন, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ যে সকল দু'আ বা যে সকল সময়ে দু'আ করেছেন, অথচ তাঁরা হাত উঠিয়েছেন বলে বর্ণিত নেই, সেসকল স্থানে নিয়মিত হাত উঠনোকে রীতি বানিয়ে নেওয়া বা হাত উঠানোকে উত্তম মনে করা আমাদেরকে বিদ'আতে নিপতিত করবে। বাকি সকল ক্ষেত্রে হাত উঠানো ও না উঠানো উভয়ই জায়েয। আবেগ, আগ্রহ ও বিশেষ দু'আর সময় হাত তুলে আকুতির সাথে দু'আ করা উত্তম।

এখানে আমাদের সাধারণ মুসলমানদের মনের একটি ভুল ধারণা দূর করা দরকার। আমরা সর্বদা দুই হাত তুলে প্রার্থনা করাকে মুনাজাত বলে মনে করি। মুখে কোনো দু'আ পাঠ বা মুখে মুখে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করাকে কখনই মুনাজাত বলে মনে করি না। এটি একেবারেই ভিত্তিহীন ধারণা। এই ধারণাটি শুধু ভিত্তিহীনই নয়, বরং সত্যের বিপরীত। আমরা উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যে, 'মুনাজাত' অর্থ সকল প্রকার যিক্‌র, দু'আ, প্রার্থনা। হাত উঠানো হোক বা না হোক, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে চলতে বা যে কোনো সময় বান্দা যখন আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তাঁকে ডাকে, তাঁর কাছে কিছু চায় বা এক কথায় তাঁর সাথে সঙ্গোপনে কথা বলে তখন বান্দা মুনাজাতে রত থাকে। তেমনি হাত উঠানো হোক বা না হোক, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে বা যে কোনো অবস্থায় বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে বা তাঁর কাছে কিছু চায় সে তখন দু'আয় রত থাকে। মুনাজাত ও দু'আ মূলত একই বিষয়। আর হাত উঠানো, কিবলামুখী হওয়া, বসা, ইত্যাদি দু'আ বা মুনাজাতের বিভিন্ন আদব। এগুলিসহ বা এগুলি ব্যতিরেকে বান্দা আল্লাহর সাথে 'মুনাজাতে' বা চুপিসারে কথায় রত থাকতে পারে বা প্রার্থনায় রত থাকতে পারে।

২০. দু'আর শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মোছা

দু'আ বা মুনাজাতের সময় হাত উঠানোর বিষয়ে যেরূপ অনেকগুলি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, দু'আ শেষে হাত দুটি দ্বারা মুখমণ্ডল মোছার বিষয়ে তদ্রূপ কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে দুই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত দুর্বল সনদে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

إذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم

"দু'আ শেষ হলে তোমরা হাত দু'টি দিয়ে তোমদের মুখ মুছবে।" হাদীসটি আবু দাউদ সংকলিত করে বলেন : "এই হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সবগুলিই অত্যন্ত দুর্বল ও একেবারেই অচল। এই সনদটিও দুর্বল।"[৩]

অন্য হাদীসে হযরত উমার ইবনু খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি দু'আ করতে হাত তুলতেন তাহলে হাত দু'টি দ্বারা মুখ না মুছে তা নামাতেন না।"[৪]

হাদীসটির সনদ দুর্বল। কারণ হাম্মাদ ইবনু ঈসা আল-জুহানী (মৃ. ২০৮ হি) নামক এক ব্যক্তি এই হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী। তিনি বলেছেন যে, তিনি তার উস্তাদ হানযালাহ ইবনু আবী সুফিয়ান, তিনি সালেম, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, তিনি উমার (রা) থেকে হাদীসটি শুনেছেন। হাদীসটি হযরত উমার থেকে অন্য কোনো সূত্রে কেউ বর্ণনা করেননি। উমরের অন্য কোনো ছাত্র বা আব্দুল্লাহর অন্য কোনো ছাত্র, বা সালেমের অন্য কোনো ছাত্র বা হানযালার অন্য কোনো ছাত্র এই হাদীসটি বর্ণনা করেননি। মূলত এই হাম্মাদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম বলে দাবি করেছেন। এই হাম্মাদ জীবনে যতগুলি হাদীস বর্ণনা করেছেন সবগুলি হাদীস পর্যালোচনা করে তার যুগের হাদীসের ইমামগণ দেখেছেন যে, তিনি হাদীস ঠিকমতো মুখস্থ রাখতে পারতেন না। তার বর্ণিত সব হাদীসের সনদ ও শব্দ তিনি উল্টেপাল্টে গুলিয়ে ফেলেছেন। এজন্য তাঁরা তাঁকে 'যয়ীফ' বা দুর্বল বর্ণনাকারী বলে ঘোষণা করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করে বানোয়াটভাবে এসকল উল্টোপাল্টা হাদীস বলেছেন।

তৃতীয় হিজরীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুর'আ (মৃ. ২৬৪ হি) বলেন : হাদীসটি মুনকার বা একেবারেই দুর্বল। আমার ভয় হয়

হাদীসটি ভিত্তিহীন বা বানোয়াট। একারণে কোনো কোনো আলিম দু'আর পরে হাত দু'টি দিয়ে মুখ মোছাকে বিদ'আত বলেছেন। কারণ এ বিষয়ে একটিও সহীহ, হাসান বা অল্প দুর্বল কোনো হাদীস নেই। এছাড়া দু'আর সময় হাত উঠানো সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে পরিচিত ও প্রচলিত ছিল, কিন্তু দু'আ শেষে হাত দিয়ে মুখ মোছার কোনো প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১]

অপরপক্ষে কোনো কোনো আলিম উপরের হাদীসের দুর্বলতা স্বীকার করেও একে গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। ৯ম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ইবনু হাজার (মৃ. ৮৫২ হি) বলেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল হলেও অনেকগুলি সূত্রে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে মূল বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য বা হাসান বলা উচিত।[২] সুনানে তিরমিযীর কোনো কেনো পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় যে ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান বা সহীহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি) বলেন যে, সুনানে তিরমিযীর সকল নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত কপি ও পাণ্ডুলিপিতে ইমাম তিরমিযীর মতামত হিসাবে উল্লেখ আছে যে, হাদীসটি গরীব বা দুর্বল। ইমাম নববীও এ বিষয়ক সকল হাদীস যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম বাইহাকী (মৃ. ৫৬৮ হি) বলেন : দু'আ শেষে দুই হাত দিয়ে মুখ মোছার বিষয়ে হাদীস যয়ীফ, তবে কেউ কেউ সে হাদীসের উপর আমল করে থাকে।"[৪]

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুর রাজ্জাক সান'আনী (মৃ. ২১১ হি) তার উস্তাদ ইমাম মা'মার ইবনু রাশিদ (মৃ. ১৫৪ হি) থেকে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু শিহাব আয-যুহরী (মৃ. ১২৫ হি) থেকে বিষয়টি বর্ণনা করে বলেনঃ আমি দেখেছি যে, কখনো কখনো আমার উস্তাদ মা'মার এভাবে দু'আর শেষে মুখ মুছতেন এবং আমিও কখনো কখনো তা করে থাকি।[৫] এ থেকে বুঝা যায় যে তাবেয়ীগণের যুগে কেউ কেউ দু'আ-মুনাজাতের শেষে এভাবে মুখ মুছতেন।

এভাবে আমরা দেখি যে, দু'আর সময় হাত উঠানো যেরূপ প্রমাণিত সুন্নাত, দু'আ শেষে হাত দুটি দিয়ে মুখমণ্ডল মুছা অনুরূপ প্রমাণিত বিষয় নয়। এ বিষয়ে দু'একটি দুর্বল হাদীস আছে, যার সম্মিলিত রূপ থেকে কোনো কোনো আলিমের মতে এভাবে মুখ মোছা জায়েয বা মুস্তাহাব। আল্লাহই ভালো জানেন।

২১. দু'আর সময় শাহাদত আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করা

দু'আর সময় হাত উঠানোর অনুরূপ আরেকটি মাসনূন পদ্ধতি দু'আর সময় ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলি উঠিয়ে কিবলার দিকে রেখে ইশারা করা। সালাতের মধ্যে ও সালাতের বাইরে দু'আর সময় এভাবে ইশারা করার বিষয়ে কতগুলি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে ইবনু আব্বাস(রা) বলেন,রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا

"প্রার্থনা করা এই যে, তুমি তোমার দুই হাত তোমার দুই কাঁধ বরাবর বা কাছাকাছি উঠাবে। আর ইস্তিগফার এই যে, তুমি তোমার একটি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে। আর ইবতিহাল বা কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করা এই যে, তুমি তোমার দুই হাতই সামনে এগিয়ে দেবে।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৬]

এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। শুধু একটি আঙ্গুল, ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে কিবলার দিকে ইশারা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইশারার সময়, বিশেষত সালাতের মধ্যে দু'আর সময় আঙ্গুলটি সোজা কিবলামুখী করে রাখতেন এবং নিজের দৃষ্টিকে আঙ্গুলের উপরে রাখতেন। তিনি এই সময় আঙ্গুল নাড়াতেন না।[৭]

২২. দু'আর সময় দৃষ্টি নত রাখা

দু'আর মধ্যে বিনয়ের একটি দিক দৃষ্টি নত রাখা। বেয়াদবের মতো উপরের দিকে তাকিয়ে দু'আ করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষত সালাতের মধ্যে দু'আর সময় উপরের দিকে নজর করতে হাদীসে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم

"যে সমস্ত মানুষেরা সালাতের মধ্যে দু'আর সময় উপরের দিকে দৃষ্টি দেয় তারা যেন অবশ্যই এই কাজ বন্ধ করে, নাহলে তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করা হবে।"[৮] অন্য বর্ণনায় 'সালাতের মধ্যে' কথাটি নেই, সব দু'আতেই দৃষ্টি ঊর্ধ্বে উঠাতে নিষেধ করা হয়েছে।[৯]

২৩. দু'আ কবুল হওয়ার সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা

(ক). রাত, বিশেষত শেষ রাত

মুমিন সর্বদা আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। তবে হাদীস শরীফে কিছু কিছু সময়কে দু'আ কবুলের জন্য বিশেষ করে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বোত্তম সময় রাত। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাত মুমিনের দু'আ ও একান্ত ইবাদতের সময়। শরীয়তের পরিভাষায় মাগরিবের শুরু থেকে ফজরের ওয়াক্তের শুরু পর্যন্ত রাত। শীতের সময় ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে আমাদের দেশে রাত প্রায় ১২ ঘণ্টা থাকে (সন্ধ্যা ৫.৩০ টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত)। অপরদিকে জুন/ জুলাই মাসে রাত প্রায় ৯ ঘণ্টা হয়ে যায় (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ভোর ৩.৪৫ টা পর্যন্ত)। রাতের এই সময়টুকুকে হাদীসের আলোকে আমরা **চারটি** পর্যায়ে ভাগ করতে পারি :

(১). প্রথম তৃতীয়াংশ (প্রথম ৩/৪ ঘণ্টা) : এই সময়টির ফযীলত সম্পর্কে বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই। তবে কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ রাতে দু'আ কবুল করেন। জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يـــنـــزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعـــطيه هـــل مـــن مستـــغـــفر فأغــفــر له حتى يطــلع الفجر

"আল্লাহ প্রত্যেক রাতে সর্বনিু আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন: কোনো প্রার্থনাকারী বা যাচ্ঞাকারী কেউ কি আছে ? যদি কেউ কিছু চায় তাহলে আমি তাকে তা প্রদান করব। ক্ষমা চাওয়ার কেউ কি আছে? যে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব। এভাবে তিনি ফজর শুরু হওয়া পর্যন্ত বলেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১]

এই হাদীসে রাত বলতে পুরো রাতই বুঝা যায়। এতে রাতের প্রথম অংশও ফযীলতের মধ্যে এসে যায়। তবে অন্যান্য বিভিন্ন হাদীসে এই ফযীলত রাতের পরবর্তী অংশগুলির জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম গ্রন্থে সংকলিত অন্য হাদীসে হযরত জাবির (রা) বলেছেন, আমি নবীজী ﷺ -কে বলতে শুনেছি :

إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة

"নিশ্চয় রাত্রের মধ্যে এমন একটি সময় আছে যে সময় কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে পার্থিব, জাগতিক বা পারলৌকিক যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দিবেন। এভাবে প্রতি রাত্রেই।"[২]

রাতের এই সময়ও সারা রতের প্রথম মুহূর্ত থেকে সারা রাতের যে কোনো সময় হতে পারে। তবে অন্যান্য হাদীসের আলোকে এই সময় শেষ রাতে হবে বলেই বুঝা যায়।

(২). প্রথম তৃতীয়াংশের পর থেকে পরবর্তী মাঝ রাত পর্যন্ত, এবং পরবর্তী সারা রাত : শীতের সময় রাত ৯.৩০ টা বা ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত এবং গরমের সময় রাত ১০ টা থেকে প্রায় ১১.৩০ টা পর্যন্ত ; এবং এরপর বাকি রাত। এই সময়ে আল্লাহ দু'আ কবুল করেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل فإنه إذا مضـــى ثلـــث الليـــل الأول هـــبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا فلم يزل بها حتى يطـــلـــع الفجـــر يقـــول ألا تائـــب ألا ســـائل يعـــطى ألا داع يجاب ألا مـــذنـــب يستـــغـــفـــر فيغـــفر له ألا سقيم يستشفي فيشفى

"আমার উম্মাতের কষ্ট না হলে ইশা'র সালাত রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করতাম। কারণ রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে মহান প্রভু আল্লাহ সর্বনিু আসমানে নেমে আসেন। প্রভাতের শুরু পর্যন্ত তিনি এভাবে থাকেন। তিনি বলেন: কেউ কি চাইবে যাকে দেওয়া হবে? কেউ কি ডাকবে যার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে? কোনো পাপী কি আছে যে ক্ষমা চাইবে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে? অসুস্থ কেউ আছে কি? যে রোগমুক্তি চাইবে ফলে তাকে সুস্থতা প্রদান করা হবে।"[৩]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملـــك مـــن ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر لـــه فـــلا يـــزال كذلك حتى يضيء الفجر

"মহান আল্লাহ প্রত্যেক রাতে, রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসে এবং বলেন : আমিই বাদশাহ, আমিই মালিক। কে আছ আমাকে ডাকবে? ডাকলেই আমি তার ডাকে সাড়া দিব, কে আছ আমার কাছে চাইবে? চাইলেই আমি তাকে প্রদান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? চাইলেই আমি তাকে ক্ষমা করব। এভাবেই বলতে থাকেন প্রভাতের আলোর বিকীরণ হওয়া পর্যন্ত।"[৪]

(৩). মধ্য রাত থেকে (রাত ১১.৩০ টা বা ১২ টা থেকে) রাতের শেষ তৃতীয়াংশের শুরু পর্যন্ত এবং বাকি রাত : উপরের হাদীসের আলোকে রাতের এই অংশ স্বভাবতই দু'আ কবুলের সময়। এ ছাড়া এই অংশ সম্পর্কে বিশেষ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উসমান ইবনু আবীল আস (রা) বলেন, নবীয়ে মুসতাফা ﷺ বলেছেন:

تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستـــجاب لـــه هـــل مـــن ســـائل فيعطى هل من مكـــروب فيـــفـــرج عنه فلا يبقى مســـلم يـــدعو بـــدعوة إلا اســـتجاب الله لـــه إلا زانـــيـــة تسعى بفـــرجـــها أو عـــشار

"মধ্য রাতে আসমানের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন : 'কোনো প্রার্থনাকারী আছ কি? যদি কেউ প্রার্থনা করে তাহলে তা কবুল করা হবে। কোনো যাচ্ঞাকারী আছ কি? যদি কেউ কিছু চায় তাহলে তাকে তা দেওয়া হবে। কোনো বিপদগ্রস্ত আছ কি? বিপদ মুক্তি চাইলে তার বিপদ কাটানো হবে।' এ সময়ে যে কোনো মুসলিম যে কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করুক, আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করবেন। শুধুমাত্র দেহ ব্যবসায়ী ব্যভিচারিণী ও টোল আদায়কারী (নাগরিকদের কষ্ট দিয়ে যে টোল খাজনা ইত্যাদি আদায় করে) বাদে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১]

(৪). রাতের সবচেয়ে মুবারক অংশ (রাত ১ টা বা ২ টা থেকে বাকি রাত) : যাকিরের সবচেয়ে বড় সম্পদ, প্রার্থনাকারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ, আল্লাহ প্রেমিকের জীবনের সর্বোত্তম ক্ষণ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। রাত আনুমানিক ১টা বা ২ টা থেকে বাকি রাত। এই সময়ের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له

"আমাদের মহান মহিমান্বিত প্রভু প্রতি রাতে, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন : কেউ যদি আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কেউ যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা প্রদান করব। কেউ যদি আমার কাছে ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব।"[২]

আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহকে (ﷺ) প্রশ্ন করা হলো: "কোন দু'আ সবচেয়ে বেশি শোনা হয় বা কবুল করা হয় ? তিনি উত্তরে বলেন :

جَوْفُ اللَّيلِ الآخِرُ، ودُبُر الصلواتِ المكتوبات

"রাত্রের শেষ অংশ ও ফরয সালাতের পরে (দু'আ বেশি কবুল হয়)।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এই অর্থে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩]

আমর ইবনু আম্বাসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده، وإذا قام يصلي في ثلث [جوف] الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن

"বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে যখন সে সাজদায় থাকে এবং যখন সে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে [বা শেষাংশে] সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়। অতএব, রাতের ঐ সময়ে যারা আল্লাহর যিক্‌র করেন, তুমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, তাহলে তা হবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, কোনো হাদীসে আমরা দেখছি রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে, কোনো হাদীসে দেখছি রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে মহান আল্লাহ প্রথম আসমানে আসেন। এখানে তো বৈপরীত্য দেখা দিল। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টিতে কোনো বৈপরীত্য নেই। আল্লাহর অবতরণ, আগমন এগুলির প্রকৃতি ও পদ্ধতি আমাদের বোধগম্য নয়। তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে বলেছেন আমরা সেভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তবে আমরা এতটুকু দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারি যে, আল্লাহ এই সময়ে তাঁর বান্দাদেরকে বিশেষ নৈকট্য প্রদান করেন, যা অন্যান্য নৈকট্য থেকে ভিন্ন ও মর্যাদাময়। আমাদের দায়িত্ব এই মহান সময়ের বরকতময় সুযোগ গ্রহণ করা। মহান রাব্বুল আলামীনের এগিয়ে দেওয়া রহমতের, বরকতের ও কবুলিয়্যতের খাঞ্চাকে অবহেলায় ফিরিয়ে না দেওয়া। বরং পরম আগ্রহে ও গভীর আবেগে এই দান গ্রহণ করা।

- আমাদের চেষ্টা করতে হবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ইবাদত ও দু'আ করার চেষ্টা করা। যখন সকলেই ঘুমিয়ে থাকবেন তখন বান্দা তার মনের সকল আবেগ উজাড় করে তার প্রভুকে ডাকবে, তার মনের সকল বেদনা, আকুতি, কষ্ট ও আবেগ সে পেশ করবে তার প্রভুর দরবারে, যিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান মহাকরুণাময় পরম দয়ালু ও দাতা। তিনিই, শুধু তিনিই তো পারেন তাঁর আরজি পূরণ করতে। আনন্দ, বেদনা ও প্রেমের অশ্রু দিয়ে যাকির তার এই সময়ের ইবাদত ও দু'আকে সুষমাময় করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক প্রদান করুন।

এ সময়ে সম্ভব না হলে অন্তত রাতের একতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে, রাত ১০/১১ টার দিকে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে অন্তত কিছু সময় দু'আয় কাটানো প্রয়োজন। অযু করে, কয়েক রাকাত নফল সালাতসহ বিতিরের সালাত আদায় করে এই সময়ে কিছু সময় যিক্‌র ও দু'আয় কাটানো খুবই প্রয়োজন।

(খ). পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পর

আমরা উপরে আবু উমামা (রা) বর্ণিত হাদীসে এর বিবরণ দেখেছি। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের পরে পালন করার জন্য অনেক যিক্‌র ও দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। যা আমরা পরে আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ।

(গ). আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়

দু'আ কবুলের অন্যতম সময় আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, আযানের সময় ও ইকামতের সময়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এ সময়ের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন। সুন্নাতের নির্দেশ আযানের সময় মুয়াযযিন যা বলেন তা বলতে হবে (হাইয়া আলা-র সময় লা হাওলা ..)। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সালাত (দরুদ) পাঠ করতে হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা ও মর্যাদা চাইতে হবে। এরপর মুমিন নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

الـدعـوة [الدعاء] بـيـن الأذان والإقامة لا تـرد فادعـوا

"আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ ফেরত দেওয়া হয় না। অতএব, তোমরা এই সময়ে প্রার্থনা করবে।" হাদীসটি সহীহ।[১]

অন্য হাদীসে সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اثـنـتان لا تـردان أو قـل ما تـردان الدعاء عند النداء [حين تقام الصلاة] وعند البـأس [عند الصف في سبيل الله] حين يلتحم بعضهم بعضا

"দুটি দু'আ কখনো ফেরত দেওয়া হয় না, বা খুব কমই ফেরত দেয়া হয় : আযানের সময় দু'আ [দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে : ইকামতের সময় দু'আ] এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের সময় দু'আ, যখন (মুসলিম ও কাফির) উভয়পক্ষ যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখী হয় এবং একে অপরের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি যুদ্ধে মিশে যায়।" হাদীসটি সহীহ।[২]

অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, একব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, মুয়াযযিনগণ তো আমাদের উপরে উঠে গেলেন ও আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা অর্জন করে নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

قل ما يقـولون، فإذا انـتـهـيـت فسـل تـعـطـه

- "মুয়াযযিনগণ যা বলে তুমি তা বল। যখন (আযানের জবাব দেওয়া) শেষ করবে, তখন আল্লাহর কাছে চাইবে বা দু'আ করবে। এই সময়ে তুমি যা চাইবে তোমাকে তা দেওয়া হবে।"

হাদীসটির সনদ হাসান।[৩]

(ঘ). জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে

উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, এই সময় দু'আ কবুল হয়।

(ঙ). দু'আ কবুলের অন্যান্য সময়

- দু'আ কবুলের অন্যান্য বিশেষ সময় : রমযান মাস, ফরয বা নফল সিয়াম অবস্থায়, ইফতারের সময়, যমযমের পানি পান করার সময়, ইত্যাদি।

(চ). সালাতের মধ্যে দু'আ

সালাত মহান প্রভুর সাথে বান্দার সর্বোচ্চ সংযোগ। সালাত মহান প্রতিপালকের সাথে বান্দার 'মুনাজাত'। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময়টাই মূলত দু'আর সময়। আল্লাহর প্রশংসা করা, স্তুতি গাওয়া ও প্রার্থনা করা, এই তো সালাত।

সালাতের পুরো সময়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আবেগী ও সুন্দর ভাষায় দু'আ করতেন। সালাত শুরু করেই, তাকবীরে তাহরীমার পরেই তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার করে দু'আ করতেন। সূরা ফাতিহা মানব ইতিহাসের মহোত্তম প্রার্থনা। এরপর কুরআন তিলাওয়াতের সময় থেমে থেমে তিনি দু'আ করতেন। রুকুতে তাসবীহের পাশাপাশি দু'আ করতেন মাঝে মাঝে।

সালাতের মধ্যে দু'আর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময় সাজদার সময়। সাজদা সালাতের মধ্যে মহান প্রভুর কাছে বান্দার সমর্পণের চূড়ান্ত পর্যায়। সাজদা আল্লাহর সাথে বান্দার চূড়ান্ত সংযোগ। মানব জীবনে দু'আ কবুলের অন্যতম সময় সাজদার সময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এ কথাই শিখিয়েছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أقـرب ما يكـون العـبد من ربـه وهو ساجـد فأكـثـروا الدعـاء

"বান্দা যখন সাজদায় রত থাকে তখন সে তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, কাজেই তোমরা এই সময়ে বেশি বেশি দু'আ করবে।"

অন্য হাদীসে হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (ওফাত দিবসের ফজরের সময়) তাঁর ঘরের পর্দা তুলে দেখলেন সাহাবীগণ হযরত আবু বকরের (রা) পিছে কাতারবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছেন। তখন তিনি বললেন :

أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تـرى لـه ألا وإني نهيت أن اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأمـا السـجود

فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

"হে মানুষেরা, নবুয়্যতের আর কিছুই বাকি থাকল না, শুধুমাত্র নেক স্বপ্ন ছাড়া, যা মুসলিম দেখে। শুনে রাখ, আমাকে রুকু ও সাজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকু অবস্থায় তোমরা তোমাদের মহান প্রভুর মর্যাদা-বাচক স্তুতি পাঠ করবে। আর সাজদা রত অবস্থায় তোমরা খুব বেশি করে দু'আ করবে, কারণ এই সময়ে তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।"[১]

সাজাদার সময় বেশি বেশি দু'আর নির্দেশনায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এ সময়ে বেশি বেশি দু'আ করতেন। এখানে দুটি দু'আ লিখছি :

যিক্‌র নং ২৪ : সাজদার দু'আ-১

আবু হুরাইরা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাজদার মধ্যে বলতেন :

للهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্ ফির লী যাম্বী কুল্লাহু, দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউআলাহু ওয়া আ-খিরাহু, ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার সকল পাপ, ছোট পাপ, বড় পাপ, প্রথম পাপ, শেষ পাপ, প্রকাশ্য পাপ, গোপন পাপ।"[২]

যিক্‌র নং ২৫ : সাজদার দু'আ-২

(২). আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় পেলাম না। (অন্ধকারে) আমি তাকে খুঁজলাম। তখন আমার হাত তার পায়ের তালুতে লাগল। তিনি তখন সাজদায় ছিলেন ও পা দুটি খাড়া ছিল। তিনি বলছিলেন:

اللهم أعوذ برضاك من سخطــك وبمــعافاتك من عقوبتــك وأعوذ بك منك لا أحصي ثنـــاء عليك أنت كما أثـــنيـــت على نفسك

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আ'উযু বিরিদা-কা মিন সাখাতিক, ওয়া বি মু'আ-ফা-তিকা মিন 'উকূবাতিকা, ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা, লা- উহসী সানা-আন 'আলাইকা। আনতা কামা- আসনাইতা 'আলা- নাফসিকা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রাথনা করছি এবং আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার কাছে আপনার থেকে। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। আপনি ঠিক তেমনি যেমন আপনি আপনার নিজের প্রশংসা করেছেন।"[৩]

আমাদের দেশে অনেকে অজ্ঞতাবশত বলেন : আমাদের মাযহাবে সাজদার সময় দু'আ করা যাবে না বা উচিত নয়। ধারণাটি সঠিক নয়। আমরা আগেই দেখেছি ইমাম আবু হানীফা (রা) সালাতের মধ্যে কুরআন পাঠের সময় দু'আ করে করে পাঠ করতে বলেছেন। তবে তাঁর মতে, ফরয সালাত যথাসম্ভব নির্ধরিত যিক্‌র আযকার ও দু'আর মাধ্যমে আদায় করতে হবে। আর বাকি সকল সুন্নাত, নফল, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সালাতের শুরুতে, তিলাওয়াতের সময়ে, রুকুতে, সাজদায় ও শেষে তাশাহহুদের পরে বেশি বেশি করে দু'আ করতে হবে। তাঁর এই মতটি সুন্নাতের আলোকে জোরদার। কারণ আমরা অধিকাংশ হাদীসেই দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অতিরিক্ত দু'আ সাধারণত তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সুন্নাত বা নফল সালাতের মধ্যে বলতেন। প্রত্যেক মুমিনের জন্য তাঁর মনের সকল আবেগ, আকুতি, বেদনা ও প্রার্থনা মহান প্রভুর দরবাবে পেশের সর্বোত্তম সুযোগ হলে সালাত, বিশেষত সাজদার অবস্থায়। পৃথিবীর কোনো নেতা যদি আমাদের বলতেন, অমুক সময় আমার কাছে আবেদন করলে আমি তা কবুল করব, তাহলে আমরা সেই সময়টিকে সদ্ব্যবহার করতে প্রাণপণে চেষ্টা করতাম। কিন্তু আফসোস! মহান রাব্বুল আলামীনের এই মহান সুযোগ আমরা অবহেলা করে এড়িয়ে চলছি। আমাদের সকলেরই উচিত, যথাসম্ভব মাসনূন দু'আ মুখস্থ করে সেগুলি দিয়ে সাজদায় দু'আ করা।

সালাতের মধ্যে দু'আর আরেকটি বিশেষ সময় তাশাহহুদের পরে সালামের পূর্বে। এই সময়ে দু'আ করা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নিয়মিত কর্ম ও বিশেষ নির্দেশ। তিনি তাঁর উম্মতকে তাশাহহুদ শিক্ষা দান করে বলেছেন :

ثم يتـــخير من المسألة ما يشاء،/ ثم يتخـــير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

"তাশাহহুদের পর মুসল্লী তার পছন্দ অনুসারে দু'আ বেছে নিয়ে দু'আ করবে।"[৪]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা যখন শেষ তাশাহহুদ শেষ করবে, তখন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে : জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জাগতিক জীবনের ও মৃত্যুর ফিতনা (পরীক্ষা বা বিপদ) থেকে এবং দাজ্জালের অমঙ্গল থেকে।"[৫]

যিক্‌র নং ২৬ : তাশাহহুদের পরের দু'আ :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহহুদের পরে দু'আর কিছু বাক্য শিখিয়েছেন :

اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمـــات إلـــى النـــور

وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আল্লিফ বাইনা কুলুবিনা-, ওয়া আসলি'হ যা-তা বাইনিনা-, ওয়াহ্দিনা- সুবুলাস সালা-ম, ওয়া নাজ্জিনা- মিনায যুলুমা-তি ইলান নূর। ওয়া জান্নিবনাল ফাওয়া-'হিশা মা যাহারা মিনহা- ওয়া মা- বাতান। ওয়া বা-রিক লানা- ফী আসমা-'ইনা-, ওয়া আবসা-রিনা-, ওয়া কুলুবিনা-, ওয়া আযওয়া-জিনা, ওয়া যুররিয়্যা-তিনা-। ওয়া তুব 'আলাইনা-, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুর রাহীম। ওয়াজ্ 'আলনা- শা-কিরীনা লিনি'মাতিকা, মুসনীনা বিহা- কাবিলীহা, ওয়া আতমিমহা- 'আলাইনা-।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিন। আপনি আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ প্রদান করুন। আপনি আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করুন, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোয় নিয়ে আসুন, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন। আপনি আমাদের শ্রবণযন্ত্রে, আমাদের দৃষ্টিশক্তিতে, আমাদের অন্তরে, আমাদের দাম্পত্য সঙ্গীগণের মধ্যে এবং আমাদের সন্তানগণের মধ্যে বরকত প্রদান করুন। আপনি আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী পরম করুণাময়। আপনি আমাদেরকে আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের, নিয়ামতের জন্য আপনার প্রশংসা করার এবং নিয়ামতকে সসম্মানে গ্রহণ করার তাওফীক প্রদান করুন এবং আপনি আমাদের জন্য প্রদত্ত আপনার নিয়ামতকে পূর্ণ করুন।" হাদীসটি সহীহ।[১]

এ সময়ে পাঠের জন্য অনেক দু'আ সুন্নাতে নববীতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এসকল মাসনূন দু'আ শিক্ষা করে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তদ্দ্বারা দু'আ করা আমদের কর্তব্য। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) সালাতের মধ্যে মাসনুন দু'আর অর্থের কাছাকাছি শব্দে দু'আ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে যে সকল দু'আ আছে সবই সালাতের মধ্যে পাঠ করা যায়। এ সকল দু'আর অর্থবোধক কাছাকাছি শব্দেও দু'আ করা যায়।[২] তবে নবুয়্যতের নূর রয়েছে মাসনূন দু'আর মধ্যে। এ সকল নববী দু'আ অর্থ বুঝে হুবহু মুখস্থ করে তা দিয়ে দু'আ করা খুবই প্রয়োজন।

বিতিরের শেষে কুনুতের দু'আ

কুনুত শব্দের অর্থ আনুগত্য, দণ্ডায়মান হওয়া, প্রার্থনা করা বা ডণ্ডায়মান অবস্থায় দু'আ করা। সালাতের মধ্যে দু'আর অন্যতম মাসনূন সময় বিতিরের সালাতের কুনুত। বিতির সালাতের শেষ রাক'আতে রুকুর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ পাঠ করতেন, যা কুনুত বা দু'আ কুনুত নামে পরিচিত। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন দু'আ পাঠ করেছেন। আমাদের সমাজে 'দু'আ কুনুত' নামে পরিচিত দু'আটিও সহীহ সনদে বর্ণিত।[৩] কিন্তু আমরা অজ্ঞতাবশত মনে করি যে, আমাদের মাযহাব অনুসারে কুনুতের সময় এই দু'আটিই পাঠ করতে হবে, অন্য কোনো দু'আ পাঠ করা যাবে না। ধারণাটি ভুল। ইমাম আবু হানীফা (রা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, কুনুতের জন্য কোনো দু'আ নেই, কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহ) তাঁর "আল-মাবসূত" গ্রন্থে লিখেছেন:

قلت فما مقدار القيام في القنوت قال كان يقال مقدار إذا السمآء انشقت والسمآء ذات البروج قلت فهل فيه دعاء موقت قال لا

"আমি বললাম : তাহলে কুনুতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'আ পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন : বলা হতো যে, সূরা 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' ও সূরা 'ওয়াস সামাই যাতিল বুরূজ' পরিমাণ। আমি বললাম : কুনুতের জন্য কি কোনো নির্দিষ্ট দু'আ আছে ? বা কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করা যাবে? তিনি বললেন : না।"[৪]

ইমাম মুহাম্মাদের অন্য গ্রন্থ "আল-হুজ্জাত"-এ তিনি লিখেছেন :

قلت فهل في القنوت كلام موقت قال لا ولكن تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو بما بدا لك

"আমি বললাম : তাহলে কুনুতের জন্য কি কোনো নির্ধারিত বাক্য বলতে হবে বা কোনো বাক্য নির্ধারিত করা যাবে ? তিন বললেন : না। বরং তুমি আল্লাহর হামদা বা প্রশংসা করবে, নবীয়ে আকরাম ﷺ-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে এবং তোমার সুবিধা ও ইচ্ছামতো যে কোনো দু'আ করবে।"[৫]

যিক্‌র নং ২৭ : কুনুতের দ্বিতীয় মাসনূন দু'আ

বিতরের কুনুত হিসাবে দুটি মাসনূন দু'আ সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। একটি "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা..." যা আমাদের দেশের সকল ধার্মিক মুসলিমের মুখস্থ। দ্বিতীয় দু'আটি সম্পর্কে ইমাম হাসান বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে নিম্নের বাক্যগুলি শিক্ষা দিয়েছেন বিতিরের সালাতে বলার জন্য :

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت [ولا يعز من عاديت]

تباركت ربنا وتعاليت

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাহ্‌ দিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বা-রিক লী ফীমা- আ'অ্‌ তাইতা, ওয়া ক্বিনী শাররা ক্বাদ্বাইতা, ফাইন্নাকা তাক্বদ্বী, ওয়ালা- ইউক্বদ্বা 'আলাইকা, ইন্নাহু লা- ইয়াযিল্লু মান ওয়া-লাইতা, [ওয়ালা- ইয়া'ইয্যু মান 'আ-দাইতা] , তাবা-রাক্‌তা রাব্বানা- ওয়া তা'আ-লাইতা ।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাকে হেদায়েত দান করুন, যাদেরকে আপনি হেদায়েত করেছেন তাদের সাথে। আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্ত ও সুস্থতা দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে। আমাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করুন (আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন), যাদেরকে আপনি ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে। আপনি আমাকে যা কিছু প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন। আপনি যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ আপনিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করেন, আপনার বিষয় কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আপনি যাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে অপমানিত হবে না। আর আপনি যাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে কখনো সম্মানিত হবে না। মহামহিমান্বিত বরকতময় আপনি, হে আমাদের প্রভু, মহামর্যাদাময় ও সর্বোচ্চ আপনি।"[১]

আমরা কখনো এই দু'আ ও কখনো প্রচলিত দু'আ পড়ব। আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) এই সময়ে যে কোনো বিষয়ে দু'আ চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তবে মাসনূন দু'আ পাঠের চেষ্টা করতে হবে। এই দুটি কুনুতের দু'আ ছাড়াও অন্যান্য মাসনূন দু'আ, যেমন এই বইয়ে উল্লেখিত **১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৫ ও ২৬** নং যিক্‌র বা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত যে কোনো দু'আ আমরা মুখস্থ করে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এ সময়ে পাঠ করতে পারি।

আমি "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে[২] উল্লেখ করেছি যে, হানাফী মাযহাবের ইমামগণ কুনুতের জন্য, এবং সালাতের মধ্যে যে কোনো স্থানে দু'আর জন্য কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে দু'আর প্রাণ থাকে না। মুসাল্লী ঠোঁটস্থভাবে অমনোযোগের সাথে সালাতের যিক্‌র ও দু'আ আউড়ে যান। এক পর্যায়ে এভাবে প্রাণহীন সালাত শেষ হয়ে যায়। সর্বদা একটি নির্ধারিত দু'আ পাঠ করলে সালাতের খুশু, আবেগ, প্রাণবন্ততা বিনয় ও আকুতি নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক মুমিনের উচিত বিভিন্ন মাসনূন শব্দের দু'আ অর্থ বুঝে মুখস্থ করে এককে সময় এককে দু'আ পাঠ করা। এতে মনের আবেগ দিয়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে খুশু ও বিনয়ের সাথে দু'আ করা সহজ হয়। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন।

(ছ). শুক্রবারের দিনের ও রাত্রের বিশেষ মুহূর্ত

শুক্রবারের দিনে একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে যে সময়ে বান্দা আল্লাহর নিকট যা প্রার্থনা করবে তাই আল্লাহ তাকে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه

"নিশ্চয় শুক্রবারে একটি সময় আছে, যে সময় কোনো মুসলিম দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা প্রদান করবেন।"[৩]

এই মুহূর্তটি রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্ধারণ করে দেন নি। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে অধিকাংশ আলিমই বলেছেন যে, শুক্রবারের দিন সূর্যাস্তের পূর্বের মুহূর্ত দু'আ কবুলের সময়। এ সময়ে যদি কোনো মুসলিম মাগরিবের সালাতের প্রস্তুতি নিয়ে সালাতের অপেক্ষায় বসে দু'আয় মশগুল থাকে তবে আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করবেন। অন্য অনেকে বলেছেন যে, ইমামের খুতবা প্রদান শুরু করা থেকে তাঁর সালাতের সালাম ফেরানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই এই মুহূর্তটি রয়েছে।[৪]

২৪. দু'আ কবুলের স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা

দু'আ সম্পর্কিত সকল হাদীস পাঠ করলে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মতকে দু'আর আদব, নিয়ম, পদ্ধতি, শব্দ ইত্যাদি সব শিক্ষা দিয়েছেন। কখন কী-ভাবে দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন তা বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। দু'আ কবুলের সময় সম্পর্কে আমরা অনেক হাদীস দেখতে পাই। কিন্তু দু'আ কবুলের স্থান সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা আমরা পাই না বললেই চলে। আমরা অনেক হাদীসে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শেষ রাত্র, সালাতের পরে, আযানের পরে ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে দু'আ করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিন্তু "অমুক স্থানে গিয়ে দু'আ কর" এরূপ কোনো নির্দেশনা আমরা কোনো হাদীসে পাই না। শুধুমাত্র হজ্ব ও আল্লাহর ঘর কেন্দ্রিক কয়েকটি হাদীসে পাওয়া যায়, যেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যয়ীফ বা দুর্বল। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, বাইতুল্লাহর দরজার কাছে মুলতাযামে, সাফা ও মারওয়ার উপরে, তাওয়াফের সময়, আরাফাতের মাঠে দু'আ করা উচিত। এ সকল স্থানের দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন। এছাড়া দু'আর স্থান নির্দেশ করে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর কারণ ইসলাম সকল যুগের সকল দেশের মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনিত বিধান। সকল যুগের সকল স্থানের মানুষই ইচ্ছা করলে সহজেই দু'আর জন্য মুবারক সময়গুলির সুযোগ নিতে পারবেন। কিন্তু দু'আ কবুলের কোনো বিশেষ স্থান থাকলে হয় সেখানে যাওয়া অনেকের জন্য সম্ভব হতো না। এজন্য আল্লাহর তাঁর সকল বান্দার জন্য দু'আ দরজা খুলে দিয়েছেন।

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় যে, আমাদের দেশের অগণিত মুসলিম আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য অগণিত সহীহ হাদীসে নির্দেশিত সময়ের প্রতি কোনো লক্ষ্য রাখেন না। কিন্তু তারা দু'আর জন্য "স্থান" খুঁজে বেড়ান। বিশেষত অনেক মুসলমানের বদ্ধমূল ধারণা ওলী বুজুর্গগণের মাযারে যেয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে দু'আ তাড়াতাড়ি কবুল হয়। এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার ফলে মাযারগুলি আজ মুসলিমের ঈমান হরণের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মাযারগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভণ্ড ব্যবসায়ীদের জমজমাট ব্যবসা। যেখানে

অগণিত সরল মুসলিম টাকা-পয়সা, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদির সাথে নিজের ঈমানও রেখে চলে আসেন।

আমরা কবর কেন্দ্রিক দু'আর শিরক বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা করব। এখানে শুধু এতটুকু আমাদের জানতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়নি যে, কোনো ওলী বুজুর্গের মাযারে গিয়ে নিজের হাজত ও প্রয়োজনের জন্য দু'আ করলে আল্লাহ সে দু'আ কবুল করবেন। একটি হাদীসও নেই এই মর্মে। আধখানা হাদীসও নেই। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেছেন :

وإذا ســألــك عبادي عني فإني قريب أجــيب دعوة الداع إذا دعان

"এবং যদি আমার বান্দাগণ আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তাদের নিকটবর্তী। প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে (আমাকে ডাকে) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দি (প্রার্থনা কবুল করি)।"[১]

আল্লাহ বললেন তিনি কাছে আছেন। ডাকলেই সাড়া দেবেন। আর আপনি তাঁর কথা বিশ্বাস না করে আর কোথায় দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। কেন দৌড়াচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কখনো কোথাও বলেছেন যে, কোনো ওলী বা বুজুর্গের কবরে বা মাযারে যেয়ে দু'আ করলে তা কবুল হবে ? কোথাও বলেননি। কাজেই আপনার অস্থিরতা মূলত মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) ওয়াদা ও শিক্ষার প্রতি আপনার অবিশ্বাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে দু'আর সকল নিয়ম ও আদব শিখিয়ে গেলেন, অথচ এ কথাটি শিখালেন না! সাহাবীগণ প্রশ্ন করেছেন, কিভাবে দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন। তিনি বিভিন্ন সময়, পদ্ধতি ও বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কখনো ঘুণাক্ষরেও বলেননি যে, ওলী আওলিয়ার মাযারে বা কবরে যেয়ে দু'আ করলে কবুল হবে। বরং তিনি বিভিন্ন হাদীসে শুধুমাত্র যিয়ারত অর্থাৎ কবরস্থ ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া ও তার জন্য দু'আ করা ছাড়া কবরের কাছে অন্য কোনো ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন।

সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগের অনেক পরে মানুষের মধ্যে বুজুর্গগণের কবরের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে নিজের হাজত প্রয়োজন প্রার্থনার রীতি ক্রমান্বয়ে দেখা যেতে থাকে। ইসলামী শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার ও জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস ইত্যাদি ছিল এর কারণ। জনশ্রুতি আছে – অমুক বুজুর্গের কবরের কাছে দু'আ করলে তা কবুল হয়। ওমনি কিছু মানুষ ছুটলেন সেখানে দু'আ করতে। পরবর্তী যুগের অনেক জীবনী গ্রন্থে এমন অনেক জনশ্রুতির কথা পাবেন। সরলমনা অনেক আলিম ও নেককার মানুষও এসকল বিষয়ে জড়িয়ে গিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, আপনি আপনার প্রেমময় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করছেন। যিনি তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) মাধ্যমে দু'আর সময় ও নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে অবিশ্বাস করে ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) শিক্ষায় অনাস্থা এনে মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে কোথাও দৌড়ে বেড়াবেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) শিক্ষার মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করুন। আর কোনো কিছুরই আপনার প্রয়োজন নেই।

(গ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা পরিত্যাগের পরিণাম

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, দু'আ করা আল্লাহর নির্দেশ, তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ। দু'আ করা ইবাদত। দু'আ না করা অক্ষমতা, অপরাধ ও আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা বা দু'আ না করার তিনটি অবস্থা ও পর্যায় রয়েছে। আমরা নিচে এই তিনটি অবস্থার আলোচনা করছি। আল্লাহর তাওফীকই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রথম অবস্থা, আল্লাহর যিক্‌রের কারণে দু'আ পরিত্যাগ

যদি কেউ দু'আর বদলে অনবরত আল্লাহর যিক্‌রে নিমগ্ন থাকেন তাহলে তা দু'আর মতোই ইবাদত ও আত্মসমর্পণ হিসেবে আল্লাহর দরবাবে কবুল হবে বলে হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি। যয়ীফ একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, উমার (রা) বা জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেছেন :

من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين

"আমার যিক্‌রে ব্যস্ত থাকার কারণে যে ব্যক্তি আমার কাছে চাইতে পারেনি, আমি প্রার্থনাকারীদের যা প্রদান করি তাঁকে তার চেয়ে উত্তম (পুরস্কার) প্রদান করি।"[২]

অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺবলেন, আল্লাহ বলেন:

من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفــضــل ما أعطي السائلين

"যাকে কুরআন ও আমার যিক্‌র আমার নিকট প্রার্থনা থেকে ব্যস্ত রাখে আমি প্রার্থনাকারীদের যা প্রদান করি তাঁকে তার চেয়ে উত্তম (পুরস্কার) প্রদান করি।"[৩]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, সকল দু'আই যিক্‌র। তবে সকল যিক্‌র দু'আ নয়। বিভিন্ন বাক্যে নিজের জন্য কিছু না চেয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর মর্যাদা প্রকাশ করা দু'আ বিহীন যিক্‌র। অনেক সময় বান্দা বিপদে আপদে মনপ্রাণ আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে শুধু তাঁর যিক্‌র করতে থাকেন। এই যিক্‌রই তার দু'আ। এই যিক্‌র দু'আ-পরিত্যাগ নয়। বরং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের দু'আ। এই যিক্‌রের কারণেই আল্লাহ তার বিপদ কাটিয়ে দিবেন। কুরআনে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, নবী হযরত ইউনূস (আ) মাছের পেটের মধ্যে ভয়ঙ্করতম বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে সকাতরে প্রার্থনা করেছিলেন:

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

"আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আপনি পবিত্র, মহান!, আমি তো সীমালংঘনকারী।"

এখানে আমরা দেখছি যে, কোনো প্রার্থনা নেই, শুধুমাত্র যিক্‌র। কিন্তু আল্লাহ এই যিক্‌রকেই দু'আ বা নিদা অর্থাৎ আহ্বান নামে অভিহিত করেছেন এবং তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তার কারণ এই আকুতিময় যিক্‌রই দু'আ। আর উপরের হাদীসে এধরনের যিক্‌রের কথা বলা হয়েছে। আমরা ইতঃপূর্বে ইসমু আযম বিষয়ক আলোচনায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :"ইউনূস (আ)-এর এই দু'আ পড়ে যে কোনো মুসলিম যে কোনো বিষয়ে দু'আ করলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেন ও প্রার্থনা পূরণ করবেন।"[১]

<u>যিক্‌র নং ২৮ :</u> **يَا حَـــيُّ، يَا قَـــيُّـــوْمُ**

উচ্চারণ: ইয়া 'হাইয়্যু, হয়া ক্বাইয়্যুম। **অর্থ:** হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসংরক্ষক।

হযরত আলী (রা) বলেন :

لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا لأنظر ما فعــل رســـول الله ﷺ فجئــت فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليهما ثم رجعت إلى القتـــال ثـــم جئـــت وهو ساجد يقول ذلك ثم ذهبت إلى القتال ثم رجعت وهو يقول ذلك ففتح الله عليه

"বদরের যুদ্ধের দিনে আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করছেন তা দেখার জন্য তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসলাম। এসে দেখি তিনি সাজাদা রত অবস্থায় রয়েছেন এবং শুধু বলছেন : **'ইয়া হাইউ ইয়া কাইউম' (হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসংরক্ষক)**, এর বেশি কিছুই বলছেন না। অতঃপর আমি আবার যুদ্ধের মধ্যে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার আসলাম। দেখি তিনি সাজদা রত অবস্থায় ঐ কথাই বলছেন। এরপর আমি যুদ্ধে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসলাম। এসে দেখি তিনি ঐ কথাই বলছেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করেন।" হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

এ হাদীসেও আমরা দেখছি, কিভাবে যিক্‌রের মাধ্যমে দু'আ করা হয়। এইরূপ সমর্পিত যিক্‌র সর্বোত্তম দু'আর ফল এনে দেয়।

<u>যিক্‌র নং ২৯ : দুশ্চিন্তা বা বিপদগ্রস্তের দু'আ-১</u>

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদ বা কষ্টের সময় বলতেন:

لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب الســـماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামাওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থ: "নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি মহান, মহাধৈর্যময় মহা বিচক্ষণ, নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি মহান আরশের প্রভু, নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি আসমানসমূহের, জমিনের ও সম্মানিত আরশের প্রভু।"[৩]

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোনো কষ্ট বা বিপদে পড়লে উপরের এই দু'আ পড়তে শিখিয়েছেন।[৪] এখানে আমরা দেখছি যে, এই দু'আ মূলত শুধুমাত্র যিক্‌র। এখানে কোনো দু'আ নেই। কিন্তু আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেই দু'আ করা হচ্ছে।

<u>যিক্‌র নং ৩০ : দুশ্চিন্তা বা বিপদগ্রস্তের দু'আ-২</u>

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে বলতেন: "তোমাদের কেউ কখনো দুশ্চিন্তা বা বিপদের মধ্যে নিপতিত হলে বলবে :

الله الله ربي، لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا

উচ্চারণ : আল্লা-হু, আল্লা-হু রাব্বী, লা- উশরিকু বিহী শাইআন। আল্লা-হু, আল্লা-হু রাব্বী, লা- উশরিকু বিহী শাইআন।

অর্থ : "আল্লাহ, আল্লাহ, আমার রব, তার সাথে কাউকে শরীক করি না, আল্লাহ, আল্লাহ, আমার রব, তার সাথে কাউকে শরীক করি না।"

হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল হলেও অন্যান্য কয়েকটি সনদে একই দু'আ বর্ণিত হয়েছে। এজন্য হাদীসটি হাসান।[৫] এই দু'আও মূলত যিক্‌র। বিপদগ্রস্ত মুমিন-হৃদয় এভাবে নিজেকে সমর্পণ করে আল্লাহর করুণা সন্ধান করেন।[৬]

<u>দ্বিতীয় অবস্থা, আল্লাহ জানেন বলে বা তাওয়াক্কুল করে দু'আ পরিত্যাগ</u>

আল্লাহ দেখছেন বলে দু'আ না করা বা আল্লাহর তাকদীরের উপর নির্ভর করে দু'আ থেকে বিরত থাকা কঠিন অপরাধ ও সুন্নাত বিরোধী কর্ম। সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করা আল্লাহর নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত এবং একটি অতিরিক্ত ইবাদত। সুন্নাতের আলোকে আমরা একটি ঘটনাও খুঁজে পাব না, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ না করে তথাকথিত

'তাওয়াক্কুল' করেছেন। অথবা আল্লাহ তো আল্লাহ আমার অবস্থা দেখছেন কাজেই দু'আর কী দরকার? – একথা বলে দু'আ করা থেকে বিরত থেকেছেন এমন একটি ঘটনাও আমরা খুঁজে পাব না।

মুহতারাম পাঠক, সাহাবীগণের যুগের পর থেকে, অনেক বুজুর্গ ও নেককার মানুষের ঘটনা আপনি বিভিন্ন গ্রন্থে পাবেন, যেখানে তাঁরা বিপদে আপদে দু'আ করেননি। দু'আ করতে বলা হলে তাঁরা বলেছেন, "আল্লাহ তো আমার অবস্থা দেখছেন, অথবা আল্লাহই আমার বিপদ দিয়েছেন আমি কেন তাঁর কাছে বিপদ কাটাতে বলব, ইত্যাদি।" কেউ হয়ত বলেছেন, দু'আর চেয়ে তাওয়াক্কুলই উত্তম।

এ সকল বুজুর্গের কর্ম, কারামত ও ঈমানের এই দৃঢ়তা দেখে আমরা বিমোহিত হয়ে মনে করি এই বুঝি ঈমানের ও তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর! এই সময়ে আমরা ভুলে যাই যে, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর। তার পরেই তাঁর সাহাবীগণ। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের একটি ঘটনাও পাব না যে, তিনি কখনো কোনো সমস্যায়, বিপদে বা প্রয়োজনে দু'আ না করে তাওয়াক্কুল করেছেন। তিনি সর্বদা দু'আ করেছেন ও দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দু'আই ইবাদত, দু'আই তাওয়াক্কুল এবং দু'আই ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। উপরিউক্ত বুজুর্গগণের স্তর এর নিচে। তাঁরা ক্বলবের বিশেষ হালতে এসকল কথা বলেছেন। তাঁদের হালতের চেয়ে উচ্চ হালত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এবং তার পরে তাঁর সাহাবীগণের হালাত।

ইবাদত, বন্দেগি, নির্জনবাস, যিক্র আযকার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়টি খুব বেশি মনে রাখতে হবে। অগণিত বুজুর্গের অগণিত আকর্ষণীয় বিবরণ আমরা দেখতে পাব। এগুলি হয়ত ভালো। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শই অনুকরণীয় আদর্শ।

বানোয়াট একটি গল্প আমাদেরকে ভুল বুঝতে সাহায্য করে। এই ঘটনায় বলা হয়েছে: ইবরাহীমকে (আ) যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে বলেন : আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন। তিনি বলেন : আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। জিবরাঈল (আ) বলেন : তাহলে আপনি আপনার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। তখন ইবরাহীম (আ) বলেন :

حسبي من سؤالي علمه بحالي

"তিনি আমার অবস্থা জানেন, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট, অতএব আমার আর কোনো প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।"

এই কাহিনীটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী, সনদহীনভাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। কুরআন কারীমে হযরত ইবরাহীমের অনেক দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কখনো কোনো প্রয়োজনে দু'আ করেননি এরূপ কোনো ঘটনা কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত হয়নি।[১]

সর্বোপরি দু'আ পরিত্যাগ করা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার বিপরীত। উপরের বিভিন্ন হাদীসে দু'আ করার নির্দেশ আমরা দেখেছি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল বিষয় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে তাও দেখেছি। উপরন্তু না চাইলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

من لم يدع الله غضب الله عليه

"কেউ আল্লাহর কাছে না চাইলে বা দু'আ না করলে আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।" হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[২]

আমরা দেখেছি যে, কুরআন করীমে আল্লাহর কাছে দু'আ না করার ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন : "এবং তোমাদের প্রভু বললেন : তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করা আমি তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" আমরা দেখেছি যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'আই ইবাদত। আল্লাহর কাছে দু'আ না করাই আল্লাহর ইবাদত থেকে অহঙ্কার করা।

তৃতীয় অবস্থা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ

আল্লাহর কাছে দু'আ না করার সর্বশেষ অবস্থা আল্লাহর কাছে দু'আ না করে অন্যের কাছে দু'আ করা। বিশেষ বিপদে বা বড় বড় সমস্যায় আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া। বাকি ছোটখাট বা সাধারণ বিপদ আপদ, সমস্যা, হাজত, প্রয়োজন ইত্যাদির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা। এই অবস্থা শিরকের অবস্থা ও ভয়ঙ্করতম ধ্বংসের কারণ।

শিরকের মূলই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা

কুরআন কারীমের আলোকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, যুগে যুগে অধিকাংশ কাফির মুশরিক আল্লাহর উপর ঈমান থাকা সত্ত্বেও, আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে বিশ্বাস করার পরেও এই দু'আর কারণেই মুশরিক হয়ে গিয়েছে।

কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানতে পারি যে মক্কার মুশরিকগণ বিশ্বাস করতো যে – আল্লাহই এই বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, সর্বময় ক্ষমতার মালিক, তাঁর উপরে কারো ক্ষমতা নেই, তিনিই একমাত্র রিযিক দাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তারা একবাক্যে তা স্বীকার করতো। কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে একথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] অর্থাৎ, তারা বিশ্বাস করতো যে,– 'লা খালিকা ইল্লাল্লাহ' , 'লা রাব্বা ইল্লাল্লাহ' , 'লা রাযিকা ইল্লাল্লাহ' , 'লা মালিকা ইল্লল্লাহ' ইত্যাদি। কিন্তু তারা এই বিশ্বাস সত্ত্বেও আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি অন্যান্য নবী, ফিরিশতা, প্রতিমা, পাথর, গাছ ইত্যাদির ইবাদত বা পূজা করত। অর্থাৎ, তারা 'লা-

ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' মানত না ।[১]

শিরকের উৎপত্তি আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের কারণে নয় । শিরকের উৎপত্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ, ফিরিশতা, গাছ, পাথর বা প্রাকৃতিক শক্তিকে অলৌকিক বা অপার্থিব কল্যাণ ও অকল্যাণের ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাদের ইবাদত বা পূজা করা । বিশেষত তাদের কাছে সাহায্য, কল্যাণ, আশ্রয় ও বিপদমুক্তি প্রার্থনা করা । হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রিয়, নেককার ওলী, বুজুর্গ, নবী বা ফিরিশতাগণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, অতিভক্তি ও তাদেরকে মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতার অধিকারী মনে করার কারণে মানব সমাজে শিরক প্রবেশ করেছে ও প্রতিপালিত হয়েছে । এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয় । হাদীস থেকে শুধুমাত্র মুসলিম সমাজে শিরক প্রবেশের দু'টি কহিনী আলোচনা করছি ।

প্রথম ঘটনা : প্রথম মানব সমাজ ছিল তাওহীদবাদী মুমিন মুসলিম । আদম (আ)-এর পরে কয়েক শতাব্দী এভাবেই মানুষ তাওহীদ ও ঈমানের উপর ছিল । এরপর আওলিয়া কেরামের ক্ষেত্রে অতিভক্তির কারণে ক্রমান্বয়ে সমাজে শিরকের শুরু হয় । সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে, তাফসীরে তাবারী ও অন্যান্য তাফসীরের গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এ সকল বর্ণনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: আদম সন্তানদের মধ্যে ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাসর – এই পাঁচ ব্যক্তি খুব নেককার বুজুর্গ মানুষ ছিলেন । তাঁদের অনেক অনুসারী, ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন, যারা তাঁদের বেলায়েতের বিষয়ে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন । তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের বিষয়ে অতিভক্তিকারী কোনো কোনো মু'তাকীদ বলেন : আমরা যদি এঁদের ছবি বানিয়ে রেখে দিই তাহলে তা আমাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতে উৎসাহিত করবে । এরপর যখন এরাও মারা গেল তখন ইবলিস পরবর্তী যুগের মানুষদেরকে ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো এঁদের শুধু শুধু ছবি করে রাখেননি । তারা তো এদের ইবাদত করত এবং এদের ডাকার ফলেই তো তারা বৃষ্টি পেত । তখন সে যুগের মানুষেরা এঁদের পূজা করা শুরু করল ।[২]

দ্বিতীয় ঘটনা : তাওহীদের অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) । তঁদেরই বংশধর আরব জাতি । তারাও তাওহীদের উপর ছিল । তাদের মধ্যে শিরকের প্রচলন সম্পর্কে ইবনু ইসহাক তার "সীরাতুন্নবী" গ্রন্থে বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ীর সূত্রে লিখেছেন : এরা বলেন যে, ইসমাঈলের বংশে আরবদের মধ্যে শিরক প্রচলনের কারণ ছিল, এরা কাবাঘরের খুবই ভক্তি করত । তারা কাবাঘর ছেড়ে যেতে চাইতেন না । যখন তাদের বাধ্য হয়ে কাবাঘর ছেড়ে বিভিন্ন এলাকায় যেতে হতো, তখন তারা সাথে করে কাবাঘরের তাযীমের জন্য কাবাঘরের কিছু পাথর নিয়ে যেতেন । তারা যেখানেই যেতেন সেখানে এই পাথরগুলি রেখে তার তাওয়াফ করতেন ও সম্মান করতেন । পরবর্তী যুগে ক্রমান্বয়ে এ সকল পাথর ইবাদত করার প্রচলন হয়ে যায় । পরে মানুষেরা খেয়াল খুশি মতো বিভিন্ন পাথর পূজা করতে শুরু করে । এছাড়া আরবদের নেতা আমর ইবনু লুহাঈ তার কোনো কাজে সিরিয়ায় গমন করেন । সেখানের মানুষেরা মূর্তি পূজা করত । তিনি তাদের বলেন : এসকল মূর্তি তোমরা কেন পূজা কর? তারা বলে : আমরা এদের পূজা করি । এদের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করি । তখন এরা আমাদের বৃষ্টি দান করে । বিপদে আমরা এদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি । তখন এরা আমাদের সাহায্য করে । তখন তিনি তাদের থেকে কয়েকটি মূর্তি এনে মক্কায় স্থাপন করেন এবং মক্কাবাসীকে এদের তাযীম করতে নির্দেশ দেন ।"[৩]

আল্লাহর ফিরিশতা, নবী ও ওলীদের নিকট প্রার্থনা করার যুক্তি

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি ছিল দুটি : প্রথম যুক্তি – এরা সবাই আল্লাহর প্রিয়, আল্লাহর নবী বা ফিরিশতা । অথবা আল্লাহর পুত্রকন্যা । এদের ইবাদত করলে আল্লাহ নিশ্চয় খুশি হবেন এবং এভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারব । কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে :

والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

"আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু) গ্রহণ করেছে তারা বলে : আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদাত করি যেন এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে ।"[৪]

দ্বিতীয় যুক্তি – আল্লাহই একমাত্র প্রভু , প্রতিপালক এবং সকল ক্ষমতার মালিক । তবে কিছু মানুষ ও ফিরেশতা আছেন যারা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় , তাদের সুপারিশ আল্লাহ গ্রহণ করেন । এ সকল ফিরেশতা ও মানুষের ইবাদাত করলে, এরা খুশি হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে মানুষের বিপদ কাটিয়ে দেন, প্রয়োজন পূরণ করেন । এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون

"তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না । তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী শাফায়াতকারী । আপনি বলুন : তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাচ্ছ যা তিনি জানেন না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে ? সুবহানাল্লাহ! তিনি সুমহান, সুপবিত্র এবং তোমাদের শিরক থেকে তিনি উর্ধ্বে ।"[৫]

মুশরিকগণ যদিও মনে করত যে, একমাত্র আল্লাহই সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং এসকল উপাস্য আল্লাহর নিকট থেকেই

সুপারিশ করে এনে দেন, তবুও তাদের ধারণা ছিল আল্লাহর সাথে এদের যে সম্পর্ক তাতে এদের সুপারিশ আল্লাহ ফেলতে পারবেন না। এভাবে এদের মধ্যে 'মানুষের মঙ্গল বা অমঙ্গল করার এক ধরনের ক্ষমতা' আছে বলেই তারা মনে করত। অর্থাৎ, তারা মনে করতো যে, মূল ক্ষমতা আল্লাহরই। তবে এদেরকে তিনি (আল্লাহ) কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এজন্য কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে ইহুদি, নাসারা ও কাফিরদের শিরকের প্রতিবাদে আল্লাহ বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, "এরা আল্লাহকে ছাড়াও যে সকল নবী, ফিরিশতা, ওলী বা প্রতিমার ইবাদত বা পূজা করে তারা কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গলের ক্ষমতা রাখে না।"[১]

তাহলে শিরকের ভিত্তি ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নবী, ফিরিশতা, ওলী বা কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে অপার্থিব ও অলৌকিক মঙ্গল ও অমঙ্গলের ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বা তাদের সাথে আল্লাহর সরাসরি বিশেষ সম্পর্ক ও সুপারিশের বিশেষ অধিকার আছে মনে করে এদের কাছে প্রার্থনা করা। দু'আ বা প্রার্থনাই মূলত সকল শিরকের মূল। উৎসর্গ, কুরবানি (sacrifice), নযর, মানত, ফুল, সাজদা, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই মূলত দু'আর জন্যই। যেন পূজিত ব্যক্তি বা বস্তু এ সকল ভেট বা উৎসর্গে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পূরণ করেন বা হাজত মিটিয়ে দেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের ইবাদত ও কর্ম। অপরদিকে এদের কাছে প্রার্থনা মূলত জাগতিক। ফসল, রোগব্যাধি, বিপদাপদ, সন্তান, বিবাহ, ইত্যাদি জাগতিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়ার জন্যই এদের কাছে প্রার্থনা করা হয়। জান্নাত বা স্বর্গ লাভ, ক্ষমা, স্রষ্টার প্রেম, আখেরাতের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে এদের কাছে চাওয়া হয় না।

এজন্য আমরা কুরআন করীমের বিবরণ থেকে দেখতে পাই যে, মুশরিকরা ফিরিশতা, নবী, প্রতিমা ইত্যাদির ইবাদত করত মূলত দু'আর মাধ্যমে। সাধারণভাবে মুশরিকদের শিরকই ছিল যে, তারা আল্লাহকেও ডাকত বা আল্লাহর কাছে দু'আ চাইত, আবার আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য নবী, ফিরিশতা, বুজুর্গ, পাথর, প্রতিমা ইত্যাদির কাছেও দু'আ চাইত। এজন্য কুরআন করীমে এদের শিরককে অধিকাংশ স্থানে 'দু'আ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রায় ৭০ এরও অধিক স্থানে মুশরিকদের শিরককে 'দু'আ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সাধারণ বিপদ ও হাজত বনাম বড় বিপদ ও হাজত

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, মুশরিকদের এসকল দু'আ-প্রার্থনা সবই ছিল মূলত পার্থিব ও জাগতিক সমস্যাদি কেন্দ্রিক। রোগ, ব্যধি, বৃষ্টিপাত, সন্তান, বাণিজ্যে উন্নতি, বরকত, বিপদমুক্তি, রিযিক বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েই মুশরিকগণ এসকল উপাস্যের কাছে প্রার্থনা করত, যেন তারা আল্লাহর নিকট থেকে তাদের হাজত পূর্ণ করে দেয়। আখেরাতের মুক্তি, জান্নাত, কামালাত ইত্যাদির জন্য এদের কাছে কেউ যেত না। মূলত অধিকাংশ মুশরিক আখেরাতে অবিশ্বাস করতো।

জাগতিক এ সকল প্রার্থনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুশরিকের সাধারণ নিয়ম ছিল, ছোটখাট বিপদ আপদ প্রয়োজনে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যদের কাছে চাওয়া। আর খুব কঠিন বিপদে আল্লাহর কাছে চাওয়া। সম্ভবত তারা ভাবতো, ছোটখাট বিষয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে বিরক্ত করার কী দরকার। এজন্য তো আল্লাহর প্রিয় ফিরিশতা, নবী, আল্লাহর মেয়ে, স্ত্রী ইত্যাদি রয়েছে। একান্ত যে সকল কঠিন বিপদে এরা কূল পান না, সেখানে মহাপ্রভু সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহকে ডাকা যেতে পারে।

কুরআন কারীমে এ বিষয়ে অনেক স্থানে বলা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে যে, মুশরিকগণ যখন কঠিন বিপদে পড়ে, নদীতে বা সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে, বা আল্লাহর আযাব বা প্রাকৃতিক গজব এসে উপস্থিত হয় তখন মনেপ্রাণে আল্লাহর নিকট বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। অথচ সাধারণ হাজত প্রয়োজনে তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যদের নিকট প্রার্থনা করে।[২]

কুরআনের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ মুশরিকই এইভাবে চলত। সূরা হজ্বের একটি বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, কিছু মানুষ সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত করত। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা ও ঈমানের দৃঢ়তা খুবই কম। এজন্য কঠিন বিপদে পড়লে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলত এবং শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ত। তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যর কাছে চাওয়া শুরু করত।[৩]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নবী, ওলী, ফিরিশতা বা কারো কাছে প্রার্থনা করা শিরকের মূল। এবং একারণেই অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান থাকা সত্ত্বেও শিরকে লিপ্ত হয়। এজন্যই মহান আল্লাহ কুরআন করীমে ইরশাদ করেছেন :

وما يؤمــن أكــثـــرهـــم بالله إلا وهـــم مـــشــركـــون

"অধিকাংশ মানুষই শিরকে রত অবস্থায় আল্লাহর উপর ঈমান আনে।"[৪]

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আতা, ইকরিমাহ, আমির, ইবনু সিরীন, হাসান বসরী, কাতাদাহ, ইবনু যাইদ প্রমুখ সকল সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী, মুফাস্সির একথাই বলেছেন যে, সকল মুশরিকই বিশ্বাস করে যে,আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদাতা, প্রভু, প্রতিপালক এবং আল্লাহই রাব্বুল আলামীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে তার সাথে শিরক করে।[৫]

মুসলিম সমাজের 'দু'আ কেন্দ্রিক শিরক'

দু'আর আলোচনার মধ্যে উপরের 'দু'আ কেন্দ্রিক শিরক'-এর আলোচনার উদ্দেশ্য এই শিরক থেকে আত্মরক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকা। আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, বিভিন্ন মুসলিম সমাজে পূর্বতন ধর্মের প্রভাবে, ইসলামের মূলনীতি ও বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতার

কারণে, বিপদে আপদে মূর্ত কাউকে আঁকড়ে ধরে মনের আকুতি জানানোর মানবীয় দুর্বলাতার কারণে, আল্লাহর প্রতি আস্থার অভাবে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে দু'আ কেন্দ্রিক শিরক ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমাদের সমাজেও অগণিত মুসলিম বিপদে আপদ, রোগব্যাধি, ফসল, সন্তান, বিবাহ ইত্যাদি জাগতিক সমস্যাদির জন্য দেশের অগণিত মাযারে গিয়ে মাযারে শায়িত ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করেন। তাদের নিকট সমস্যা মেটানোর আব্দার করেন। তারা যেন খুশি হয়ে সমস্যা মেটানোর ব্যবস্থা করেন এই আশায় প্রার্থনার পূর্বে নযর, মানত, উৎসর্গ, ভেট, টাকা-পয়সা, সাজদা, ক্রন্দন ইত্যাদি পেশ করা হয়। এই কঠিন শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা মুমিনের অন্যতম কাজ। শিরক থেকে মুক্ত হতে না পারলে বাকি সকল কর্মই ব্যর্থ। অনন্ত ধ্বংস থেকে মুক্তির কোনো উপায় থাকবে না।

এখানে লক্ষণীয় যে কাফির মুশরিক ও পৌত্তলিক সমাজের মতো আমাদের দেশের মানুষেরাও সাধারণত কোনো পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি বা মর্যাদার জন্য এ সকল কবর, মাযার বা দরবারে যান না। আপনার সমাজের আনাচে কানাচে ছড়ানো অগণিত মাযারে গিয়ে দেখবেন সকলেই পার্থিব বিপদ আপদ, সন্তান, রোগব্যধি, মামলা ইত্যাদি জাগতিক সমস্যার দ্রুত নিস্পত্তি ও হাজত পূরণের জন্য এ সকল স্থানে নযর, মানত ইত্যাদি নিয়ে হাজিরা দেন। দু'চার জন মানুষ যারা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যিয়ারত করেন, তাঁরা নযর, মানত ইত্যাদির ধার ধারেন না। নীরবে যিয়ারত করে চলে যান।

এই বইয়ের পরিসরে কবরে দু'আ কেন্দ্রিক শিরকের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। আমার "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি।[১] এখানে এতটুকুই বলতে চাই যে, উপরের অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। কোথাও কখনো ঘুণাক্ষরেও বলেননি যে, কোনো প্রকার বিপদে অথবা ছোটখাট প্রয়োজনে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে তোমরা প্রার্থনা করবে, অথবা কারো কবরে গিয়ে আল্লাহর কাছে চাইবে। উপরন্তু কঠিনভাবে বারবার নিষেধ করেছেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইতে। বিশেষ করে কবর-কেন্দ্রিক ইবাদত থেকে অত্যন্ত কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। কবরকে কেন্দ্র করেই যে শিরক প্রসার লাভ করে, – তা বিশেষভাবে জানিয়েছেন। এ ধরনের মানুষদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।

সমাজে অনেক কথা প্রচলিত আছে। অমুক ব্যক্তি বিপদে পড়ে অমুক বুজুর্গকে ডেকেছিল, তিনি তাকে উদ্ধার করে দিয়েছেন। অমুক ব্যক্তি অমুকের মাযারে গিয়ে দু'আ করে বিপদ কেটে গিয়েছে। এগুলিতে কান দেবেন না। হিন্দু, খ্রিষ্টান ও সকল মুশরিক সমাজেই এই ধরনের কথা প্রচলিত।

ভাবতে বড় অবাক লাগে, এই সকল লোকমুখের কথা আমাদের অনেক মুসলমান ভাইয়েরা কত সহজে বিশ্বাস করেন! অথচ কুরআন ও হাদীসের কথায় আমাদের আস্থা আসে না। আল্লাহর রাব্বুল আলামীন ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ অগণিত ঘটনায় বলেছেন যে,– অমুক, অমুক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বিপদ মুক্ত হয়েছে। ইউনূস (আ) মাছের পেটের গভীরতম অন্ধকারে কঠিনতম বিপদে আল্লাহকে ডেকে বিপদ মুক্ত হলেন। এই কথায় আস্থা রেখে এরা আল্লাহকে ডাকতে চান না। অস্থির হয়ে শিরকের মধ্যে নিপতিত হন।

প্রিয় পাঠক, কুরআন ও হাদীসের বিবরণে আস্থা রাখুন। শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকুন। তাঁর রহমত থেকে আস্থা হারাবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরকের ভয়াবহ অন্ধকার থেকে রক্ষা করুন।

৮. রাসূল (ﷺ)-এর উপর সালাত-সালাম জ্ঞাপক বাক্যাদি

আল্লাহর যিক্র ও দু'আর একটি বিশেষ প্রকরণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা। সালাত ও সালাম প্রার্থনা মূলক যিক্রের অন্যতম। এতে মুমিন বান্দা আল্লাহর স্মরণ করেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন তাঁর মহান নবীর উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করেন। সালাত ও সালাম পাঠকারী উপরের বিভিন্ন হাদীসে সাধারণভাবে বর্ণিত যিক্রের ফযীলত ও সাওয়াব অর্জন করবেন। কিন্তু সালাত ও সালামের বিশেষ গুরুত্ব, মর্যাদা ও রুহানী আসর রয়েছে, যে জন্য পৃথকভাবে তার আলোচনা করতে ইচ্ছা করছি। আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

(ক) সালাত ও সালাম : অর্থ ও অভিব্যক্তি

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ইসলামী শব্দের ফার্সী অনুবাদ বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করার ফলে তা মূল আরবী আবেদন হারিয়ে ফেলেছে এবং অনেক সময় আমরা মূল আরবী পরিভাষা যা কুরআন করীম, হাদীস শরীফ ও সকল ইসলামী গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা জানিও না। এ সকল পরিভাষার মধ্যে অন্যতম 'সালাত'। 'সালাত' ইসলামের অন্যতম পরিভাষা। মুসলিম জীবনের অন্যতম দু'টি ইবাদত 'সালাত' নামে পরিচিত ; প্রথমটি ,– ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ , ইসলামের অন্যতম ইবাদত 'সালাত' যা আমরা বাংলায় ফার্সী প্রতিশব্দ 'নামায' বলে অভিহিত করি। দ্বিতীয়টি ,– মানবতার মুক্তির দূত, আল্লাহর প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য 'সালাত' প্রেরণ করা, যাকে আমরা বাংলায় ফার্সী শব্দে দরুদ বলে থাকি।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে দুরাইদ: আবু বকর মুহাম্মাদ বিন হুসাইন (৩২১ হি) লিখেছেন : 'সালাত' শব্দের মূল: দু'আ বা প্রার্থনা। صلِّ عليــه "সাল্লি আলাইহি" অর্থাৎ, "তার জন্য দু'আ কর"।[২] এ শতকের অন্যতম ভাষাতত্ত্ববিদ আহমদ ইবনে ফারিস (৩৯৫হি) লিখেছেন : "এই মূল ধাতুটির ২টি মূল অর্থ রয়েছে : একটি অর্থ আগুন বা আগুন জাতীয় উত্তাপ, জ্বর ইত্যাদি বোধক। দ্বিতীয় অর্থ – এক ধরনের উপাসনা। ... দ্বিতীয় অর্থে সালাত শব্দের অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা। ... আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত অর্থ রহমত। হাদীস শরীফে এসেছে : اللهم صــل علىـآل أبي أوفى "হে আল্লাহ, আপনি আবু আউফার বংশের উপর সালাত প্রদান করুন (অর্থাৎ, রহমত বা করুণা করুন)।"[৩] চতুর্থ হিজরী শতকের অন্য ভাষাবিদ আল্লামা ইসমাঈল বিন হাম্মাদ আল জাওহারী (৩৯৮ হি) তাঁর প্রখ্যাত "আস সিহাহ" অভিধান গ্রন্থে লিখেছেন : "সালাত শব্দের অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা। আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাতের অর্থ : রহমত

বা করুণা। এছাড়া আগুনে পোড়ান বা ঝলসানকেও আরবীতে সালাত বলা হয়।"[১]

পরবর্তী সকল ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা উপরের কথাগুলিই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, সালাত শব্দের অর্থ রহমত ও বরকতের জন্য দু'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাতকে (নামায) সালাত নামকরণের কারণ এই ইবাদতের মূল আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, তাঁর করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত প্রদানের বা সালাত পাঠানর অর্থ রহমত, করুণা ও বরকত প্রদান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ﷺ-কে সালাত প্রদান বা সালাত প্রেরণের অর্থ তাঁকে রহমত প্রদান, সর্বোত্তম মর্যাদা ও প্রশংসা প্রদান। ফিরিশতারা কারো উপর সালাত প্রেরণ করেছেন অর্থ তাঁরা আল্লাহর কাছে উক্ত ব্যক্তির জন্য রহমতের, মর্যাদা ও ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করেছেন। কোনো মানুষ অন্যের উপর 'সালাত' প্রদান করেছে বা 'সালাত' প্রেরণ করেছে বলতে বুঝান হয় ঐ মানুষটি তাঁকে মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছে, তাঁর জন্য রহমত, ক্ষমা ও মর্যাদার দু'আ করেছে।[২]

(খ) কুরআন করীমে সালাত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহ স্মরণ (যিক্‌র) কর এবং প্রভাতে ও বিকালে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা (তাসবীহ) কর। তিনি তোমাদের উপর সালাত প্রদান করেন (তোমাদেরকে দয়া করেন, ক্ষমা করেন, তোমাদের প্রশংসা ছড়িয়ে দেন এবং তোমাদেরকে সম্মানিত করেন) এবং তাঁর ফিরেশতাগণও (তোমাদের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন)[৩]; যেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসেন। তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি করুণাশীল।"[৪]

এখানে আমরা দেখছি যে, আল্লাহ সকল বিশ্বাসীকে সালাত প্রদান করেন, অর্থাৎ তাঁর অফুরন্ত করুণা, ক্ষমা ও বরকত তাদেরকে দান করেন। আর তাঁর সম্মানিত ফিরিশতাগণ আল্লাহর কাছে বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য করুণা, ক্ষমা ও বরকত চেয়ে প্রার্থনা করেন। এ ছাড়া আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ বিশেষভাবে কোনো কোনো বিশ্বাসীর জন্য সালাতের উল্লেখ করেছেন। বিপদে আপদে যারা ধৈর্য ধারণ করেন তাদের বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে :

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

এ সকল মানুষদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেক 'সালাত'-সমূহ (অগণিত করুণা, ক্ষমা, বরকত ও সু-প্রসংসা[৫]) এবং রহমত এবং তাঁরাই সুপথপ্রাপ্ত।"[৬]

এখানে আমরা দেখছি বিশেষভাবে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ বিশেষ 'সালাত' প্রদান করেন। এছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-কেও মুমিনদের জন্য 'সালাত' প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"(হে রাসূল) আপনি তাঁদের (মুমিনদের) সম্পদ থেকে দান (যাকাত) গ্রহণ করুন, যা তাঁদেরকে পবিত্রতা, বরকত ও বৃদ্ধি প্রদান করবে এবং আপনি তাঁদের উপর 'সালাত' দান করুন (তাঁদের কল্যাণ, বরকত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য দু'আ করুন)। নিশ্চয় আপনার 'সালাত' তাঁদের জন্য রহমত, শান্তি ও তৃপ্তি।[৭] আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।"[৮]

সর্বোপরি, মহান আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর সালাত প্রদান করেন আর বিশ্বাসীদের দায়িত্ব তাঁর (নবীর) উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করা। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর উপর 'সালাত' প্রদান করেন (আল্লাহ তাঁর মহান নবীকে রহমত করেন, সর্বোত্তম মর্যাদা প্রদান করেন, বরকত দান করেন, তাঁর সুপ্রশংসা ও মর্যাদা বিশ্বাবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন, আর ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন)[৯]। হে বিশ্বসীগণ, তোমরা তাঁর উপর 'সালাত' ও 'সালাম' প্রেরণ কর।"[১০]

আল্লাহ বিশ্বাসীদের নির্দেশ দিলেন তাঁর প্রিয়তম রাসূলের উপর সালাত ও সালামের। কাউকে সালাম প্রদান করলে তাঁকে সম্মান প্রদান করা হয়। সাহাবীগণ আগে থেকেই রাসূলে আকরাম ﷺ কে সালাম দিয়ে আসছিলেন। সালাম প্রদানের ইসলামী পদ্ধতি তাঁদের সুপরিচিত : "আস-সালামু আলাইকুম ..."। কিন্তু তাঁকে তাঁরা কিভাবে "সালাত" জানাবেন? সালাত তো দু'আ করা। তিনিই তো তাঁদের জন্য

দু'আ করবেন, তাঁরা কিভাবে সৃষ্টির সেরা নবীদের নেতা মানব জাতির মুক্তির দূতকে দু'আ করবেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন সাহাবায়ে কেরাম। কিভাবে তাঁরা এই আয়াতের নির্দেশ পালন করবেন। অবশেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন।

যিক্‌র নং ৩১ : দরুদে ইবরাহীমী-১

হযরত কা'ব বিন আজুরা (রা) বলেন :

لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا

যখন উপরের আয়াতটি নাযিল হলো তখন সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর নবী, আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত প্রেরণ করব? তখন তিনি বললেন, তোমরা বলবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

অর্থ : "হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনের উপর সালাত প্রেরণ করুন যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহাসম্মানিত। এবং আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপরে এবং মুহাম্মাদরে পরিজনের উপরে যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপরে এবং ইবরাহীমের পরিজনের উপরে। নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহা সম্মানিত ।"[১]

যিক্‌র নং ৩২ : দরুদে ইবরাহীমী-২

বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত অন্য হাদীসে কা'ব (রা) বলেন :

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا

"রাসূলে আকরাম ﷺ-কে বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে সালাম দেওয়া তো আমরা জানি, কিভাবে সালাম দিতে হবে, কিন্তু আপনার উপর 'সালাত' আমরা কিভাবে প্রদান করব? তখন তিনি বললেন , তোমরা বলবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

অর্থঃ "হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনের উপর সালাত প্রেরণ করুন যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহা প্রশংসিত মহা সম্মানিত ।"[২]

এই হাদীসে (কামা সাল্লাইতা 'আলা- ইবরাহীমা) ও (কামা- বা-রাকতা 'আলা ইবরাহীমা) বাক্য দুটি নেই, সরাসরি (আল ইবরাহীমা) বলা হয়েছে।

হাদীস শরীফে আমরা দেখতে পাই আরো অনেক সাহাবীই এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে রাসূলে আকরাম ﷺ-এর কাছে সালাত প্রদানের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করেছেন।[৩] আর তিনি তাঁদের সকলকেই "দরুদে ইবরাহিমী" শিক্ষা দিয়েছেন। ভাষার ক্ষেত্রে এরূপ সামান্য কম-বেশি আছে।

আল্লামা ইবনুল আসীর মুবারাক বিন মুহাম্মাদ (৬০৬ হি) বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর প্রিয়তম নবীর (ﷺ) উপর সালাত প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু আমরা তো তাঁর মর্যাদা অনুধাবন করতে পারব না, তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্যও পুরো বুঝতে পারব না। তাই আমরা এ দায়িত্ব আবার মহান আল্লাহকেই দিলাম, আমরা বললাম : হে আল্লাহ আপনি তাঁর উপর সালাত প্রদান করুন, কারণ তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে আপনিই ভালো অবগত আছেন।" তিনি আরো বলেন : "আমরা যখন বলি : 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ', হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন, তার অর্থ : হে আল্লাহ, দুনিয়াতে তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠা করে, তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাঁর শরীয়তকে হেফাজত করে তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন এবং আখেরাতে তাঁর শাফা'আত কবুল করে, তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করে তাঁকে মর্যাদাময় করুন।"[৪]

(গ) হাদীস শরীফে সালাত ও সালাম

হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলে আকরাম (ﷺ)এর উপর সালাত পাঠ করা ও সালাম পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ ইবাদত ও অত্যন্ত বড় নেক কর্ম। বস্তুত সৃষ্টির সেরা, সকল যুগের সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু, হাবীব ও খলীল রাসূলে আকরাম ﷺ আজীবন কষ্ট করে আমাদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের শান্তি, মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পথ ইসলামকে মানব জাতির জন্য পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জন্য যে মানব সন্তান আল্লাহর কাছে মর্যাদা ও রহমতের প্রার্থনা না করবে, তাঁর উপর যে মানুষ সালাম না পাঠাবে সে মানুষ মানব জাতির কলঙ্ক। একজন মানুষের নূন্যতম প্রেরণা হওয়া উচিত যে,

সে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি ও শান্তির বার্তাবাহক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর উপর হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করবে, তাঁর শান্তি, মর্যাদা ও রহমতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু মানব সন্তানের দায়িত্ব তাঁর জন্য প্রার্থনা করা।

প্রথমত, সালত পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত

সালাত পাঠ করা আমাদের দায়িত্ব। তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন আমরা জীবন বিলিয়ে দিলেও তাঁর সামান্যতম প্রতিদান দিতে পারব না, কারণ আমরা হয়ত আমাদের পার্থিব সংক্ষিপ্ত জীবনটা বিলিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি তো আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক অনন্ত জীবনের সফলতার পথ দেখাতে তাঁর মহান জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাই মহানবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমাদের নূন্যতম দায়িত্ব যে আমরা সদা সর্বদা তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব, বা তাঁর জন্য সালাত পাঠ করব। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনের দয়া দেখুন, তাঁর হাবীবের প্রতি তাঁর সম্মান প্রদর্শনের একটি দিক এই যে, যদিও সালাত পাঠ আমাদের দায়িত্ব তবুও আল্লাহ এতে এতো খুশি হন যে এর জন্য অফুরন্ত পুরস্কার দান করেন।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠের বিভিন্ন প্রকাররের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম নিম্নের ৬ প্রকার পুরস্কার:

(১). আল্লাহ দয়া, ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

"তোমরা আমার উপর সালাত পাঠ কর ; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ১০ বার সালাত (রহমত) করবেন।"[১]

হযরত আবু বুরদা ইবনু নিয়ার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من صلى علي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات

"যদি কেউ অন্তর থেকে ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে একবার সালাত পাঠ করে, আল্লাহ সেই সালাতটির বিনিময়ে তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, ১০টি সাওয়াব লিখবেন এবং ১০টি গোনাহ ক্ষমা করবেন।"[২]

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ১০ বার সালাত (রহমত) করবেন, তাঁর ১০টি পাপ ক্ষমা করা হবে এবং তাঁর মর্যাদা ১০টি স্তর বাড়িয়ে দেওয়া হবে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩]

হযরত আবু তালহা (রা) বলেন, একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে দেখা গেল। তাঁর চেহারা মুবারকে আনন্দের ছাপ ছিল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আজ আপনি খুবই আনন্দচিত্ত। আপনার চেহারা মুবারাকে আনন্দের ছাপ রয়েছে। তিনি বললেন :

أَجَلْ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلاةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا

"হাঁ, আমার প্রভুর নিকট থেকে একদূত এসে আমাকে বলেছেন : আপনার উম্মতের কোনো ব্যক্তি যদি আপনার উপর সালাত পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তাঁর জন্য ১০টি সাওয়াব লিখবেন, তাঁর ১০ টি গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন, তাঁর জন্য দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তাঁর জন্য ঠিক অনুরূপ সালাত (রহমত ও মর্যাদা) ফিরিয়ে দেবেন।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৪]

হযরত আবু তালহা থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত চেহারায় আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম: আমরা আপনার চেহারা মোবারকে আনন্দ দেখতে পাচ্ছি? তিনি বললেন : আমার কাছে ফিরেশতা এসে বলেন , আপনার প্রভু বলেছেন –

أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"আপনি কি খুশি নন যে, যদি কেউ আপনার উপর ১ বার সালাত পাঠ করে তাহলে আমি তাঁর উপর ১০ বার সালাত (রহমত ও দয়া) দান করব। আর যদি কেউ আপনার উপর ১ বার সালাম জানায় আমি তাঁর উপর ১০ বার সালাম জানাই।"[৫]

আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা) বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে যান, আমিও তাঁকে অনুসরণ করি। তিনি একটি খেজুরের বাগানে প্রবেশ করেন এবং সাজদায় যান। তিনি সাজদা রত অবস্থায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন, ফলে আমি ভয় পেয়ে যাই এই ভেবে যে, সাজদা রত অবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল কিনা? এজন্য আমি কাছে এসে নজর করি। তিনি মাথা তুলে বলেন : আব্দুর রহমান, তোমার কী হয়েছে? তখন আমি আমার (মনের ভয়ের) কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন : জিবরাঈল আমাকে বললেন : আপনি কি এজন্য খুশি নন যে, আল্লাহ বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ

"আপনার উপর যে সালাত (দরুদ) পাঠাবে আমিও তার উপর সালাত (রহমত, বরকত) পাঠাব, আর যে আপনার উপর সালাম পাঠাবে আমি তার উপর সালাম পাঠাব।" (নবীজী বলেন :) " আর এ জন্য আমি শুকরানা সাজদা করি।"[১]

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে (আযান দিতে) শুনবে তখন সে যা যা বলবে তোমরাও তা বলবে, এরপর তোমরা আমার উপর সালাত পাঠ করবে ; কারণ যে আমার উপর সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাঁকে একটি সালাতের বিনিময়ে ১০ বার সালাত (রহমত, মর্যাদা, বরকত) প্রদান করবেন। এরপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা প্রার্থনা করবে ; ওসীলা জান্নাতের এমন একটি মর্যাদার স্থান যা শুধুমাত্র আল্লাহর একজন বান্দাই লাভ করবেন, আমি আশা করি আমিই তা লাভ করব। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে তাঁর জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হবে।"[২]

যিক্‌র নং ৩৩ : আরেকটি মাসনূন সালাত

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিন, 'আবদিকা ওয়া রাসূলিকা, ওয়া সাল্লি 'আলাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-ত, ওয়াল মুসলিমীন ওয়াল মুসলিমা-ত।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি সালাত প্রেরণ করুন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর, এবং সালাত প্রেরণ করুন সকল মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী, মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীর উপর।"

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন :

أيما رجل مسلم لم تكن عنده صدقة فليقل في دعائه ... فإنها (له) زكاة

"কোনো মুসলিমের কাছে যদি দান করার কিছুই না থাকে তাহলে তার উচিত দু'আর মধ্যে উপরিউক্ত কথাগুলি (সালাতটি) বলা উচিত, তাহলে এই সালাত তাঁর জন্য যাকাত স্বরূপ গণ্য হবে (সে দান করার সাওয়াব অর্জন করবে)।"

হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা থাকলেও, তা অনুধাবনযোগ্য এবং সাখাবী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[৩] আরো অনেক সাহাবা থেকে সহীহ সনদে সালাত পাঠের অপরিসীম অপরিমেয় পুরস্কারের বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

(২). ফিরিশতারা রহমত ও মর্যাদার জন্য দু'আ করবেন

সালাত পাঠের পুরস্কারের আরেকটি দিক , আল্লাহর সম্মানিত ফিরিশতাগণ সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করেন। হযরত আমির বিন রাবিয়া (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে খুতবায় বলতে শুনেছি যে :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ

"যে ব্যক্তি আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে, যতক্ষণ যে সালাত পাঠ করতে থাকবে ততক্ষণ ফিরেশতাগণ তাঁর জন্য সালাত (দু'আ) করতে থাকবেন, অতএব কোনো বান্দা চাইলে তা বেশি করে করুক অথবা কম করে করুক।" হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[৪]

অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ

"কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ তাঁর উপর সত্তর বার সালাত (রহমত ও দু'আ) করবেন, অতএব কোনো বান্দা চাইলে তা বেশি করে করুক অথবা কম করে করুক।" হাদীসটির সনদ হাসান[৫]

হাসান[১]

(৩). সালাত রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কাছে পৌছান হবে

সালাত পাঠের পুরস্কারের ৩য় দিক , সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছান হবে। অন্য কোনো পরলোকগত মানুষের জন্য দু'আ করা হলে তা আল্লাহ হয়ত কবুল করবেন এবং যার জন্য দু'আ করা হয়েছে তাকে বিনিময়ে মর্যাদা বা পুণ্য দান করবেন। কিন্তু তিনি হয়ত দু'আকারীর বিষয়ে বিস্তারিত জানবেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠকারীর সকল পুরস্কারের অতিরিক্ত আনন্দ এই যে, তাঁর নাম ও পরিচয়সহ তাঁর সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পৌছান হবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানি, যে কোনো মুসলিম দুনিয়ার যেখানেই থাক না কেন, দুনিয়ার যে প্রান্ত থেকেই সে সালাত পাঠ করুক না কেন, তাঁর সালাত মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর রওযা মুবারাকায় পৌছান হবে। উপরন্তু কোনো কোনো হাদীসে এরূপও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করবেন।

আউস বিন আউস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلام وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام

"তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন শুক্রবার। এদিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, এদিনেই সিংগা ফুক দেওয়া হবে, এদিনেই কিয়ামত হবে। কাজেই এই দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে সালাত পাঠ করবে, কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পেশ করা হবে।" সাহাবীগণ বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, মিশে যাবেন, কিভাবে তখন আমাদের সালাত আপনার নিকট পেশ করা হবে?" তিনি বলেন : "মহান আল্লাহ মাটির জন্য নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২]

অন্য একটি হাদীসে আবু হুরাইরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من صلى عليَّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليَّ من بعيد أعلمته

"কেউ আমার কবরের নিকট থেকে আমার উপর সালাত পাঠ করলে আমি শুনতে পাই। আর যদি কেউ দূর থেকে আমার উপর সালাত পাঠ করে তাহলে আমাকে জানান হয়।"[৩]

হাদীসটি সনদের দিক থেকে খুবই দুর্বল। তবে একাধিক সমার্থক বর্ণনার কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে সর্বাবস্থায় যে যেখানে অবস্থান করবে সেখানে থেকেই সালাত ও সালাম পাঠ করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন আর তাদের সালাত ও সালাম তাঁর দরবারে পৌছান হবে বলে তাদেরকে নিশ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রিয়তম নাতী ইমাম হুসাইন, আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী তাঁর থেকে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني

"তোমরা যেখানেই থাকনা কেন আমার উপর সালাত পাঠ কর, কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌছান হবে।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৫]

ইমাম হাসান বিন আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً، ولا تتخذوا بيتي عيداً، وصلوا عليَّ وسلموا، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أين ما كنتم

"তোমরা তোমাদের বাড়িতে বসেই সালাত প্রেরণ করবে, তোমাদের বাড়িগুলিকে কবর বানিয়ে ফেলবে না। আর আমার বাড়িকেও ঈদ (ঈদগাহ বা আনন্দ বা সমাবেশের স্থান) বানিয়ে ফেলবে না। তোমরা (তোমাদের বাড়িতেই) আমার উপর সালাত ও সালাম পাঠাও, কারণ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সালাত ও সালাম আমার কাছে পৌঁছে যায়।"[৬]

এই মর্মে অন্য হাদীসে আবু হুরাইরার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي

"তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানাবে না এবং তোমাদের বাড়িগুলিকে কবর বানাবে না, যেখানেই থাকনা কেন আমার উপর

সালাত পাঠ করবে; কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছে যাবে।"[১]

আল্লাহর কত দয়া! বিশ্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উম্মত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে, ক'জনের জন্যই বা সম্ভব হবে রওযা মুবারাকে গিয়ে সালাত ও সালাম পাঠের। তাই তাদের জন্য দিলেন অফুরন্ত নিয়ামত। নিজ ঘরে বসে উম্মত সালাম জানাবে, সালাত পাঠ করবে, আর আল্লাহর ফিরিশতাগণ তা রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর রওযা মুবারাকায় পৌঁছে দেবেন।

এভাবে বিভিন্ন সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা সালাত পাঠকারীর জন্য বিশেষ সুখবর পাচ্ছি যে, তার সালাত সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হয়। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সালাত পাঠকারীর নাম ও পরিচয়ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জানান হয়। আম্মর বিন ইয়াসির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إن الله وكل بقبْري ملكاً أعطاه الله أسماع الخلائق، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه: هذا فلان بن فلان قد صلى عليك

"মহান আল্লাহ আমার কবরে একজন ফিরিশতা নিয়োগ করছেন, যাকে সকল সৃষ্টির শ্রবণশক্তি প্রদান করা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যখনই কোনো ব্যক্তি আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে তখনই ঐ ফিরিশতা আমাকে সালাত (দরুদ) পাঠকারীর নাম ও তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করে আমাকে তাঁর সালাত (দরুদ) পৌঁছে দিয়ে বলবে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর সালাত (দরুদ) প্রেরণ করেছে।"

হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে। তবে এই অর্থে আরো কয়েকটি দুর্বল সনদের হাদীস আল্লামা সাখাবী তাঁর সালাত বিষয়ক বই "আল-ক্বাওলুল বাদীয়"[২] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যে সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় সালাত পাঠকারীর সালাত যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পেশ করা হয় তখন সালাত পাঠকারীর নাম ও পিতার নামসহ তার পরিচয় তাঁর দরবারে পেশ করা হয়। একই বিষয়ে কয়েকটি দুর্বল বা যয়ীফ হাদীস বর্ণিত হলে বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, যাকে মুহাদ্দিসগণ 'হাসান লিগাইরিহী' বলেন। এ হাদীসটিও এভাবে 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য।[৩]

আমরা অন্যান্য সহীহ হাদীসের আলোকে জেনেছি যে, আমাদের সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পৌঁছান হয়। পরের হাদীসগুলির আলোকে আমরা আরো আশা করছি যে, আমাদের সালাত তাঁর দরবারে পৌঁছানর সময় আমাদের ও আমাদের পিতাদের নামও তাঁর মুবারক দরবারে উচ্চারিত হয়। আমাদের জন্য এর চেয়ে গৌরবের ও আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে?

(৪). রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করবেন

কিন্তু প্রিয় পাঠক, এর চেয়েও আনন্দের বিষয় আপনাকে জানাচ্ছি। আনাস বিন মালিক (রা) বলেছেন , রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من صلى علي صلاة صليت عليه عشرا، وفي لفظ: بلغتني صلاته وصليت عليه

"কেউ আমার উপর একবার সালাত (দরুদ) প্রেরণ করলে আমি তাঁর উপর ১০ বার সালাত (দু'আ) করি। দ্বিতীয় বর্ণনায় : কেউ আমার উপর সালাত প্রেরণ করলে তা আমার কাছে পৌঁছান হয় এবং আমি তাঁর উপর সালাত প্রেরণ করি।" হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[৪]

সম্মানিত পাঠক, সালাত পাঠকারীর জন্য এর চেয়ে খুশির খবর আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্য দু'আ করবেন। শুধু তাই নয় একবর দরুদের জন্য তিনি ১০ বার দু'আ করবেন। সুব'হা-নাল্লাহ ! কত বড় পুরস্কার!!

(৫). রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফায়াত লাভের ওসীলা

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, সালাত পাঠকারীর জন্য আখেরাতের মুক্তি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফায়াত ও জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। হযরত আবু দারদা (রা) বলেছেন , রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من صلى علي حين يصبح عشرا، وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة

"যে ব্যক্তি সকালে আমার উপর ১০ বার সালাত (দরুদ) পাঠ করবে এবং সন্ধ্যায় ১০ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভের সৌভাগ্য তাঁর হবে।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৫]

যিক্র নং ৩৪ : আরেকটি মাসনূন সালাত

اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, স্বাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিন, ওয়া আনযিলহুল মাক্ব'আদাল মুক্বার্‌রাবা 'ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ।

অর্থ : "হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত (দরুদ) প্রেরণ করুন এবং তাঁকে কিয়ামতের দিন আপনার নৈকট্যপ্রাপ্ত অবস্থানে অবতীর্ণ করুন।"

রুআইফি বিন সাবিত আনসারী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من قال ... وَجَـبَـتْ لَـهُ شَـفَـاعَـتِـي

"যে ব্যক্তি উপরের কথাগুলি (সালাতটি) বলবে, তার জন্য আমার শাফায়াত পাওনা হবে। হাদীসটির সনদে একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন, তবে আল্লামা হায়সামী ও মুনযিরী হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[১]

এই অর্থে অন্য হাদীসে ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَوْلَى النَّاسِ بِـــي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْـــثَــرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً

"কিয়ামতের দিন মানুষদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী (আমার শাফায়তের সবচেয়ে বেশি হকদার) হবে, যে সবচেয়ে বেশি আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করে।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে। তবে এই অর্থের অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে হাদীসটি হাসান বলে গণ্য। এই অর্থে হযরত আবু উমামা (রা) থেকে কিছুটা দুর্বল সনদে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২]

অন্য একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বলা হয়েছে :

من صلى عليَّ في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة

"যদি কেউ দিনে ১ হাজার বার আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করে তাহলে জান্নাতে তাঁর অবস্থান স্থল না দেখে তাঁর মৃত্যু হবে না (মৃত্যুর পূর্বেই তার জান্নাতের ঘর দেখার সৌভাগ্য হবে)।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৩]

অন্য হাদীসে সামুরা বিন জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

رأيت البارحة عجباً، رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانـــاً، فجاءته صلاته عليَّ فأقامته على قدميه وأنقذته

"আমি গত রাতে একটি অদ্ভুৎ স্বপ্ন দেখলাম (তাঁর স্বপ্নও ওহী), আমি দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি সিরাতের (পুলসিরাতের) উপর বুকে হেটে চলেছে, কখনো বা হামাগুড়ি দিচ্ছে, কখনো বা ঝুলে পড়ছে (অর্থাৎ, সে পুলসিরাত পার হতে পারছে না, খুবই কষ্ট হচ্ছে) এমতাবস্থায় আমার উপর পাঠকৃত তার সালাত এসে তাকে সোজাভাবে সিরাতের উপর সোজা দু'পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল এবং তাকে উদ্ধার করল।"

ইবনুল কাইয়েম ও সাখাবীর আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসটির সনদে দুর্বলতা থাকলেও তা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বা আলোচনাযোগ্য।[৪]

(৬). আল্লাহ সকল সমস্যা ও দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন

হযরত উবাই বিন কাব (রা) বলেছেন : রাতের তিনভাগের দুইভাগ অতিক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বলতেন : হে মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর যিক্র কর, আল্লাহকে স্মরণ কর, কিয়ামত এসে গেছে! কিয়ামত এসে গেছে! মৃত্যু তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে এসে উপস্থিত! মৃত্যু তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে এসে উপস্থিত! আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার উপর অনেক সালাত (দরুদ) পাঠ করি, আমি (আমার সকল দু'আ প্রার্থনার) কী পরিমাণ অংশ আপনার সালাত (দরুদ) হিসাবে নির্ধারিত করব? তিনি বললেন : তোমার যা ইচ্ছা হয়। আমি বললাম : এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন : তোমার যা ইচ্ছা, তবে যদি আরো বেশি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম : অর্ধেক ? তিনি বললেন : তোমার যা ইচ্ছা, তবে যদি আরো বেশি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম : দুই তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : তোমার যা ইচ্ছা, তবে যদি আরো বেশি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম : আমার সকল প্রার্থনা ও দু'আ আপনার (সালাত পাঠের) জন্যই নির্ধারিত করব। তখন তিনি বললেন :

إِذًا تُــكْــفَى هَــمَّــكَ وَيُــغْــفَــرُ لَــكَ ذَنْــبُــكَ

"তাহলে তোমার সকল চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করা হবে এবং তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে।" হাদীসটি সহীহ।[৫]

হযরত হাব্বান বিন মুনকিয (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি বলে : হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার সালাতের (দু'আর) এক তৃতীয়াংশ আপনার (সালাত পাঠের) জন্য নির্ধারণ করব কি ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হাঁ, যদি চাও। লোকটি বলল : দুই তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : হাঁ, যদি চাও। লোকটি বলল : আমার সকল সালাত (দু'আ) আপনার জন্য নির্ধারিত করি ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

إذنْ يكــيفــيك الله ما أهــمك من أمر دنياك وآخــرتك

"তাহলে আল্লাহ তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাবেন (সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন)।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৬]

একজন মুসলিম যত পাপীই হোন না কেন, তার পার্থিব বা পারলৌকিত যে কোনো সমস্যা, যে কোনো বিপদ-আপদ, যে কোনো বেদনা ব্যথায় তিনি আল্লাহর দরবারে আকুতি জানান, প্রার্থনা করেন। আল্লাহর রহমতই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। শত

পাপের বোঝা মাথায় নিয়েও আমরা আশা করি মহান প্রভু আল্লাহ দয়া করে আমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন এবং আমাদের সকল সমস্যা মিটিয়ে দিবেন, আমাদের বেদনা দূর করবেন এবং আমাদের আনন্দ স্থায়ী করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর সালাত পাঠ আমাদের প্রার্থনা কবুল হওয়ার অন্যতম ওসীলা। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রা) বলেন : আমি সালাত আদায় করছিলাম, আর নবীয়ে আকরাম ﷺ, আবু বকর ও উমার তাঁর সাথে ছিলেন। আমি যখন (সালাতের তাশাহহুদের বৈঠকে) বসলাম তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণ বর্ণনা করলাম, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ করলাম এবং এরপর আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করলাম। তখন নবীয়ে রাহমাত ﷺ বললেন :

سَـلْ تُـعْـطَـهْ سَـلْ تُـعْـطَـهْ

"এখন প্রর্থনা কর, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে, তুমি প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থিত বস্তু দেওয়া হবে।" ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।[১]

দু'আর আগে দুরুদ শরীফ পাঠে উৎসাহ প্রদান করে এবং সালাত পাঠকে দু'আ কবুলের অন্যতম ওসীলা হিসাবে বর্ণনা করে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দু'আর শেষে সালাত পাঠের বিষয়ে আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كل دعاء محجتوب حتى يصلى على النبي ﷺ

"সকল দু'আ পর্দার আড়ালে থাকবে (আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না) যতক্ষণ না নবীর উপর (ﷺ) সালাত পাঠ না করবে।" হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। সম্মিলিতভাবে হাদীসটি হাসান।[২] হযরত উমার (রা) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩]

দ্বিতীয় শতাব্দীর তাবে-তাবেয়ী মুহাদ্দিস আবু সুলাইমান আব্দুর রাহমান বিন সুলাইমান আদ দারানী (মৃত্যু ১৯৭ হি) বলেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার কোনো হাজত পেশ করতে চায়, বা কোনো প্রার্থনা করতে চায় তার উচিৎ, সে যেন দু'আর শুরুতে নবীয়ে রাহমাতের (ﷺ) উপর সালাত পাঠ করে দু'আ শুরু করে, এরপর তাঁর প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে পেশ করে এবং শেষে পুনরায় সালাত পাঠের মাধ্যমে তার দু'আ শেষ করে। কারণ নবীজীর (ﷺ) উপর সালাত আল্লাহ কবুল করবেন, আর আশা করা যায়, আল্লাহ সালাতের মধ্যবর্তী প্রার্থনাও দয়া করে কবুল করে নেবেন।"[৪]

দ্বিতীয়ত, সালাম পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত

সালাত বা 'দরুদ' ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমাদের আরেকটি কর্তব্য তাঁর প্রতি সালাম জানান। আল্লাহ কুরআন করীমে সালাত ও সালাম একসাথে উল্লেখ করেছেন। আমরাও সাধারণত সালাত ও সালাম একত্রে পড়ে থাকি। উপরে আলোচিত একাধিক হাদীসে সালাতের সাথে সালামের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হাদীসে দেখেছি যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের সম্মানে বলেছেন যে, " যদি কেউ আপনার উপর ১ বার সালাত পাঠ করে তবে আমি তাঁর উপর ১০ বার সালাত (রহমত ও দয়া) দান করব। আর যদি কেউ ১ বার আপনার উপর সালাম জানায় আমি তাঁর উপর ১০ বার সালাম জানাই।" অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلامَ

"আল্লাহর কিছু ফিরিশতা আছেন যারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ান, আমার উম্মতের সালাম তাঁরা আমার কাছে পৌঁছে দেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫]

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন , রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ

"যখনই কেউ আমাকে সালাম করে তখনই আল্লাহ আমার রূহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যেন আমি তার সালামের প্রতিউত্তর দিতে পারি।"[৬]

তৃতীয়ত, সালাত না পড়ার পরিণতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর সালাত পাঠ করা আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনকারীর জন্য রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত প্রেরণে অবহেলাকারী নিঃসন্দেহে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ মানুষ। বিশেষ করে তার কাছে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা স্মরণ করা হয়, কেউ তার কাছে তাঁর নাম উচ্চারণ করে, বা কোনোভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামটি তার কানে প্রবেশ করে, তা সত্তেও সে তাঁর জন্য সালাত পড়ে না তার চেয়ে অকৃতজ্ঞ আর কে হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত আমাদের সর্বদা পাঠ করা উচিৎ। হয়তবা কেউ পার্থিব ব্যস্ততায় তা ভুলে যেতে পারে। কিন্তু যদি কোনো প্রকারে তাঁর নামটি কানে আসে, বা তাঁর কথা মনে আসে তাহলে একজন মুসলমানের হৃদয়ে তাঁর প্রতি যে ভালবাসা থাকা অত্যাবশ্যক সেই ভালবাসার নূন্যতম দাবি যে, সে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সকল ভালবাসা দিয়ে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ কাছে দু'আ করবে, তাঁর জন্য সালাত প্রেরণ করবে। যার হৃদয়ে

এতটুকু ভালবাসাও নেই তাকে অকৃতজ্ঞ অপূর্ণ মুমিন বলা ছাড়া উপায় নেই। হাদীস শরীফে তাকে 'কৃপণ' বলা হয়েছে।

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

"কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার নিকট আমার উল্লেখ করা হলেও সে আমার উপর সালাত পাঠ করল না।" তিরমিযী ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১]

এ ধরনের মানুষ শুধু কৃপণই নয়, সে আল্লাহর রহমত থেকেও বঞ্চিত। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

"পোড়া কপাল হতভাগা ঐ ব্যক্তির, যার কাছে আমার কথা স্মরণ করা হলো অথচ আমার উপর সালাত (দরুদ) পড়ল না।"[২]

অন্য হাদীসে কা'ব বিন আজুরাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে উঠার সময় ৩ বার 'আমীন' বলেন। পরে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কারণ উল্লেখ করেন। একটি কারণ তিনি বলেন : "জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন – যার নিকট আপনার নাম নেওয়া হলো অথচ আপনার উপর সালাত পড়ল না সে (আল্লাহর রহমত থেকে) দূরে হয়ে যাক ! আমি (তাঁর এই বদ্দু'আয় শরীক হয়ে) বললাম : আমীন।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

আরেকটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إن جبريل أتاني فقال: ... ومن ذُكِرْتَ عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت : آمين

"জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে বললেন, ... এবং যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার উপর সালাত পাঠ করল না, ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল তাকে যেন আল্লাহ (তাঁর রহমত থেকে) দূর করে দেন", আপনি 'আমীন' বলুন, তখন আমি 'আমীন' বললাম।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৪]

অন্য হাদীসে ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من ذُكِرتُ عنده فخَطِئَ الصلاة عليَّ خطئ طريق الجنة

"যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আমার উপর সালাত (দরুদ) পড়তে ভুলে গেল, সে জান্নাতের পথ ভুলে গেল।"[৫] হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং হাসান বা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের।[৬]

একজন মুসলিমের ঈমানের দাবি যে, তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও সে আল্লাহকে এবং তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভুলে যাবে না। আমাদের সকল কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা দেন দরবারের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের উচিৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা স্মরণ করা। এমন কখনো হওয়া উচিৎ নয় যে, আমরা অনেক সময় ধরে কথাবার্তা বলছি, গল্প করছি অথচ মাঝে মাঝে দু'একবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা আমাদের মনে আসছে না। এটি হৃদয়ের খুবই দুঃখজনক অবস্থা। যদি কিছু মানুষ একত্রে বসে যে কোনো বিষয়ে কথাবার্তা বলেন কিন্তু পুরা মজলিসে একবারও আল্লাহর স্মরণ না করেন তাহলে তাদের এই মাজলিসটি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দুঃখ ও বেদনার কারণ হবে। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ

"যখন কিছু মানুষ একটি মাজলিসে বসে, কিন্তু সেই মাজলিসে তারা আল্লাহর স্মরণ করে না এবং তাদের নবীর (ﷺ) উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করে না তাহলে এই মজলিসটি তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিবেন, আর ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমা করবেন।"

অন্য বর্ণনায় :

إِلا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ

"তারা জান্নাতে গেলেও উক্ত মাজলিস তাদের দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে, কারণ যে সাওয়াব থেকে তারা বঞ্চিত হবেন তার জন্য তারা দুঃখ ও আফসোস করবেন।"[৭]

যিক্র বিহীন, সালাত বিহীন মজলিস দুর্গন্ধময় মজলিস। যে কোনো সময়ে যে কোনো কাজে যে কোনো কথায় একাধিক মুসলমান একত্রিত হলে তাদের দায়িত্ব যে কয় মিনিটের মাজলিসই হোক না কেন, মাজলিসে অন্তত ২/১ বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা

মনে করে তাঁর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করা। তা না হলে তাদের মজলিসটা হবে দুনিয়ার জঘন্যতম দুর্গন্ধময় মজলিস, যে দুর্গন্ধ যার হৃদয় আছে সেই অনুভব করবে। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما اجـتـمع قوم، ثم تـفـرقوا عن غـير ذكـر الله وصلاة على النبي ﷺ إلا قاموا عـن أنـتـن جـيـفـة

"যদি কিছু মানুষ একত্রিত হন, এরপর তারা আল্লাহর যিক্‌র ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ না করেই মাজলিস ভেঙ্গে চলে যান, তারা যেন পঁচা, দুর্গন্ধময় নিকৃষ্টতম মৃতলাশ ভক্ষণ করে উঠে গেলেন।" অন্য বর্ণনায় : "যদি কিছু মানুষ একটি মজলিসে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ না করেই মাজলিস ভেঙ্গে চলে যায় তাহলে তারা যেন জঘন্যতম দুর্গন্ধময় পঁচা মৃতদেহ থেকে উঠে গেল।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[১]

৯.আল্লাহর কালাম পাঠের যিক্‌র

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, কুরআনের নামই 'যিক্‌র'। সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর যিক্‌র কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা, কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করা, কুরআন শিক্ষা করা, কুরআন শিক্ষা দান করা, কুরআনের আলোচনা করা ও সর্বোপরি কুরআনের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা – এগুলি সবই যিক্‌র। শুধু তাই নয়। এগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র।

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সর্বশ্রেষ্ট যিক্‌র: 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'সুব'হানাল্লাহ', ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, এ সকল যিক্‌রের শ্রেষ্ঠত্ব কুরআনের পরে। কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। বাকি যিক্‌রের শ্রেষ্ঠত্বের কারণও কুরআনের অংশ হওয়া।

হযরত সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন :

أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهى من القرآن، لا يضـرك بـأيهن بـدأت: سـبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر

"কুরআনের পরে সর্বোত্তম বাক্য চারটি , এই বাক্যগুলিও কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। তুমি চারটির যে বাক্যই প্রথমে বল কোনো ক্ষতি নেই : 'সুব'হানাল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহ', 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার'।[২]

(ক) কুরআনী যিক্‌রের বিশেষ ফযীলত

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কুরআনই শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র। অন্যান্য যিক্‌রের শ্রেষ্ঠত্বের কারণও কুরআনের অংশ হওয়া। অনেক হাদীসে কুরআন কেন্দিক যিক্‌রের মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদীসে হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن

"আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে (আল্লাহর নৈকট্য পেতে) তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে তার চেয়ে, অর্থাৎ কুরআনের চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই।" হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৩]

হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما تقـرب العباد إلى الله بمـثـل ما خـرج منه يعني القرآن

"বান্দাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়েত অর্জনের জন্য তাঁর থেকে যা বেরিয়ে এসেছে সেই কুরআনের মতো আর কিছুই নেই।" তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন আবার সনদের কিছু দুর্বলতাও বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী গবেষকগণ হাদীসটির সনদকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুজুর্গ একবাক্যে বলেছেন যে, সকল যিক্‌রের শ্রেষ্ঠ যিক্‌র কুরআন তিলাওয়াত।[৫] তাবে তাবেয়ী সুফিয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১ হি)বলেন :

أفـضـل الذكـر تلاوة القرآن في الصلاة ثم تلاوة القرآن في غير الصـلاة ثـم الصـوم ثـم الذكـر

"সর্বোত্তম যিক্‌র সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত, এরপর সালাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত। এরপর সিয়াম। এরপরে অন্যান্য যিক্‌র।"[৬]

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন:

من شغله القرآن [قراءة القرآن] عن ذكري ومسئلتي أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضـل

القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه

"যাকে কুরআন তিলাওয়াত বা কুরআন চর্চা আমার যিক্‌র থেকে ও আমার কাছে প্রার্থনা করা থেকে ব্যস্ত রাখে তাঁকে আমি প্রার্থনাকারীদেরকে যা প্রদান করি তার সর্বোত্তম সাওয়াব প্রদান করি। সকল কথার উপর কুরআনের মর্যাদা ঠিক অনুরূপ যেমন সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর মর্যাদা।" হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে বলে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন।[১]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুবারাকপূরী বলেন: "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকার ফলে অন্যান্য যিক্‌র ও দু'আ করতে সময় পায় না আল্লাহ তাঁকে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দেন। প্রার্থনাকারীদের প্রয়োজন ও মনোবাঞ্ছনা যেভাবে পূরণ করেন তার চেয়ে বেশি ও উত্তমভাবে তাঁর প্রয়োজন তিনি মিটিয়ে দেন। হাদীসের শেষ বাক্য দ্বারা উপরের বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেহেতু কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র ও সর্বোত্তম দু'আ, তাই কুরআনে মাশগুল বান্দার পুরস্কারও সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।[২]

(খ) কুরআন শিক্ষার ফযীলত

কুরআন তিলাওয়াত, চর্চা, গবেষণা, কুরআনের অর্থ চিন্তা করা, অনুধাবন করা, শিক্ষা, শেখান ইত্যাদি সবই যিক্‌র ও সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন, আলোচনা, শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি কাজে রত থাকেন তাহলে স্বভাবতই তিনি উপরের হাদীসসমূহে বর্ণিত যিক্‌রের ফযীলতসূমহ অর্জন করবেন এবং সর্বোত্তম পর্যায়ে অর্জন করবেন। এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে কুরআন কেন্দ্রিক যিক্‌রসমূহের অতিরিক্ত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি। কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দানের ফযীলতের বিষয়ে আবু হুরারইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দান করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"[৩]

উকবা ইনু আমের (রা) বলেন : আমরা মসজিদে নববী সংলগ্ন সুফফাতে বসে ছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাছে এসে বললেন : তোমাদের মধ্যে কেউ কি চায় যে, প্রতিদিন মদীনার উপকণ্ঠে আকীক প্রান্তরে যেয়ে কোনো পাপে, অন্যায়ে, আত্মীয়স্বজনের ক্ষতিতে লিপ্ত না হয়ে দুটি বিশাল উঁচু চুট ওয়ালী উটনী নিয়ে ফিরে আসবে? আমরা বললাম : আমরা প্রত্যেকেই তা পছন্দ করি। তিনি বলেন :

أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل

"তোমরা কেন মসজিদে যেয়ে আল্লাহর কেতাবের দুটি আয়াত শিক্ষা করছ না বা পাঠ করছ না? কারণ কুরআনের দুটি আয়াত শিক্ষা করা দুটি অনুরূপ উষ্ট্রীর চেয়ে উত্তম। তিনটি তিনটির চেয়ে ও চারটি চারটির চেয়ে উত্তম।"[৪]

হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي ألف ركعة

"হে আবু যার, (মসজিদে বা কোথাও) যেয়ে কুরআন করীমের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য ১০০ (একশত) রাক'আত সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। (মসজিদে বা কোথাও) যেয়ে ইল্‌মের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমরা জন্য ১০০০ (একহাজার) রাক'আত সালাত আদায় করা থেকে উত্তম।" হাফিয মুনযিরী হাদীসটির সনদ হাসান বলেছেন। কেউ কেউ সনদের দুর্বলতা দেখিয়েছেন।[৫]

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, এ সকল হাদীসে কুরআন শিক্ষা বলতে কুরআন বুঝা, অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ও তার বিধানাবলী শিক্ষা করা বুঝান হয়েছে। আমরা আজ ইসলামের মূল প্রেরণা, অনুভূতি ও শিক্ষা থেকে শত যোজন দূরে সরে এসেছি। একদিন আমার এক বাংলাদেশী বন্ধুকে এক মিশরীয় বন্ধুর সাথে পরিচয় করে দিয়ে বললাম : আমার বন্ধু হাফিজ অমুক। মিশরীয় বন্ধু বললেন : তাই! হাফিজ!! একলক্ষ হাদীস মুখস্থ আছে? আমি বললাম : না, না, তা নয়। হাফিযে কুরআন। কুরআন মুখস্থ আছে। মিশরীয় বন্ধু বললেন : মুসলিম উম্মাহর আগের দিনে প্রত্যেক আলিম, বরং সকল শিক্ষার্থিই কুরআন মুখস্থ করতেন। কুরআন মুখস্থকারীকে বিশেষভাবে কখনো হাফিজ বলা হতো না। সকলেই তো কুরআন মুখস্থ করেছেন, কাজেই কে কাকে হাফিজ বলবেন। লক্ষাধিক হাদীস মুখস্থ করতে পারলে তাকে হাফিজ বলা হতো। এখন আর কেউ হাদীস মুখস্থ করতে পারি না। অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলিম বরং অধিকাংশ আলিম হাফিজ নন। এজন্য কুরআনের হাফিজকেই হাফিজ বলা হচ্ছে। হয়ত এমন দিন আসবে, যেদিন একপারা কুরআন মুখস্থ করলেই তাকে সসম্মানে হাফিজ বলা হবে !

কুরআন শিক্ষা, তিলাওয়াত, শোনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশে এবং সাহাবী-তাবেয়ীগণের ভাষায় ও কর্মে এগুলি সবই ছিল অর্থ বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা ও জীবনকে সে অনুসারে পরিচালিত করার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমরা কুরআন শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র না বুঝে দেখে দেখে উচ্চারণ শিক্ষাকেই বুঝি। এর চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করি না।

আমরা জানি যে, সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের ভাষা ছিল আরবী। আরবী ভাষা বুঝার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সকলের শীর্ষে। তা

সত্ত্বেও তাঁরা কুরআনের ৫/১০ টি আয়াতের বেশি একবারে শিখতেন না। ৫/১০টি আয়াত শিখে, সেগুলির অর্থ, ব্যাখ্যা, নির্দেশনা ও কিভাবে তা পালন করতে হবে সবকিছু না শিখে পরবর্তী আয়াত তাঁরা শুরু করতেন না। এমনকি অনেক সাহাবী ১০/১২ বৎসর ধরে একটি সূরা শিক্ষা করেছেন। অর্থ না বুঝে এবং আমল না করে শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াত করাকে তাঁরা অন্যায় বলে জেনেছেন। বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ যাঁরা আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন তাঁরা বলেছেন :

إنهم كانوا يأخذون من رسول الله ﷺ عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قال فيعلمنا العلم والعمل

"তাঁরা যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন সেই দশটি আয়াতের মধ্যে যা কিছু ইল্ম ও আমল আছে সব না শিখে পরবর্তী দশ আয়াত শেখা শুরু করতেন না।"[১]

ইবনু মাস'ঊদ, উবাই ইবনু কা'ব, উসমান (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে দশ আয়াত শিক্ষা দিতেন। তাঁরা এই দশ আয়াতের মধ্যে যত প্রকার আমল আছে সব না শিখে পরবর্তী আয়াত শিখতে শুরু করতেন না। এভাবে তিনি তাঁদেরকে কুরআন ও আমল একত্রে শিক্ষা দান করতেন।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) আট বৎসর ধরে সূরা বাকারাহ শিক্ষা করেছেন। উমার (রা) বার বৎসর ধরে সূরা বাকারাহ শিক্ষা করেন। যেদিন তাঁর সূরা বাকার শিক্ষা সমাপ্ত হয় সেদিন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া জানাতে একটি উট জবাই করে খাওয়ান।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, "আমাদের যুগের মানুষেরা কুরআন শিক্ষার পূর্বে ঈমান অর্জন করতেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর কুরআনের কোনো সূরা নাযিল হলে সে সময়ের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেই সূরার আহকাম, হালাল, হারাম, কোথায় থামতে হবে, ইত্যাদি সবকিছু শিখে নিতেন। এরপর এমন মানুষদের দেখছি, যাঁরা ঈমানের আগেই কুরআন শিখছে। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে জানে না কুরআন তাকে কি নির্দেশ প্রদান করছে, কি থেকে নিষেধ করছে এবং কোথায় তাকে থামতে হবে। এরা কুরআনকে শুধু দ্রুত পড়ে যায় যেমন করে বাজে খেজুর ছিটিয়ে দেওয়া হয় তেমনভাবে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণ যারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ তাঁদের অনেকেই কুরআন করীমের দুই-একটি সূরা মাত্র জানতেন। তবে তাঁরা কুরআন অনুসারে জীবন পরিচালনার তাওফীক পেয়েছিলেন। আর এই উম্মতের শেষ জামানার মানুষেরা ছোট, বড়, অন্ধ সকলেই কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন অনুসারে কর্ম করতে পারবে না।[৫]

হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন :

اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا

"তোমরা যা ইচ্ছা যত ইচ্ছা ইল্ম অর্জন কর। কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা ইল্মকে আমলে পরিণত করবে বা ইল্ম অনুসারে জীবন পরিচালনা করবে ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো পুরস্কার বা সাওয়াব প্রদান করবেন না।[৬]

প্রিয় পাঠক, কুরআন শিক্ষার এই মহান মর্যাদা ও সাওয়াব যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমে এই কুরআনের মর্যাদা হৃদয়পটে আঁকতে হবে। আমরা যদি উপরের হাদীসগুলিকে সত্যিকারের ঈমান নিয়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্যিকার অর্থে আল-আমীন, আস-সাদেক, মহাসত্যবাদী হিসাবে অবচেতন মনের গভীরে সুদৃঢ় বিশ্বাসে মেনে নিয়ে তাঁর উপর্যুক্ত বাণীগুলিকে হৃদয়ের পটে এঁকে রাখতে পারি তাহলেই আমরা পরবর্তী নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিতে পারব।

প্রথম পদক্ষেপ : প্রথম পদক্ষেপ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা। আমাদের দেশের হাজার হাজার ধার্মিক নেককার মানুষ আছেন যারা জীবনের মধ্যপ্রান্তে বা শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। তারা দীর্ঘদিন বিভিন্ন দরবার, বুজুর্গ, ইসলামী দল বা গ্রুপের সাথে সংযুক্ত আছেন। হয়ত তারা নিজেদেরকে যাকির মনে করেন। কিন্তু তারা কুরআনের একটি সূরাও বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারেন না। তারা দেখে কুরআন পড়তেও পারেন না। কি দুর্ভাগ্য আমাদের !!

আমরা প্রতিদিন, প্রতিমাসে ও প্রতি বছর শত শত ঘণ্টা সময় গল্প গুজব করে, খবর পড়ে শুনে বা আলোচনা করে, গীবত ও পরচর্চা করে, খেলাধুলা করে বা দেখে নষ্ট করি। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করার সময় পাই না। বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিখতে বড়জোর ২/৩ মাস নিয়মিত প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক ব্যয় করলেই সম্ভব। আমরা অনেকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় অনেক সময় সুন্নাত-সম্মত বা খেলাফে সুন্নাত যিক্র আযকার করে কাটাই। অথচ এ সকল যিক্রের চেয়ে বড় যিক্র মুমিনের জীবনের অন্যতম নূর কুরআন করীম তিলাওয়াত শিক্ষা করি না। আল্লাহর কালামের প্রতি এই চরম অবহেলা করছেন আল্লাহর যাকিরগণ! আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে আহলে কুরআন হওয়ার তাওফীক দান করেন ; আমীন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : কুরআন বুঝার মতো আরবী ভাষা শেখা। আমি অনেক নও মুসলিমকে দেখেছি তাঁরা ইসলাম গ্রহণের পরে অতি আগ্রহের সাথে শত ব্যস্ততার মধ্যেও বিভিন্ন বই পুস্তক বা কোর্সের মাধ্যমে আরবী শিক্ষা করেন এবং কিছু সময়ের মধ্যেই কুরআন

বুঝার মতো চলনসই আরবী শিখে ফেলেন। আসলে বিষয়টি ভালবাসা ও গুরুত্ব প্রদানের উপর নির্ভর করে।

তৃতীয় পদক্ষেপ : আরবী ভাষা শিক্ষা করা সম্ভব না হলে অন্তত কুরআন কারীমের এক বা একাধিক অনুবাদ গ্রন্থ বা বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় তাফসীর গ্রন্থ সংগ্রহ করে নিয়মিত তিলাওয়াতের সাথে সাথে নিয়মিত অর্থ পাঠ করা। এভাবে আমরা অন্তত মূল না বুঝলেও অনুবাদের মাধ্যমে কুরআনের আলোয় নিজেদের আলোকিত করতে পারব। হয়ত আমরা এভাবে কুরআনের সাথী আল্লাহর পরিজন হয়ে যেতে পারব। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আমি এমন অনেক ভাইকে চিনি যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বা অতি অল্প শিক্ষিত। আরবী মোটেও জানেন না। কিন্তু নিয়মিত কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পাঠের ফলে তাদের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, কুরআন কারীমের যে কোনো স্থান থেকে তিলাওয়াত করলে তার অর্থ অনুধাবন করতে পারেন। শাব্দিক অর্থ বুঝেন না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সেই আয়াতগুলিতে কি বলা হয়েছে তা বুঝতে পারেন।

বিশেষ সাবধানতা : আমরা সাধারণত আল্লাহর কিতাবের জন্য এত পরিশ্রম! করার সময় পাই না। এত আগ্রহও আমাদের নেই। কিন্তু যদি কেউ সেই তাওফীক পান, তবে শয়তান অন্য পথে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করে। শয়তান তার মধ্যে অহঙ্কার প্রবেশ করায়। তিনি মনে করতে থাকেন যে, তিনি একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, তিনি সমাজের অন্য অনেকের চেয়ে ইসলাম ভাল জানেন, সমাজের আলিমগণ কুরআন বুঝেন না, আলিমরাই ইসলাম নষ্ট করলেন, ইত্যাদি।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, সকল প্রকারের অহঙ্কারই কঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ। সবচেয়ে খারাপ অহঙ্কার জ্ঞান বা ধার্মিকতার অহঙ্কার। বস্তুত মুমিন কুরআন পাঠ করেন ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি পালন করেন একান্তই নিজের জন্য। কুরআন পাঠ করে মুমিন আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার আশা করেন। মুমিন কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করে নিজের জীবনকে পরিচালিত করার জন্য। অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় অন্যের দিকে তাকানোর কারণে। মুমিন কখনোই অন্যের ভুল ধরার জন্য বা অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করার জন্য ইবাদত করেন না। যখনই মনে হবে যে, আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ হয়ে কুরআন পড়ি, কয়েকখানা তাফসীর পড়েছি, অথচ অমুক আলিম বা তমুক ব্যক্তি তা পড়েনি, অথবা সমাজের আলিমগণ কুরআন পড়ে না... ইত্যাদি তখনই বুঝতে হবে যে, শয়তান মুমিনের এত কষ্টের উপার্জন ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বাঁচতে হলে সতর্ক হতে হবে। অন্য মানুষদের ভুলভ্রান্তি চিন্তা করা অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। সর্বদা আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে যে, আল্লাহ যেন কুরআন তিলাওয়াত, চর্চা ও পালনের ইবাদত কবুল করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ামত বহাল রাখেন।

অহঙ্কারের আরেকটি প্রকাশ যে, আল্লাহর তাওফীকে কিছুদিন কুরআন চর্চার পরে নিজেকে বড় আলিম মনে করা এবং বিভিন্ন শরয়ী মাসআলা বা ফাতওয়া প্রদান করতে থাকা। কুরআন চর্চাকে নিজের আখেরাত গড়া ও আল্লাহর দরবারে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে। নিজের জীবন সে অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। ফাতওয়ার দায়িত্ব আলিমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রত্যেক মুসলিমই কুরআন পড়বেন, শিখবেন ও চর্চা করবেন নিজের জন্য। তবে প্রত্যেক মুসলিমই বিশেষজ্ঞ আলিম হবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে চিরশত্রু শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন।

(গ) কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

কুরআনী যিক্‌রের সর্বপ্রথম কাজ তিলাওয়াত। আল্লাহর মহান বাণী তিলাওয়াত করার চেয়ে বড় যিক্‌র বা মহান কর্ম আর কিছুই হতে পারে না। তিলাওয়াত বলতে মূলত কুরআন ও হাদীস বুঝে ও হৃদয় দিয়ে তিলাওয়াত করা বুঝান হয়েছে। তবে আমরা আশা করব, অপারগতার কারণে আমরা না বুঝে তিলাওয়াত করলেও আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে এ সকল সাওয়াব ও পুরস্কার প্রদান করবেন। বিশেষত যদি আমরা তিলাওয়াতের পাশাপাশি অনুবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে থাকি।

কুরআনের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কুরআন তিলাওয়াত অর্থ বুঝে এবং হৃদয়কে অর্থের সাথে একাত্ম করে দিয়ে তিলাওয়াত করা। আল্লাহ বলেছেন:

وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا

"যখন তাঁদের (মুমিনদের) নিকট আল্লাহর (কুরআনের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।"[১]

আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, আয়াতের অর্থ যদি হৃদয়কে আলোড়িত না করতে পারে তাহলে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله

"আল্লাহ সর্বোত্তম বাণীকে সুসমঞ্জস এবং বারংবার আবৃত্তিকৃত গ্রন্থ হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন। যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে এই গ্রন্থ থেকে (এই গ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে) তাদের শরীর রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়। অতঃপর তাদের দেহ ও মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি ঝুকে পড়ে।"[২]

কুরআনের অর্থ হৃদয়ে প্রবেশ করে হৃদয়কে নাড়া না দিলে শরীর কিভাবে শিহরিত হবে? মন কিভাবে প্রশান্ত হবে ?

তিলাওয়াতের সাথে সাথে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। এখানে প্রথমে তিলাওয়াতের ফযীলত বিষয়ক কিছু হাদীস উল্লেখ করছি।

(১). হযরত ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি বর্ণ পাঠ করবে সে একটি পুণ্য বা নেকী অর্জন করবে। পুণ্য বা নেকীকে দশগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান করা হবে। আমি বলছি না যে, (আলিফ-লাম-মিম) একটি বর্ণ। বরং 'আলিফ' একটি বর্ণ, 'লাম' একটি বর্ণ ও 'মীম' একটি বর্ণ।" হাদীসটি সহীহ।[১]

(২). হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

"যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে সুপারদর্শী সে সম্মানিত ফিরিশতাগণের সঙ্গে। আর কুরআন তিলাওয়াত করতে যার জিহ্বা জড়িয়ে যায়, উচ্চারণে কষ্ট হয়, কিন্তু কষ্ট করে অপারগতা সত্ত্বেও সে তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার।"[২]

(৩). অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران"

"যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে তা তিলাওয়াত করেন তিনি নেককার সম্মানিত ফিরিশতাগণের সঙ্গে। আর যিনি বারবার কুরআন তিলাওয়াত করে তা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন এবং তার জন্য খুব কষ্টকর হচ্ছে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।"[৩]

(৪). আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে বলতে শুনেছি:

اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه

"তোমরা কুরআন পাঠ করবে; কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তার সঙ্গীদের (কুরআন পাঠকারীগণের) জন্য শাফা'আত করবে।"[৪]

(৫). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان

"সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য শাফা'আত করবে। সিয়াম বলবে : হে প্রভু, আমি একে দিনের বেলায় খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার পক্ষে আমার শাফা'আত কবুল করুন। কুরআন বলবে : হে প্রভু, আমি রাতের বেলায় তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার পক্ষে আমার শাফা'আত কবুল করুন। তখন তাদের উভয়ের শাফা'আত কবুল করা হবে।"[৫]

(৬). মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন :

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين

"সকালে ও বিকালে তোমার মনের মধ্যে বিনয়, আকুতি ও ভয়ভীতির সাথে অনুচ্চ শব্দে আল্লাহর যিক্‌র কর এবং গাফিল বা অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।"[৬]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর যিক্‌র না করলে সে অমনোযোগী এবং অমনোযোগী হওয়া নিষিদ্ধ। রাত্রে অন্তত কুরআনের ১০০ টি আয়াত তিলাওয়াত করলে বা তাহাজ্জুদের সালাতে তিলাওয়াত করলে বান্দা আল্লাহর দরবারে যাকির হিসাবে গণ্য হবে এবং অমনোযোগী হওয়ার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين

"যে ব্যক্তি রাত্রের (তাহাজ্জুদের) সালাতে ১০০ আয়াত পাঠ করবে তাঁকে গাফিল বা অমনোযোগীদের তালিকায় লেখা হবে না। আর যে ব্যক্তি রাত্রের (তাহাজ্জুদের) সালাতে ২০০ আয়াত পাঠ করবে তাঁকে আল্লাহর খাঁটি, মুখলিস নেককার বান্দা হিসাবে লেখা হবে।" হাকিম ও

যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১]

অন্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, অন্তত দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলে বা তাহাজ্জুদের সালাতে দশটি আয়াত পাঠ করলেও বান্দা অমনোযোগী হওয়ার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين

"যে ব্যক্তি রাত্রে দশটি আয়াত পাঠ করবে তাকে গাফিল বা অমনোযোগীদের দলভুক্ত হিসাবে লেখা হবে না।" হাদীসটি সহীহ।[২]

(৭). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يـوحى إليــه لا ينبغــي لصــاحب القرآن أن يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করল সে ধাপেধাপে নবুয়তের সিঁড়ি বেয়ে নিজের দেহের মধ্যে নবুয়ত গহণ করল। পার্থক্য এই যে তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করা হবে না। (অর্থাৎ সে ওহী পেল না, তবে ওহীর ও নবুয়তের জ্ঞান সে গ্রহণ করল)। কুরআনের অধিকারী বা কুরআনের সঙ্গীর জন্য উচিত নয় যে, নিজের মধ্যে আল্লাহর কালাম থাকা অবস্থায় সে অন্যান্য মানুষদের মতো আবেগ তাড়িত হবে, অথবা কেউ রাগ করলে বা উত্তেজিত হলে সেও রাগ করবে বা উত্তেজিত হবে।"[৩]

স্বভাবতই এসকল হাদীসে কুরআন পাঠ করা বলতে বুঝে ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে পড়া বুঝানো হয়েছে। তোতাপাখিকে তো আর আলিম বলা যায় না। যিনি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে কুরআন পাঠ করেন তিনিই তার হৃদয়ে নবুয়তের ইল্‌ম ধারণ করেন।

(৮). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يقال لصاحب القرآن اقــرأ وارق ورتــل كما كنت تــرتــل فــي الــدنيا فــإن مــنــــزلك عــنــد آخــر آية تــقــرؤها

"কিয়ামতের দিন কুরআনের সাথীকে (কুরাআনের মানুষকে) বলা হবে : তুমি দুনিয়াতে যেভাবে সুন্দর তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করতে সেভাবে পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। তোমার পড়া যে আয়াতে শেষ হবে সেখানে তোমার আবাসস্থাল হবে।" সহীহ।[৪] অর্থাৎ, জান্নাতের উঁচু মর্যাদার উপরে উঠার ধাপ হবে কুরআন করীমের আয়াতের সংখ্যা অনুসারে। যে ব্যক্তি যত আয়াত পাঠ করতে পারবেন তিনি তত উপরে উঠে উচ্চ মর্যাদায় নিজেকে আসীন করবেন।

বিশুদ্ধ তিলাওয়াত অপরিহার্য

অপরদিকে কুরআন তিলাওয়াতের অর্থ আরবী ভাষা ও আরবী রীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সুন্নাত অনুসারে ধীরে ধীরে, পরিপূর্ণ ভক্তি ও ভালবাসা সহকারে পাঠ করা।

আমাদের দেশে সাধারণ ধার্মিক মুসলিম ছাড়াও অনেক আলিম, ইমাম, ক্বারীও বাংলায় বা 'বাংরবি' ভাষায় কুরআন তিলাওয়াত করেন। 'হামি টুমাকে ওয়ালোওয়াছি' – কথাটির সকল শব্দ মূলত বাংলা হলেও একে আমরা বাংলা বলতে পারি না। হয়ত 'ইংলা' বা 'বাংলিশ' বলা যেতে পারে। তেমনি বাংলা উচ্চারণ পদ্ধতিতে আরবী কুরআন তিলাওয়াত করলেও তা কখনই আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করা হবে না।

আরবী ভাষায় প্রতিটি বর্ণের নির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থল, উচ্চারণ পদ্ধতি, সিফাত বা গুণাবলী, মদ বা দীর্ঘতা ও অন্যান্য উচ্চারণ বিষয়ক নিয়মাবলী রয়েছে। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমকে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন। আরবী ভাষার রীতি অনুসারে না পড়লে কখনই কুরআন তিলাওয়াত করা হবে না। এ বিষয়ে সাধারণ মুসলিম তো দূরের কথা অধিকাংশ মাদ্রাসাতেও অমার্জনীয় অবহেলা বিরাজমান। সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগে লক্ষ লক্ষ অনারব ইসলামের ছায়াতলে আসেন। তারা কুরআনের বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণের বিষয়ে কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করতেন ও উচ্চারণের সামান্যতম বিচ্যুতিকে কিভাবে কঠিন গোনাহ ও ভয়ঙ্কর বেয়াদবী বলে মনে করতেন সে বিষয়ে অনেক বিবরণ আমরা হাদীসের গ্রন্থসমূহে পাই।[৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তিলাওয়াত পদ্ধতি

বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণের পাশাপাশি কুরআন কারীমকে শান্তভাবে, ধীরে, স্পষ্টকরে ও টেনে টেনে পড়তে হবে। এটি আল্লাহর নির্দেশিত ফরয। এ বিষয়ে আমাদের অপরাধ বড় কঠিন। অধিকাংশ হাফিজই দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করেন। তারাবীহের সালাতে যদি কোনো হাফিজ একটু ধীরে তিলাওয়াত করেন তাহলে মুসল্লীগণ ঘোর আপত্তি শুরু করেন। বাধ্য হয়ে হাফিজ সাহেব এমনভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন যাতে তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতা প্রথম ও শেষের কয়েকটি শব্দ ছাড়া কিছুই বুঝতে পারেন না বা শুনতেও পারেন না। কাজেই, সাওয়াব তো দূরের কথা কুরআনের সাথে বেয়াদবীর অপরাধ কঠিন হয়ে পড়ে।

মহান আল্লাহ কুরআন করীমে ইরশাদ করেছেন :

ورتـــل الـــقـــرآن تـــرتـــيـــلا

"এবং আপনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন আবৃত্তি করুন।"[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, আতা, হাসান বাসরী, কাতাদাহ ও অন্যান্য সকল সাহাবী ও তাবেয়ী মুফাসসির বলেছেন যে, তারতীল অর্থ কুরআনকে ধীরে ধীরে, শান্তভাবে, স্পষ্ট করে ও টেনে টেনে পড়া, যেন তা বুঝা ও তার অর্থ চিন্তা করা সহজ হয়।[২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এভাবেই কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন:

كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের সূরা তিলাওয়াত করলে তারতীলসহ ধীরে ও টেনে তিলাওয়াত করতেন, ফলে সূরাটি যতটুকু লম্বা তার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা হয়ে যেত।"[৩]

আনাস (রা) রাসূলুল্লাহর (ﷺ) তিলাওয়াত পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন :

كانـــت مـــدا

"তাঁর কিরাআত ছিল টেনে টেনে।"[৪]

উম্মু সালামাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কিরাআত পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন:

كان يقـــطـــع قـــراءتـــه آيـــة آيـــة

"তিনি প্রত্যেক আয়াতে থামতেন (একসাথে কখনো দুই আয়াত তিলাওয়াত করতেন না।)"[৫]

হাফসকে (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাআত পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "তোমরা তাঁর মতো তিলাওয়াত করতে পারবে না।" প্রশ্নকারীগণ তবুও একটু শোনাতে অনুরোধ করেন। তখন তিনি খুব ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করেন।[৬]

হযরত হুযাইফা (রা) বলেন :

صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلـــت يصـــلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتـــتح آل عمـــران فقرأهـــا يقـــرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ

"এক রাতে আমি (তাহাজ্জুদের সালাতে) নবীয়ে আকরাম ﷺ-এর সাথে সালাতে দাঁড়ালাম। তিনি সূরা বাকারাহ শুরু করলেন। আমি ভাবলাম তিনি হয়ত ১০০ আয়াত পাঠ করে রুকুতে যাবেন। কিন্তু তিনি ১০০ আয়াত পার হয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম তিনি হয়ত এই সূরা শেষ করে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি সূরা 'নিসা' শুরু করলেন এবং তা পুরোপুরি পাঠ করলেন। এরপর তিনি সূরা 'আলে ইমরান' শুরু করলেন এবং তা শেষ করলেন। তিনি ধীরে ধীরে টেনে টেনে তিলাওয়াত করলেন। যখন তাসবীহের উল্লেখ আছে এমন কোনো আয়াত তিনি পড়ছিলেন তখন তিনি তাসবীহ পাঠ করছিলেন। যখন কোনো প্রার্থনার উল্লেখ আছে এমন কোনো আয়াত পাঠ করছিলেন, তখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন। আবার আশ্রয় চাওয়ার উল্লেখ আছে এমন আয়াত আসলে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। ...।"[৭]

বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ধীরে ধীরে টেনে টেনে পড়ার সাথে সাথে যথাসম্ভব সুন্দর ও মধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন হাদীসে সাধ্যমতো মধুর ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি হাদীসে হযরত বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

زيـــنـــوا الـــقـــرآن بـــأصـــواتـــكـــم

"তোমরা কুরআনকে তোমাদের শব্দ ও উচ্চারণ দিয়ে মধুর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।"[৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেন :

لا تـــنـــثـــروه نـــثـــر الرمـــل ولا تهـــذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلـــوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة

"তোমরা কুরআনকে বালি ছিটানোর মতো ছিটিয়ে দেবে না বা কবিতার মতো দ্রুত আবৃত্তি করবে না। কুরআনের আশ্চর্য বাণী থেমে ও বুঝে পড়বে। কুরআন দিয়ে হৃদয়কে নাড়া দেবে। কখন সূরার শেষে পৌঁছাব এই চিন্তা করে কখনো কুরআন তিলাওয়াত করবেন না।"[৯]

(ঘ) কুরআনের অর্থ চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার ফযীলত

কুরআন করীমকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন অনুধাবন করার জন্য, শুধুমাত্র তিলাওয়াতের জন্য নয়। কুরআনের তিলাওয়াত যেমন একটি ইবাদত, কুরআন অনুধাবন করা, বুঝা ও কুরআন নিয়ে চিন্তা করা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই তা অনুধাবন করা। উপরের হাদীসগুলি আলোচনা করতে যেয়ে আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছি যে, কুরআন পাঠের ফযীলত মূলত পাঠ করে তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। হৃদয়ঙ্গম করলেই নবুয়তের ইল্‌ম আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের যুগে বা ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলিতে এভাবেই কুরআন পাঠ করতেন মুসলিমগণ। যেসকল অনারব দেশে ইসলাম প্রবেশ করেছে সেসকল দেশের মানুষও কুরআন বুঝার মতো আরবী শিখে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা এখন না বুঝেই পড়ি। তবুও আশা করব যে, আল্লাহ তা'লা দয়া করে আমাদেরকে কুরআন পাঠের জন্য নির্ধারিত সাওয়াব দান করবেন। আমাদের না বুঝার অসহায়ত্ব বা আলসেমী তিনি দয়া করে ক্ষমা করবেন।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তা বুঝার জন্য সহজ করেছেন যেন সবাই তা বুঝতে পারে ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। "এই কুরআনে আমি বিভিন্ন উপদেশ, উদাহরণ, বিধান ইত্যাদি উল্লেখ করেছি যেন তারা অনুধাবন করতে ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" প্রায় ৫০ স্থানে এভাবে বলা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب

"এক বরকতময় কল্যাণময় গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।"[১]

কুরআন কারীমে চার স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন :

ولــقــد يــســرنا الــقــرآن لـلــذكــر فهل من مــدكــر

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি , কে আছে উপদেশ গ্রহণ করার ?"[২]

যারা কুরআন অনুধাবন করতে, বুঝতে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করে না তাদের বিষয়ে অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে :

أفــلا يــتــدبــرون القرأن أم على قــلوب أقــفــالـها

"তারা কি কুরআনকে অনুধাবন করে না ? না কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?"[৩]

বিভিন্ন হাদীসে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে অনুধাবন করতে ও চিন্তা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনি কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে যে, যারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করবে কিন্তু তার অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে না তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে।[৪]

আল্লাহর কিতাব পাঠ করাকে কুরআন কারীমে 'তিলাওয়াত' বলা হয়েছে, কারণ তিলাওয়াত অর্থ অনুসরণ করা। এজন্য কুরআন শুধুমাত্র না বুঝে পাঠ করলে তিলাওয়াত হয় না। বুঝে পাঠ করে তা অনুসরণ করে চললেই তা তিলাওয়াত বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

"যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তাঁরা তা সত্যিকারভাবে তেলাওয়াত করে, তাঁরাই এই কিতাবের উপর ঈমান এনেছে।"[৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সকল সাহাবী ও তাবেয়ী মুফাসসির একমত যে দুটি গুণ থাকলেই সেই তিলাওয়াতকে 'সত্যিকারের তিলাওয়াত' বলা যাবে : (১). পঠিত আয়াতের অর্থ বুঝে হৃদয়কে তার সাথে একাত্ম করে তিলাওয়াত করতে হবে। (২). পঠিত আয়াতের সকল বিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ ও পালন করতে হবে। হৃদয়ঙ্গম ও অনুসরণ ছাড়া কখনই সত্যিকারের তিলাওয়াত বলে গণ্য হবে না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উমার (রা) বলেন : সত্যিকার তিলাওয়াতে পঠিত আয়াতের সাথে হৃদয় আলোড়িত হবে। যে আয়াতে শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেখানে থেমে আল্লাহর কাছে শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। যে আয়াতে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, সেখানে থেমে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে হৃদয় দিয়ে তিলাওয়াত করলেই তা 'সত্যিকার তিলাওয়াত' বলে গণ্য হবে।[৬]

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ইমাম সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের সময়েও আয়াতের অর্থ অনুযায়ী থেমে থেমে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে পছন্দ করতেন। জাহান্নামের কথা আসলে আশ্রয় প্রার্থনা করা, জান্নাতের কথা আসলে জান্নাত চাওয়া, ক্ষমার কথা আসলে ইস্তিগফার করা এবং এভাবে হৃদয়কে আলোড়িত করে সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, বিশেষত সকল প্রকার সুন্নাত-নফল সালাতে। শুধুমাত্র ফরয সালাত যেহেতু জামাতে আদায় করতে হয় সেহেতু সেক্ষেত্রে যথাসাধ্য সংক্ষেপ করার ও সকল মুক্তাদীর দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তিলাওয়াতের মধ্যে না থামাই পছন্দ করতেন। তবে ফরয সালাতেও কেউ কুরআন তিলাওয়াতের সময় এভাবে দু'আ করলে সালাতের ক্ষতি হবে না বলে তিনি বলেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) তাঁর মাবসূত গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্ত

ারিত আলোচনা করেছেন।[১]

সাবাহী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ, আবু রাযীন, কাইস ইবনু সা'দ, 'আতা, হাসান বাসরী, কাতাদাহ, ইকরিমাহ, আবুল আলিয়াহ, ইব্রাহীম নাখয়ী প্রমুখ সকল তাবিয়ী, তাবে-তাবিয়ী মুফাসসির বলেছেন যে, সত্যিকার তিলাওয়াতের অর্থ পঠিত সকল আয়াতের সকল প্রকার বিধানাবলী পরিপূর্ণ পালন ও অনুসরণ করা। কুরআনের সহজ সঠিক অর্থ বুঝা ও সকল প্রকার দূরবর্তী ও বিকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকা। যারা এভাবে বুঝবেন ও পালন করবেন তারাই শুধু সত্যিকার তিলাওয়াতকারী বলে গণ্য হবেন।[২]

আমরা কুরআনের বর্ণনা, হাদীসের নির্দেশনা ও সাহাবীগণের বাণী থেকে জেনেছি যে, কুরআন তিলাওয়াতের অন্যতম আদব কুরআন দিয়ে অন্তরকে নাড়ানো। অন্তর নড়লেই ঈমান বৃদ্ধি পাবে, শরীর শিহরিত হবে এবং কর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে।

(ঙ) কুরআন আলোচনা ও গবেষণার অতিরিক্ত ফযীলত

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده

"যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে ও পরস্পরে তা শিক্ষা ও আলোচনা করতে থাকে, তখনই তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে, আল্লাহর রহমত তাদের আবৃত করে নেয়, ফিরিশতাগণ তাদের ঘিরে ধরে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থদের নিকট তাদের যিক্র করেন।"[৩]

(চ) কুরআন শ্রবণের অতিরিক্ত ফযীলত

আল্লাহর মহান বাণী কুরআন কারীম তিলাওয়াতের ন্যায় মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাও একটি বড় ইবাদত ও আল্লাহর রহমত লাভের অন্যতম ওসীলা। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন :

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون

"এবং যখন কুরআন পাঠ করা হবে, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করবে এবং চুপ করে থাকবে, তাহলে হয়ত তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে।"[৪]

ইমাম তাবারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, – হে মুমিনগণ, যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ কর, যেন তা ভালোভাবে বুঝতে পার এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পার। আর কুরআন পাঠের সময় চুপ করে থাকবে, যেন তা বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পার। কুরআন পাঠের সময় কথা বলবে না, তাহলে তা বুঝতে অসুবিধা হবে। আর এভাবে কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারলে, তার নির্দেশ মতো চলতে পারলে এবং কুরআনের আলোয় নিজের জীবন আলোকিত করতে পারলে তোমরা আল্লাহর রহমত অর্জন করতে পারবে।[৫]

কুরআন শ্রবণের ফযীলত ও বরকত প্রমাণের জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট। তবে এ বিষয়ে দুই একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে, তার জন্য বহুগুণ বর্ধিত সাওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি তা তিলাওয়াত করবে, তার জন্য এই আয়াতটি কিয়ামতের দিন নূরে পরিণত হবে।" হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে বলে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন।[৬] কিন্তু আব্দুর রাজ্জাক সানআনী হাদীসটি দ্বিতীয় আরেকটি সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়।[৭]

হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন :

من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا

"যদি কেউ আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতও শ্রবণ করে, তাহলে তা কিয়ামতের দিন তার জন্য নূরে পরিণত হবে।"[৮]

অনেক তাবেয়ী বুজুর্গ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাকে তিলাওয়াতের চেয়েও বেশি সাওয়াবের বলে মনে করতেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী খালিদ ইবনু মা'দান (১০৩ হি) বলেন :

إن الذي يقرأ القرآن له أجر وان الذي يستمع له أجران

"যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার। আর যিনি তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, তার জন্য রয়েছে দুটি পুরস্কার।"[১]

(ছ) কুরআনের মানুষ হওয়ার ফযীলত

(আহলুল কুরআন) অর্থাৎ কুরআনের অধিকারী বা কুরআনের মানুষ হওয়ার অর্থ জীবনকে কুরআন কেন্দ্রিক ও কুরআন অনুযায়ী করে ফেলা। আর এ মুমিনের জীবনের মহত্তম পর্যায়। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته

"মানুষের মধ্যে আল্লাহর কিছু পরিবার পরিজন রয়েছে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল, তাদের পরিচয় কি ? তিনি বলেন : তারা কুরআনের মানুষ। তারাই আল্লাহর পরিজন ও আল্লাহর বিশেষ ঘনিষ্ট খাস মানুষ।" হাদীসটি সহীহ।[২]

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া কুরআন কেন্দ্রিক হতে পারা। যাকে আল্লাহ রাতদিন কুরআন চর্চা ও কুরআন পালন নিয়ে ব্যস্ত থাকার তাওফীক প্রদান করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় নিয়ামত পেয়েছেন। দুনিয়াতে কিছু চাওয়ার থাকলে এই ধরনের নিয়ামতই চাওয়া যায়। হিংসা করার মতো কোনো নিয়ামত থাকলে তা এই নিয়ামত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه (وفي رواية أخرى: يقوم به) أناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار

"শুধুমাত্র দুই ব্যক্তিকেই হিংসা করা যায় (শুধুমাত্র এই দুই ব্যক্তি নিয়ামতের মতো নিয়ামত কামনা করা যায়) : প্রথম ব্যক্তি, যাঁকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন আর সে রাত-দিন শুধু কুরআন তিলাওয়াত বা কুরআন পালন নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাঁকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে রাতদিন সম্পদ দান করতে থাকে।"[৩]

কুরআনের মানুষ হলে, জীবনকে কুরআন অনুসারে পরিচালিত করলে এবং সকল কাজে কুরআনকে সামনে রাখলে কুরআন তাঁকে জান্নাতে নিয়ে যাবেই। হযরত জাবের (রা) নবীয়ে আকরাম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار

"কুরআন এমন একজন শাফা'আতকারী যার শাফা'আত অবশ্যই কবুল করা হবে। আবার কুরআন এমন একজন বিবাদী অভিযোগকারী যার অভিযোগ সত্য বলে মেনে নেয়া হবে। যে ব্যক্তি কুরআনকে নিজের জীবনে সামনে রেখে চলবে কুরআন তাঁকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে নিজের পিছে রেখে দেবে কুরআন তাঁকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

কুরআনের মানুষ হতে পারলে শুধু ঐ মানুষ নিজেই লাভবান হবেন না, উপরন্তু তার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। মু'আয ইবনু আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যয়ীফ হাদসে বলা হয়েছে :

من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং কুরআন অনুসারে কর্ম করবে তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি মুকুট পরানো হবে যার জ্যোতি হবে পৃথিবীর সূর্যের জ্যোতির চেয়েও সুন্দরতর। তাহলে যে ব্যক্তি নিজে কর্ম করবে তার পুরস্কার কত হবে তা ভেবে দেখ!" হাদীসটির সনদ দুর্বল বা যয়ীফ।[৫]

হযরত বুরাইদা আসলামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بم كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, কুরআনের ইলম অর্জন করবে ও সে অনুসারে কর্ম করবে, কিয়ামতের দিন তাঁর পিতা-মাতাকে নূরের মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর মতো এবং তাঁর পিতা-মাতকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান একপ্রস্ত পোশাক পরানো হবে। তারা বলবেন : কিসের জন্য আমাদের এসব পরানো হচ্ছে ? তাঁদেরকে বলা হবে : তোমাদের সন্তান কুরআন গ্রহণ করেছে এজন্য তোমাদেরকে এভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে।" হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৬]

আলী (রা) থেকে খুবই দুর্বল সনদে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة

من أهل بيته كلهم وجبت له النار

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, মুখস্থ করবে, কুরআনের বিধান মেনে কুরআনের হালালকে হালাল হিসাবে পালন করবে ও কুরআনের হারামকে হারাম হিসাবে বর্জন করবে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁর পরিবারের দশ ব্যক্তির জন্য তাঁর শাফা'আত কবুল করবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম পাওনা হয়ে গিয়েছিল ।"

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সংকলন করে বলেন যে, হাদীসটি দুর্বল, কারণ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী রাবী হাফস ইবনু সুলাইমান হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল । এই হাদীস তিনি যার থেকে শুনেছেন বলে বর্ণনা করেছেন সেই কাসীর ইবনু যাযান অপরিচিত ব্যক্তি, মুহাদ্দিসগণ তার পরিচয় ও সততা সম্পর্কে কিছুই জানেন না । এধরনের রাবীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় ।[১]

(জ) কুরআন তিলাওয়াতের আদব ও নিয়ম

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র আল্লাহর কালাম । কুরআনই যাকিরের অন্যতম সম্পদ ও সম্বল । কুরআন তিলাওয়াত, গবেষণা, আলোচনা ইত্যাদির অনেক মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত নিয়ম ও আদব আছে, যা হাদীস ও সাহাবীগণের মতামতের আলোকে আলিমগণ বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন । এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয় । সংক্ষেপে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় লিখছি :

১. যথাসম্ভব ওযু-সহ আদবের সাথে তিলাওয়াত করা । ওযু ছাড়াও তিলাওয়াত করা যায় । তবে কুরআন স্পর্শ করা যায় না । গোসল ফরয থাকলে তিলাওয়াত করা যায় না ।
২. সম্ভব হলে মিসওয়াক করে সুন্দর পোশাকে বসে তিলাওয়াত করা । তবে বসে শুয়ে দাঁড়িয়ে, হাঁটতে চলতে সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যায় ।
৩. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করা ।
৪. তিলাওয়াতের সময় অর্থের দিকে খেয়াল রাখা এবং যথা সম্ভব অর্থকে হৃদয়ে জাগরুক করে হৃদয়কে নাড়া দেওয়া ।
৫. তিলাওয়াতের সময় সাজদার আয়াতে সাজদা করা, তাসবীহের আয়াতে তাসবীহ পড়া, পুরস্কারের আয়াতে পুরস্কার চাওয়া ও আযাবের আয়াতে আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়া ।
৬. তিলাওয়াতের সময় মনকে যথাসম্ভব বিনীত ও আল্লাহর রহমতের জন্য ব্যাকুল রাখা ।
৭. তিলাওয়াতের সাথে সাথে সাধ্যমত বিনীত হৃদয়ে ক্রন্দন করা । রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন তিলাওয়াতের সময় চোখের পানি বইয়ে ক্রন্দন করতেন । মুখচাপা ক্রন্দনে তার বুকের মধ্যে শব্দ উঠত । হযরত আবু বকর (রা), উমার (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও সালাতে ও সালাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন ঠেকাতে পারতেন না ।
৮. একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তিলাওয়াতের সময় কারো সাথে কথা বলার জন্য তিলাওয়াত কেটে না দেওয়া । যথাসম্ভব মনোযোগের সাথে তিলাওয়াত শেষ করে কথা বলা ।
৯. তিন দিনের কমে কুরআন খতম না করা । যথসম্ভব প্রতি মাসে বা ২/৩ মাসে একবার খতম করা ।
১০. ঘরের কুরআনকে ফেলে না রাখা । প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় তা দেখে পাঠ করা ।
১১. রমযান মাসে বেশি বেশি তিলাওয়াত করা ।
১২. মুখস্থ থাকলেও যথাসম্ভব দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করা ; কারণ কুরআন শরীফের (মুসহাফের) পৃষ্ঠায় নজর বুলানোই একটি ইবাদত ।
১৩. প্রতি বৎসর অন্তত একবার উত্তম তিলাওয়াত করতে পারেন এমন কাউকে তিলাওয়াত করে শুনান ।[২]

ঝ. যিক্‌র গণনা প্রসঙ্গ

আমরা ৯ প্রকার যিক্‌রের আলোচনা শেষ করেছি । পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশের পূর্বে আমরা তাসবীহ বা হাতে যিক্‌র গণনা করা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই । উপরের হাদীসগুলি থেকে জানতে পারলাম যে , যিক্‌র দুইভাবে আদায় করা যায় : বেশি বেশি পাঠ করে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠ করে । নির্দিষ্ট সংখ্যক যিক্‌রের জন্য গণনার প্রয়োজন । কিন্তু আমরা দেখি যে, কোনো কোনো সাহাবী ও পরবর্তী ইমামগণ যিক্‌র গণনা করতে নিষেধ করেছেন । তারা বলতেন, আল্লাহই তো গণনা করছেন, তুমি কেন গণনা করবে । তুমি কি আল্লাহর কাছে যেয়ে গুণে হিসাব বুঝে নেবে?

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও তার মাযহাবের ইমামগণ যিক্‌র ও তাসবীহ-তাহলীল গণনা মাকরুহ বলে জেনেছেন । ইমাম তাহাবী ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফের সনদে ইমাম আবু হানীফা থেকে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) যিক্‌র গণনা করতে দেখলে বলতেন, তোমাদের গোনাহগুলি গণনা করে হিসাব করে রাখ, সাওয়াব গণনার প্রয়োজন নেই ।[৪]

উকবা ইবনু সুবহান নামাক একজন তাবেয়ী বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে প্রশ্ন করলাম, যদি কেউ যিক্‌রের সময় তার তাসবীহ-তাহলীল হিসাব করে রাখে তাহলে কী হবে? তিনি বললেন :

سبحان الله! أتحاسبون الله

"সুব'হানাল্লাহ! তোমরা কি আল্লাহর হিসাব নেবে ?"[১]

এ সকল হাদীসের আলোকেই ইমাম আবু হানীফা (রহ) তাসবীহ তাহলীল গণনা মাকরুহ মনে করেছেন। তবে ইমাম তাহাবী (রহ) এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, যেসকল যিক্‌র হাদীস শরীফে নির্দিষ্ট সংখ্যায় আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যার জন্য নির্দিষ্ট সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে, সে সকল যিক্‌রের ক্ষেত্রে মুমিনের উচিত তা গণনা করে পাঠ করা। কারণ গণনা ছাড়া নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ হয়েছে কিনা এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত সাওয়াবের পরিমাণ যিক্‌র পালিত হয়েছে কিনা তা জানার উপায় নেই। এজন্য এ সকল যিক্‌র গণনা করে পালন করতে হবে।

আর যেসকল যিক্‌র সাধারণভাবে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ সংখ্যার জন্য বিশেষ সাওয়াব বর্ণনা করা হয়নি, সেসকল যিক্‌র গণনা করা বাতুলতা। সেক্ষেত্রেই আল্লাহর হিসাব গ্রহণের প্রশ্ন আসে। নির্ধারিত সংখ্যক যিক্‌রের অতিরিক্ত সকল সাধারণ যিক্‌রের ক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব কোনো রকম গণনা বা হিসাব ছাড়া যথাসম্ভব বেশি বেশি এবং যথাসম্ভব মনোযোগ সহকারে এসকল যিক্‌রের বাক্য উচ্চারণ করবেন। হিসাবপত্রের দায়িত্ব রাব্বুল আলামীনের উপর ছেড়ে দেবেন।

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কর্ম থেকে জানা যায় যে, সালাত, সালাম, তাসবীহ, তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ ইত্যাদি যিক্‌র, যা সাধারণভাবে বেশি বেশি আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অনেকে নিজের সুবিধামতো নির্দিষ্ট সংখ্যায় ওযীফা হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। যেমন, কেউ কেউ সারাদিনে ১০০০ বার সালাত বা তাসবীহ বা তাহলীল করবেন বলে নিজের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এগুলি তাঁরা গুণে আদায় করতেন। এর অতিরিক্ত অগণিত যিক্‌র তাঁরা আদায় করতেন।[২]

এখানে অনেকে প্রশ্ন করেন, সংখ্যা নির্ধারিত যিক্‌র কিভাবে গণনা করব? প্রচলিত 'তাসবীহ' ব্যবহার করে? না হাতের কর গণনা করে? কেউ কেউ বলেন, তাসবীহ ব্যবহার বিদ'আত কি না ?

এই প্রশ্নের উত্তর , যিক্‌র গণনার ক্ষেত্রে হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করা সুন্নাত ও উত্তম, তবে গণনার জন্য দানা বা তাসবীহ ব্যবহার না-জায়েয নয়, বিদ'আতও নয়। তবে হাতের আঙ্গুল দ্বারা গণনা করা উত্তম, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাসবীহ তাহলীল ও যিক্‌র আযকার হাতে গণনা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন:

رأيت النبي ﷺ يعقد التسبيح بيده [بيمينه]

"আমি নবীজী (ﷺ)-কে দেখলাম তিনি নিজের হাতে [দ্বিতীয় বর্ণনা : ডান হাতে] তাসবীহের গিঠ দিচ্ছেন (হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করছেন)।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩]

হাতের আঙ্গুল দ্বারা গণনা করা উত্তম হওয়ার দ্বিতীয় কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতে গণনা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। হযরত ইউসাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে বলেছেন :

عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات

"তোমরা মহিলাগণ অবশ্যই তাসবীহ (সুব'হানাল্লাহ), তাহলীল (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকদীস (সুব্বুহুন কুদ্দূসুন) করবে এবং আঙ্গুলের গিটে গণনা করবে ; কারণ এদেরকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে এবং কথা বলানো হবে। (এরা যিক্‌রের সাক্ষ্য প্রদান করবে।)" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪]

দানা বা তাসবীহ দ্বারা যিক্‌র গণনা জায়েয ও সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত। বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সাহাবী/সাহাবীয়াকে দানা বা বীচির দ্বারা তাসবীহ তাহলীল বা যিক্‌র গণনা করতে দেখেছেন। তিনি তাঁদেরকে এভাবে গণনা করতে নিষেধ করেননি, তবে সংক্ষিপ্ত ও উত্তম যিক্‌রের উপদেশ প্রদান করেছেন। এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কাঁকর, দানা, বীচি ইত্যাদির মাধ্যমে যিক্‌র গণনা জায়েয।

পরবর্তী যুগে কোনো কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে জমা করা কাঁকর, দানা, বীচি, গিরা দেওয়া সুতা বা 'তাসবীহ' ব্যবহারের কথা জানা যায়। আবু সাফিয়্যা নামক একজন সাহাবী পাত্র ভর্তি কাঁকর রাখতেন। ফজরের সালাতের পরে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তিনি এগুলি দিয়ে যিক্‌র করতেন। আবার বিকালেও অনুরূপ করতেন। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস কাঁকর দিয়ে তাসবীহ তাহলীল ও যিক্‌র করতেন। হযরত ইমাম হুসাইনের কন্যা ফাতিমা গিঠ দেওয়া সুতা (তাসবীহের মতো) দ্বারা গণনা করে তাসবীহ তাহলীল করতেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর ১০০০ টি গিরা দেওয়া একটি সুতা ছিল। তিনি এই সংখ্যক তাসবিহ-তাহলীল পাঠ না করে ঘুমাতেন না। এছাড়া তিনি কাঁকর জমা করে তা দিয়ে যিক্‌র করতেন বলে বর্ণিত আছে। হযরত আবু দারদা (রা) খেজুরের বীচি একটি থলের মধ্যে রাখতেন। ফজরের সালাতের পরে সেগুলি বাহির করে যিক্‌রের মাধ্যমে গণনা করে শেষ করতেন।

আল্লামা শাওকানী, সয়ূতী আব্দুর রাউফ মুনাবী প্রমুখের আলোচনায় মনে হয় ইমাম আবু হানীফা (রা) ও তার সঙ্গীগণ বা মাযহাবের ইমামগণ ছাড়া পূর্বযুগের অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম যিক্‌র গণনা বা তাসবীহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেননি। ইমাম সুয়ূতী এ

বিষয়ে একটি ছোট্ট বই লিখেছেন।[১] সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সুন্নাত ও নির্দেশনা সংখ্যা নির্ধারিত যিক্‌র হাতের আঙ্গুলে গণনা করা। প্রয়োজনে, বিশেষত যারা ওযীফা হিসাবে দৈনিক বেশি সংখ্যক যিক্‌র নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছেন তারা তাসবীহ, কাঁকর, বীচি, ছোলা, ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

ঞ. সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে

সম্মানিত পাঠক, আমরা যিক্‌রের প্রকারভেদ ও ফযীলত আলোচনা শেষ করেছি। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা মুমিনের জীবনের যিক্‌রের প্রয়োগ ও বিভিন্ন সময়ে কিভাবে কী যিক্‌র পালন করবেন তার বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ। এখানে যে বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ যিক্‌র। যিক্‌রের এমন কোনো সময় নেই বা অবস্থা নেই যে, সে সময়ে বা অবস্থায় যিক্‌র করতে হবে, অন্য সময় করতে হবে না। মুমিন সদা সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে রত থাকে। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন :

كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه

"নবীজী (ﷺ) সকল অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করতেন।"[২]

এখানে যিক্‌র বলতে মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে যিক্‌র বুঝানো হয়েছে। মনের স্মরণ তো সর্বদায়ই থাকে। সকল অবস্থায় কোনো না কোনো কর্ম মুমিন করে। কিন্তু সকল অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করা যাবে কিনা ? নাপাক অবস্থায় ? শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে, চলতে ? এই প্রশ্নের উত্তরেই হযরত আয়েশা (রা) এ কথা বলেছেন। আর এ থেকে মুসলিম উম্মার ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এ কথাই বুঝেছেন। এজন তাঁরা এই হাদীস থেকে প্রমাণিত করেছেন যে, নাপাক অবস্থায়, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, রাস্তাঘাটে, মাঠে এবং সর্বাবস্থায় মুমিন বান্দা মুখে মাসনূন বাক্যাদি উচ্চারণ করে আল্লাহর যিক্‌র করতে পারবেন। সালাত, সালাম, তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ ও সকল প্রকার যিক্‌রের বিষয়েই একথা প্রযোজ্য।[৩] শুধুমাত্র ইস্তিঞ্জা রত অবস্থায় ও স্বামী-স্ত্রী একান্ত অবস্থায় ছাড়া সর্বদা সকল অবস্থায় মুমিনের জিহ্বা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ এটি এবং এটিই তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের আদর্শ ও কর্ম।[৪]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেলায়াতের পথে যিকরের সাথে

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বেলায়াতের পরিচয়, যিক্‌রের অর্থ, গুরুত্ব মর্যাদা, ফযীলত ও প্রকারভেদ আলোচনা করেছি। আমরা

দেখেছি যে, আল্লাহর বেলায়াত অর্জন মুমিনের অন্যতম কাম্য ও মুমিন জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য অর্জনে যিক্র অন্যতম অবলম্বন। তবে নফল পর্যায়ের যিক্রের মাধ্যমে বেলায়াত অর্জনের পূর্বে মুমিনকে আরো অনেক কর্ম করতে হয়। যেগুলির অবর্তমানে সকল যিক্র অর্থহীন ও ভণ্ডামিতে পরিণত হতে পারে। এ অধ্যায়ে আমরা এ জাতীয় কিছু বিষয় আলোচনা করব। এছাড়া যিক্রের ন্যূনতম বা পরিপূর্ণ ফযীলত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ও আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রার্থনা করি।

ক. ইবাদত কবুলের শর্ত পূরণ

কুরআন কারীম ও সুন্নাতের আলোকে যিক্রসহ সকল ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল বা গৃহীত হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক শর্ত রয়েছে :

(১) বিশুদ্ধ ঈমান ও ইখলাস: শির্ক, কুফ্র ও নিফাক-মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। শুধু তাই নয়। উপরন্তু ইবাদতটি পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্যর সামান্যতম সংমিশ্রণ থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না।

(২) সুন্নাতের অনুসরণ : কর্মটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত, রীতি ও তাঁর শিক্ষা অনুসারে পালিত হতে হবে। যদি কোনো ইবাদত তাঁর শেখানো ও আচরিত পদ্ধতিতে পালিত না হয়, তাহলে যত ইখলাস, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতাই থাক না কেন, তা আল্লাহর দরবারে কোনো অবস্থাতেই গৃহীত বা কবুল হবে না।

(৩) হালাল ভক্ষণ : ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল-জীবিকা-নির্ভর হতে হবে। হারাম ভক্ষণকারীর কোনো ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তটির বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম শর্তটির বিষয়ে 'কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আকীদা' গ্রন্থে ও 'মুসলমানী নেসাব' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করবে। আবার এ বিষয়ের প্রতি সার্বক্ষণিক সচেতনতা ছাড়া সকল ইবাদতই অর্থহীন। এজন্য এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে এ বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া বা এই দুটি বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করাই ইসলামের মূল ভিত্তি। ঈমানের প্রথম অংশ (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য বা মা'বুদ নেই) এই সাক্ষ্য প্রদান করা। দ্বিতীয় অংশ (মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল) এই সাক্ষ্য প্রদান করা। প্রথম অংশকে সংক্ষেপে "তাওহীদ" ও দ্বিতীয় অংশকে সংক্ষেপে "রিসালাত" বলা হয়।

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, তাওহীদের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। **প্রথমত,** জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ। এই পর্যায়ে মহান আল্লাহকে তাঁর গুণাবলী ও কর্মে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহই এই মাহবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিযিকদাত ও পালনকর্তা। এ সকল কর্মে তাঁর কোনো শরীক বা সমকক্ষ নেই।

দ্বিতীয়ত, কর্ম পর্যায়ের একত্ব বা ইবাদতের একত্ব। এ পর্যায়ে বান্দার কর্মে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা হয়। অর্থাৎ বান্দার সকল প্রকার ইবাদাত বা উপাসনা আরাধনা মূলক কর্ম যেমন প্রার্থনা, সাজদা, জবাই উৎসর্গ, মানত, তাওয়াক্কুল, ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর জন্য করা ও আল্লাহরই প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা এই পর্যায়ের তাওহীদ।

তাওহীদের এই দুইটি পর্যায় একে অপরের সম্পূরক ও পরস্পরে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়কে পৃথক করা যায় না বা একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির উপর ঈমান এনে মুসলিম হওয়া যায় না। তবে এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, ঈমানের প্রথম অংশ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-তে মূলত দ্বিতীয় পর্যায় বা ''তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্''-র বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়নি যে (লা খালিকা ইল্লাল্লাহ) অর্থাৎ (আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই,), বা (লা রাযিকা ইল্লাল্লাহু) অর্থাৎ (আল্লাহ ছাড়া কোন রিজিকদাতা নেই)। অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া কোন জীবনদাতা নেই, মৃত্যুদাতা নেই, পালনকর্তা নেই ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্য দানের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং আমাদের এই ঘোষণা দিতে হবে, এই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য বা মাবুদ নেই।

এর কারণ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে মক্কার কাফিরগণ এবং সকল যুগের কাফির-মুশরিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করত। তারা একবাক্যে স্বীকার করত যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, তিনিই সর্বশক্তিমান এবং সকল কিছুর একমাত্র মালিক তিনিই।[১]

মহান আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের এই বিশ্বাস নিয়ে তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত বা উপাসনা করতো। তাঁকে সাজদা করত, তাঁর নামে মানত করত, তাঁর কাছে প্রার্থনা করত, সাহায্য চাইত। তবে তারা এর পাশাপাশি অন্যান্য দেবদেবী, নবী, ফিরিশতা, ওলী, পাথর, গাছগাছালি ইত্যাদির পূজা উপাসনা করত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত, উপাসনা বা পূজা করা যাবে না এই কথাটি

তারা মানতো না। তাদের দাবি ছিল যে, কিছু মানুষ ও ফিরিশতা আছেন যারা মহান আল্লাহর খুবই প্রিয়। এদের ডাকলে, এদের পূজা-উপাসনা করলে আল্লাহ খুশি হন ও তাঁর নৈকট্য, প্রেম ও সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এছাড়া তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল প্রিয় সৃষ্টির সুপারিশ আল্লাহ শুনেন। কাজেই এদের কাছে প্রার্থনা করলে এরা আল্লাহর নিকট থেকে সুপারিশ করে ভক্তের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করে দেন। এজন্য তারা এ সকল ফিরিশতা, জিন, মানুষ, নবী, ওলী বা কল্পিত ব্যক্তিত্বের মুর্তি, সমাধি, স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্যকে সম্মান করত এবং সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে সাজদা, মানত, কুরবানী ইত্যাদি করত।[১]

এজন্য ইসলামে ইবাদতের তাওহীদের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মূলত এর মাধ্যমেই ঈমান ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

আল্লাহর একত্বে বা তাওহীদের বিশ্বাসের ৬টি দিক রয়েছে, যেগুলিকে আরকানুল ঈমান বা ঈমানের স্তম্ভ বলা হয়। (১) আল্লাহর উপর বিশ্বাস, (২) আল্লাহর মালাইকা বা ফিরিশতাগণের উপর বিশ্বাস, (৩) আল্লাহর গ্রন্থসমূহের উপর বিশ্বাস, (৪) আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, (৫) আখেরাতের উপর বিশ্বাস, (৬) আল্লাহর জ্ঞান ও নির্ধারণ বা তাকদীরে বিশ্বাস।

ঈমানের দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা। এ কথা বিশ্বাস করা যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল। মানবজাতির মুক্তির পথের নির্দেশনা দানের জন্য তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন। মানবজাতির মুক্তির পথ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকে দান করেছেন। তিনি আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তার পরে আর কোনো ওহী নাযিল হবে না, কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। তিনি বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তার আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। তার রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন মানুষই মুক্তির দিশা পাবে না। তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বজনীন নবী ও রাসূল হিসাবে তার নবুয়তের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তার উম্মতকে শিখিয়ে গিয়েছেন, কোন কিছুই তিনি গোপন করেননি। তিনি যা কিছু উম্মতকে শিখিয়েছেন, জানিয়েছেন সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন। তার সকল শিক্ষা, সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। আল্লাহকে ডাকতে হলে, তাঁকে পেতে হলে, তার ইবাদত করতে বা তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অবশ্যই তাঁর শিক্ষা অনুসারে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা ইবাদত করতে হবে। তার শিক্ষার বাইরে ইবাদত করলে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান করতে হবে এবং সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসতে হবে। তাঁর ভালবাসার অংশ হিসেবে তাঁর সাহাবীগণ ও বংশধরকে ভালবাসতে হবে। ভালবাসা, ভক্তি ও মর্যাদা ক্ষেত্রে অবশ্যই মুমিনকে কুরআন কারীম ও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত তাঁর বাণীর উপর নির্ভর করতে হবে। মনগড়াভাবে কিছুই বলা যাবে না। নিজের পছন্দ-অপছন্দ অবশ্যই তাঁর শিক্ষার অধীন করতে হবে।

খ. ফরয ও নফল পালন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, বেলায়াতের পথে চলার ক্ষেত্রে কর্ম দুই প্রকার : (১) ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় কর্ম, ও (২) ফরযের অতিরিক্ত নফল বা সুন্নাত ইবাদত। ফরয ইবাদত পালনই আল্লাহর বেলায়েত, নৈকট্য, সাওয়াব ও সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম কর্ম। ফরযের পরে অনবরত নফল ইবাদত পালন বান্দাকে আল্লাহর বন্ধুত্ব বা বেলায়েতের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় যিক্‌রেরও দুটি পর্যায় আছে : (১) ফরয যিক্‌র, যেমন, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র ও (২) নফল যিক্‌র, যা মূলত আমাদের আলোচনার বিষয়। যদি কোনো মুমিন অন্যান্য ফরয ইবাদত আদায় করার পরে নফল যিক্‌র আদায় করেন তাহলে তার যিক্‌র হবে অত্যন্ত ফলদায়ক। কিন্তু তিনি যদি ফরয যিক্‌র ও অন্যান্য ফরয ইবাদতে অবহেলা করেন, অথচ নফল যিক্‌র বেশি বেশি করেন তাহলে তা নিঃসন্দেহে বাতুলতা।

অনেকে ফরয ইবাদত পালন করেন না। ফরয ইল্‌ম, আকীদা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্ব, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত (যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য) পালন না করে নফল ইবাদত পালন করা, নফল যিক্‌র ইত্যাদি পালন বিশেষ কোনো উপকারে লাগবে না। অবস্থা বিশেষে হয়ত নফল ইবাদত কোনো কোনো ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। কিন্তু কোনো অস্থাতেই তা আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়েতের মাধ্যম নয়। ফরয পরিত্যাগ করলে হারামের গোনাহ হয়। হারামের গোনাহে রত অবস্থায় নফল ইবাদতের অর্থ হলে সর্বাঙ্গে মলমূত্র লাগানো অবস্থায় নাকে আতর মাখা।

এছাড়া, ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সকল নফল ইবাদত থাকে তাও ফরযের বাইরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। সালাতের মধ্যে অসংখ্য ফরয, সুন্নাত ও নফল যিক্‌র আযকার রয়েছে। এগুলি বিশুদ্ধভাবে পালন করা সালাতের বাইরে সারাদিন বিশুদ্ধ মাসনূন যিক্‌রের চেয়ে অনেক উত্তম। এর অর্থ এই নয় যে, বিশুদ্ধ সালাত আদায় করলেই চলবে। এর অর্থ , নফল যিক্‌র আযকারে রত হওয়ার আগে সালাত ইত্যাদি ফরয যিক্‌র ও তৎসংশ্লিষ্ট নফল যিক্‌র বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে। তা না হলে আমাদের যিক্‌র আযকার পণ্ডশ্রম ও সুন্নাত বিরোধী হয়ে যাবে। এ বিষয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর বক্তব্য আমরা পুস্তকের শুরুতে উল্লেখ করেছি।

ফরয ও নফলের দু'টি শ্রেণী রয়েছে , – পালন ও বর্জন। কোনো কাজ করা যেরূপ ফরয, তেমনি কিছু কাজ বর্জন করা ফরয। এসকল কাজ করাকে হারাম বলা হয়। অনুরূপভাবে কিছু কর্ম করা নফল-মুসতাহাব বা সুন্নাত। আবার কিছু কাজ বর্জন করাও নফল-

---

মুসতাহাব বা সুন্নাত। এ ধরনের কাজ করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। মাকরুহ কখনো হারামের নিকটবর্তী হয়, যাকে মাকরুহ তাহরীমি বলা হয়। কখনো তা মাকরুহ তানযিহী বা অনুচিত পর্যায়ের হয়, যা বর্জন করা উত্তম তবে করলে গোনাহ হবে না।

আল্লাহর নৈকট্যের পথে কর্মের চেয়ে বর্জনের গুরুত্ব বেশি। যা করা ফরয তা করতেই হবে। আর যা বর্জন করা ফরয তা বর্জন করতেই হবে। যে ব্যক্তি তার উপরে ফরয এরূপ কোনো কর্ম পালন করছেন না, বা তার জন্য হারাম এরূপ কোনো কার্যে রত রয়েছেন, অথচ বিভিন্ন নফল মুসতাহাব কর্ম পালন করছেন তার কাজকে আমরা ইসলামের শিক্ষা বিরুদ্ধ বলতে বাধ্য। তিনি জেনে অথবা না জেনে ভণ্ডামীতে রত রয়েছেন।

দ্বিতীয় স্তরে নফল পর্যায়ে বর্জনীয় নফলের গুরুত্ব করণীয় নফলের থেকে অনেক বেশি। সাজানোর পূর্বে পরিচ্ছন্নতা। নিজেকে নোংরা, অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে এরপর যতটুকু সম্ভব সাজগোজ করতে হবে। এজন্য সকল প্রকার মাকরুহ বর্জন করা নফল ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم

"আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু নিষেধ করলে তা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করবে। আর তোমাদেরকে যা করতে নির্দেশ প্রদান করব তা সাধ্যমত করবে।"[১]

আমরা এই গ্রন্থে মূলত নফল যিক্‌র সম্পর্কে আলোচনা করছি। এ সকল নফল যিক্‌র পালনের চেয়ে মাকরুহ বর্জন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য যাকিরকে এ সকল যিক্‌র পালনের পাশাপাশি সকল প্রকার মাকরুহ বর্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। কখনো কোনো মাকরুহ করে ফেললে বেশি বেশি তাওবা করতে হবে। ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মাকরুহের মধ্যে নিয়োজিত রেখে পাশাপাশি এ সকল যিক্‌র আযকারে রত থাকা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর শিক্ষা, সুন্নাত ও রীতির ঘোর বিরোধী ও বিপরীত।

গ. কবীরা গোনাহ বর্জন

এভাবে মুমিন সর্বদা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কর্ম পরিহার করতে চেষ্টা করবেন। আর হারাম ও কবীরা গোনাহ-সমূহ থেকে শত যোজন দূরে থাকতে সদা সচেষ্ট থাকবেন। আমরা জানি যে, সকল চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু অপরাধ হবেই। তবে ছোটখাট পাপ ও ভুলভ্রান্তি আল্লাহ নেক কর্মের কারণে ক্ষমা করে দেন। এজন্য কঠিন পাপগুলি থেকে দূরে থাকার জন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা, সংখ্যা ও পরিচয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম অনেক কথা লিখেছেন। যে সকল পাপের বিষয়ে কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফে কঠিন গজব, শাস্তি বা অভিশাপের উল্লেখ করা হয়েছে বা যে সকল কর্মকে কুরআন বা হাদীসে কঠিন পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিকে কবীরা গুনাহ হিসাবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও অনেক পাপকে কবীরা বলা হয়েছে। এছাড়া যে কোনো সাধারণ পাপও সর্বদা করলে তা বড় পাপে পরিণত হয়।

ইমাম যাহাবী "আল-কাবাইর" গ্রন্থে কবীরা গুনাহ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস সমূহ সংকলিত করেছেন। যে সকল পাপকে কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফে বড় পাপ বা কঠিন শাস্তি, গজব বা অভিষাপের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সেগুলির তালিকা প্রদান করেছেন। আমি এখানে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। পরে এগুলির মধ্য থেকে বিশেষ কতগুলি পাপ যা আমাদের নেক কাজগুলিকে বিনষ্ট করে দেয় সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ।

এ সকল পাপ বা অপরাধকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি : ব্যক্তিগত বা হক্কুল্লাহ বিষয়ক ও সামাজিক বা হক্কুল ইবাদ বিষয়ক। যদিও উভয় প্রকার পাপই আল্লাহর অবাধ্যতা ও পরস্পরে সম্পৃক্ত, তবুও সংক্ষেপে বুঝার জন্য দুইভাগ করে আলোচনা করছি:

প্রথমত, হক্কুল্লাহ বিষয়ক বা ব্যক্তিগত কবীরা গুনাহসমূহ

১. **ঈমান বিষয়ক :** শিরক, কুফর, নিফাক, বিদ'আত, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা বোধ করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, তকদীরে অবিশ্বাস করা, গনক বা জ্যোতিষীর কথা সত্য মনে করা, অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রায় বিশ্বাস করা, মক্কার হারামে যে কোনো প্রকার অন্যায় করার ইচ্ছা, যাদু শিক্ষা বা ব্যবহার, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জবাই করা, নিজের জীবন, সম্পদ, ও সকল মানুষের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বেশি ভালবাসায় ত্রুটি থাকা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা হাদীস বলা, নিজের পছন্দ-অপছন্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও শরীয়তের অনুগত না হওয়া, বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া, আত্মহত্যা করা।

২. **ফরয ইবাদত পরিত্যাগ বিষয়ক :** সালাত পরিত্যাগ, যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা, ওজর ছাড়া রমযানের সিয়াম পালনে অবহেলা, জুম'আর সালাত পরিত্যাগ করা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব আদায় না করা, ধর্ম পালনে অতিশয়তা বা সুন্নাতের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ইবাদত করা, সালাতরত ব্যক্তি সামনে দিয়ে গমন করা।

৩. **হারাম খাদ্য ও পানীয় :** মদপান, মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত ভক্ষণ করা, স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান করা।

৪. **পবিত্রতা ও অন্যান্য অভ্যাস বিষয়ক :** পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়া, মিথ্যা বলার অভ্যাস, প্রাণীর ছবি তোলা বা আঁকা, কৃত্রিম চুল লাগান, শরীরে খোদাই করে উল্কি লাগান। পুরুষের জন্য মেয়েলী পোশাক বা চাল চলন, টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরা, সোনা ও রেশমের ব্যবহার, গোফ বেশি বড় করা, দাড়ি না রাখা। মেয়েদের জন্য পুরষালী পোশাক বা আচরণ, সৌন্দর্য প্রকাশক পোশাক পরিধান করে, মাথা, মাথার চুল বা শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত রেখে বা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া।

৫. **অন্তরের বা মনের পাপ :** অহংকার, গর্ব করা, নিজেকে বড় ভাবা, নিজের মতামত বা কর্মের প্রতি পরিতৃপ্ত থাকা, রিয়া, হিংসা, কোনো

মুসলিমকে হেয় বা ছোট ভাবা, ক্রোধ, প্রশংসা ও সম্মানের লোভ, সম্পদের লোভ, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা, দ্বীনী ইল্ম পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা, ইল্ম গোপন করা।

এগুলির মধ্যে কিছু পাপের সাথে মানুষের অধিকার জড়িত। মিথ্যা হাদীস বলা এমনিতেই ভয়ঙ্করতম পাপ। সাথে সাথে এই মিথ্যা দ্বারা যারা প্রভাবিত হয়, বিপথগামী হয় তাদের সকলের পাপের ভাগ পেতে হয় মিথ্যাবাদীকে। যাকাত প্রদানে অবহেলা করলে একদিকে আল্লাহর অবাধ্যতা ও ইসলামের রুকন নষ্ট করা হয়। সাথে সাথে সমাজের দরিদ্রদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ইল্ম গোপন করলে সাধারণত সমাজের মানুষেরা অজ্ঞতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং এই আলিম তাদের অপরাধের জন্য দায়ী থাকেন। যাদু ও মিথ্যা বলার অভ্যাস যদি কারো কোনো ক্ষতি না করে তাহলেও কবীরা গোনাহ। পক্ষান্তরে কারো কোনো প্রকার ক্ষতি করলে তা দ্বিতীয় একটি কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে অহংকার, হিংসা, কাউকে হেয় ভাবা ইত্যাদি ব্যক্তিগত কবীরা গোনাহ হলেও সাধারণত এগুলির অভিব্যক্তি ব্যক্তির বাইরে প্রকাশিত হয়ে অন্যদের কষ্ট দেয়। তখন তা আরো অনেক হক্কুল ইবাদ সংশ্লিষ্ট কবীরা গোনাহের মধ্যে ব্যক্তিকে নিপতিত করে। কৃপণতা যদিও মানসিক পাপ ও ব্যাধি, কিন্তু সাধারণত এই ব্যধি মানুষকে বান্দার হক নষ্ট বা ক্ষতি করার অনেক পাপের দিকে প্ররোচিত করে।

দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির অধিকার সংক্রান্ত কবীরা গোনাহসমূহ

কুরআন-হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় যে, মানুষের মূল দায়িত্ব দুটি ও পাপের সূত্রও দুটি। প্রথম দায়িত্ব, মানুষ তার মহান প্রভুর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস, অগাধ ভালবাসা ও আস্থা পোষণ করবে এবং এই আস্থা, বিশ্বাস ও ভালবাসা বৃদ্ধিপায় এমন সকল কর্ম আল্লাহর মনোনীত রাসূলের শিক্ষা অনুসারে পালন করবে। আর এই দায়িত্বে অবহেলা সৃষ্টি করে এমন সকল কর্ম বা চিন্তচেতনাই প্রথম পর্যায়ের পাপ।

মানুষের দ্বিতীয় দায়িত্ব, এই পৃথিবীকে সুন্দর বসবাসযোগ্য করতে তার আশেপাশে সকল মানুষ ও জীবকে তারই মতো ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করা। আর এই দায়িত্বের অবহেলা জনিত কর্মই দ্বিতীয় পর্যায়ের পাপ। আল্লাহর সৃষ্টির কষ্ট প্রদান, ক্ষতি করা, শান্তি বিনষ্ট করা বা অধিকার নষ্ট করাই মূলত সবচেয়ে কঠিন অপরাধ। এ জাতীয় পাপগুলিকে কুরআন বা হাদীসে বেশি আলোচনা করা হয়েছে, বেশি বিশ্লেষণ ও ভাগ করা হয়েছে। একই জাতীয় পাপের শাখা প্রশাখাকে বিশেষভাবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এর তালিকাও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

১. ইসলাম নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধীর (চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি) শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ বা চেষ্টা করা।
২. আইনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কোনো মানুষকে খুন বা হত্যা করা। এমনকি ডাকাতী, খুন, ধর্মদ্রোহিতা ইত্যাদি ইসলামী বিধানে যে অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে নির্ধারিত সেই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কোনো ব্যক্তি নিজের হাতে শাস্তি দিলে তা হবে খুন বা হত্যা। একমাত্র উপযুক্ত আদালতের বিচারের মাধ্যমেই অপরাধীর অপরাধ, তার মাত্রা ও তার শাস্তি নির্ধারিত হবে। যথাযথ বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে অপরাধী মনে করা বা শাস্তি দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টির অধিকার নষ্টকারী কঠিন অপরাধ।
৩. রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসক বা বিচারক কর্তৃক জনগণের দায়িত্ব, সম্পদ বা আমানত আদায়ে অবহেল বা ফাঁকি দেওয়া।
৪. নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক, প্রশাসক বা প্রধানকে ধোকা দেওয়া বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কিছু করা।
৫. রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ।
৬. অন্যায় দেখেও সাধ্যমতো প্রতিকার বা প্রতিবাদ না করা।
৭. রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে থেকে মৃত্যুবরণ করা।
৮. রাষ্ট্র প্রশাসনের অন্যায় বা জুলুম সমর্থন বা সহযোগিতা করা।
৯. সমাজের মানুষদেরকে কবীরা গোনাহের কারণে কাফির বলা বা মনে করা।
১০. বিচারকের জন্য ন্যায় বিচারে একনিষ্ট না হওয়া বা বিচার্য বিষয়ের বাইরে কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচার করা।
১১. আইন প্রয়োগকারীর জন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা ও আপনজনদের জন্য হালকাভাবে শাস্তি প্রয়োগ করা।
১২. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা প্রয়োজনের সময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা।
১৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ, দখল বা ভোগ করা, তা যত সামান্যই হোক।
১৪. মুনাফিককে নেতা বলা।
১৫. জিহাদের মাঠ থেকে পালিয়ে আসা।
১৬. মুসলিমগণকে কষ্ট প্রদান ও গালি দেওয়া।
১৭. জুলুম, যবরদস্তি, মিথ্যা মামলা বা অবৈধভাবে কোনো মানুষ থেকে কিছু গ্রহণ করা।
১৮. হাটবাজার, রাস্তাঘাটে টোল আদায় করা বা চাঁদাবাজী করা।
১৯. মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট প্রদান বা তার অধিকার নষ্ট। যে কোনো মানুষকে কষ্ট দেওয়াই কঠিন পাপ। তবে হাদীস শরীফে বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণীগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সাধারণ নির্দেশনা তো আছেই।
২০. কোনো মহিলা বা এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা। যে কোনো মানুষের সামান্যতম সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ অন্যতম কবীর গোনাহ। তবে মহিলা ও এতিম যেহেতু দুর্বল এজন্য হাদীস শরীফে তাদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে তাদের সম্পদ অবৈধ দখল বা ভোগকারীর জন্য কঠিনতম শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
২১. আল্লাহর প্রিয় ধার্মিক বান্দাগণকে কষ্ট প্রদান বা তাদের সাথে শত্রুতা করা।
২২. প্রতিবেশীর কষ্ট প্রদান।

২৩. কোনো মাজলিসে এসে খালি জায়গা দেখে না বসে ঠেলাঠেলি করে অন্যদের কষ্ট দিয়ে মাজলিসের মাঝে এসে বসে পড়া বা এমনভাবে মাঝে বসা যাতে অন্য মানুষদের অসুবিধা হয়।
২৪. কারো স্ত্রী বা চাকর বাকর ফুসলিয়ে সরিয়ে দেওয়া।
২৫. কর্কশ ব্যবহার ও অশ্লীল- অশ্রাব্য কথা বলা।
২৬. অভিশাপ বা গালি দানে অভ্যস্ত হওয়া।
২৭. কোনো মুসলিমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু অর্থলাভ করা।
২৮. তিন দিনের অধিক কোনো মুসলিমের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা।
২৯. মুসলিমগণের একে অপরকে ভালো না বাসা, বা তাদের মধ্যে ভালবাসার অভাব থাকা।
৩০. মুসলিমদের গোপন দোষ খোঁজা, জানা ও বলে দেওয়া।
৩১. নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্য তা পছন্দ না করা।
৩২. কোনো ব্যক্তিকে তার বংশের বিষয়ে অপবাদ দেওয়া।
৩৩. পিতামাতার অবাধ্য হওয়া বা তাঁদের কষ্ট প্রদান করা।
৩৪. সুদ গ্রহণ করা, প্রদান করা, সুদ লেখা বা সুদের সাক্ষী হওয়া।
৩৫. ঘুষ গ্রহণ করা, প্রদান করা ও ঘুষ আদান প্রদানের মধ্যস্থতা করা।
৩৬. মিথ্যা শপথ করা।
৩৭. হীলা বিবাহ করা বা করানো।
৩৮. আমানতের খেয়ানত করা।
৩৯. কোনো মানুষের উপকার করে পরে খোটা দেওয়া।
৪০. মানুষের গোপন কথা শোনা বা জানার চেষ্টা করা।
৪১. স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবাধ্য হওয়া।
৪২. স্বামীর জন্য স্ত্রীর টাকা বা সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে ভোগ বা দখল করা।
৪৩. চোগলখুরী করা বা একজন মানুষের কাছে অন্য মানুষের নিন্দামন্দ ও শত্রুতামূলক কথা বলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট করা।
৪৪. গীবত বা পরচর্চা করা। অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে বিরাজমান বাস্তব ও সত্য দোষগুলি উল্লেখ করা।
৪৫. অসত্য দোষারোপ করা। অর্থাৎ কারো মধ্যে যে দোষ বিরাজমান নেই অনুমানে বা লোকমুখে শুনে সেই তার সম্পর্কে সেই দোষের কথা উল্লেখ করা।
৪৬. জমির সীমানা পরিবর্তন করা।
৪৭. মহান সাহাবীগণকে গালি দেওয়া।
৪৮. আনসারগণকে গালি দেওয়া।
৪৯. পাপ বা বিভ্রান্তির দিকে বা খারাপ রীতির দিকে আহ্বান করা।
৫০. কারো প্রতি অস্ত্র জাতীয় কিছু উঠান বা হুমকি প্রদান।
৫১. নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলা।
৫২. জেদাজেদি ঝগড়া, বিতর্ক কলহ বা কোন্দল।
৫৩. ওজন, মাপ বা দ্রব্যে কম দেওয়া বা ভেজাল দেওয়া।
৫৪. কোনো উপকারীর উপকার অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
৫৫. নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে প্রদান থেকে বিরত থাকা।
৫৬. কোনো প্রাণীর মুখে আগুণে পুড়িয়ে বা কেঁটে দাগ বা মার্কা দেওয়া।
৫৭. জুয়া খেলা।
৫৮. অবৈধ ঝগড়া বা গোলযোগে সহযোগিতা করা।
৫৯. কথাবার্তায় সংযত না হওয়া।
৬০. ওয়াদা ভঙ্গ করা।
৬১. উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
৬২. স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক তাদের একান্ত গোপনীয় কথা অন্য কাউকে বলা।
৬৩. কারো বাড়ি বা ঘরের মধ্যে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি করা।
৬৪. কেউ আল্লাহর নামে শপথ করে সাহায্য বা ক্ষমা চাইলে আর তার প্রতি বিরক্ত থাকা অথবা তাকে ক্ষমা বা সাহায্য না করা।
৬৫. যা কিছু শোনা হয় বিচার বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য নির্ধারণ না করে তা বলা।
৬৬. বঞ্চিত ও দরিদ্রদেরকে খাদ্য প্রদানে ও সাহায্য দানে উৎসাহ না দেওয়া।
৬৭. ব্যভিচার, সমকামিতা বা যৌন অনাচার ও অশ্লীলতা।
৬৮. নিরপরাধ মানুষকে, বিশেষত মহিলাকে ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর স্পষ্ট সাক্ষ্য ছাড়া ব্যভিচার বা অনৈতিকতার অপবাদ দেওয়া।

৬৯. মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা প্রসার করতে পারে এমন কোনো গল্পগুজব বা কথাবার্তা বলা বা প্রচার করা। এর মধ্যে সকল পর্নোগ্রাফি, ছবি, অশ্লীল উপন্যাস ও গল্প অন্তর্ভুক্ত। এগুলির প্রচার, বিক্রয়, আদান প্রদান সবই কবীরা গোনাহ।

উপরের সকল পাপই অত্যন্ত ক্ষতিকর। কুরআন ও হাদীসে এগুলির ভয়ঙ্কর শাস্তি ও খারাপ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো পাপ নেক আমলের ফলে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। আবার কোনো কোনো পাপ সকল নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। এ সকল ইবাদত বিনষ্টকারী পাপের অন্যতম শিরক, কুফর, অহঙ্কার, হিংসা, অপরের অধিকার নষ্ট করা, গীবত করা ইত্যাদি।

ঘ. আল্লাহর পথের পথিকদের পাপ

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর পথে চলতে সচেষ্ট ও ধর্ম-সচেতন অনেক মানুষ অনেক সময় এসব ইবাদত বিধ্বংসী পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যান। অনেক সচেতন মুসলিম ব্যভিচার, মিথ্যা, মদপান, সালাত বা সিয়াম পরিত্যাগ ইত্যাদি পাপে কখনোই লিপ্ত হন না। কখনো এরূপ কিছু করলে সকাতরে তাওবা-ইসতিগফার করতে থাকেন। কিন্তু জেনে অথবা না জেনে তাঁরা শির্ক, কুফ্র, বিদ'আত, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, আত্মতুষ্টি, গীবত ইত্যাদি পাপের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছেন।

এর কারণ, কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই শয়তান কখনো নিরাশ হয় না। প্রত্যেক মানুষকেই কোনো না কোনোভাবে বিভ্রান্ত করতে ও পাপে লিপ্ত করতে সে সদা সচেষ্ট। সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য তার নিজস্ব পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী রয়েছে। সবাইকেই সে পরিপূর্ণ ধর্মহীন অবিশ্বাসী করতে চায়। যাদের ক্ষেত্রে সে তা করতে সক্ষম না হয় তাদেরকে সে 'ধর্মের আবরণে' পাপের মধ্যে লিপ্ত করে। অথবা বিভিন্ন প্রকার 'অন্তরের পাপে' লিপ্ত করে, যেগুলি নেককার মানুষের নেক-আমল নষ্ট করে দেয়, অথচ সেগুলিকে অনুধাবন করা অনেক সময় ধার্মিক মানুষের জন্যও কষ্টকর হয়ে যায়। আমরা এখানে এ জাতীয় কিছু পাপের কথা আলোচনা করতে চাই।

<u>(১) শিরক</u>

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিছু কর্ম আছে যা আমাদের অর্জিত পুণ্য, সাওয়াব ও সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে দেয়। এ ধরনের কর্ম থেকে বিরত হতে না পারলে আমাদের যিক্র-আযকার সবই ব্যর্থ হবে। এ সকল পাপের অন্যতম শিরক। শিরক মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ। শিরক অর্থ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। আল্লাহর কর্মে বা তাঁর গুণাবলীতে বা ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার বলে মনে করাই শিরক।

শিরকের ব্যাখ্যা ও বিবরণ প্রদান এখানে সম্ভব নয়। প্রত্যেক মুমিনের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করা। এখানে সামান্য কিছু আলোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয় মনে করছি।

কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে: "তাদের (মানুষদের) অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে।"[১] এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশ্বাসী ও ধার্মিক মানুষই শির্ক করে। আর যেনতেন কোনো সৃষ্টিকে সে আল্লাহ সাথে শরীক করে না, বরং আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক আছে মনে করেই কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সে শরীক করে। শিরকের মূল নবী, ওলী, ফিরিশতা, জিন বা প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে 'ঐশ্বরিক ক্ষমতা' বা 'আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক' কল্পনা করা। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার কাছে বা তার মুর্তি, সমাধি বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানে তার সাহায্য-সহানুভুতি কামনা করে প্রার্থনা, উৎসর্গ ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করা।

আল্লাহর কর্ম ও গুণাবলীতে শিরক করা

এই বিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ। অন্য কোনো সৃষ্টি, প্রাণী, মানুষ, নবী, ওলী, ফিরিশতা বা কোনো কিছু সৃষ্টি, পরিচালনা, অদৃশ্য জ্ঞান, অদৃশ্য সাহায্য, রিযিক দান, জীবন দান, সুস্থতা বা রোগব্যধি দান, বৃষ্টি দান, বরকত দান, অনাবৃষ্টি প্রদান, অমঙ্গল প্রদান ইত্যাদি কোনো প্রকার কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা রাখেন বা আল্লাহ কাউকে অনুরূপ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন বলে বিশ্বাস করা শিরক। আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে অনেক বিষয়ের দায়িত্ব প্রদান করেছেন, কিন্তু ক্ষমতা প্রদান করেন নি। ফিরিশতা ছাড়া কোনো নবী, ওলী বা কাউকে কোনোরূপ দায়িত্ব বা ক্ষমতা কিছুই প্রদান করেন নি। আল্লাহ কাউকে কোনো অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলে বিশ্বাস করা শিরক।

এই জাতীয় একটি অতি প্রচলিত শিরক অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা। কোনো বস্ত, প্রাণী, কর্ম, বার, তিথি, মাস ইত্যাদিকে অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রা বলে মনে করা স্পষ্ট শিরক। আমাদের দেশে অনেক মুসলিমও 'কী করলে কী হয়' জাতীয় অনেক বিষয় লিখেন বা বিশ্বাস করেন। এগুলি সবই শিরক। জন্মদিনে নখ বা চুল কাটা, ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখা, রাতে নখ কাটা, পিছন থেকে ডাকা, কাক ডাকা ইত্যাদি অগণিত বিষয়কে অমঙ্গল বা অশুভ মনে করা হয়, যা নিতান্তই কুসংস্কার, মিথ্যা ও শিরকী বিশ্বাস। পাপে অমঙ্গল ও পুণ্যে কল্যাণ ; এছাড়া অমঙ্গল বা অশুভ বলে কিছুই নেই।

আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা

ইবাদত অর্থ উপাসনা, পূজা বা আরাধনা। সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর পাওনা। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই"ইসলামের ভিত্তি ও মুমিনের অন্যতম যিক্র। দুঃখজনক বিষয়, প্রতিদিন কয়েক হাজার বার "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বদু নেই" যিক্র করেও অনেক যাকির আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত, পূজা, উপাসনা বা আরাধনা করে থাকেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রার্থনা বিষয়ক আলোচনায় কিছু কথা উল্লেখ করেছি। সাজদা করা, দু'আ করা, মানত

করা, কুরবানি বা উৎসর্গ (sacrifice) করা এগুলি সবই ইবাদত। আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য জীবিত বা মৃত, বিমূর্ত, মূর্ত, প্রস্তরায়িত বা সমাধিস্থ, নবী, ওলী, ফিরিশতা বা যে কোনো নামে বা প্রকারে কারো জন্য এগুলি করা হলে তা শিরক হবে। এছাড়া মূর্তিতে ফুলদান, মূর্তির সামনে নীবরে বিনয়ে দাঁড়ানো ইত্যাদি কর্মও এই পর্যায়ের।

শিরক মানব জীবনের কঠিনতম পাপ। অন্যান্য পাপের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য তিনটি: (১). শিরক ও কুফর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও কঠিনতম পাপ, এর উপরে কোনো পাপ নেই। (২). অন্যান্য সকল পাপ আল্লাহ বিভিন্ন নেক কর্মের কারণে বা দয়া করে তাওবাসহ বা তাওবা ছাড়া ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু শিরক-কুফরী পরিত্যাগ করে তাওবা না করলে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না। (৩). শিরক ও কুফরীর কারণে অন্য সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়।

কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ কুরআন করীমে ইরশাদ করেছেন : "তোমার কাছে এবং তোমার পূর্বের নবী-রাসূলগণের কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সকল কর্ম বিনষ্ট হবে এবং তুমি অবশ্যই ধ্বংসগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১]

(২) কুফ্র বা অবিশ্বাস

কুফর অর্থ অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা। আল্লাহ, তাঁর রাসূল বা তাঁর দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা কুফরী। আমাদের মুসলিম সমাজের প্রচলিত কুফরীর মধ্যে অন্যতম আল্লাহর বিভিন্ন বিধান, যেমন - সালাত, পর্দা, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি, ইসলামী আইন ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ বা এগুলিকে বর্তমানে অচল মনে করা। ইসলামকে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে পালন করতে হবে এবং সমাজ, বিচার, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম চলবে না বলে মনে করা, ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কোনো সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা, ওয়ায, মাহফিল, যিক্র, তিলাওয়াত, সালাত, মাদ্রাসা, মসজিদ, বোরকা, পর্দা ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা অনুভব করা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবী-রাসূলের প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা প্রকাশ করা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করা, তাঁর পরে কারো কাছে কোনো প্রকার ওহী এসেছে বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই কুফরী।

সুস্পষ্ট কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। তাওহীদ বা রিসালাত অস্বীকার করে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে কোনো ওহী নাযিল হতে পারে বা কোনো নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তির বিশ্বাসের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা, তাকে মুসলিম মনে করা বা তার বিশ্বাসও সঠিক বলে মনে করা কুফরী। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম বলে মনে করা, অন্যান্য ধর্মের শিরক বা কুফরীমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, সেগুলির প্রতি মনের মধ্যে ঘৃণাবোধ না থাকা, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করা, ক্রিসমাস (বড়দিন), পূজা ইত্যাদিতে আনন্দ করা বা উদ্‌যাপন করা ইত্যাদি বর্তমান যুগে অতি প্রচলিত কুফরী কর্ম ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

গণক, জ্যোতিষী, রাশি, হাত, জটা ফকির ইত্যাদি সকল প্রকার ভাগ্য, গোপন বিষয় বা ভবিষ্যৎ গণনা করা, অথবা এসকল মানুষের কথায় বিশ্বাস করা কুফরী। এরূপ কোনো কোনো কর্ম ইসলামের নামেও করা হয়। যেমন, 'এলেম দ্বারা চোর ধরা' ইত্যাদি। যে নামে বা যে পদ্ধতিতেই করা হোক গোপন তথ্য, গায়েব, অদৃশ্য, ভবিষ্যৎ বা ভাগ্য গণনা বা বলা জাতীয় সকল কর্মই আরবী (কাহানা)-র অন্তর্ভুক্ত ও কুফরী কর্ম।

শিরকের ন্যায় কুফরীও মানুষের জীবনের সকল কর্ম বিনষ্ট করে দেয়। এবিষয়েও অগণিত আয়াত ও হাদীস রয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে : "আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী (অবিশ্বাস) করবে, তার কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২]

(৩). বিদ'আত বা ধর্মের মধ্যে নব উদ্ভাবন

যে কর্ম, বিশ্বাস, রীতি বা আচার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ ধর্মীয় কর্ম হিসাবে, সাওয়াব, আল্লাহর নৈকট্য বা ইবাদত হিসাবে পালন করেননি, এরূপ কোনো কর্ম, বিশ্বাস, রীতি বা আচারকে ধর্মের অংশ বা সাওয়াবের কর্ম বলে মনে করা বিদ'আত। বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির ইবাদত, বন্দেগি আল্লাহ কবুল করবেন না বলে বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে। শিরকের ন্যায় বিদ'আতের পাপেও ধার্মিক মানুষেরাই লিপ্ত হন। ধার্মিক মানুষদেরকে পাপে লিপ্ত করার জন্য শয়তানের অন্যতম মাধ্যম বিদ'আত। এই পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে সুন্নাত, সুন্নাতের অনুসরণ, সুন্নাতের খেলাফ চলা, উদ্ভাবন ও বিদ'আত সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আমি "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছি। এজন্য এখানে এ বিষয়ে আলোচনা পরিত্যাগ করছি।

(৪) অহঙ্কার বা তাকাব্বুর

নিজেকে অন্য কোনো মানুষ থেকে কোনো দিক থেকে উন্নত, ভালো, উত্তম বা বড় মনে করা, অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের চেয়ে হেয় মনে করাই কিবর, তাকাব্বুর বা অহঙ্কার। এটি মূলত একটি মানসিক অনুভূতি, তবে কর্মের মধ্যে অনেকসময় তার কিছু প্রভাব থাকে। অহঙ্কার একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর অধিকার। কোনো মানুষের অহঙ্কার করাটা মূলত আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ। কারণ, অহঙ্কারের বিষয় সর্বদা আল্লাহর নিয়ামতেই হয়।

পৃথিবীর সকল নিয়ামত আল্লাহ সবাইকে সমানভাবে প্রদান করেন না। কাউকে দেন, কাউকে দেন না অথবা কমবেশি প্রদান

করেন। যিনি নিয়ামত পেয়েছেন তার দায়িত্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু যদি তিনি এই নিয়ামতকে আল্লাহর দয়ার দান বা ভিক্ষা হিসাবে গ্রহণ না করে নিজের নিজস্ব উপার্জন ও সম্পদ মনে করেন তখনই অহঙ্কারের শুরু হয়। এতে প্রথমেই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন – বাস্তবে আমরা দুনিয়াতে বড় ছোট রয়েছি। কাজেই তা অস্বীকার করব কিভাবে ? কেউ বেশি জ্ঞানী , ডিগ্রিধারী, সম্পদশালী, শক্তিশালী, ... কেউ কম। কাজেই যার বেশি আছে তিনি কিভাবে যার কম আছে তাকে সমান ভাববেন ?

বিষয়টি এখানে নয়। আপনার জ্ঞান, সম্পদ, সৌন্দর্য, প্রভাব, শক্তি, বাকপটুতা, ডিগ্রি, পদমর্যাদা, ইত্যাদি হয়ত আপনার আরেক ভাই থেকে বেশি। এখন প্রশ্ন , আপনার নিকট যে সম্পদটি বেশি আছে তা আপনার নিজস্ব উপার্জন না আল্লাহর দয়ার দান? যদি আল্লাহর দয়ার দান বলে আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি কখনই নিজেকে তার চেয়ে বড় বলে বা তাকে আপনার চেয়ে হেয় বলে ভাবতে পারবেন না। আপনি ভাববেন – আল্লাহর কত দয়া! আমাকে দয়া করে এই নিয়ামতটি দিয়েছেন অথচ তাকে দেননি। ইচ্ছা করলে তিনি এর উল্টো করতে পারতেন। একান্ত দয়া করেই তিনি আমাকে নিয়ামত দিয়েছেন। আমার কাজ , বেশি বেশি শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য আল্লাহর দরবারে আকুতি জানানো। এই অনুভূতি মুমিনের। অনুভূতি থাকলে কোনো মানুষ নিজেকে কারো চেয়ে বড় ভাবতে পারে না। বড়জোর নিজেকে 'বেশি নিয়ামতপ্রাপ্ত' বা 'বেশি দয়াপ্রাপ্ত' বলে মনে করতে পারে। এই মানুষটি কখনোই অন্য কাউকে তার চেয়ে হেয় বলে অবজ্ঞা করার কথা চিন্তা করে না। সে কখনো আল্লাহর দয়ার দানকে নিয়ে মনের মধ্যে গোপনে বা মুখে প্রকাশ্যে বড়াই করতে পারে না।

অহঙ্কার ও মুমিনের কৃতজ্ঞতার অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য দেখুন। আপনি একজন মানুষকে দেখলেন সে কথাবার্তায়, ভদ্রতায়, ডিগ্রিতে, অর্থে, শিক্ষায়, সৌন্দর্যে বা অন্য কোনো দিক থেকে আপনার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থানে রয়েছেন। তাকে দেখে আপনার মনে বা অনেকের মনে হাসি, অবজ্ঞা বা উপহাস উৎপন্ন হচ্ছে। অথচ আপনাকে দেখে আপনার মনে বা অন্যদের মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা বোধ জাগছে। আপনি কি করবেন ? অবজ্ঞা ও অবহেলা ভরে তার দিকে তাকাবেন? – এটিই তো অহঙ্কার। আপনি আল্লাহর দেয়া সকল নিয়ামতকে অস্বীকার করে আল্লাহর সাথে অবিশ্বাসীর মতো ব্যবহার করলেন।

মুমিনের মনে এই পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যাবে। অপরদিকে ঐ ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ একটুও কমবে না। তিনিও আমার মতোই আল্লাহর বান্দা। তাকে আল্লাহ যতটুকু দিয়েছেন তা নিয়েই তিনি রয়েছেন। তাকে সম্মান করতে হবে। তার জন্য দু'আ করতে হবে। কোনো অবস্থায় তার প্রতি অবজ্ঞার প্রশ্নই আসে না।

সবচেয়ে বড় কথা, আমি তো জানি না, এই কমজ্ঞানী, অভদ্র, দুর্বল বা অবজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষটি আল্লাহর কাছে কতটুকু প্রিয়। আমি জানি না, কিয়ামতের দিন আমার অবস্থা কী হবে আর তার অবস্থা কী হবে। হয়ত এই অবহেলিত দুর্বল মানুষটি কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত বেশি লাভ করবে। হয়ত আমার চেয়ে অনেক সম্মান প্রাপ্ত হবে। হয়ত আমাকে আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতার অপরাধে ধরা পড়তে হবে। তাহলে আমার জন্য অহঙ্কারের সুযোগটা কোথায় ?

অহঙ্কার সকল ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক অনুভূতি। তবে তা যদি আল্লাহর ইবাদত কেন্দ্রিক হয় তাহলে তা আরো বেশি ক্ষতিকারক। নিজেকে ভালো দ্বীনদার মনে করা শয়তানের অন্যতম চক্রান্ত। সাথে সাথে যদি নিজেকে অন্য কোনো মুসলমানের চেয়ে বেশি দ্বীনদার মনে করা হয় তাহলে ধ্বংসের ষোলকলা পূর্ণ হয়।

পাঠক হয়ত আবারো প্রশ্ন করবেন, ধর্ম পালনে তো কম-বেশি আছেই। আমি দাড়ি রেখেছি, আরেকজন রাখেনি। আমি যিক্‌র করি অথচ সে করে না। আমি বিদ'আতমুক্ত, অথচ অমুক বিদ'আতে জড়িত। আমি সুন্নাত পালন করি কিন্তু অমুক করে না। আমি ইসলামের দাওয়াত, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছি অথচ আমার আরেক ভাই শুধুমাত্র সালাত-সিয়াম পালন করেই আরামে সংসার করছেন। এখন কি আমি ভাবব যে, আমি ও সে সমান বা আমি তার চেয়ে খারাপ? তাহলে আমার এত কষ্টের প্রয়োজন কি ?

প্রিয় পাঠক, বিষয়টি আবারো ভুল খাতে চলে গেছে। প্রথমত, আমি যা কিছু করেছি সবই আল্লাহর দয়া, রহমত ও তাওফীক হিসাবে তাঁর দরবারে শুকরিয়া জানাতে হবে এবং এই নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য সকাতরে দু'আ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে ভাই এ সকল নিয়ামত পাননি তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দু'আ করতে হবে, যেন আল্লাহ তাকেও এ সকল নিয়ামত প্রদান করেন এবং আমরা একত্রে আল্লাহর জান্নাতে ও রহমতের মধ্যে থাকতে পারি। তৃতীয়ত, আমাকে খুব বেশি করে বুঝতে হবে যে, আমি যা কিছু করছি তা আমার প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের তুলনায় খুবই কম। আমি কখনোই আল্লহর দেয়া দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারিনি। কাজেই, আমার তৃপ্ত হওয়ার মতো কিছুই নেই। চতুর্থত, আমাকে বারবার সজাগ হতে হবে যে, আমি জানি না আমার ইবাদত আল্লাহর দরবারে গ্রহণ হচ্ছে কি না ? হয়ত আমার এ সকল ইবাদত বিভিন্ন ভুল ও অন্যায়ের কারণে কবুল হচ্ছে না, অথচ যাকে আমি আমার চেয়ে ছোট ভাবছি তার অল্প আমলই আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন, কাজেই কিভাবে আমি নিজেকে বড় ভাবব? পঞ্চমত, আমি জানি না, আমার কী পরিণতি ও তার কী পরিণতি ? হয়ত মৃত্যুর আগে সে আমার চেয়ে ভালো কাজ করে আমার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা নিয়ে আল্লাহ দরবারে হাজিরা দেবে।

মুহতারাম পাঠক, কিয়ামতের হিসাব নিকাশ শেষে জান্নাতে প্রবেশের আগে কখনো কোনো মুমিন নিশ্চিত হতে পারে না, নিজেকে অন্য কারো চেয়ে উত্তম বা বেশি ধার্মিক ভাবা তো দূরের কথা! সাহাবী, তাবেয়ীগণ ও পূর্ববর্তী যুগের শ্রেষ্ঠতম বুজুর্গ ও নেককার মানুষেরা নিজেদেরকে জীবজানোয়ারের চেয়ে উত্তম ভাবতে পারতেন না। তাঁরা বলতেন, কিয়ামতের বিচার পার হওয়ার পরেই বুঝতে পারব, আমি জানোয়ারের অধম না তাদের চেয়ে উত্তম। অহঙ্কার আমাদের নেক কর্ম বিনষ্ট করে দেয়। যার অন্তরে অহঙ্কার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে। হযরত ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন, নবীজী ﷺ বলেছেন:

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১]

সুপ্রিয় পাঠক, অহঙ্কার অন্তরের কর্ম হওয়ার কারণে আমরা সহজে তা ধরতে পারি না। আমরা মনে করি যে, আমার মধ্যে অহঙ্কার নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে অহঙ্কার বিদ্যমান। বিভিন্নভাবে তা যাচাই করা যায়। অতি সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় মানুষের মধ্যে বেরোতে কি আপনার লজ্জা বোধ হয়? এরূপ পোশাক পরিহিত অবস্থায় যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আপনাকে দেখে ফেলেন তবে কি খুব সংকোচ বোধ হয়? যদি হয় তবে বুঝতে হবে যে, মনের মধ্যে অহঙ্কার বিদ্যমান।

কোনো সমাবেশ বা মাজলিসে পিছনে বা নিচে বসতে হলে কি আপনার খারাপ লাগে? মনের মধ্যে কি আশা হয় যে, কেউ আপনাকে ডেকে সম্মান করুক, আগে সালাম দিক? যদি হয় তবে বুঝবেন যে, অহঙ্কার অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে।

অন্তরের মধ্যে অহঙ্কারের অনুপ্রবেশ রোধের জন্য মুমিনকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালা বলেন, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম মাথায় এক বোঝা খড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে বলা হলো, আপনি কেন এ কাজ করছেন? আল্লাহ তো আপনাকে সচ্ছলতা দিয়েছেন, যাতে এমন না করলেও আপনার চলে? তিনি বলেন, আমি অন্তরের অহঙ্কার ও অহংবোধকে আহত করতে চাচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যার অন্তরে শরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" হাদীসটি হাসান।[২]

(৫) হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা

অহঙ্কারের পাশাপশি মানব হৃদয়ে সবচেয়ে নোংরা ও ক্ষতিকারক কর্ম হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, অমঙ্গল কামনা, পারস্পারিক শত্রুতা, ইত্যাদি। হৃদয়ে এগুলির উপস্থিতি হৃদয়কে কলুষিত করে, ভারাক্রান্ত করে, আল্লাহর যিক্র থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং সর্বোপরি অন্যান্য নেক আমল নষ্ট করে দেয়। হাদীসের আলোকে মুসলমান মুসলমানে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার দুটি ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা জানতে পারি।

প্রথমত, আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئ

"প্রতি সপ্তাহে দুইবার – সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দাদের কর্ম (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তখন সকল মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি বাদে যার ও তার অন্য ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা (hatred) আছে। এদের বিষয়ে বলা হয় : এদের বিষয় স্থগিত রাখ, যতক্ষণ না এরা ফিরে আসে।"[৩]

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يطـــلع الله إلى جميع خلـــقه ليلة النصف من شعبان فيـــغـــفـــر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحـــن [لأخـــيه]

"শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত্রে (১৪ই শা'বানের দিবাগত রাত্রে) আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তির সাথে অন্য ভাইয়ের বিদ্বেষ (hatred) রয়েছে তাদেরকে বাদে।" হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য। সার্বিকভাবে হাদীসটি সহীহ।[৪]

দ্বিতীয়ত, সকল নেক কর্ম ও ধর্ম ধ্বংস করে দেয়। হযরত যুবাইর ইবুনল আউআম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم

"পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে : হিংসা ও বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলি না যে তা চুল মুণ্ডন করে, বরং তা দ্বীন বা ধর্মকে মুণ্ডন ও ধ্বংস করে দেয়। আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, বিশ্বাসী না হলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরে একে অপরকে ভালো না বাসলে তোমরা বিশ্বাসী বা মুমিন হতে পারবে না। এই ভালবাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, সর্বত্র ও সর্বদা পরস্পরে সালাম প্রদানের রেওয়াজ প্রচলিত রাখবে।" হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।[৫]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে যয়ীফ সনদে বর্ণিত অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:

إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب

"খবরদার! হিংসা থেকে আত্মরক্ষা করবে; কারণ হিংসা এমনভাবে নেককর্ম ধ্বংস করে ফেলে, যেমনভাবে আগুন খড়ি বা খড়কুটো পুড়িয়ে ফেলে।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে, তবে উপরের হাদীসের অর্থ তা সমর্থন করে।[৬]

অন্যায়ের ঘৃণা করা বনাম হিংসা ও অহংকার

আরেকটি বিষয় আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে দেয়। আমরা জানি যে, শিরক, কুফর, বিদ'আত, হারাম, পাপ ইত্যাদিকে ঘৃণা করা ও যারা এগুলিতে লিপ্ত বা এগুলির প্রচার প্রসারে লিপ্ত তাদেরকে ঘৃণা করা আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ঈমানী দায়িত্ব। আমরা এই দায়িত্ব ও হৃদয়কে মুক্ত রাখার মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করব?

এই বিষয়টিকে শয়তান অন্যতম ফাঁদ হিসাবে ব্যবহার করে, যা দিয়ে সে অগণিত ধার্মিক মুসলিমকে হিংসা, হানাহানি, আত্মতৃপ্তি ও অহংকারের মত জঘন্যতম কবীরা গোনাহের মধ্যে নিপতিত করছে। এই ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে হবে।

প্রথমত, পাপ অন্যায়, জুলুম অত্যাচার, শিরক, কুফর, বিদ'আত বা নিফাককে অপছন্দ বা ঘৃণা করতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে ও তাঁর প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে। তিনি যে পাপকে যতটুকু ঘৃণা করেছেন, নিন্দা করেছেন বা যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন ততটুকু গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর পদ্ধতি বা সুন্নাতের বাইরে মনগড়াভাবে ঘৃণা করলে তা হবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামের নামে নিজের ব্যক্তি আক্রোশ বা অহংকারকে প্রতিষ্ঠা করা ও শয়তানের আনুগত্য করা।

এক্ষেত্রে বর্তমানে অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ কঠিন ভুলের মধ্যে নিপতিত হন। কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত কঠিন পাপগুলিকে আমরা ঘৃণা করি না বা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি না, কিন্তু যেগুলি কোন পাপ নয়, কম ভয়ঙ্কর পাপ বা যেগুলির বিষয়ে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় আলিমগণ মতভেদ করেছেন সেগুলি নিয়ে হিংসা-বিদ্বেষে নিপতিত হই। ইতঃপূর্বে আমি ইসলামের কর্মগুলির পর্যায় আলোচনা করেছি। আমাদের সমাজের ধার্মিক মুসলিমদের দলাদলি, গীবতনিন্দা ও অহঙ্কারের ভিত্তি শেষ দুইতিন পর্যায়ের সুন্নাত-নফল ইবাদত। আমরা কুফর, শিরক, হারাম উপার্জন, মানুষের ক্ষতি, সৃষ্টির অধিকার নষ্ট, ফরয ইবাদত ত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা, আপত্তি, বিরোধিতা বা ঘৃণা করি না। অথচ নফল নিয়ে কি ভয়ঙ্কর হিংসা ঘৃণার সয়লাব। অনেক সময় এসকল নফল, ইখতিলাফী বিষয়, অথবা মনগড়া কিছু 'আকীদা'কে ঈমানের মানদণ্ড বানিয়ে ফেলি।

ফরয সালাত যে মোটে পড়ে না, তার বিষয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি না, কিন্তু যে সুন্নাত সালাত আদায় করল না, বা সালাতের মধ্যে টুপি বা পাগড়ী পরল না, অথবা সালাতের শেষে মুনাজাত করল বা করল না, অথবা সালাতের মধ্যে হাত উঠালো বা উঠালো না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা হানাহানি ও অহঙ্কারে লিপ্ত রয়েছি।

দ্বিতীয়ত, এই ঘৃণা একান্তই আদর্শিক ও ঈমানী। ব্যক্তিগত জেদাজেদি, আক্রোশ বা শত্রুতার পর্যায়ে যাবে না। আমি পাপটিকে ঘৃণা করি। পাপে লিপ্ত মানুষটিকে আমি খারাপে লিপ্ত বলে জানি। আমি তার জন্য দু'আ করি যে, আল্লাহ তাকে পাপ পরিত্যাগের তাওফীক দিন।

তৃতীয়ত, ঘৃণা অর্থ হিংসা নয়। ভালবাসার সাথে এই ঘৃণা একত্রিত থাকে। মা তার মলমূত্র জড়ানো শিশুকে দেখে নাক সিটকায় ও তাকে ঘৃণা করে। আপন ভাই তার অপরাধে লিপ্ত ভাইকে ঘৃণা করে। কিন্তু এই ঘৃণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে ভালবাসা। মূলত ব্যক্তি শিশু বা ব্যক্তি ভাইকে ঘিরে থাকে তার সীমাহীন ভালবাসা, আর তার গায়ে জড়ানো ময়লা বা অপরাধকে ঘিরে থাকে ঘৃণা। সাথে থাকে তাকে ঘৃণিত বিষয় থেকে মুক্ত করার আকুতি। মুমিনের পাপের প্রতি ঘৃণাও অনুরূপ। পাপের প্রতি ঘৃণা যেমন দায়িত্ব, ঈমানের প্রতি ভালবাসাও অনুরূপ দায়িত্ব। মুমিনের পাপের দিকে নয়, বরং তার ঈমানের দিকে আগে দৃষ্টি দিতে হবে। ঈমান ও অন্যান্য নেক আমলের জন্য মুমিনকে ভালবাসা ফরয। পাশাপাশি পাপের প্রতি আমাদের ঘৃণা থাকবে, এই ঘৃণা কখনোই মুমিনকে হিংসা করতে শেখায় না, বরং মুমিন ভাইয়ের জন্য দরদভর দু'আ করতে প্রেরণা দেয়, যেন তিনি পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন।

চতুর্থত, ঘৃণা ও অহংকার এক নয়। আমি পাপকে ঘৃণা করি। পাপীকে অন্যায়কারী মনে করি। পাপের প্রসারে লিপ্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। কিন্তু এগুলির অর্থ এই নয় যে, আমি আমার নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে অমুক পাপীর চেয়ে উন্নত, মুত্তাকী বা ভাল মনে করি। নিজেকে কারো চেয়ে ভাল মনে করা তো দূরের কথা নিজের কাজে তৃপ্ত হওয়াও কঠিন কবীরা গোনাহ ও ধ্বংসের কারণ। আমি জানি না, আমার ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে কিনা, আমি জানি না আমার পরিণতি কী আর উক্ত পাপীর পরিণতি কী, কিভাবে আমি নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করব?

পঞ্চমত, সবচেয়ে বড় কথা , মুমিনকে নিজের গোনাহের চিন্তায় ও আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকতে হবে। অন্যের কথা চিন্তা করা থেকে যথা সম্ভব বিরত থাকতে হবে। আমরা অধিকাংশ সময় অন্যের শিরক, কুফর, বিদ'আত, পাপ, অন্যায় ইত্যাদির চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। মনে হয় আমাদের বেলায়াত, কামালাত, জান্নাত, নাজাত সবকিছু নিশ্চিত। এখন শুধু দুনিয়ার মানুষের সমালোচনা করাই আমার একমাত্র কাজ।

বাঁচতে হলে এগুলি পরিহার করতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া পাপ বা পাপীর চিন্তায় নিজের হৃদয়কে ব্যস্ত রাখা খুবই অন্যায়। এই চিন্তা আমাদের কঠিন ও আখেরাত বিধ্বংসী পাপের মধ্যে ফেলে দেয়। এ আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার। যখনই আমি পাপীর চিন্তা করি তখনই আমার মনে তৃপ্তি চলে আসে, আমি তো তার চেয়ে ভাল আছি। তখন নিজের পাপ ছোট মনে হয় ও নিজের কর্মে তৃপ্তি লাগে। আর এই ধ্বংসের অন্যতম পথ।

এজন্য সাধ্যমত সর্বদা নিজের দ্বীনী বা দুনিয়াবী প্রয়োজন বা আল্লাহর যিক্‌র ও নিজের পাপের চিন্তায় নিজেকে রত রাখুন। হৃদয় পবিত্র থাকবে এবং আপনি লাভবান হবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক প্রদান করুন।

(৬) সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা

আমরা ইতোপূর্বে কবীর গোনাহের আলোচনার সময় কুরআন ও হাদীসে এজাতীয় গোনাহের মধ্যে যে সকল গোনাহকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার সংক্ষেপ তালিকা পেশ করেছি। সেখানে এ জাতীয় ৬৯ টি পাপের উল্লেখ রয়েছে।

মহান প্রভু আল্লাহ মানুষকে ভালবাসেন ও মানুষকে করুণা করতে চান। সাথে সাথে তিনি ন্যয়বিচারক মহাবিচারের প্রভু। তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে ন্যয় প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি। কোনো মানুষ যদি অন্য কোনো মানুষ, সৃষ্টি বা জীব জানোয়ারের অধিকার বা প্রাপ্য নষ্ট করে বা কম দেয় এবং জীবদ্দশায় তার অধিকার বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে না পারে মহাবিচারের দিনে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত সৃষ্টির অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দেবেন। সেদিন কোনো টাকাপয়সা বা সম্পদ দিয়ে ক্ষতিপূরণ দানের সুযোগ থাকবে না। তখন যালিম, ক্ষতিকারী বা অধিকার হরণকারী ব্যক্তির নেককর্ম বা সাওয়াব নিয়ে মাযলূমকে প্রদান করা হবে। যদি যাকির এ বিষয়ে সতর্ক না থাকেন তাহলে তার কষ্টার্জিত সাওয়াব ও নেক কর্ম অন্য মানুষ ভোগ করবেন, আর তিনি বঞ্চিত হয়ে শাস্তি ভোগ করবেন।

কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে সমাজের পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এগুলি শিক্ষা করা ও পালন করা যাকিরের জন্য বিশেষ জরুরি। আমাদের সমাজে অনেক ধার্মিক ব্যক্তিই স্ত্রীর অধিকার, সন্তানগণের অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, সহকর্মীর অধিকার, কর্মদাতার অধিকার, কর্মী বা কর্মচারীর অধিকার আত্মীয়স্বজনের অধিকার, বিধবা, এতিম, দরিদ্র ও সমাজের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর অধিকার, সমাজের অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার, পলিত পশু ও জীব জানোয়ারের অধিকার সম্পর্কে খুবই অসচেতন। আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ অন্যের অধিকার নষ্ট করার কঠিন পাপে লিপ্ত থাকেন। হয়ত তাহাজ্জুদ, যিক্র, নফল সিয়াম, দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ও প্রচারে রত রয়েছেন ; কিন্তু স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, কর্মস্থল, সেবা গ্রহণে আগত ব্যক্তি, কর্মদাতা ও অন্য অনেকের অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘন ও নষ্ট করেন। এগুলিকে অনেকে খুবই হালকা ভাবেন বা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাদের কঠিন অন্যায়কে যুক্তিসঙ্গত করতে চেষ্টা করেন। যাকিরকে এসকল বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

(৭) গীবত বা পরনিন্দা করা বা শোনা

অন্য মানুষের অধিকার নষ্টের একটি বিশেষ দিক গীবত বা পরনিন্দা করা। কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার কোনো সত্যিকারের দোষক্রটি বলাই ইসলামের পরিভাষায় গীবত। যেমন,– একজন মানুষ বেটে, রগচটা, অহঙ্কারী, তোতলা, বিলাসী, অল্প শিক্ষিত, জামাত কাযা করে, ধুমপান করে, স্ত্রী পর্দা করে না, দ্বীনের অমুক কাজে অবহেলা করে ... , ইত্যাদি কোনো দোষ বা দৃষ্টিকটু বিষয় সত্যিই তার মধ্যে রয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে তার এই দোষ উল্লেখ করা গীবত ও কঠিন পাপ।

মুমিনের পুণ্য বিনষ্ট করার অন্যতম কারণ গীবত। কুরআনে গীবতকে 'মৃতভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পাপের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে অগণিত হাদীসে উম্মতকে সাবধান করেছেন। সবচেয়ে কঠিন বিষয় গীবত করা বান্দার হক্ক সংশ্লিষ্ট পাপ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা না করলে এই অপরাধের কারণে আমাদের পুণ্য তাকে প্রদান করতে হবে।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم

"হে মুমিনগণ তোমরা অধিকাংশ অনুমান-ধারণা পরিত্যাগ কর; কারণ কোনো কোনো অনুমান-ধারণা পাপ। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের অনুপস্থিতিতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَنَافَسُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

"খবরদার! তোমরা অবশ্যই অনুমান-ধারণা থেকে বহুদূরে থাকবে। কারণ অনুমান ধারণাই সবচেয়ে বড় মিথ্যা। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় জানার চেষ্টা করবে না, গোপন দোষ সন্ধান করবে না, পরস্পরে হিংসা করবে না, পরস্পরে বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না এবং পরস্পরে শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। তোমরা পরস্পরে ভাইভাই আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও।"[২]

এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, অনুমানে কথা বলা এবং অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা হারাম। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান ছাড়াও যদি অন্যের কোনো দোষক্রটি মানুষ জানতে পারে তা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা গীবত ও হারাম।

গীবত ১০০% সত্য কথা। কোনো ব্যক্তির ১০০% সত্য দোষক্রটির কথা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করার নামই গীবত। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা কি জান গীবত বা অনুপস্থিতের নিন্দা কী? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (ﷺ) ভাল জানেন। তিনি বলেন, তোমার ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। তখন প্রশ্ন করা হলো, বলুন তো, আমি

যা বলছি তা যদি সত্যই আমার ভাইয়ের মধ্যে বিরাজমান হয় তাহলে কি হবে? তিনি বলেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যই তার মধ্যে বিরাজমান থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তার মিথ্যা অপবাদ করলে।"[১]

আমরা ভাবি, সত্য কথা বলব তাতে অসুবিধা কি? আমরা হয়ত বুঝি না বা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রনায় বুঝতে চাই না যে, সব সত্য কথা জায়েয নয়। অনেক সত্য কথা মিথ্যার মত বা মিথ্যার চেয়েও বেশি হারাম। আবার কখনো বলি, আমি এ কথা তার সামনেও বলতে পারি। আর সামানে যা বলতে পারেন তা পিছনে বলাই তো গীবত।

গীবতের নিন্দায় এবং এর কঠোরতম শাস্তির বর্ণনায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

ধার্মিক মানুষদের পতনের অন্যতম কারণ গীবত। সমাজের অধিকাংশ ধার্মিক, আলিম, যাকির, আবিদ, ইসলামের দাওয়াত, তাবলীগ, আন্দোলন ইত্যাদিতে নিয়োজিত ধর্মপ্রাণ মুসলিম সকলেই এই কঠিন বিধ্বংসী পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ি। সাধারণত আমরা নিজেদের সহকর্মী, সঙ্গী অথবা অন্য কোনো দলের বা মতের কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির গীবত করে মজা পাই। এছাড়া সমাজের ব্যবসায়ী, নেতৃস্থানীয় মানুষ সকলেরই ব্যক্তিগত সমালোচনা ও গীবত করে আমরা তৃপ্তি পাই। অনেক সময় আমরা গীবতকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণিত করতে গিয়ে বলি– 'আমি এ সকল কথা তার সামনেও বলতে পারি'। সামনে যে কথা বলা যায় সে কথা অগোচরে বললে গীবত হবে। অনেক সময় আমরা গীবতকে ইসলামী বা ধর্মীয় রূপদান করি। লোকটি অন্যায় করে, পাপ করে তা বলব না ? এখানে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে:

প্রথমত, কোনো ব্যক্তির অন্যায় দেখলে বা জানলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা মুমিনের দায়িত্ব। কিন্ত তার অন্যায়ের কথা তার অনুপস্থিতিতে অন্য মানুষের সামনে আলোচনার নামই গীবত, যা কঠিনভাবে হারাম। গীবতের মাধ্যমে কোনোদিনই কাউকে সংশোধন করা যায় না। শুধুমাত্র নিজের শয়তানী প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো হয়।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তির দোষত্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে বলার একটিই শরীয়ত সম্মত কারণ আছে, অন্য কাউকে অধিকতর ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এক্ষেত্রেও মুমিনকে বুঝতে হবে যে, এই কাজটি একটি ঘৃণিত কাজ। একান্তই বাধ্য হয়ে তিনি তা করছেন। কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না বলা।

তৃতীয়ত, গীবত কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে হারাম করা হয়েছে। কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে গীবতকে কোনো অবস্থায় হালাল বলা হয় নি। শুধু কোনো মানুষ বা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার একান্ত প্রয়োজনে তা বৈধ হতে পারে বলে আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন। এখন মুমিনের কাজ কুরআন ও হাদীস যা নিষেধ করেছে তা ঘৃণাভরে পরিহার করবেন। এমনকি সেই কর্মটি কখনো জায়েয হলেও তিনি তা সর্বদা পরিহার করার চেষ্টা করবেন। শূকরের মাংস, মদ, রক্ত ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন এবং প্রয়োজনে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। এখন মুমিনের দয়িত্ব কী? বিভিন্ন অজুহাতে প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে এগুলি ভক্ষণ করা? না যত কষ্ট বা প্রয়োজনই হোক তা পরিহার করার চেষ্টা করা?

গীবতও ঠিক অনুরূপ একটি হারাম কর্ম যা একান্ত প্রয়োজনে বৈধ হতে পারে। গীবত ও শূকরের মাংসের মধ্যে দুটি পার্থক্য। **প্রথম পার্থক্য** শূকরের মাংস যে প্রয়োজনে খাওয়া যেতে পারে তা কুরআনেই বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে গীবতের ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু কুরআন বা সহীহ হাদীসে বলা হয়নি। **দ্বিতীয় পার্থক্য** , সাধারণভাবে শূকরের মাংস ভক্ষণ করা শুধুমাত্র আল্লাহর হক্ক জনিত পাপ। সহজেই তাওবার মাধ্যমে তা ক্ষমা হতে পারে। পক্ষান্তরে গীবত বান্দার হক্ক জনিত পাপ। এর ক্ষমার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা প্রয়োজন। এজন্য মুমিনের দায়িত্ব বিভিন্ন অজুহাতে বা যয়ীফ-মাউযূ হাদীসের বরাত দিয়ে এই পাপে লিপ্ত না হয়ে যথাসাধ্য একে বর্জন করা।

চতুর্থত, ইসলামে অন্যের দোষ তার অনুপস্থিতিতে বলতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে তা গোপন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"মুসলিম মুসলিমের ভাই। একজন আরেকজনকে জুলুম করে না এবং বিপদে পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাতে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কষ্ট-বিপদ দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।"[২]

মিশরের গভর্নর সাহাবী উকবা ইবনু আমির (রা) এর সেক্রেটারী 'আবুল হাইসাম দুখাইন' বলেন, আমি উকবা (রা) কে বললাম, আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী মদপান করছে। আমি এখনি যেয়ে পুলিশ ডাকছি যেন তাদের ধরে নিয়ে যায়। উকবা বলেন, তুমি তা করো না। বরং তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও এবং ভয় দেখাও।.... আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে বলতে শুনেছি,

من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة في قبرها

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন করল, সে যেন জীবন্ত প্রেথিত একটি কন্যাকে তার কবর থেকে উঠিয়ে জীবন দান

করল।" হাদীসটি সহীহ।[১]

পঞ্চমত, মুমিনের দায়িত্ব যথাসম্ভব নিজের অন্তরকে নিজের ভুলত্রুটি ও পাপের স্মরণে, তাওবায় ও দু'আয় ব্যস্ত রাখা। অন্যের ভুল, অন্যায়, পাপ ইত্যাদির চিন্তা মুমিনের অন্তরকে নোংরা করে এবং অগণিত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে। গীবতের ফলে মুমিনের মনে অহংকার জন্ম নেয়, যা আখেরাতের ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

প্রিয় পাঠক, নাজাতের উপায় কারো অনুপস্থিতে তার কথা আলোচনা বা চিন্তা করা সর্বোতবাবে পরিহার করা। সর্বদা নিজের দোষত্রুটির কথা চিন্তা করা। নিজের নাজাতের পথ খুঁজতে থাকা। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন ; আমীন।

(৮) নামীমাহ বা চোগলখুরী

গীবতের আরেকটি পর্যায় 'নামীমাহ', 'চোগলখুরী' অর্থা কানভাঙ্গানো বা কথা লাগান। একজনের কাছে অনুপস্থিত কারো কোনো দোষত্রুটি আলোচনা গীবত। আর যদি এমন দোষত্রুটি আলোচনা করা হয় যাতে দুই ব্যক্তি মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয় তাহলে তাকে আরবীতে 'নামীমাহ' বলা হয়। এটি গীবতের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ ও জঘন্যতম কবীরা গোনাহের একটি। সত্য কথা লাগানোও নামীমাহ, যেমন সত্য দোষ বলা গীবত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يــدخــل الــجــنــة قــتــات

"চোগলখোর বা কানভাঙ্গানিতে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২]

মনে করুন 'ক' 'খ'-এর কাছে 'গ' সম্পর্কে কিছু গীবত বা খারাপ মন্তব্য করেছে। 'খ' 'ক'-এর মুখ থেকে সেগুলি শুনে কোনো প্রতিবাদ না করে গীবত শোনার পাপে পাপী হয়েছে। এখন এই পাপকে বহুগুণে বৃদ্ধি করার জন্য সে 'গ'-এর নিকট এসে 'ক'-এর কথাগুলি সব বলে দিল। এভাবে 'খ' গীবত শোনা, গীবত করা ও নামীমাহ করার পাপে লিপ্ত হলো। এই দুর্বল ঈমান ব্যক্তি 'গ'-এর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য তার প্রভু মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি, গজব ও শাস্তি চেয়ে নিল।

মুহতারাম পাঠক, মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য মিথ্য কথা বলা জায়েয, কিন্তু সম্পর্ক নষ্টকারী সত্য কথা জায়েয নয়। এছাড়া এসকল গীবত ও নামীমা হতে লিপ্ত মানুষদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। যদি কেউ আপনার কাছে এসে আপনার কোনো ভাই সম্পর্কে এধরনের কথা বলে তাহলে তাকে থামিয়ে দিন। এই লোকটি চোগলখোর। সে সত্যবাদী হলেও আপনার শত্রু। আপনার হৃদয়ের প্রশান্তি, প্রবিত্রতা ও আপনার ভাইয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়। আল্লাহ আমাদেরকে চোগলখোরী ও চোগলখোর থেকে হেফাযত করুন ; আমীন।

সম্মানিত পাঠক, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, গীবত, নামীমা ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক হৃদয়জাত অনুভূতি থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম উপায় , যথাসম্ভব সর্বদা নিজের জাগতিক ও পারলৌকিক উন্নতি, নিজের দোষত্রুটি সংশোধন ও তাওবার উপায় ইত্যাদির চিন্তায় মনকে মগ্ন রাখা। আত্ম প্রশংসার প্রবণতা রোধ করে আত্ম সমালোচনার প্রবণতা বৃদ্ধি করা। 'আমার ভালগুণাবলী তো আছেই। সেগুলির প্রশংসা করে বা শুনে কি লাভ। আমার ভুলত্রুটি কি আছে তা জেনে এবং সংশোধিত করে আরো ভাল হতে হবে' এই চিন্তাকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করতে হবে।

অন্য কোনো মানুষের কথা মনে হলে, আলোচনা হলে বা কেউ তাঁর প্রশংসা করলে মনের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা, হিংসা বা অহংকার আসতে পারে। এজন্য এ সকল ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে নিজের মনে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ভাল ধারণা বদ্ধমূল করা, তার প্রশংসা যেক্তিক ও উচিত বলে নিজের মনকে বিশ্বাস করানো, তার ভাল গুণাবলীর কথা মনে করে তাকে শ্রদ্ধা করতে নিজের মনকে উদ্ধুদ্ধ করা প্রয়োজন। ক্রমান্বয়ে এভাবে আমরা এ সকল কঠিন ও ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারব।

(৯) প্রদর্শনেচ্ছা ও সম্মানের আগ্রহ

মুমিন তার সকল কর্ম কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেখানোর জন্য বা কারো নিকট থেকে প্রশংসা, সম্মান বা পুরস্কার লাভের জন্য কর্ম করাকে 'রিয়া' বলা হয়। বাংলায় আমরা একে 'প্রদর্শনেচ্ছা' বলতে পারি। মুমিনের সকল ইবাদত ধ্বংস করার ও তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ এই 'রিয়া'। কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়।[৩]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ রিয়াকে 'শিরক আসগার' বা ছোট শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য কিছু 'পুরস্কার' বা প্রশংসা আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এই শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত কবুল হবে না। এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إلا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قال قلنا بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل

"দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শির্ক। গোপন শির্ক এই যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে।[১]

রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুমিনের চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব সকল নফল ইবাদত গোপনে করা। তবে যে ইবাদত প্রকাশ্যে করাই সুন্নাত-সম্মত তা প্রকাশ্যেই করতে হবে। রিয়ার ভয়ে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা প্রকাশ্যে করণীয় ইবাদত বাদ দেওয়া যাবে না। রিয়ার অনুভূতি মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। কখনো এসে গেলে বারংবার তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করতে হবে।

রিয়ার অন্যতম কারণ সমাজের মানুষদের কাছে সম্মান, মর্যাদা বা প্রশংসার আশা। আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে যে, দুনিয়ায় কোনো মানুষই কিছু দিতে পারে না। সকলেই আমার মতই অক্ষম। যে মানুষকে দেখানো জন্য, শোনানোর জন্য, যার প্রশংসা বা পুরস্কার লাভের জন্য আমি লালায়িত হচ্ছি সে আমার মতই অসহায় মানুষ। আমার কর্ম দেখে সে প্রশংসা নাও করতে পারে। হয়ত তার প্রশংসা শোনার আগেই আমার মৃত্যু হবে। অথবা প্রশংসা করার আগেই তার মৃত্যু হবে। আর সে প্রশংসা বা সম্মান করলেও আমার কিছুই লাভ হবে না। আমার মালিক ও পালনকর্তার পুরস্কারই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি অল্পতেই খুশি হন ও বেশি পুরস্কার দেন। তিনি দিলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আর তিনি না দিলে কেউ দিতে পারে না।

কা'ব ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه

"দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে নেকড়েদুটি মেশপালের যে ক্ষতি করবে, সম্পদ ও সম্মানের লোভ মানুষের দীনের তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।[২]

সম্মানিত পাঠক, দুনিয়ার সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি একটি কঠিন বোঝা ও ফিতনা ছাড়া কিছুই নয়। সম্মান ও প্রতিপত্তিহীন মানুষের অন্তর বিনয় ও সরলতায় ভরা থাকে। ফলে আল্লাহর বেলায়াত অর্জন তাদের জন্য খুবই সহজ হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অধিকাংশই এরূপ সাধারণ মানুষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره

"অনেক মানুষ এমন আছেন যার মাথার চুল এলোমেলো, পদযুগল ধুলিধসরিত, পরণের কাপড় অতি-সাধারণ এবং সমাজে তাদেরকে কোনো গুরত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা এত বেশি যে, যদি তিনি শপথ করে আল্লাহর কাছে কিছু দাবি করেন তবে আল্লাহ তা পূরণ করেন।"[৩]

(১০) ঝগড়া-তর্ক

আল্লাহর পথের পথিক বা ধার্মিক মানুষদের জন্য শয়তানের একটি ফাঁদ ঝগড়া ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়া। ধার্মিক মানুষেরা অনেক সময়েই ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-তর্কে জড়িয়ে পড়েন। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل

"কোনো সম্প্রদায়ের সুপথপ্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ যে, তারা ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে।"[৪]

আমাদের সর্বদা চেষ্টা করতে হবে বিতর্ক এড়িয়ে চলার। ধর্মীয় আলোচনার দায়িত্ব আলিমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। একান্ত ই বাধ্য হলে আমরা আলোচনায় লিপ্ত হব, কিন্তু ঝগড়ায় লিপ্ত হব না। তথ্য ভিত্তিক আলোচনা বা মত-বিনিময় জ্ঞান বৃদ্ধি করে। আর ঝগড়া-তর্ক জ্ঞান গ্রহণের পথ রুদ্ধ করে দেয়। আলোচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজের জানা তথ্যাদি উপস্থাপন করেন এবং অন্যের নিকট নতুন কিছু পেলে বা নিজের ভুল ধরতে পারলে তা আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে ঝগড়-তর্কে উভয় পক্ষই নিজের জ্ঞানকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন এবং যে কোনো ভাবে নিজের মতের সঠিকতা ও অন্য মতের ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। নিজের জ্ঞানের ভুল স্বীকার করাকে ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করেন। এ কারণে ইসলামে ঝগড়া-তর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها

"নিজের মত বাতিল হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যার আচরণ সুন্দর তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে।" হাদীসটি সহীহ।[৫]

৬. যিক্‌রের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ

আল্লাহর যিক্‌র মানব হৃদয়ের খাদ্য ও আত্মার পাথেয়। আল্লাহর রহমত, নিয়ামত, করুণা, বরকত, বিধান, পুরস্কার, শাস্তি, তাঁর প্রশংসা, মর্যাদা, একত্ব ইত্যাদির স্মরণ মানুষের হৃদয়কে পূত পবিত্র, প্রশান্ত ও শক্তিশালী করে। যিক্‌র মূলত রূহের জন্য অক্সিজেন ও পানির মতো। যে মুহূর্তগুলি বান্দা আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত থাকে সেই মুহূর্তগুলি তার আত্মা অক্সিজেন ও পানির অভাবে কষ্ট পেতে থাকে। মহান প্রভুর সাথে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। দুর্বল হয়ে পড়ে তার হৃদয়। চিরশত্রু শয়তান সুযোগ পায় এই দুর্বল হৃদয়কে আক্রমণ করার।

আত্মিক সুস্থতা ও ভারসম্যপূর্ণ হৃদয়ের জন্য মুমিনকে সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে হৃদয়কে রত রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন ব্যস্ততায়, কর্ম, চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদির কারণে কিছু সময় যিক্‌র বিহীনভাবে অতিবাহিত হলে, আবার যিক্‌রের দিকে ফিরে আসতে হবে। মুখ ও মনকে সাধ্যমতো ব্যস্ত রাখতে হবে মহান প্রভুর স্মরণে।

জাগতিক ব্যস্ততার ফলে যিক্‌র থেকে সাময়িক বিরতি আত্মার কিছু ক্ষতি করলেও তা স্বাভাবিক এবং সে ক্ষতির পূরণ সম্ভব। কিন্তু এর চেয়েও ভয়ঙ্কর ক্ষতি এমন বিষয়ে হৃদয়কে রত রাখা যা আল্লাহর যিক্‌র থেকে তাকে দূরে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি হৃদয়ে অনীহা সৃষ্টি করে।

আমরা জানি যে, মানুষ অসুস্থ হলে তার রুচি নষ্ট হয়। তখন দেহের জন্য উপকারী খাদ্যে তার অনীহা সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতিকারক খাদ্য গ্রহণে তার লোভ বেড়ে যায। হৃদয়ের অবস্থাও অনুরূপ। স্বাভাবিকভাবে মানবহৃদয় আল্লাহর যিক্‌রে তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু অসুস্থ হৃদয় তার প্রভুর যিক্‌রে অনীহা অনুভব করে।

বর্তমান সমাজের প্রায় সকল প্রচার মাধ্যম, বিনোদন, পত্রিকা, গল্প, উপন্যাস হৃদয়কে অসুস্থ করার ও আল্লাহর যিক্‌র থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার কর্মে নিয়োজিত। আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, এ সকল প্রচার ও বিনোদন মাধ্যমগুলি শুধু আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরতই রাখে না। উপরন্তু মহান আল্লাহর যিক্‌র, ধর্ম, নৈতিকতা, ধার্মিক মানুষ ও ধর্মজীবনের প্রতি কটাক্ষ, বিষোদগার ও ঘৃণা ছড়াতে ব্যস্ত। এসকল প্রচার ও বিনোদন মাধ্যম মুনিনের জন্য বিষের মতোই ক্ষতিকর।

সম্মানিত পাঠক, যথাসাধ্য চেষ্টা করুন এগুলি থেকে দূরে থাকার। বিনোদনের জন্য ইসলাম-সম্মত অথবা ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী নয় এরূপ মাধ্যম ব্যবহার করুন। সাহিত্য উপন্যাস, গল্প, পত্রিকা ইত্যাদি পরিহার করে ইসলামী বই, সৎ মানুষদের জীবনী ইত্যাদি পাঠে নিজেকে রত রাখা দরকার। প্রয়োজনে এমন সাহিত্য পাঠ করুন যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। অমুসলিম লেখকগণের উপন্যাস গল্প শিরক, কুফরী, মূর্তিপূজা, অনৈসলামিক রীতিনীতির কথায় ভরা। এর চেয়েও ক্ষতিকর মুসলিম নামধারী অনেক লেখকের উপন্যাস ও সাহিত্য। তারা ইসলামী মূল্যবোধকে আহত করার মানসেই সাহিত্য রচনা করেন।

কোনো কোনো পত্র-প্রত্রিকার মূলনীতি ইসলাম, মুসলিম, আলিম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কুৎসা রটনার মাধ্যমে পাঠকের মনকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি বিরক্ত বা বিদ্বেষসম্পন্ন করে তোলা। যখনই কোনো পত্র-পত্রিকা বা সাহিত্যকর্মে এরূপ লেখালেখি দেখতে পাবেন, তখনই তা পড়া বন্ধ করুন। এগুলি বিষ। স্বল্পমাত্রার বিষের মতো ক্রমান্বয়ে তা আপনার হৃদয়কে আল্লাহর যিক্‌র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। সংবাদ জানার জন্য, বা সাহিত্যের জন্য অন্য পত্রিকা বা বই পড়ুন। সবচেয়ে ভালো হয় এসকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা। আল্লাহ আমাদের শয়তান ও তার অনুচরদের খপ্পর থেকে রক্ষা করুন।

চ. আত্মশুদ্ধিমূলক মানসিক ও দৈহিক কর্ম

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু মানসিক বা দৈহিক কর্ম আছে যা অতি সহজে আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য, সাওয়াব, রহমত ও বরকত লাভে সাহায্য করে। এ সকল কর্ম পালন করতে পারলে যাকির অতি অল্প আমলে অধিক সাওয়াব অর্জন করতে পারেন। আমাদের উচিত এগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা।

<u>(১) জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব স্মরণ</u>

মানব জীবনে জাগতিক, সাংসারিক কর্মকাণ্ড, ব্যস্ততা ও চিন্তাভাবনা থাকবেই। আল্লাহ মানুষকে এসকল কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তবে এই ব্যস্ততা ও কর্ম নিজের, পরিবারের ও সমাজের সকলের পৃথিবীতে সুন্দররূপে বাঁচার ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তি ও আল্লাহর সানিধ্যে অফুরন্ত নিয়ামত লাভের জন্য। কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত ও বরকত অর্জন করে নিজে বাঁচতে হবে এবং অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনা ও মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা সৃষ্টি ও কর্মের উদ্দেশ্যের একেবারে বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করি। আমরা স্বার্থপর হয়ে যাই এবং নিজের অপ্রয়োজনীয় ও অবৈধ স্বার্থরক্ষার জন্য অন্যান্যদের অকল্যাণ, ক্ষতি বা ধ্বংস কামনা করি বা সে জন্য চেষ্টা করি। এভাবে আমরা মূলত নিজেদেরকেও ধ্বংস করি। লোভ, লালসা, হিংসা, হানাহানি আমাদের হৃদয় ও জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করে, আমাদেরকে স্রষ্টার প্রেম, করুণা ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে, তাঁর শাস্তির মধ্যে নিপতিত করে এবং সর্বোপরি আমাদের পারলৌকিক জীবনের কঠিন ধ্বংস ও ক্ষতি নিশ্চিত করে।

এই ক্ষতিকর পরিণতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য যুগে যুগে অনেক মানুষ সন্যাস, বৈরাগ্য বা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন বেছে নিয়েছেন। এভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছেন। ইসলামে বৈরাগ্য বা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ। সমাজের মধ্যে বসবাস করে, সকল কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের হৃদয়কে মোহমুক্ত রাখায় ইসলামী বৈরাগ্য। আর এই অবস্থা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম প্রতিনিয়ত এই জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব, মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা নিজেকে স্মরণ করানো। কুরআন ও হাদীসে এজন্য বারবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পৃথিবীতে নিজেকে প্রবাসী বা পথিক হিসাবে গণ্য করতে বলা হয়েছে। এই স্মরণ আমাদের জন্য অগণিত সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি আমাদের হৃদয়গুলিকে লোভ, হিংসা, প্রতিহিংসা ইত্যাদির কঠিন

ভার থেকে মুক্ত করবে। আমাদের জীবনকে হানাহানি ও হিংস্রতা থেকে মুক্ত করবে।

দিনের বিভিন্ন অবসরে ও বিশেষ করে সকালে, সন্ধ্যা বা রাতে নির্ধারিত সময়ে নিজেকে স্মরণ করান : যে মানুষের পরবর্তী নিশ্বাসের নিশ্চয়তা নেই সে কী জন্য হানাহানিতে লিপ্ত হবে? কিজন্য সে লোভ করবে। সেতো পথিক। চলার পথের প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করা ও পাথেয় সংগ্রহই তো তার কাজ। চলার পথে যদি কেউ কষ্ট দেয় তাকে সম্ভব হলে ক্ষমা করে দিই না কেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই তো তাকে আর দেখব না। রাস্তায়, ফেরীতে, রেলস্টেশনে বা এয়ারপোর্টে বসার চেয়ার, ট্রলি, খাবারের প্লেট, সামান্য ধাক্কাধাক্কির জন্য কি আমরা সময় নষ্ট করে মারামারিতে লিপ্ত হই? এই জীবন তো এ সকল অস্থায়ী স্থানেরই একটু বিস্তৃত রূপ। চেষ্টা করি না কেন এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ক্ষমা, ভালবাসা ও সেবায় ভরে দিতে। তাতে জীবন হবে আল্লাহর রহমতে ধন্য আর আমি অর্জন করব আখেরাতের অমূল্য পাথেয়।

পার্থিব স্বার্থপরতা বা লোভের জন্য প্রভুর নির্দেশনার বাইরে কাজ করছি? কি লাভ হবে তাতে? সে লাভ কি ভোগ করতে পারব? পারলে কতদিন। তারপর তো আমাকে প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অমুকের খুশির জন্য, তমুকের কাছে বড় হওয়ার জন্য, আরেকজনের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য আমি এই কাজটি করতে চাচ্ছি। কি লাভ তাতে? সে আমাকে কী দেবে? যা দেবে তা থেকে কি আমি লাভবান হতে পারব? আমাকে তো আমার প্রভুর কাছে একাকীই চলে যেতে হবে। আমার তো বাস্তববাদী হওয়া উচিত। নিজের জাগতিক ও পরকালীন জীবনের জন্য যে কাজে আমার রব খুশি সেই কাজই তো আমার করা উচিত।

সুপ্রিয় পাঠক, এভাবে আমাদের উচিত প্রতিদিন নিজেদের সকল কর্ম বিচার করা। ক্ষণস্থায়ী প্রবাসের জন্য ও চিরস্থায়ী আবাসের জন্য যা প্রয়োজনীয় সেগুলিই করা। এ চিন্তা আমাদেরকে উপরে বর্ণিত ক্ষমাময় ও হিংসাহীন হৃদয় অর্জনেও সাহায্য করবে। এই চিন্তাগুলি বেলায়াত ও ইহসানের পথে আমাদের মহামূল্য পাথেয়।

(২) সৃষ্টির কল্যাণে রত থাকা

আল্লাহর রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি, বিশেষত মানুষের প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সকল জাগতিক প্রয়োজনে সাহায্য করা, সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে গোলমাল বা অশান্তি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপদে পড়লে উদ্ধার করা, মাযলূম হলে সাহায্য করা, মৃত্যুবরণ করলে কাফন-দাফনে শরীক হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মানব সেবমূলক কাজের জন্য অকল্পনীয় সাওয়াব ও মর্যাদার কথা অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যতক্ষণ একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তার কল্যাণে রত থাকবেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করান, অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার নিকট মসজিদে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে কিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন সকলের পা পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। ... এইরূপ অগণিত হাদীস আমরা হাদীসের গ্রন্থে দেখতে পাই।[1]

(৩) হিংসা-মুক্ত কল্যাণ কামনা

হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও অন্যের অমঙ্গল কামনা থেকে মুক্ত রাখা এমন একটি কর্ম যা মানুষকে অতিরিক্ত নফল ইবাদত ও যিক্‌র আযকার ছাড়াই জান্নাতের অধিকারী করে তোলে। আনাস (রা) বলেন, "একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি বললেন : এখন তোমাদের এখানে একজন জান্নাতী মানুষ প্রবেশ করবেন। তখন একজন আনসারী মানুষ প্রবেশ করলেন, যাঁর দাড়ি থেকে ওযুর পানি পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে তাঁর জুতাজুড়া ছিল। পরের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই কথা বললেন এবং একই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। তৃতীয় দিনেও রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম দিনের মতোই আবারো বললেন এবং আবারো একই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। তৃতীয় দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিস ভেঙ্গে চলে গেলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার উক্ত আনসারী ব্যক্তির পিছে পিছে যেয়ে বলেন, আমি আমার পিতার সাথে মন কষাকষি করেছি এবং তিন রাত বাড়িতে যাব না বলে কসম করেছি। সম্ভব হলে এই কয় রাত আপনার কাছে থাকতে দিবেন কি ? তিনি রাজি হন। (আব্দুল্লাহর ইচ্ছা হলো তিন রাত তাঁর কাছে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ইবাদত জেনে সেই মতো আমল করা, যেন তিনিও জান্নাতী হতে পারেন)। তিনি তিন রাত তাঁর সাথে থাকেন, কিন্তু তাঁকে রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতে বা বিশেষ কোনো নফল ইবাদত পালন করতে দেখেন না। তবে তিন দিনের মধ্যে তাঁকে শুধুমাত্র ভালো কথা ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো খারাপ কথা বলতে শোনেননি। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার কাছে তাঁর আমল খুবই নগণ্য মনে হতে লাগল। আমি বললাম : দেখুন, আমার সাথে আমার পিতার কোনো মনমালিন্য হয়নি। তবে আমি পরপর তিনি দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনলাম এখন একজন জান্নাতী মানুষ আসবেন এবং তিনবারই আপনি আসলেন। এজন্য আমি আপনার আমল দেখে সেইমতো আমল করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে তিন রাত্র কাটিয়েছি, কিন্তু আমি আপনাকে বিশেষ কোনো আমল করতে দেখলাম না! তাহলে কী কর্মের ফলে আপনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতী বললেন? তিনি বললেন: তুমি যা দেখেছ এর বেশি কোনো আমল আমার নেই, তবে আমি আমার অন্তরের মধ্যে কোনো মুসলমানের জন্য কোনো অমঙ্গল ইচ্ছা রাখি না এবং আমি কোনো কিছুর জন্য কাউকে হিংসা করি না। তখন আব্দুল্লাহ বলেন: এই কর্মের জন্যই আপনি এই মর্যাদায় পৌঁছাতে

পেরেছেন।" হাদীসটি সহীহ।[১]

অন্য হাদীসে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "বেটা, যদি পার তবে এমনভাবে সকাল ও সন্ধ্যা করবে (জীবন কাটাবে) যে, তোমার হৃদয়ে কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা নেই। সম্ভব হলে এইরূপ চলবে, কারণ এইরূপ চলা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে, তবে ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[২]

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, সংঘাতপূর্ণ জীবনে অনেক মানুষ আমাদেরকে কষ্ট দেন, হক্ক নষ্ট করেন, ক্ষতি করেন বা শত্রুতা করেন। অনেকে অকারণেও এগুলি করেন। এদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে হৃদয়কে কিভাবে বিরত রাখব ? আসলে বিষয়টি কঠিন বলেই তো সাওয়াব বেশি। তবে চেষ্টা করলে তা কঠিন থাকে না। মানবীয় স্বভাবের কারণে আমাদের মনে বিশেষ মুহূর্তে ক্রোধ, কষ্ট বা বিরক্তি আসবেই। তবে মনটা একটু শান্ত হলেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনের মধ্য থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর কাছে নিজের জন্য ও যার কর্মে বা ব্যবহারে আমরা কষ্ট পেয়েছি তার জন্য ইস্তিগফার করতে হবে ও দু'আ করতে হবে।

প্রয়োজনে নিজের হক্ক রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে অধিকার আদায়ের চেষ্টা বা কর্ম আর মনের হিংসা ও শত্রুতা এক নয়। এক ব্যক্তি আমার অধিকার নষ্ট করেছেন, আমি তার নিকট থেকে আমার অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি। কিন্তু তার সাথে আমার অন্য কোনো শত্রুতা নেই। আমি আমার অধিকার ফেরৎ পাওয়া ছাড়া তার কোনো প্রকার অমঙ্গল কামনা করি না। বরং আমি সর্বদা তার জন্য দু'আ করি। এভাবে হৃদয়কে অভ্যস্ত করলে ইন্‌শা আল্লাহ আমরা উপরিউক্ত সাহাবীর মতো হতে পারব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত জীবিত করার সাওয়াব অর্জন করতে পারব।

(৪) আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যধারণ

মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সহজেই অত্যন্ত বেশি সাওয়াব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম সবর বা ধৈর্যধারণের গুণ অর্জন করা। ধৈর্য মুমিনের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধৈর্য বলতে নিষ্ক্রিয় নির্জীবতা বুঝানো হয় না, বরং সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বুঝানো হয়। পারিপার্শিক অবস্থা বা অন্যের আচরণ দ্বারা নিজের আচরণ প্রভাবিত না করে নিজের স্থির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা। এক কথায় Re-active না হয়ে Pro-active হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أفــضــل الإيــمـــان الصـــبـــر والســمـــاحـــة

"ধৈর্য ও উদারতাই সর্বোত্তম ঈমান।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধৈর্য তিন প্রকারের: (১) বিপদ-আপদ ও কষ্টে ধৈর্য, (২) পাপ ও লোভ থেকে ধৈর্য এবং (৩) ক্রোধের মধ্যে ধৈর্য।

বিপদে হতাশ বা অধৈর্য হয়ে পড়া একদিকে যেমন ঈমানের পরিপন্থী, অপরদিকে তা মানবীয় ব্যক্তিত্বের চরম পরাজয়। হতাশা, অস্থিরতা বা উৎকণ্ঠা বিপদ দূর করেনা, বিপদের কষ্ট কমায় না বা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ দেখায় না। সর্বোপরি হতাশা বা ধৈর্যহীনতা স্বয়ং একটি কঠিন বিপদ যা মানুষকে আরো অনেক কঠিন বিপদের মধ্যে নিপতিত করে। পক্ষান্তরে ধৈর্য বিপদ দূর না করলেও তা বিপদ নিয়ন্ত্রণ করে, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য শান্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেয় এবং অস্থিরতা জনিত অন্যান্য বিপদের পথরোধ করে। সর্বোপরি বিপদে কষ্টে ধৈর্যের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর নিকট মহান মর্যাদা, সাওয়াব, জাগতিক বরকত ও পারলৌকিক মুক্তি অর্জন করেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে: "আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করব। আর আপনি শুভ সংবাদ প্রদান করুন ধৈর্যশীলদেরকে, যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তণকারী।"[৪]

ধৈর্য হলো কর্মময় স্থিরচিত্ততা ও হতাশামুক্ত সুদৃঢ় মনোবল। মুমিন দৃঢ় মনোবল নিয়ে নিজের কল্যাণ ও স্বার্থ অর্জনের জন্য চেষ্টা করবেন। বিপদে আপদে কখনোই অতীতের ভুলভ্রান্তি নিয়ে হতাশা বা আফসোস করে সময় নষ্ট করবেন না বা মনের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও হতাশার অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দিবেন না। বরং যা ঘটার আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটেছে এই বিশ্বাস নিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে কর্মের পথে এগোতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تقل لَوْ أَنِّي فعلت كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تفتحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক প্রিয় ও অধিক কল্যাণময়, যদিও প্রত্যেকের ভিতরেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার জন্য যা কল্যাণকর তা অর্জনের জন্য তুমি সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। কখনোই হতাশা বা অবসাদগ্রস্ত হবে না। যদি তুমি কোনো বিপদে-অসুবিধায় নিপতিত হও তবে তুমি বলবে না যে, যদি আমি এইরূপ করতাম!! বরং তুমি বলবে: আল্লাহর নির্ধারণ এবং তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। কারণ 'যদি করতাম!!' বলে অতীতের কর্ম নিয়ে আফসোস শয়তানের কর্মের পথ উন্মুক্ত করে।"[৫]

ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অন্যতম দিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.

"যে অপরকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করতে পারে সেই প্রকৃত বীর নয়, প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে।"[১]

আবূ দারদা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমাকে এমন একটি কর্ম শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেন

لا تغضب ولك الجنة

"তুমি ক্রোধান্বিত হবে না তাহলেই জান্নাত তোমার প্রাপ্য হবে।"[২]

ক্রোধ সম্বরণ করা ও ক্রোধের সময় আত্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তন্মধ্যে রয়েছে, ক্রোধান্বিত হলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা, আল্লাহর ক্রোধের কথা স্মরণ করা, উত্তেজিত অবস্থায় কথা না বলে চুপ করে থাকা, মুখে-মাথায় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা, ওজু করা, দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে শয়ন করা ইত্যাদি।

ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যার কারণে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে বা যে কষ্ট দিয়েছে তাকে ক্ষমা করতে ও তার সাথে উত্তম আচরণ করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। বিশেষত যাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব সেইরূপ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা অতীব প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন: "ভাল এবং মন্দ (আচরণ) সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান।"[৩]

প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে যেয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "তারা কবীরা গোনাহ সমূহ ও অশ্লীল কর্ম বর্জন করে এবং যখন তারা ক্রোধান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে।"[৪] অন্যত্র জান্নাতী মুমিনদের পরিচয়ে বলা হয়েছে: "তারা ক্রোধ সম্বরণ ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষদেরকে ক্ষমা করে।"[৫]

ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمصيه أمضاه ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة

"যে ব্যক্তি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তার মর্যাদা রক্ষা করবেন ও দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। বিরক্তি ও ক্রোধে উত্তেজিত অবস্থায় যদি কেউ রাগ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সম্বরণ করে তবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার হৃদয়কে পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবেন।" হাদীসটি হাসান।[৬]

(৫) আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ

অন্তরের একটি সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর সু-ধারণা পোষণ করা ও সর্বদা আল্লাহর রহমতের আশায় হৃদয়কে ভরপুর রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

(إن) حُسْنَ الظَّنِّ (بالله) مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

"আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা আল্লাহর সর্বোত্তম ইবাদতের অন্যতম।"[৭]

যত কঠিন বিপদ বা সমস্যাই আসুক না কেন, মুমিনের হৃদয়ে অবিচল আস্থা থাকে যে, তার করুণাময় দয়াময় প্রতিপালক তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তার জন্য যা কল্যাণকর তারই ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহর রহমতের প্রতি অবিচল আস্থার সামান্যতম ঘাটতি ঈমানেরই ঘাটতি। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, হতাশা বা অবসাদে আক্রান্ত হওয়া অবিশ্বাসেরই নামান্তর। কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে: "একমাত্র কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না।"[৮]

ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ও দুশ্চিন্তা শয়তানের বিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্য। মহান করুণাময় আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বরকত-রহমতের অঙ্গীকার করেন।"

আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব যে, আমাদের অধিকাংশ দুশ্চিন্তাই ভবিষ্যতকে নিয়ে অমূলক দুশ্চিন্তা। রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হলে অধিকাংশ সময়েই আমরা খারাপ পরিণতির কথা চিন্তা করে হতাশা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সমাজিক যে কোনো প্রকৃত বা সাম্ভাব্য সমস্যাকে নিয়ে আমাদের চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খারাপ দিকটা নিয়েই আবর্তিত হয়। অথচ সকল অবস্থায় ভাল চিন্তা করা, আল্লাহর রহমতে সকল বিপদ কেটে যাবেই এইরূপ সুদৃঢ় আশা পোষণ করা মুমিনের ঈমানের দাবী এবং আল্লাহর অন্যতম ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ। যে

বান্দা রহমতের আশা করতে পারেন না তিনি তো আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করতে পারলেন না। আর আল্লাহ তো বান্দার ধারণা ও আস্থা অনুসারেই তার প্রতি ব্যবহার করবেন।

সাম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে তো নয়ই, প্রকৃত বিপদের ক্ষেত্রেও মুমিন কখনোই হতাশ হন না। কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।"[১]

এভাবে আল্লাহ একটি কষ্টের জন্য দুইটি স্বস্তির ওয়াদা করেছেন। এজন্য মুমিন কষ্ট, বিপদ বা অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হলে এই ভেবে খুশি হন যে, এই কষ্ট মূলত আগত স্বস্তিরই পূর্বাভাস মাত্র। মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলি তাঁর রহমতের আশায় ভরে দিন এবং সকল হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত রাখুন।

(৬) কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি

শুক্র অর্থ কৃতজ্ঞতা, রিদা অর্থ সন্তুষ্টি এবং কানা'আত অর্থ স্বল্পে তুষ্টি। এই তিনটি কর্মে মুমিনের মনকে অনুশীলন করতে হবে। এগুলি দুনিয়া ও আখিরাতের অনন্ত নিয়ামতের উৎস। আল্লাহ বলেন: "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।"[২]

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অগণিত নেয়ামত রয়েছে। আবার অনেক কষ্টও রয়েছে। মানুষের একটি বড় দুর্বলতা আনন্দের কথা তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া ও কষ্ট বেদনার কথা বারংবার স্মরণ করা। এই দুর্বলতা কাটাতে হবে। জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ইতিবাচক হতে হবে। আমরা কখনোই কষ্ট ও অসুবিধাগুলিকে বড় করে দেখব না। কষ্টের কথা বারংবার মনে করে জাবর কাটব না। বরং আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত, শান্তি, সুখ বারংবার স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। এই ইতিবাচক ও কৃতজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা মানব জীবনের শ্রেষ্টতম সম্পদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো মানুষের জীবনকে অনন্ত শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে ভরে দেয়।

কষ্টের অনুভুতিকে ক্রমান্বয়ে কৃতজ্ঞতার অনুভুতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। আল্লাহর অগনিত নিয়ামতের মধ্যে কিছু কষ্টের কারণে যদি গোনাহ ক্ষমা হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তাহলে অসুবিধা কী? দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের জীবনেই বিপদাপদ ও অসুবিধা আসে। কাজেই আমার জীবনে তো কিছু অসুবিধা থাকবেই। বিপদ ও সমস্যা তো আরো কঠিন হতে পারত। অনেকের জীবনেই তো আমার চেয়েও অধিক কষ্ট আছে। কাজেই আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق (والرزق) فلينظر إلى من هو أسفل منه ... فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه

"সম্পদে, শক্তিতে বা রিয্কে তোমাদের চেয়ে উত্তম কারো দিকে যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি পড়বে, তখন যেন সে তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় যারা আছে তাদের দিকেও দৃষ্টি করে। তাকে আল্লাহ যে নিয়ামতে দিয়েছেন তার প্রতি অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন থেকে আত্মরক্ষার উপায় এটি।"[৩]

অতি সামান্য নেয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। সামান্যতম আনন্দ, তৃপ্তি, ভাললাগা, চারিপার্শের কারো সামান্যতম সুন্দর আচরণ সব কিছুর জন্য হৃদয়ভরে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। আমার প্রতিপালকের দেওয়া সামান্যতম নেয়মতও যে আমার জন্য অনেক বড়। ছোট্ট নেয়ামতকে বড় করে অনুভব করলে আল্লাহ আরো বড় নেয়ামত প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير

যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[৪]

জীবনের সকল আনন্দ, সুখ, খুশি, লাভ, পুরস্কার ইত্যাদি সকল নিয়ামতের কথা প্রসঙ্গ ও সুযোগ পেলে অন্যদেরকে বলতে হবে। আমরা সাধারণত সুখের বা আনন্দের কথার চেয়ে দুঃখের কথা বলতে বেশি আগ্রহী। আমাদেরকে এর বিপরীত বলার অভ্যাস আয়ত্ব করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر

"আল্লাহর নিয়ামতের কথা বলা কৃতজ্ঞতা এবং তা না বলা অকৃতজ্ঞতা।"[৫]

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবি, বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের প্রতি সামান্যতম সহযোগিতা করেন তবে আমাদের দায়িত্ব, তার প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সম্ভব হলে তাকে প্রতিদান দেওয়া। না হলে তার জন্য দু'আ করা এবং তার উপকারের কথা অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করা ও বলা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لا يشكر الله من لا يشكر الناس

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও অকৃতজ্ঞ।"[১]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه

"যদি তোমাদের কাউকে কেউ কোনোভাবে উপকার করে তবে তোমরা তার প্রতিদান দেবে। যদি তোমরা প্রতিদান দিতে না পার তবে তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবে যাতে অনুভব করতে পার যে, তোমরা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছ।"[২]

(৭) নির্লোভতা

যুহদ অর্থ নির্লোভতা, নির্লিপ্ততা, বৈরাগ্য ইত্যাদি। ইসলামে সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগের বৈরাগ্য নিষিদ্ধ। সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে অবস্থান করে জাগতিক সম্পদ ও সম্মানের লোভ থেকে হৃদয়কে বিমুক্ত রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সচ্ছলতা, অসচ্ছলা, সম্মান ও অসম্মান সকল অবস্থায় হৃদয়ের অবস্থা এক থাকাই ইসলামী বৈরাগ্য। আল্লাহ যখন যেভাবে রাখবেন তখন সেই অবস্থায় বান্দা তার দায়িত্বগুলি পালন করতে সচেষ্ট থাকবেন। সম্পদ বা প্রতিপত্তি থাকলে তা দিয়ে বান্দা যথাসাধ্য আখিরাতের পাথেয় অর্জনের চেষ্টা করেন। সম্পদ বা প্রতিপত্তি না থাকলে বান্দা ভারমুক্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নিরিবিলি আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। যে কোনো সময়ে তার মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ আবাসে গমনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন।

এই জগতে মুমিন একজন পথচারী বা প্রবাসী মাত্র। বাস, রেল বা বিমানে ভাল সিট পেতে চান যাত্রী, কিন্তু ভাল সিট না পেলে দুশ্চিন্তায় মনকে ভারাক্রান্ত করেন না। যে সিট পেয়েছেন তাতে বসেই নিজের গন্তব্যস্থলে গমন করেন। পথের সৌন্দর্য ও শান্তি তাকে আনন্দিত করে। কিন্তু পথের কষ্ট তাকে হতাশ করে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি ঘুম থেকে উঠলে আমরা দেখলাম যে, তার দেহে চাইয়ের দাগ হয়ে গিয়েছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য একটি বিছানা বানিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন,

ما لي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب أستظل تحت شجرة ثم راح وتركها

"আমার সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক! দুনিয়াতে আমার অবস্থা অবিকল সেই আরোহীর মত, যে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে এবং এরপর গাছটি ফেলে রেখে সে চলে গিয়েছে।"[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك

"তুমি দুনিয়াতে এমন হও, যেন তুমি প্রবাসী অথবা পথচারী। ইবনু উমার বলতেন, যখন সন্ধ্যা হবে, তখন তুমি পরবর্তী সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এই অপেক্ষা করবে না। আর যখন সকাল হবে তখন তুমি পরবর্তী সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকবে না। তোমার সুস্থতা থেকে তুমি তোমার অসুস্থতার পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তোমার জীবন থেকে তুমি তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেয় গ্রহণ কর।"[৪]

সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس

"দুনিয়ার বিষয়ে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন, আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।" হাদীসটি সহীহ।[৫]

(৮) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রেম

আল্লাহর প্রিয় হার্দিক কর্মের অন্যতম ভালবাসা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে অন্য সকল কিছু এবং নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে। এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সকল মুমিনকে ভালবাসতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما

"তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে, প্রথম বিষয় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অন্য সকলের চেয়ে তার নিকট বেশি প্রিয় হবেন।"[৬]

তিনি আরো বলেছেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"তোমাদের কেউ ততক্ষন মুমিন হতে পারবে না, যাতক্ষন না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশী ভালবাসবে।"[১]

ভালবাসা অর্জনের অন্যতম উপায় সাহচার্য ও অনুকরণ। সাহাবীগণ এভাবেই সত্যিকারের নবীপ্রেম অর্জন করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালের নবীপ্রেমিকগণ দৈহিক সাহচার্য না পেলেও সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও হাদীস পাঠ, তাঁর ও তাঁর সহচরদের জীবনী পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে তাঁর রুহানী সাহচার্য লাভ করে তাঁর ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরই হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করে হৃদয়ের মধ্যে এই ভালবাসাকে চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ করেছিলেন তাঁরা। আমাদেরও এপথে এগোতে হবে।

নবীর (ﷺ) সকল উম্মাতকে ভালবাসা নবী-প্রেমের অংশ। যার মধ্যে তাঁর আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ যত বেশি তার প্রতি মুমিনের প্রেমও তত বেশি। আল্লাহর ওয়াস্তে এই ভালবাসা। দল, মত, পাওনা, দেনা ইত্যাদি কারণে তা বাড়ে না বা কমে না। বরং দীন পালনের কারণে তা বাড়ে-কমে।

(৯) সুন্দর আচরণ

সমাজের সকলের সাথে উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করা আল্লাহর প্রিয়তম ইবাদতসমূহের অন্যতম। আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُق وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُق لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ.

"কিয়ামতের দিন কর্মবিচারের পাল্লায় বান্দার সবচেয়ে ভারী ও মূল্যবান কর্ম হবে সুন্দর আচরণ এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী মানুষ শুধু তার সুন্দর ব্যবহারের বিনিময়েই নফল সালাত ও নফল সিয়াম পালন করার সাওয়াব অর্জন করবে।[২]

মুমিনের আচরণ এমনই যে সহজেই তিনি মানুষকে আপন করে নেন এবং অন্যেরাও তাকে আপন করে ভালবেসে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف

"মুমিন ঐ ব্যক্তি যে নিজে অন্যদেরকে ভালবাসে এবং অন্যেরাও তাকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি নিজে অন্যদের ভালবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসে না তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।" হাদীসটি হাসান।[৩]

হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, হুসনে খুলুক বা সুন্দর আচরণের তিনটি দিক রয়েছে। প্রথমত: কথা ও আচরণের ক্ষেত্রে বিনম্রতা, প্রফুল্ল চিত্ত, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সত্য পরায়ণতা, কম কথা বলা ও বেশি শ্রবণ করা। দ্বিতীয়ত, কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হলে গালি গালাজ, অভিশাপ ও সীমালঙ্ঘণ বর্জন করা। তৃতীয়ত, ক্ষমা করা, বিশেষত প্রতিশোধ নেওয়া বা প্রতিউত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে ক্ষমা করে দেওয়া। এইরূপ আচরণের অধিকারী কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ– এর সবচেয়ে নৈকট্যের মর্যাদায় সমাসীন হবেন। আর এর বিপরীত আচরণের অধিকারী সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানে থাকবেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ও কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থান লাভ করবে যাদের আচরণ সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি অপ্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে, যাদের কথায় বা আচরণে অহংকার প্রকাশিত হয় এবং যারা কথাবার্তায় অন্যের প্রতি অবজ্ঞা বা অভদ্রতা প্রকাশ করে।" হাদীসটি হাসান।[৪]

(১০) নফল সিয়াম ও নফল দান

আমরা দেখেছি যে, সকল ইবাদতই মূলত যিক্র। আল্লাহর পথে আগ্রসর হওয়ার জন্য ফরয ইবাদত পালনের পরে বেশি বেশি নফল ইবাদত মুমিনের পাথেয়। বিশেষত নফল সিয়াম, নফল দান, নফল ইল্ম অর্জন ইত্যাদি ইবাদত বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করতে হবে। নফল সিয়াম বা সিয়াম মুমিনের জীবনে অন্যতম ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ নফল সিয়াম পালনের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁরা নিয়মিত ও অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন। প্রতি দুইদিন পর একদিন, বা একদিন পর একদিন, বা প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার, প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, প্রতি মাসের প্রথমে ও শেষে নিয়মিত নফল সিয়াম পালনের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এছাড়া সুযোগমতো যত বেশি সম্ভব অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন তিনি।

নফল দান, সাদকা, সাহায্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রত্যেক মুমিনের নিয়মিত ও অনিয়মিত দানের অভ্যাস রাখা প্রয়োজন। মানুষের অভাব চিরন্তন। মনের অভাব থেকে কেউই মুক্ত নয়। মুমিন সর্বদা চেষ্টা করবেন অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক

সমস্যা মেটানোর পর প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে নিয়মিত কিছু নির্ধারিত এতিম, বিধবা, অসহায় বা অভাবী মানুষকে সাহায্য করার। এছাড়া সর্বদা সাধ্যমতো দান করার চেষ্টা করতে হবে। দানের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও সাওয়াব বিষয়ে হাদীস আলোচনা করার জন্য পৃথক বই প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার অধিপতি ছিলেন। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে তিনি যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে এক পঞ্চমাংশ পেতেন। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা অভাবী মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার আগেই তাঁর সব সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেত। মাসের পর মাস তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে রান্না করার মতো কিছুই থাকত না। শুধুমাত্র ২/১ টি শুকনো খেজুর ও পানি খেয়েই তাঁদের মাসের পর মাস চলে যেত। এ সকল ঘটনা বিস্তারিত বলতে গেলে বিশাল আকারের বই লিখতে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা এ ধরনের ব্যয়ের জন্য আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের জীবনে এ ধরনের অগণিত ঘটনা রয়েছে, যা আলোচনা করলে আমাদের পার্থিব সম্পদ ও বিলাসিতার লোভ কিছুটা কমতে পারে। এই পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে শুধু দু'টি ঘটনা উল্লেখ করছি। উমার (রা) জাবির (রা)-এর হাতে একটি দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন: দিরহাম দিয়ে কী করবে? জাবির বলেন: আমার পরিবারের সদস্যগণ খুবই শখ করেছে গোশত খাওয়ার, তাই তাদের জন্য কিছু গোশত ক্রয় করব। উমার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বারবার বলতে থাকেন – 'শখ করেছে?' হযরত জাবির বলেন: আমি মনে মনে কামনা করছিলাম, আমার হাতের দিরহামটি যদি হারিয়ে যেত এবং উমার তা না দেখতেন ! উমার (রা) বলেন:

أكل ما اشتهيتم اشتريتم! أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لابن عمه وجاره؟ أين ذهب عنكم هذه الآية: ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾

"তোমাদের যা শখ হবে তাই কিনবে ? তোমাদের মধ্যে কেউ কি চায় না যে, তার ভাইয়ের জন্য ও প্রতিবেশীর জন্য একটু ক্ষুধার্ত থাকবে (নিজে ক্ষুধার্ত থেকে সেই অর্থ তার ভাইকে প্রদান করবে)? আল্লাহ বলেছেন : যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন বলা হবে) তোমরা তোমাদের সুখ ও মজাদার সব কিছু তো পার্থিব জীবনেই ভোগ করে শেষ করে ফেলেছ, সুতরাং আজ তোমাদরেকে অপমানকর আযাবের শাস্তি প্রদান করা হবে।"[১] তোমরা কি কুরআনের এই বাণী ভুলে গেলে ?[২]

অন্য এক ঘটনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, একদিন তিনি খাবারের মাজলিসে বসে খাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর পিতা উমার (রা) তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি সরে গিয়ে তাঁর জন্য মাজলিসের সামনে স্থান করে দেন। উমার (রা) বসে বিসমিল্লাহ বলে এক লোকমা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় লোকমা মুখে দেওয়ার পরে তিনি বলেন, আমি খাদ্যের মধ্যে চর্বির গন্ধ পাচ্ছি, যা গোশতের চর্বি বলে মনে হচ্ছে না। তখন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি বাজারে গিয়েছিলাম মোটাতাজা ছাগলের গোশত কেনার আশায়। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখলাম তার মূল্য বেশি। এজন্য এক দিরহাম দিয়ে রোগাপটকা বকরির গোশত কিনলাম এবং এক দিরহাম দিয়ে ঘি কিনে এর সাথে মিশালাম, যেন ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে গোশতটুকু চেটেপুটে খেতে পারে। তখন উমার (রা) বলেন :

مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ إِلا أَكَلَ أَحَدَهُمَا وَتَصَدَّقَ بِالآخَرِ

"যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দুটি দিরহাম জমা হতো, তখনই তিনি তার একটি দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় করতেন এবং অন্যটি তিনি দান করতেন।" এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন : "হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি খানা গ্রহণ করুন। ভবিষ্যতে কখনোই আমি এর ব্যতিক্রম করব না। যদি কখনো আমি দু'টি দিরহামের মালিক হয় তাহলে ঠিক রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে ব্যয় করেছেন (একটি সংসারের জন্য ও অপরটি সমাজের জন্য) সেভাবেই আমি ব্যয় করব।"[৩]

এ ছিল সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা। আর কোথায় আমরা !

ছ. যিক্‌রের জন্য আদব

আমরা দেখেছি যে, যিক্‌র মুমিনের জীবনের সার্বক্ষণিক ইবাদত। মুমিন সর্বাবস্থায় যিক্‌রে রত থাকবেন। যিক্‌রের আদবের অর্থ যথাসম্ভব এগুলি পালন করা। তবে সবগুলি আদব পালন করতে না পারার অর্থ এই নয় যে, যিক্‌র বন্ধ করতে হবে বা এ অবস্থায় যিক্‌র করলে কোনো পাপ হবে। নিম্নে আমি কিছু আদব ও নিয়ম আলোচনা করব এবং কোন্ বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা উল্লেখ করার চেষ্টা করব। আল্লাহর দরবারে সকাতরে তাওফীক ও কবুলিয়ত প্রার্থনা করছি।

(১) যিকিরের ওযীফা তৈরি করা

"ওযীফা" অর্থ নিয়মিত বা নির্ধারিত কর্ম, নির্ধারিত কর্ম তালিকা, দৈনন্দিন কর্ম ইত্যাদি। মুমিন নিজের জন্য প্রতিদিনের যে সকল কর্ম পালনের নির্ধারিত তালিকা বা কর্মসূচী তৈরি করেন তাকেই 'ওযীফা' বলা হয়।

বিভিন্ন হাদীসে আমরা বিভিন্ন প্রকার যিকির ও ইবাদতের ফযীলতের কথা জানতে পারি। স্বভাবত অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে সকল প্রকার নেক আমল সবসময় করা সম্ভব হয় না। তবে যিকির বা অন্য কোনো বিষয়ে কোনো ফযীলতের বিষয়ে সহীহভাবে জানতে পারলে অন্তত একবার হলেও পালন করা মুমিনের কর্তব্য। এরপর যথাসম্ভব তা পালনের চেষ্টা করতে হবে।

এ ধরনের সাময়িক কর্ম মুমিনের জীবনের মূল নিয়ম হবে না। মূল নিয়ম হবে নিয়মিত কর্ম। মুমিনের দায়িত্ব হলো মাসনূন যিকির

আযকারের মধ্য থেকে নিজের সময়, সুযোগ ও ক্বলবের হালতের দিকে লক্ষ্য রেখে একেবারে কম না হয় আবার সাধ্যের বাইরে চলে না যায় এমনভাবে নিজের জন্য সুনির্দিষ্ট ওযীফা বা নির্ধারিত যিকিরের তালিকা ও কর্মসূচি তৈরি করে নিতে হবে। মাঝে মাঝে অনেক যিকির বা ইবাদত করে আবার মাঝে মাঝে একেবারে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে অল্প হলেও নির্ধারিত ওযীফা নিয়মিত পালন করা উত্তম। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل وكـــان آل محمد ﷺ إذا عملوا عملا أثبتوه

"হে মানুষেরা, তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো নফল আমল গ্রহণ কর; কারণ তোমরা ক্লান্ত না হলে আল্লাহ ক্লান্ত হবেন না। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম হলো যে কর্ম নিয়মিত করা হয়, যদিও তা কম হয়। আর মুহাম্মাদের (ﷺ) বংশের (তিনি ও তাঁর পরিজনের) নিয়ম ছিল কোনো আমল শুরু করলে তা স্থায়ী রাখা।"[১]

অসংখ্য সাহাবী-তাবেয়ীর জীবন থেকে আমরা এই বিষয়টি দেখতে পাই। তাঁরা তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত, দোয়া, সালাত পাঠ, চাশ্‌ত, তাসবীহ তাহলীল ও অন্যান্য যিকিরের একটি নির্দিষ্ট ওযীফা নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। এর বাইরে তাঁরা সর্বদা অনির্ধারিতভাবে আল্লাহর যিকিরে তাঁদের জিহ্বা আর্দ্র রাখতেন।[২] ইতঃপূর্বে আমি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আমাদেরও এভাবে কিছু যিকির নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত। অতিরিক্ত যিকির হবে অনির্ধারিত ও অগণিত।

(২) ওযীফা নষ্ট না করা

প্রত্যেক নির্ধারিত যিক্‌র যথাসময়ে পালন করার চেষ্টা করতে হবে। কোনো অসুবিধার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে পালন সম্ভব না হলে পরবর্তী সময়ে তা আদায় (কাযা) করার চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সাহাবীগণ এধরনের নির্ধারিত যিক্‌র, দু'আ ও তিলাওয়াত পালন করতেন রাত্রে একাকী। তাহাজ্জুদের সালাত ও এসকল যিক্‌র, তিলাওয়াত ও দু'আয় তাঁরা রাত্রের অধিকাংশ সময়, বিশেষত শেষ রাত ব্যয় করতেন। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل

"যে ব্যক্তি তার নির্ধারিত ওযীফা পালন না করে ঘুমিয়ে পড়বে, সে যদি তা ফজর ও যোহর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নেয় তাহলে সে যথাসময়ে রাতের বেলায় আদায় করার সাওয়াব পাবে।"[৩]

রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নিয়মও তাই ছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন :

كان رسول الله ﷺ إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো আমল করলে তা স্থায়ী করতেন (নিয়মিত পালন করতেন)। তিনি কখনো ঘুম বা অসুস্থতার কারণে রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারলে দিনের বেলায় ১২ রাক'আত সালাত আদায় করতেন।"[৪]

(৩) যিক্‌রে মনোযোগ

যিক্‌রের সময় হৃদয় ও জিহ্বাকে একত্রিত করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে হবে। মুখে যা উচ্চারণ করতে হবে মনকে তার অর্থের দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে। যিক্‌রের শব্দের সাথে হৃদয়কে আলোড়িত করতে হবে। সর্বোত্তম যিক্‌র হলে – যা মুখে ও মনে একত্রে উচ্চারিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের যিক্‌র – শুধু মনের যিক্‌র। তৃতীয় পর্যায়ের যিক্‌র– শুধু মুখের যিক্‌র। অনেক সময় যাকিরের মনে ওয়াসওয়াসা আসে যে, চলতে ফিরতে, গাড়িতে, মাজলিসে বা জনসমক্ষে মুখের যিক্‌র করলে রিয়া হবে বা মানুষ রিয়াকারী বলবে, কাজেই শুধু মনে যিক্‌র করি। এই চিন্তা অর্থহীন ও যিক্‌র থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তানী ওয়াসওয়াসা। যাকিরের দায়িত্ব, নিজের মনকে আল্লাহ-মুখী করা ও রিয়া থেকে পবিত্র করা। সাথে সাথে বেপরোয়াভাবে সর্বদা নিজের জিহ্বাকে যিক্‌রে ব্যস্ত ও আর্দ্র রাখা।

(৪) মনোযোগের উপকরণ: সুন্নাত বনাম বিদ'আত

যিক্‌র এবং অন্য সকল ইবাদতের প্রাণ মনোযোগ। মনোযোগ একটি মাসনূন ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ মনোযোগ সহকারে যিক্‌রের সাথে হৃদয়কে আলোড়িত করে ক্রন্দন ও আবেগসহ যিক্‌র করতেন।

এই মনোযোগ ও আবেগ সৃষ্টির জন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি তাঁদের কর্ম থেকে আমরা দেখতে পাই না। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ সহকারে যিক্‌র করতেন। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলিম, আবিদ বা যাকির মনোযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ সকল পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে যিক্‌রের অংশে পরিণত হয়ে বিদ'আতে পর্যবসিত হয়।

যেমন, ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন যে, "যাকিরের জন্য লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ একটু টেনে টেনে এর অর্থ মনের মধ্যে

নেড়েচেড়ে চিন্তা করে যিক্‌র করা উত্তম।"[১] এই মদ্দ, অর্থাৎ টানা মূলত কোনো সুন্নাত ইবাদত নয়। টানার মধ্যে কোনো সাওয়াব নেই। ইবাদত এই যিক্‌রটি মুখে উচ্চারণ করা ও মনে এর অর্থ অনুধাবন ও চিন্তা করা। উচ্চারণ বা চিন্তার প্রয়োজনে যাকির যদি ব্যক্তিগতভাবে একটু থেমে বা একটু টেনে যিক্‌র করেন তাহলে এই থামা বা টানার মধ্যে কোনো ইবাদত বা সাওয়াব নেই। তবে অনুধাবন, চিন্তা ও বুঝা ইবাদত এবং এ জন্য তিনি সাওয়াব পাবেন। যদি কেউ এভাবে না টেনে সংক্ষেপে বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে সাথে অনুরূপ অনুধাবন ও চিন্তা করতে পারেন তাহলে তিনিও একই সাওয়াব অর্জন করবেন। যদি কেউ সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বা নিয়মকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন অথবা এরূপ কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত কোনো সাওয়াব বা ইবাদত হচ্ছে বলে মনে করেন তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

তাহলে আমরা মনে করছি যে, যদি কেউ মনোযোগ অর্জনের জন্য একটু ধীরে লয়ে টেনে টেনে উচ্চারণ করে অথবা চোখ কন্ধ করে, বিশেষভাবে বসে বা উচ্চারণ করে যিক্‌র করেন তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। এগুলি জায়েয কর্ম। তিনি একটি জায়েয উপকরণ একটি মাসনূন ইবাদত অর্জনের জন্য ব্যবহার করছেন। কিন্তু সমস্যা ত্রিবিধ :

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ এভাবে ধীর ধীরে বা টেনে টেনে উচ্চারণের রীতি অনুসরণ করতেন বলে কোথাও জানা যায় না। তাঁরা ঠোঁট নেড়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করতেন, উপরের হাদীসে তা আমরা দেখেছি। কখনো কোনো রকম ব্যতিক্রম উচ্চারণ করলে তা সাহাবীগণ বর্ণনা করতেন। এখন আমরা কোন্ যুক্তিতে তাদের রীতির বাইরে যাব ?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ চোখ মেলে দৃষ্টিকে সাজদার স্থানে নিবদ্ধ করে সালাত আদায় করতেন। তাঁরা কখনো চোখ বুজে সালাত আদায় করেছেন বলে আমরা কোথাও বর্ণনা পাচ্ছি না। আমরা জানি যে, চক্ষু বন্ধ করে যিক্‌র, সালাত, মুরাকাবা ইত্যাদিতে মনোযোগ বেশি আসে। কিন্তু মনোযোগ সৃষ্টির যুক্তিতে কি আমরা চোখ বুজে সালাত আদায় করতে পারব ? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মনোযোগ অর্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা মনোযোগ সৃষ্টির জন্য এ সকল রীতি অনুসরণ করেননি। আমরা কিভাবে তাকে ভালো বলব?

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনে ইবাদত পালনের জন্য কোনো উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, দাঁড়িয়ে সালাত পড়া ইবাদত। কারো জন্য দাঁড়াতে কষ্টকর হলে তিনি একটি লাঠি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আমরা সবার জন্য লাঠি ব্যবহারের রীতি প্রচলন করতে পারি না। মনোযোগের জন্য দুই একবার চোখ বন্ধ করে সালাত আদায়ের অনুমতি কেউ কেউ দিয়েছেন। কিন্তু সর্বদা চোখ বন্ধ করে সালাতের রীতি চালু করা কখনোই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে কোন যাকির মনোযোগের প্রয়োজনের এ সকল জায়েয উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন।

তৃতীয়ত, এই ধরনের উপকরণের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ইবাদত পালনকারী এক পর্যায়ে উপকরণকে ইবাদতের অংশ মনে করেন। তখন তা বিদ'আতে পরিণত হয়। যেমন, যে ব্যক্তি টেনে টেনে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করছেন তিনি ভাবছেন – যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে তা উচ্চারণ করছে তার ইবাদতটি পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। অথবা একটু টেনে উচ্চারণ করলে ইবাদতটি আরো ভালো হতো।

এখানে তিনটি কর্ম আছে : যিক্‌রটির উচ্চারণ, মনোযোগ ও ধীর লয়। তিনি তিনটি কাজকেই পৃথক ইবাদত মনে করছেন। প্রথম দুটি অর্জিত হলেও তৃতীয়টির অভাব থাকলে ইবাদতকে অসম্পূর্ণ ভাবছেন। যে কাজটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবাদত হিসাবে বলেননি বা করেননি তাকে তিনি ইবাদত মনে করছেন। অথবা তিনি ভাবছেন যে, এভাবে টেনে না পড়লে মনোযোগ আসতেই পারে না। অর্থাৎ, মনোযোগ অর্জনের একমাত্র উপকরণ এভাবে টেনে উচ্চারণ করা। এভাবে তিনি মনে করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মতো স্বাভাবিক উচ্চারণের মনোযোগ আসতে পারে না। এ কথার অর্থ ,– 'পরিপূর্ণ সুন্নাত পদ্ধতিতে ইবাদত করলে ইবাদত পূর্ণ হবে না বা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের ইবাদত পূর্ণ ছিল না !' এভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে বিদ'আতের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করবেন।

আমরা জানি যে, মনোযোগ ও বিনয় সহকারে সালাত আদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হাদীস শরীফে প্রত্যেক সালাতকে জীবনের শেষ সালাত মনে করে ভয়ভীতি ও বিনয় সহকারে আদায় করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এখন একব্যক্তি সালাতের মধ্যে এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য কাফনের কাপড় পরিধান করে বা গলায় বেড়ি পরে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন। এক্ষেত্রে তিনি এমন একটি উপকরণ ব্যবহার করছেন যা খেলাফে সুন্নাত বা সুন্নাত-সম্মত নয়। এই উপকরণ কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ ব্যবহার করেননি, যদিও সালাতের মনোযোগ সৃষ্টির আগ্রহ তাঁদের ছিল সবচেয়ে বেশি। এরপরেও যদি তিনি মাঝেমধ্যে এই উপকরণ ব্যবহার করেন তাহলে হয়ত কেউ কেউ তা মেনে নেবেন বা প্রতিবাদ করবেন না। কিন্তু তিনি যদি একে সালাতের অবিচ্ছেদ্য রীতি বানিয়ে নেন তাহলে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আতে পরিণত হবে। তৃতীয় পর্যায়ে যদি তিনি সালাতের জন্য কাফনের কাপড় বা বেড়ি পরিধানকে অতিরিক্ত একটি ইবাদত বলে মনে করেন অথবা এই পোশাক ছাড়া সালাতের মনোযোগ সম্ভব নয় বলে মনে করেন তাহলে তার বিদ'আত আরো পরিপক্কতা লাভ করবে।

উপরের দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য যিক্‌র কেন্দ্রিক কিছু বিভ্রান্তি সমাধানের চেষ্টা করা। যিক্‌রের মনোযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আবিদ বা যাকির বুজুর্গ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করেছেন। যেমন, ঘাড় বা শরীর নাড়ানো, শরীরের বিভিন্ন স্থানের দিকে লক্ষ্য করে যিক্‌র করা, যিক্‌রের শব্দ দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের কল্পনা করা, ইত্যাদি। এগুলি সবই খেলাফে সুন্নাত উপকরণ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাঝেমধ্যে এ সকল উপকরণের ব্যবহার অনেকটা চোখ বুজে সালাত আদায়ের মতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এগুলিকে রীতি বানিয়ে ফেলা হয়েছে এবং এরপর সেগুলিকে ইবাদত বলে মনে করা হয়েছে। এভাবে বিদ'আতের সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে আমাদের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :

প্রথমত, সকল ইবাদত, সাওয়াব ও কামালাতের ক্ষেত্রে একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি আমাদেরকে সকল ইবাদতের ও কামালাতের পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত সুন্নাত বা রীতি ও পদ্ধতি শিখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সাহাবীগণ তাঁর সুন্নাত অনুসরণের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। সুন্নাতের মধ্যেই নিরাপত্তা, মুক্তি ও কামালাত। আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে ইবাদতে, উপকরণে, পদ্ধতিতে, প্রকরণে সবকিছুতে সুন্নাতের মধ্যে থাকা।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি বা শেখাননি তাই সুন্নাত বিরোধী বা খেলাফে সুন্নাত। এক্ষেত্রে বলতে পারব না যে, তিনি তো নিষেধ করেননি। এ কথা বললে আর কোনো সুন্নাতই পালন করা যাবে না। সালাতুল ঈদের জন্য আযান দিতে তিনি নিষেধ করেন নি। রামাদান ছাড়া অন্য সময়ে সালাতুল বিত্‌র জামাাতে আদায় করতে নিষেধ করেন নি। খালি মাথায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেন নি। এরূপ অগণিত উদাহরণ রয়েছে। ইবাদতের পূর্ণতা অর্জনের আগ্রহ তাঁরই সবচেয়ে বেশি ছিল। ইবাদতের পূর্ণতার পথ শেখানোর দায়িত্বও তাঁরই ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি যা করেননি বা শেখাননি তা বর্জনীয়। 'সুযোগ ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি করেননি' অর্থ – তিনি তা বর্জন করেছেন। এ বিষয়ে আমি "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

অতএব, কোনো ইবাদত পালনের জন্য সুন্নাতে শেখনো হয়নি এমন কোনো উপকরণ ব্যবহার করা উচিত নয়, বিশেষত যে উপকরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু করেননি তা ব্যবহার করা কখনোই উচিত নয়। একান্ত বাধ্য হলে, সুন্নাত পদ্ধতিতে ও সুন্নাত পর্যায়ের ইবাদত পালনের জন্য কোনো উপকরণ ব্যবহার করা যায়, তবে তাকে রীতিতে পরিণত করা উচিত নয়। সর্বাবস্থায় সুন্নাতের বাইরে না যাওয়াই আমাদের জন্য মঙ্গল।

তৃতীয়ত, যদি কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাঝে মধ্যে আবেগ, মনের প্রেরণা বা তৃপ্তির কারণে এ ধরনের কোনো উপকরণ 'মনোযোগ' অর্জনের জন্য ব্যবহার করেন তাহলে তা হয়ত আপত্তিজনক হবে না। তবে এগুলিকে রীতিতে পরিণত করা যাবে না।

চতুর্থত, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের মাকসূদ বা উদ্দেশ্য এই নয় যে, ইবাদত করে আল্লাহকে কৃতার্থ করে দেব বা তাকে জান্নাত বা বেলায়েত প্রদানে বাধ্য করব বা নির্দিষ্ট কোনো ফলাফল লাভ করব। আমাদের উদ্দেশ্য, আমরা তাঁর করুণা, রহমত ও ক্ষমা চাই এই আবেগটা প্রকাশ করব। সুন্নাতের অনুসরণই মূলত ইবাদত। সুন্নাতের মধ্যে থেকে আমরা যতটুক ইবাদত করব ততটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুন্নাতের মধ্যে থেকে যতটুকু করতে পারি তাতেই আমাদের চলবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে সালাত, যিক্‌র ইত্যাদি ইবাদত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। মনোযোগ অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপায় মানব সমাজে প্রচলিত। যেমন, বনে জঙ্গলে চলে যাওয়া, নির্জন প্রান্তরে যাওয়া, চক্ষু বন্ধ করা, আত্মসম্মোহন করা ইত্যাদি। এই ধরনের কোনো পদ্ধতি তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে জাননি। চোখ মেলে, মসজিদে জামাতের সাথে স্বাভাবিক পোশাকে সালাত আদায়ের রীতি শিখিয়ে গিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব সুন্নাতের মধ্যে থেকে যতটুকু সম্ভব মনোযোগ অর্জন করা। এতে যতটুকু হবে তাতেই আমাদের চলবে। এর বেশি এগোতে যাওয়ার অর্থ তার সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা করা। তিনি করেননি বা শেখাননি এমন কোনো উপায় বা উপকরণ দিয়ে ইবাদতকে উচ্চমার্গে নিয়ে যাওয়ার অর্থ তাঁর শিক্ষাকে অপূর্ণ মনে করা। আমরা হয়ত দেখতে পাব যে, অনেক আবিদ বা যাকির চোখবুজে, কাফনের কাপড় পরিধান করে, সালাতের আগে আত্মসম্মোহন করে নিয়ে, মস্তিষ্ককে অটো সাজেশনের মাধ্যমে আলফা বা ডেলটা লেভেলে নিয়ে যেয়ে, গোরস্থানের কাছে যেয়ে, নির্জন প্রান্তরে যেয়ে, মাটির উপরে বা নিচে কবর তৈরি করে তার মধ্যে দাড়িয়ে বা এই ধরনের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে সালাত আদায় করে খুবই আনন্দ, তৃপ্তি, মনোযোগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুভব করছেন। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি ? মনোযোগ অর্জনের জন্য এ সকল উপকরণ ব্যবহার করা বা এসকল উপকরণকে সালাত আদায়ের সাথে রীতিতে পরিণত করা ? নাকি সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ?

সম্মানিত পাঠক, এ সকল মজা, তৃপ্তি, আধ্যাত্মিক অনুভূতি ইত্যাদি কোনোটিই ইবাদত নয়। এগুলি একান্তই জাগতিক, পার্থিব ও মনোদৈহিক বিষয়। এগুলির জন্য কোনোপ্রকার সাওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য আপনি পাবেন না। সিয়াম রাখলে আমরা দৈহিক ও জাগতিকভাবে অনেক লাভবান হই। এই লাভগুলি ইবাদত নয়। এগুলি ইবাদতের অতিরিক্ত লাভ। এ সকল জাগতিক বিষয়ের জন্য ইবাদত করলে তা আর ইবাদত থাকে না। ইবাদত অর্থ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে ইবাদত করা। কাজেই, এ সকল উন্নতী ও বুজুর্গীর কথা যেন আপনাকে মোহিত না করে। হৃদয়কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিয়ে মোহিত করে রাখুন, তাঁকে অনুসরণ করুণ। সেখানে আর কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন না। আমরা চোখ মেলে, জামাতে, সুন্নাতের শিক্ষার মধ্যে থেকেই সালাত আদায় করব। এভাবেই যতটুকু সম্ভব মনোযোগ অর্জনের চেষ্টা করব। এভাবেই যতটুকু তৃপ্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুভব করতে পারি তাতেই আমাদের চলবে। এটুকু নিয়েই আমরা মহাবিচারের দিনে মহাপ্রভুর দরবারে হাজিরা দিতে চাই। এই সামান্য পুঁজি নিয়েই আমরা সেদিনে রাহমাতুল্লিল আলামীন নবীয়ে মুসতাফা ﷺ-এর হাউযে হাযিরা দিতে চাই।

সম্মানিত পাঠক, উপরের বিষয়গুলি সামনে রেখে, যথাসম্ভব মনোযোগ অর্জন করে যিক্‌র করার চেষ্টা করুন। সুন্নাতে স্পষ্টভাবে শেখানো হয়নি এমন কোনো বিষয়কে যিক্‌রের সাথে জড়িয়ে ফেলবেন না বা রীতিতে পরিণত করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতে তৃপ্ত থাকার তাওফীক দিন এবং আমাদেরকে সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে থেকেই তাঁর সন্তুষ্টি, পরিপূর্ণ বেলায়েত ও কামালাত অর্জনের তাওফীক দান **করুন।**

(৫) বসে বা শুয়ে যিক্‌র

মুমিন যখন বিশেষভাবে যিক্‌রের জন্য বসবেন তখন যথাসম্ভব যাঁর যিক্‌র করা হচ্ছে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আদব, বিনয়, আগ্রহ, আবেগ ও ভালবাসা নিয়ে শান্ত মনে বসতে হবে। সম্ভব হলে কিবলামুখী হয়ে বসা উত্তম। তবে প্রয়োজনে শুয়েও যিক্‌র ও ওযীফা আদায় করা যায়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন :

كان النبي ﷺ يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض

"আমার নিয়মিত অপবিত্রতার সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।"[১]

আয়েশা (রা) নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

إني لأقرأ حزبي أو عامة حزبي وأنا مضطجعة على فراشي

"আমি আমার নিয়মিত তিলাওয়াত-ওযীফা বা তার অধিকাংশই আমি নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ি।"[২]

(৬) একাকিত্ব, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

যথাসম্ভব পবিত্র ও নির্জন স্থানে যিক্র করা উত্তম। পবিত্র নামের যিক্রের জন্য মেসওয়াক করা ও মুখকে দুর্গন্ধমুক্ত করা উচিত।[৩]

(৭) যিক্র রত অবস্থায় বিভিন্ন কর্ম

ইমাম নববী, ইমাম ইবনুল জাযারী প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, যিক্র রত অবস্থায় যদি যাকিরকে কেউ সালাম প্রদান করে, তাহলে তিনি সালামের উত্তর প্রদান করে আবার যিক্রে রত হবেন। যদি তাঁর নিকট কেউ হাঁচি দিয়ে 'আল-'হামদু লিল্লাহ' বলেন, তাহলে তিনি তার জওয়াবে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলে পুনরায় যিক্রে মনোনিবেশ করবেন। যাকির যিক্র রত অবস্থায় আযান শুরু হলে, তিনি আযানের কথাগুলি বলে মুয়াযযিনের জওয়াব প্রদানের পরে যিক্রে রত হবেন। যিক্র রত অবস্থায় কোনো অন্যায়, ইসলাম বিরোধী বা অনৈতিক কাজ দেখলে তিনি তার প্রতিবাদ করবেন, কোনো ভালো কর্মে নির্দেশনার সুযোগ আসলে তা পালন করবেন, কেউ উপদেশ বা পরামর্শ চাইলে তা প্রদান করবেন, এরপর আবার যিক্রে রত হবেন। অনুরূপভাবে ঘুম আসলে বা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার যিক্র শুরু করবেন।[৪]

(৮) উচ্চারণ ও শ্রবণ

শরীয়ত সম্মত বা মাসনূন যিক্র, সালাতের মধ্যে বা সালাতের বাইরে সকল প্রকার যিক্রের ক্ষেত্রেই মূলনীতি যে, তা স্পষ্ট জিহ্বা দ্বারা এভাবে উচ্চারণ করতে হবে যে, উচ্চারণকারী কোনো সমস্যা বা অসুবিধা না থাকলে তার নিজের উচ্চারণ শুনতে পাবেন। এইভাবে নিজে শুনার মতো করে জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করা না হলে তা যিক্র বলে গণ্য হবে না। তবে মনের স্মরণ, তাফাক্কুর বা ফিকিরের কথা ভিন্ন।[৫]

(৯) যথাসম্ভব নীরবে বা মৃদু শব্দে যিক্র করা

ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যিক্র অর্থ স্মরণ করা বা করানো। স্মরণ করানো বা ওয়ায-নসীহত জাতীয় যিক্রে প্রয়োজন মতো জোরে আলোচনা করতে হবে, যাতে শ্রোতাগণ শুনতে পান। আর স্মরণ করা বা সাধারণ যিক্রের ক্ষেত্রে যাকিরের কর্ম নিজে শোনা ও তাঁর প্রভুকে শোনানো। এক্ষেত্রে সুন্নাত চুপে চুপে ও অনুচ্চস্বরে যিক্র করা।

যিক্র একটি নফল ইবাদত। সকল নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেই সুন্নাতের সাধারণ মূলনীতি যথাসম্ভব একাকী ও যথাসম্ভব চুপে চুপে তা আদায় করা। যিক্র সম্পর্কিত সকল হাদীস, সাহাবী-তাবেয়ীগণের কর্ম ও চার ইমামসহ তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ফকীহ ও ইমামগণের মতামত পর্যালোচনা করলে সন্দেহাতীতভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, যিক্রের মূল সুন্নাত নীরবে, মনেমনে বা মৃদু শব্দে যিক্র করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সাধারণত সকল যিক্র চুপে চুপে ঠোঁট নেড়ে বা মৃদু শব্দে পালন করতেন। কোনো কোনো যিক্র, যেমন ঈদুল আযহার তাকবীর, হজ্বের তালবিয়া, বিতিরের পরে তাসবীহ ইত্যাদি জোরে বা শব্দ করে বলেছেন। প্রথম যুগের সকল ফকীহ ও ইমাম একমত হয়েছেন যে, যে সকল স্থানে বা সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ জোরে বা শব্দ করে যিক্র করেছেন বলে স্পষ্টভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সে সকল স্থান বা সময় ছাড়া অন্য সকল স্থানে ও সময়ে যিক্র আস্তে বা মৃদু স্বরে আদায় করা সুন্নাত এবং জোরে বা উচ্চৈঃস্বরে যিক্র সুন্নাতের খেলাফ।

হানাফী মাযহাবে জোরে যিক্র বিদ'আত

হানাফী মাযহাবে এ বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করা হয়েছে। হানাফী মযহাবের মূলনীতি যিক্রের ক্ষেত্রে মূল সুন্নাত চুপে চুপে নিস্বরে যিক্র করা المخافتة والإخفاء আর জোরে বা উচ্চশব্দে যিক্র করা মূলত বিদ'আত।[৬] শুধুমাত্র যে সকল যিক্র ও দু'আ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরে সাহাবীগণ শব্দ করে পাঠ করতেন বলে নিশ্চিতরূপে এজমা বা সহীহ হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত, যেমন – ঈদুল আযহার সময়ের তাকবীর, হজ্বের তালবিয়্যহ ইত্যাদি ছাড়া কোনো প্রকার যিক্র ও দু'আ সশব্দে উচ্চারণ করা হানাফী মাযহাবে বিদ'আত ও মাকরুহ তাহরীমী। যেখানে সুন্নাত অথবা বিদ'আত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ আছে সেখানে তাকে বিদ'আত হিসাবে গণ্য করে তা বর্জন করতে হবে। উপরন্তু যে সুন্নাত পালন

করতে বিদ'আতের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয় সেই সুন্নাতও বর্জন করতে হবে। কারণ বিদ'আত বর্জন করা ফরয, আর সুন্নাত বা সাওয়াব অর্জন করা ফরয নয়। ফরয নষ্ট করে কোনো সুন্নাত পালন করা যায় না। হানাফী মযহাবের সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও অন্যান্য মাযহাবের গ্রন্থে এ বিষয়ে বারাবার বলা হয়েছে।[১]

পরবর্তী যুগে জোরে যিক্‌র প্রচলিত ও সমর্থিত হয়

সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগ শেষ হওয়ার পরে ক্রমান্বয়ে সমাজে বিভিন্ন সুন্নাত বিরোধী কর্ম প্রবেশ করতে থাকে। বিশেষত বাগদাদের খিলাফতের পতনের পরে সারা মুসলিম বিশ্বে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ফিতনা ফাসাদ ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামী জ্ঞান, বিশেষত কুরআন, হাদীস ও ফিকহের চর্চা কমে যায়। বিশাল মুসলিম বিশ্বের তুলনায় অতি নগণ্য সংখ্যক আলিম উলামা ইলমের ঝাণ্ডা বয়ে চলেন।

এ যুগে সুন্নাতের জ্ঞানের অভাব, আবেগ, আগ্রহ, সাময়িক ফাইদা, ফলাফল, বিভিন্ন স্থানে প্রচলন ইত্যাদির কারণে অনেকে সশব্দে যিক্‌র করতে শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে তা রীতিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে তা ব্যক্তিগত থেকে সম্মিলিত যিক্‌রের রীতিতে পরিণত হয়। সেই যুগে কোনো কোনো আলিম যখন এইভাবে জোরে যিক্‌রের প্রচলন দেখতে পান, তখন সেগুলির পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তারা এভাবে যিক্‌রকারীদের মধ্যে অনেক নেককার মানুষকে দেখতে পান এবং এভাবে যিক্‌রের মধ্যে 'ফল' দেখতে পান। এজন্য তাঁরা একাকী বা সবাইমিলে জোরে জোরে যিক্‌রকে জায়েয বলে বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করেন। তাঁরা জোরে যিক্‌রের বিরুদ্ধে কুরআন, হাদীস ও ইমামগণের মতামতকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন।[২]

আপনারা যে কোনো গবেষক একটু চেষ্টা করলেই বিষয়টি জানতে পারবেন। ৫০০ হিজরী পর্যন্ত লেখা সকল ফিকহের গ্রন্থ আপনারা পাঠ করে দেখুন, সেখানে জোরে যিক্‌রকে বিদ'আত লেখা হয়েছে। অথচ পরবর্তী যুগে দুই একজন লেখক ঢালাওভাবে তা (যিক্‌র) জায়েয করেছেন এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইমামদের সকল কথা বাতিল করে দিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও অধিকাংশ আলিম স্পষ্ট লিখেছেন যে, জোরে যিক্‌র জায়েয হলেও মসজিদের মধ্যে ইল্‌ম ও ফিকহ্ শিক্ষামূলক যিক্‌র বা ওয়ায-আলোচনা ছাড়া কোনো যিক্‌র জোরে বা উচ্চৈঃস্বরে করা মাকরুহ, অর্থাৎ মাকরুহ তাহরীমি।[৩] এ মসজিদের মধ্যে একাকী জোরে যিক্‌র করার বিধান। এখন সবাই মিলে সমবেতভাবে, সমস্বরে ও ঐক্যতানে যিক্‌রের কী বিধান হবে তা পাঠক নিজেই চিন্তা করুন।

আমাদের সমাজেও উচ্চৈঃস্বরে যিক্‌রের খুবই প্রচলন। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন :

প্রথমত, জায়েয বা না-জায়েয আমাদের বিবেচ্য নয়। আমাদের বিবেচ্য সুন্নাত কি? অনেক কর্মই জায়েয, কিন্তু সুন্নাত নয়। আমরা এখানে যিক্‌রের ইবাদতকে সুন্নাত পদ্ধতিতে হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মতো পালন করতে চাই।

দ্বিতীয়ত, কোনো কর্ম জায়েয হওয়ার অর্থ তাকে রীতিতে পরিণত করা নয়। সালাতের আগে গলা খাঁকরি দেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয, কিন্তু একে সালাতের রীতিতে পরিণত করলে বিদ'আত হবে। এ ধরনের অনেক উদাহারণ আমার "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে আলোচনা করেছি। কেউ যদি একাকী অন্য কারো অসুবিধা না করে মাঝে মাঝে ভালো লাগলে একটু জোরে জোরে যিক্‌র করেন তাহলে তা জায়েয হবে। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে সর্বদা একাকী বা সমবেতভাবে জোরে বা চিৎকার করে যিক্‌র করাই উত্তম?

তৃতীয়ত, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেন জোরে জোরে যিক্‌র করব ? কাকে শুনাব? যে যিক্‌র যাকির আল্লাহকে শুনাবেন সে যিক্‌র তিনি ও তার প্রভু শুনলেই হলো। অন্য কাউকে শুনানোর উদ্দেশ্য কি ?

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তাঁর যিক্‌র করতে হবে। তাঁর মহান রাসূল ﷺ উম্মতকে শিখিয়েছেন কিভাবে যিক্‌র করতে হবে। আমাদের কী প্রয়োজন সুবিধামতো বানোয়াট পদ্ধতিতে যিক্‌র করার ? কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে :

واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين

"এবং যিক্‌র করুন আপনার রবের আপনার মনের মধ্যে (মনে মনে) বিনীতভাবে এবং ভীতচিত্তে এবং অনুচ্চস্বরে সকালে এবং বিকালে, আর অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।"[৪]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যাকিরের মধ্যে চারটি অবস্থা একত্রিত হলে তিনি কুরআন নির্দেশিত পদ্ধতিতে যিক্‌রকারী বলে গণ্য হবেন:

(১) যিক্‌র মনের মধ্যে হবে। অর্থাৎ, যিক্‌র বা স্মরণ মূলত মনের কাজ। যিক্‌রের সময় যে কথা মুখে উচ্চারিত হবে তা অবশ্যই মনের মধ্যে আলোড়িত ও আন্দোলিত হবে।

(২) বিনীতভাবে যিক্‌র করতে হবে।

(৩) ভীত ও সন্ত্রস্ত চিত্তে যাঁর যিক্‌র করছি তাঁর মর্যাদার পরিপূর্ণ অনুভূতি হৃদয়ে নিয়ে যিক্‌র করতে হবে।

(৪) যিক্‌রের শব্দ মুখেও উচ্চারিত হতে হবে। আর সেই উচ্চারণ হবে অনুচ্চস্বরে।

অর্থাৎ, যিক্‌রে শুধু মনই নয়, মনের সাথে আন্দেলিত হবে জিহ্বা। ভক্তি, ভয় ও বিনয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মৃদু শব্দে যিক্‌র করতে হবে।

সম্মানিত পাঠক, এরপরেও কি যিক্‌রের জন্য অন্য কোনো চিন্তার প্রয়োজন আছে? আমরা অতি সহজে বুঝতে পারি যে, এই চারটি অবস্থা একে অপরের সম্পূরক ও পরিপূরক। যেখানে বিনয় আছে সেখানে ভক্তি ও ভয় থাকবে। আর যেখানে ভক্তি ও বিনয় আছে সেখানে অন্তর আলোড়িত হবেই। আর যেখানে অন্তরের অনুভূতি, ভক্তি ও বিনয় আছে সেখানে শব্দ কখনই জোরে হবে না, হতে পারেই না। অন্তরের সকল আলোড়ন, বিনয় ও ভীতি প্রকাশ করবে একান্ত বিগলিত মৃদু শব্দের বাক্য।

যিক্‌রের প্রাণ মনের আবেগ, বিনয় ও ভীতবিহ্বল অবস্থা। আর এই অবস্থায় কোনো মানুষ ইচ্ছা করলেও মুখের আওয়াজ জোর করতে পারে না। আবেগ, বিনয় ও ভীতি যত বেশি হবে শব্দের জোর ততই কমতে থাকবে। মুহতারাম পাঠক, আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে, কোনো মানুষ দুনিয়ার কোনো বড় নেতা বা কর্মকর্তার সামনে বিনীত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে চিৎকার করে তাকে ডাকছে ? এ কি সম্ভব ?

যিক্‌র-দু'আর বিষয়ে অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে :

ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين

"ডাক তোমাদের প্রভুকে বিনীত-বিহ্বল চিত্তে এবং চুপে চুপে। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীগণকে পছন্দ করেন না।"[১]

প্রিয় পাঠক, মহান প্রভু শিখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে তাঁকে ডাকতে হবে, কিভাবে তাঁর যিক্‌র করতে হবে এবং কিভাবে তাঁর কাছে দু'আ করতে হবে। তিনি আরো জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর শেখানো সীমার বাইরে বেরিয়ে তাঁকে যারা ডাকে তাদের তিনি পছন্দ করেন না। সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী মুফাসসিরগণ লিখেছেন যে, দু'আ ও যিক্‌রের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ শব্দ উচ্চ করা বা জোরে করা।[২]

হাসান বসরী বলেন, আমরা যাদের দেখেছি, সেসব মানুষের (সাহাবী ও প্রথম যুগের তাবেয়ীগণের) রীতি ছিল কোনো ইবাদত চুপে চুপে বা গোপনে করতে পারলে তা কখনো জোরে বা প্রকাশ্যে করতেন না। তাঁরা বেশি বেশি যিক্‌র-দু'আয় লিপ্ত থাকতেন, কিন্তু শুধুমাত্র ফিসফিস ছাড়া কিছুই শোনা যেত না।[৩]

প্রিয় পাঠক, আসুন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা পর্যালোচনা করি। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন :

كنا مع رسول الله ﷺ [في سفر] فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا [في رواية للبخاري: رفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله] فقال النبي ﷺ يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে [এক সফরে] ছিলাম। আমরা যখন কোনো প্রান্তরে পৌঁছাচ্ছিলাম তখন আমরা তাকবীর ও তাহলীল [আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ] বলছিলাম। আমাদের শব্দ কিছু উচ্চ হয়ে গেল। তখন নবীজী ﷺ বললেন : হে মানুষেরা, নিজেদেরকে ধীর ও প্রশান্ত কর। তোমরা যাঁকে ডাকছ তিনি বধির বা দূরবর্তী নন। তোমরা যাঁকে ডাকছ তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রবণশীল এবং নিকটবর্তী। মহামহিমান্বিত তাঁর নাম, মহাউচ্চ তাঁর মর্যাদা।"[৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আজীবন এভাবেই আল্লাহর যিক্‌র করেছেন। এখন পাঠক আপনিই সিদ্ধান্ত নিবেন আপনার জন্য কোন্‌টি উত্তম। আপনার সামানে দু'টি বিকল্প : (১). বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে নিজের মনকে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উৎসাহ দিবেন, সুন্নাতকেই সাওয়াব ও কামালাতের জন্য যথেষ্ট বলে বিশ্বাস করবেন ; অথবা (২). বিভিন্ন যুক্তি ও অজুহাত দিয়ে সুন্নাত-বিরোধী বিভিন্ন পদ্ধতি, শব্দ, উচ্চশব্দ, চিৎকার বা অন্য কোনো নিয়ম পদ্ধতি জায়েয করবেন এবং সেই জায়েযের জন্য সুন্নাতকে সর্বদা পরিত্যাগ করবেন।

সম্মানিত পাঠক, আপনার কাছে কোনটি ভালো মনে হয় ? আমি আমার জন্য সুন্নাতকেই যথেষ্ট ও সুন্নাতকেই নিরাপদ বলে দৃঢ়তমভাবে বিশ্বাস করি। আল্লাহর কাছে সকাতরে আর্জি করি, তিনি দয়া করে আমাদের হৃদয়, প্রবৃত্তি ভালোলাগা ও মন্দলাগাকে তাঁর হাবীবের (ﷺ) সুন্নাতের অনুগত ও অনুসারী বানিয়ে দেন।

তৃতীয় অধ্যায়
দৈনন্দিন যিক্‌র ওযীফা
প্রথম পর্বঃ সকালের যিক্‌র-ওযীফা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা যিক্‌রের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রকারভেদ, আদব ইত্যাদি বিষয় জানতে পেরেছি। এ অধ্যায়ে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো ও আচরিত 'যিক্‌র'গুলি বিস্তারিত আলোচনা করব। যিক্‌রের মধ্যে আমরা ইসতিগফার, দু'আ, সালাত, সালাম সবই উল্লেখ করব। কারণ আমরা দেখেছি যে, এগুলি সবই যিক্‌র। দু'আ, ইসতিগফার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার যিক্‌র রাসূলুল্লাহ ﷺ কখন কিভাবে পালন করেছেন বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

মুমিনের জীবন যিক্‌র কেন্দ্রিক হবে। সে তার সাধ্যমতো সদা সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে নিজের জিহ্বা ও হৃদয়কে আর্দ্র রাখবে। এছাড়াও যিক্‌রের জন্য কুরআন ও হাদীসে বিশেষ ৬ টি দৈনন্দিন সময় উল্লেখ করা হয়েছে: (১). সকাল, (২). বিকাল, (৩). সন্ধ্যা, (৪). ঘুমানোর আগে, (৫). শেষ রাত্রে ও (৬). পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সময় সকাল। মুমিনের জীবনের প্রতিদিন শুরু হবে আল্লাহর যিক্‌ররের মধ্য দিয়ে। সকালেই সে তার প্রভুর যিক্‌রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রুহানী খাদ্য ও শক্তি সংগ্রহ করবে, যা তাকে সারাদিন সকল প্রতিকূলতার মধ্যে পবিত্র হৃদয়ে আল্লাহর সাথে নিজেকে যুক্ত রাখতে সাহায্য করবে।

সকালের সময়কে আমরা দুভাগে ভাগ করছি – প্রথমত, ফজরের ফরয সালাত আদায় পর্যন্ত ও দ্বিতীয়ত, ফজরের সালাতের পর থেকে 'সালাতুদ দোহা' বা চাশতের নামায পর্যন্ত। প্রথম সময়ে সাধারণত মুমিন ঘুম থেকে উঠে ওযু করে সালাতের প্রস্তুতি নেন। ফজরের আযান হলে তিনি সুন্নাত সালাত আদায় করেন এবং পরে মসজিদে যেয়ে ফরয সালাত আদায় করেন। এই পর্যায়ে আমি ঘুম ভাঙ্গার যিক্‌র, ওযুর যিক্‌র, আযানের যিক্‌র, ঘর থেকে বাহির হওয়া, মসজিদে গমন, সুন্নাত ও ফরয সালাত আদায়ের কিছু নিয়মাবলী আলোচনা করব। এগুলি মূলত সাধারণ বিষয়। মুমিন সকল সময়ে ওযু, গোসল, আযান ও সালাতে এগুলির দ্বারা উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি সেই সকল যিক্‌র আলোচনা করব যা মুমিন ফজরের সালাতের পর থেকে 'দোহা'-র সালাত বা চাশতের নামায পর্যন্ত ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে পালন করবেন।

সকালের যিক্‌রঃ প্রথম পর্যায়

১. ঘুম ভাঙ্গার যিক্‌র

রাতে ঘুম থেকে উঠা দুই প্রকার হতে পারে, রাতের বেলায় কোনো কারণে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া এবং স্বাভাবিকভাবে ভোরে ঘুম থেকে উঠা।

যিক্‌র নং ৩৫ : রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে পালনীয় যিক্‌র

(২, ৯, ৪, ১, ১০ ও ১৩ নং যিক্‌র একত্রে) :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرالحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولا قوة إلا بالله

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর, 'আল-'হামদু লিল্লাহ', ওয়া 'সুব'হা-নাল্লা-হ', ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া 'আল্লা-হু আকবার', লা- 'হাওলা ওয়া লা- ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, এবং প্রশংসা তাঁরই। এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর (সাহায্য) ছাড়া।"

হযরত উবাদা ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছে'ন, "যদি কারো রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় অতঃপর সে উপরের যিক্‌রের বাক্যগুলি পাঠ করে এবং এরপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় অথবা কোনো প্রকার দু'আ করে বা কিছু চায় তাহলে তার দু'আ কবুল করা হবে। আর যদি সে এরপর উঠে ওযু করে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাত কবুল করা হবে।"[১]

সুবহানাল্লাহ ! বিছানায় থাকা অবস্থাতেই, কোনোরূপ ওযু বা পবিত্রতা অর্জন ছাড়াই এই বাক্যগুলি পাঠ করলে এতবড় পুরস্কার !! এই যিক্‌রের মধ্যে অতি পরিচিত যিক্‌রের ৬ টি বাক্য রয়েছে, যা প্রায় সকল মুসলমানেরই মুখস্থ রয়েছে।

যিক্‌র নং ৩৬ : স্বাভাবিকভাবে ভোরে ঘুম থেকে উঠার যিক্‌র :

বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর যিক্‌রের মধ্য দিয়ে দিনের শুভ ও কল্যাণময় সূচনা করতে ও যিক্‌রের মধ্য দিয়ে দিনের কল্যাণময় সমাপ্তি করতে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোরে ঘুম থকে উঠে বিভিন্ন যিক্‌র রাসূলুল্লাহ ﷺ পালন করতেন ও করতে শিখিয়েছেন। এখানে একটি যিক্‌র উল্লেখ করছি:-

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور

উচ্চারণ : আল-'হামদু লিল্লা-হিল লাযী আ'হইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে জীবিত করেছেন মৃত্যুর (ঘুমের) পরে, আর তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) ও হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুম থেকে উঠে উপরের যিক্‌রটি বলতেন।[১]

২. ইস্তিঞ্জার যিক্‌র

যিক্‌র নং ৩৭ (ক) : ইস্তিঞ্জায় পূর্বে যিক্‌র

بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-ইসি।

অর্থ: "আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি – অপবিত্র, অকল্যাণ, খারাপ কর্ম থেকে বা পুরুষ ও নারী শয়তান থেকে।"

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিঞ্জার জন্য গমন করলে এই দু'আটি পাঠ করতেন। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসে 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া দু'আটি বর্ণিত হয়েছে। মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা গ্রন্থে সংকলিত অন্য সহীহ হাদীসে দু'আটির শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

ইস্তিঞ্জার সময় মুখের যিক্‌র অনুচিত :

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌রে রত থাকতেন। এই যিক্‌র বলতে মুখে উচ্চারণের যিক্‌র বুঝান হয়েছে। এই হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ সকল অবস্থায় মুখে আল্লাহর যিক্‌র করা সম্ভব ও উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে দুটি অবস্থায় যিক্‌র না করাই উচিত বলে অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন। প্রথমত, ইস্তিঞ্জায় রত থাকা অবস্থা। তবে অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহ এই অবস্থায় মুখে যিক্‌র মাকরূহ তানযিহী বা অনুচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম নববী লিখেছেন : প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার সময় কোনো প্রকার আল্লাহর যিক্‌র করা মাকরূহ। তাসবীহ, তাহলীল, সালামের উত্তর প্রদান, হাঁচির উত্তর প্রদান, হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলা, আযানের জবাব দেওয়া ইত্যাদি কোনো প্রকারের যিক্‌র মুমিন এই অবস্থায় এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলন অবস্থায় করবেন না। যদি তিনি হাঁচি দেন তাহলে জিহ্বা না নেড়ে মনে মনে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবেন। এছাড়া প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা বলাও এ সময়ে মাকরূহ। এই দুই অবস্থায় কথাবার্তা বা যিক্‌র মাকরূহ তাহরীমি বা হারাম পর্যায়ের মাকরূহ নয়, বরং মাকরূহ তানযীহী বা "অনুচিত" পর্যায়ের মাকরূহ। এই অবস্থায় যিক্‌র করলে গোনাহ হবে না, তবে যিক্‌র না করাই উচিত। ইস্তিঞ্জায় রত ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করাও মাকরূহ। অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহের এ মত। ইবনু সীরীন, ইবরাহীম নাখয়ী প্রমুখ এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তারা এই অবস্থায় যিক্‌র, তাসবীহ-তাহলীল, সালামের উত্তর ইত্যাদি জায়েয বলেছেন।[৩]

যিক্‌র নং ৩৭ (খ) : ইস্তিঞ্জার পরের যিক্‌র :

غفرانك

উচ্চারণ : গুফরা-নাকা। **অর্থ :** "আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইস্তিঞ্জা শেষে বেরিয়ে আসলে এই দু'আটি বলতেন। হাদীসটি হাসান। কোনো কোনো যয়ীফ সূত্রে এই বাক্যটির পরে অতিরিক্ত কিছু বাক্য বলা হয়েছে।[৪]

৩. ওযুর যিক্‌র

যিক্‌র নং ৩৮ : ওযুর পূর্বের যিক্‌র : **بسم الله**

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হ। **অর্থ :** আল্লাহর নামে। **অথবা,**

بسم الله الرحمن الرحيم

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হির রা'হমা-নির রা'হীম।

অর্থ : পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে।

- ওযুর পূর্বে "বিসমিল্লা-হ" অথবা "বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম" বলা সুন্নাত। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

"ওযুর শুরুতে যে আল্লাহর নাম যিক্‌র করল না তার ওযু হবে না।" হাদীসটি কয়েকটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে ভিন্ন

ভিন্ন যয়ীফ সনদে বর্ণিত হওয়ার ফলে তা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।[১]

ওযুর আগে মুখে নিয়্যাত পাঠ খেলাফে সুন্নাত

এখানে উল্লেখ্য যে, ওযুর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলা ছাড়া অন্য কোনো মাসনূন যিক্র নেই। আমাদের দেশে অনেকে ওযুর পূর্বে 'নাওয়াইতু আন...' ইত্যাদি শব্দে ওযুর নিয়্যাত বলেন বা পাঠ করেন। নিয়্যাত অর্থ উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা। যে কোনো ইবাদতের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। এই নিয়্যাত মানুষের অন্তরের অভ্যন্তরীণ সংকল্প বা ইচ্ছা, যা মানুষকে উক্ত কর্মে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করেছে। নিয়্যাত, উদ্দেশ্য বা সংকল্প করতে হয়, বলতে বা পড়তে হয় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো জীবনে একটিবারের জন্যও ওযু, গোসল, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি কোনো ইবাদতের জন্য কোনো প্রকার নিয়্যাত মুখে বলেননি। তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, ইমাম আবু হানীফা (রহ)-সহ চার ইমাম বা অন্য কোনো ইমাম ও ফকীহ কখনো কোনো ইবাদতের নিয়্যাত মুখে বলেননি বা বলতে কাউকে নির্দেশ দেননি।

পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম এগুলি বানিয়েছেন। তাঁরাও বলেছেন যে, মুখের উচ্চারণের কোনো মূল্য নেই, মনের মধ্যে উপস্থিত নিয়্যাত বা উদ্দেশ্যই মূল, তবে এগুলি মুখে উচ্চারণ করলে মনের নিয়্যাত একটু পোক্ত বা দৃঢ় হয়। এজন্য এগুলি বলা ভালো। তাঁদের এই ভালোকে অনেকেই স্বীকার করেননি। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী ওযু, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি যে কোনো ইবাদতের জন্য মুখে নিয়্যাত করাকে খারাপ বিদ'আত হিসাবে নিন্দা করেছেন এবং কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেছেন। কারণ এভাবে মুখে নিয়্যাত বলার মাধ্যমে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের আজীবনের সুন্নাত – 'শুধুমাত্র মনে মনে নিয়্যাত করা'-কে পরিত্যাগ করছি। আমি "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[২]

ওযুর মধ্যে কোনো সহীহ মাসনূন যিক্র নেই

ওযুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার পরে ওযু শেষ করার আগে কোনো প্রকারের মাসনূন যিক্র নেই। আমাদের দেশে ধার্মিক মানুষদের মধ্যে ওযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় কিছু কিছু দু'আ পাঠের রেওয়ায আছে। এগুলি সবই বানোয়াট দু'আ। ইমাম নাবাবী, মুল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ওযুর সময় বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়া বা মাসেহ করার সময় যে সকল দু'আ পাঠ করা হয় তা সবই 'মাউযূ' বা বানোয়াট মিথ্যা হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ থেকে এ বিষয়ে সহীহ বা গ্রহণযোগ্য সনদে একটি দু'আও বর্ণিত হয়নি।৩

কোন কোন আলিম ও বুজুর্গ এ সকল দু'আ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি, মুমিন যে কোনো সময় দু'আ ও যিক্র করতে পারে। কোনো সময়ে বা স্থানে মাসনূন যিক্র বা দু'আ না থাকলে সেখানে আমরা আমাদের বানানো দু'আ করতে পারি। এ সকল দু'আ না-জায়েয হবে না।

কথাটি বাহ্যত ঠিক হলেও এর ভিন্ন একটি দিক রয়েছে। মুমিন সর্বাবস্থায় যিক্র বা দু'আ করতে পারেন। তিনি মাসনূন শব্দ ছাড়াও নিজের বানানো শব্দে দু'আ ও যিক্র করতে পারেন, যদি তার অর্থ শরীয়ত-সঙ্গত হয়। কিন্তু মুমিন কোনো মাসনূন ইবাদত বা যিক্র পরিবর্তন করতে পারেন না। এ ছাড়া মাসনূন ব্যতীত অন্য কোনো যিক্রকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করাও অনুচিত। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত :

প্রথমত, যে সকল ইবাদত রাসূলুল্লাহ ﷺ পালন করেছেন সে সকল ইবাদতের মধ্যে বানোয়াট যিক্র প্রবেশ করানো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, - সালাত, আযান, ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, হাঁচি, ইত্যাদির মাসনূন পদ্ধতি ও যিক্র নির্ধারিত রয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করার অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ যতটুকু শিখিয়েছেন তাতে আমরা তৃপ্ত হতে পারলাম না। অথবা একথা মনে করা যে, তিনি যতটুকু শিখিয়েছে ততটুকু ভালো, তবে আরেকটু বেশি করলে তা আরো ভালো হবে। আমরা সকলেই বুঝতে পারি যে, এই চিন্তা খুবই অন্যায়।

তাহলে প্রশ্ন, হাদীসে যতটুকু বর্ণিত আছে তার বেশি কি আমরা দু'আ করতে পারব না? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। মাসনূন ইবাদত, যিক্র ও দু'আর মধ্যে আমরা কোনো কম-বেশি করব না। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অতিরিক্ত দু'আ, যিক্র ও ইবাদতের সময় ও সুযোগ শিক্ষা দিয়েছেন, সে সময়ে ও সুযোগে আমরা যত খুশি বেশি বেশি দু'আ ও যিক্র করতে পারব।

উদাহরণ হিসাবে সালাতের উল্লেখ করা যায়। সালাত মুমিনের জীবনের অন্যতম যিক্র ও ইবাদত। মুমিন যত ইচ্ছা বেশি সালাত পড়তে পারেন এবং পড়া উচিত। তবে তিনি মাসনূন সালাতের মধ্যে বৃদ্ধি করতে পারেন না। তিনি যোহরের আগে বা পরে আসর পর্যন্ত যত ইচ্ছা নফল সালাত পড়তে পারেন। কিন্তু তিনি যোহরের আগের সুন্নাত সালাত বা পরের সুন্নাত সালাত ৬ রাকাত পড়তে পারেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আজীবন ওযু করেছেন, কিন্তু তাঁরা ওযুর সময় কোনো যিক্র বা দু'আ পাঠ করেছেন বলে কোনো নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। এ সময়ে দু'আ বা যিক্রের কোনো ফযীলতও তাঁরা বলেননি। কাজেই, এই সময়ে বিশেষভাবে কোনো দু'আ করা সুন্নাতের স্পষ্ট খেলাফ।

দ্বিতীয়ত, ওযুর সময়ে যিক্র বা দু'আ না-জায়েয বা মাকরুহ নয়। মুমিন এ সময়ে মনের আবেগ হলে তাসবীহ তাহলীল করতে পারেন বা কোনো বিষয় মনে পড়লে সে জন্য দু'আ করতে পারেন। হাঁচি দিলে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বা কেউ হাঁচি দিলে উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে পারেন, কাউকে সালাম দিতে পারেন বা কেউ সালাম দিলে উত্তর দিতে পারেন। এরূপভাবে যিক্র বা দু'আ তিনি করলে তা না-জায়েয

হবে না। কিন্তু এই সময়ের জন্য কোনো দু'আ বা যিক্র তিনি রীতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺএর রীতি পরিবর্তন করা হবে এবং তাঁর সুন্নাত আংশিকভাবে নষ্ট হবে।

তৃতীয়ত, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সুন্নাতেই নিরাপত্তা এবং সুন্নাতের বাইরে গেলেই ভয়। কাজেই, একান্ত বাধ্য না হয়ে সুন্নাতের বাইরে আমরা কেন যাব? বিভিন্ন যুক্তিতর্ক দিয়ে খেলাফে সুন্নাত কর্মকে জায়েয করার চেয়ে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজের মন ও প্রবৃত্তিকে সুন্নাতের মধ্যে আবদ্ধ রাখা উত্তম নয় কি ? অগণিত সুন্নাত যিক্র, দু'আ ও ইবাদত আমরা করছি না, করতে চেষ্টা বা আগ্রহও করছি না। অথচ খেলাফে সুন্নাত কিছু কর্মের জন্য আমাদের আগ্রহ বেশি। এটা কি সুন্নাতের মহব্বতের পরিচায়ক ? মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের প্রবৃত্তিকে সুন্নাতের অধীন করে দিন ; আমীন।

ওযুর পরে পালনের জন্য একাধিক যিক্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তিনটি মাসনূন যিক্র উল্লেখ করছি :

যিক্র নং ৩৯ : ওযুর পরের যিক্র-১

أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

উচ্চারণ : আশহাদু আল্ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু [ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু] ওয়া আশহাদু আন্না মু'হাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ : "আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই [তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই] এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্রেরিত বার্তাবাহক)।"

হযরত উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ সুন্দরভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে ওযু করে এরপর উক্ত যিক্র পাঠ করে তাহলে জান্নাতের আটটি দরজাই তাঁর জন্য খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"১

যিক্র নং ৪০ : ওযুর পরের যিক্র-২

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ্ 'আলনী মিনাত তাওয়া-বীন ওয়াজ্ 'আলনী মিনাল মুতাতাহ্ হিরীন।

অর্থ : "হে আল্লাহ আপনি আমাকে তাওবাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং যারা গুরুত্ব ও পূর্ণতা সহকারে পবিত্রতা অর্জন করেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

দু'আটি ইমাম তিরমিযী বর্ণিত একটি হাদীসে উপরের (৩৯) নং যিক্রের (শাহাদাতের) পরে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসটির সনদ সহীহ।২

যিক্র নং ৪১ : ওযুর পরের যিক্র-৩

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك

উচ্চারণ : সুব'হা-নাকা আল্লা-হুম্মা, ওয়া বি'হামদিকা, আশহাদু আল্ লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, আস্তাগ্বফিরুকা, ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ: "আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ, এবং আপনার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট (তাওবা) করছি।"

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কেউ ওযু করার পরে উপরিউক্ত দু'আটি বলে, তাহলে তা একটি পত্রে লিখে তার উপর সীলমোহর অঙ্কিত করে রেখে দেওয়া হবে। কিয়ামতের আগে সেই মোহর ভাঙ্গা হবে না। হাদীসটির সনদ সহীহ।৩

৪. ওযুর পরে সালাত বা তাহিয়্যাতুল ওযু

মূলত সালাতের জন্যই ওযু করা হয়। বিশেষ করে ওযুর পরেই দুই রাক'আত সালাতের গুরুত্ব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে কষ্ট হলেও সুন্দর ও পরিপূর্ণরূপে সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ করে ওযু করার বিশেষ ফযীলত ও সাওয়াব বর্ণিত হয়েছে। এরপর যখন মুমিন সালাত পড়েন তখন তার গোনাহ ক্ষমা করা হয়। হযরত উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه [فيعلم ما يقول] إلا وجبت له الجنة

"যে কোনো মুসলিম যদি সুন্দরভাবে ওযু করে এরপর নিজের সমগ্র মন ও মুখ সালাতের দিকে ফিরিয়ে (দেহ-মনের সমগ্র অনুভূতি কেন্দ্রীভূত করে) এবং এভাবে সালাতে কী পাঠ করছে তা জেনে বুঝে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তার সকল গোনাহ এমনভাবে ক্ষমা করা হয় যে, সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।"৪

এই অর্থে আরো অনেকগুলি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যে সকল হাদীসে ওযুর পরে মনোযোগ সহকারে দুই রাক'আত সালাতের এইরূপ অতুলনীয় ও অভাবনীয় পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।৫

---

৫. গোসলের যিক্‌র

গোসলের জন্য পৃথক কোনো যিক্‌র নেই। ওযুর শুরুতে ও শেষে যেসকল যিক্‌র উল্লেখ করা হয়েছে, গোসলের আগে-পরেও সেসকল যিক্‌র পালন করতে হবে।১

৬. আযানের যিক্‌র

আযান দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ফযীলতের ইবাদত। সকল মুসলিমের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে সুযোগ পেলে সালাতের জন্য আযান দেওয়া। সর্বাবস্থায় আমরা অধিকাংশ মানুষই আযান দিতে পারি না, বরং শ্রবণ করি। আমরাও যেন আযানকে কেন্দ্র করে অগণিত পুরস্কার, রহমত ও বরকত অর্জন করতে পারি সে সুযোগ প্রদান করছেন মহান রাব্বুল আলামীন।

আযানের পূর্বে কোনো মাসনূন যিক্‌র নেই

আমাদের দেশে অনেক স্থানে আযানের পূর্বে মুয়াযযিন নিজে বা শ্রোতাগণ দরুদ সালাম পাঠ করেন। কোথাও আযানের পূর্বে মুয়াযযিন আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলেন। এগুলি সবই সুন্নাত বিরোধী কর্ম। এ সকল কর্মকে যারা পছন্দ করেন তাঁদের যুক্তি: দরুদ সালাম পাঠ তো কখনো না-জায়েয নয়। আ'ঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বললে তো কোনো দোষ নেই। কাজেই, ভালো কাজে কেন বাধা দেওয়া হবে?

কথাটি শুনতে খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু এখানে সমস্যা জায়েয বা না-জায়েয নিয়ে নয়, সুন্নাত নিয়ে। অবিকল সুন্নাত অনুসারে বিলালের মতো আযান দিলে কি আমাদের কোনো অসুবিধা আছে ? তাতে কি আমাদের সাওয়াব কম হবে?

এ সময়ে এসকল যিক্‌র সুন্নাত-সম্মত নয়, বরং সুন্নাত বিরোধী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রায় ১০ বৎসর তাঁর মুয়াযযিনগণ এবং অন্যান্য অগণিত মুয়াযযিন মুসলিম জনপদগুলিতে আযান দিয়েছেন। তাঁর পরে সাহাবীগণের যুগে শতবৎসর ধরে অগণিত মুয়াযযিন আযান দিয়েছেন। তাঁরা কেউ কখনো একটিবারও আযানের আগে আ'ঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বা দরুদ পাঠ করে নেননি। এগুলির ফযীলত রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন, তা সত্ত্বেও তিনি আযানের আগে এগুলি বলতে শিক্ষা দেননি। এজন্য এগুলি আযানের আগে না বলাই সুন্নাত। বললে সুন্নাত বর্জন করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকে ছোট করা হবে। মনে করা হবে যে, তাঁর শেখানো ও আচরিত আযানের মধ্যে একটু কমতি রয়ে গেছে, তাই শুরুতে এই বিষয়গুলি যুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দেওয়া হলো।

এসকল মাসনূন যিক্‌র বা ইবাদতের সাথে কোনো রকম সংযুক্তির ভয়াবহ পরিণতি সুন্নাত উঠে যাওয়া। যদি কোনো এলাকায় কয়েক বছর যাবৎ আ'ঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বলে আযান দেওয়া হয়, অথবা দরুদ পাঠ করে আযান দেওয়া হয় তাহলে একসময় এগুলি আযানের অংশে পরিণত হবে। তখন যদি কেউ এগুলি বাদে অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের মতো করে আযান প্রদান করেন, তাহলে তাকে (আযান দেওয়াকে) খারাপ মনে করা হবে এবং তার (মুয়াযযিনের) আযানকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হবে ও তার (মুয়াযযিনের) সমালোচনা করা হবে। যদি কেউ বলে – এগুলিতো আযানের অংশ নয় ; তাহলে বলা হবে – আমরাও বলছি না যে, এগুলি আযানের অংশ, তবে এগুলি বলা ভালো, এগুলির ফযীলত আছে, কেন সে এগুলি বলবে না? ... ইত্যাদি। এভাবে একসময় আমাদের আযান ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযান ভিন্ন রকমের হয়ে যাবে। সুন্নাত উঠে যাবে।

যিক্‌র নং ৪২ : মুয়াযযিনের সাথে সাথে তার কথাগুলি বলা :

আমরা সাধারণত একে আযানের জবাব দেওয়া বলি। মুয়াযযিন আযানের মধ্যে যা যা বলবেন মুমিন শ্রোতাও তাই বলবেন। এ বিষয়ে হাদীসে কয়েকটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলে তদ্রূপ বলবে।"২

উপরের হাদীস ও পরবর্তী হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যে, মুয়াযযিন যা বলবেন, আযান শ্রবণকারী অবিকল তাই বলবেন। কোনো ব্যতিক্রম বলতে বলা হয়নি। তবে হযরত উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম শিক্ষা দিয়েছেন- মুয়াযযিন 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বললে, শ্রোতা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবেন। এ হাদীসে তিনি আরো বলেন:

من قال ... من قلبه دخل الجنة

"এভাবে যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"৩

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন বিলাল (রা) দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। বিলাল আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন:

من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة

"এই ব্যক্তি (মুয়াযযিন) যা বলল, তা যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"৪

ফজরের আযানের জবাবে খেলাফে সুন্নাত ব্যতিক্রম

আমাদের দেশের একটি বহুল প্রচলিত রীতি, ফজরের আযানের সময় যখন মুয়াযযিন "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" – বলেন, তখন শ্রোতা "সাদাকতা ও বারিরতা (বারারতা)" অর্থাৎ, "তুমি সত্য বলেছ এবং পুণ্য করেছ" বলেন। আযানের জবাবে উক্ত কথাটি খেলাফে সুন্নাত। ইবনু হাজার আসকালানী, মুল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, আযানের জবাবে এই বাক্যটি বানোয়াট, মাওযূ ও ভিত্তিহীন। কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা কোনো সাহাবী থেকে এই দু'আটি বর্ণিত হয়নি। মূলত শাফেয়ী মযহাবের কোনো কোনো ফকীহ নিজের মন থেকে এই বাক্যটিকে এই সময়ে বলার জন্য মনোনীত করেন। পরবর্তী যুগে তা অন্যান্য মাযহাবের অনেক আলিম গ্রহণ করেছেন।১

এ সকল আলিম এই বাক্যটিকে এই সময়ে বলা পছন্দনীয় বলে মনে করেছেন। কারণ, "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" –বাক্যের অর্থের সাথে এই কথাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে :

প্রথমত, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের বিরোধিতা করা হচ্ছে। কারণ উপরের হাদীসগুলিতে আমরা দেখেছি যে, তিনি আমাদেরকে অবিকল মুয়াযযিনের অনুরূপ বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। একমাত্র "হাইয়া আলা ... "-এর সময় ছাড়া অন্য কোনো ব্যতিক্রম তিনি শিক্ষা দেননি। এ সকল হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ যে, এই একমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া হুবহু মুয়াযযিনের মতোই বলতে হবে। মুয়াযযিন যখন "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" বলবেন, তখন শ্রোতাও অবিকল তা-ই বলবেন। এর ব্যতিক্রম করলে উপরের হাদীসগুলি পূর্ণরূপে মান্য করা হবে না।

দ্বিতীয়ত, এতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সুন্নাতে নববীর প্রতি অবজ্ঞা করা হচ্ছে। কারণ আযান দেওয়া ও আযানের জবাব দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আচরিত ও শেখানো একটি অত্যন্ত জরুরি ও প্রতিদিনে বহুবার পালন করার মতন ইবাদত। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে আযান ও আযানের উত্তর প্রদানের পদ্ধতি সাহাবীগণকে শিখিয়েছেন এবং তাঁরা তা পালন করেছেন। তিনি আযানের উত্তরে এই বাক্যটি বলেন নি বা শেখান নি। সাহাবীগণও বলেন নি। এখানে অর্থের সামঞ্জস্যতার কথাও তাঁরা অনুভব করেন নি। তাঁদের পরে আমরা কী-ভাবে একটি মাসনূন ইবাদতের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারি? কী জন্যই-বা করব ? অবিকল তাঁদের মতো আযানের জবাব দিলে কি আমাদের সাওয়াব কম হবে ? না সেভাবে জবাব দিতে আমাদের কোনো কঠিন বাধা বা অসুবিধা আছে ?

প্রিয় পাঠক, সুন্নাতের মধ্যে থাকা আমাদের নিরাপত্তা ও মুক্তির রক্ষাকবজ। সুন্নাতের বাইরে কোনো ইবাদত তৈরি করে আমরা কিভাবে বুঝব যে তা আল্লাহ কবুল করবেন? আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের মধ্যে থাকার তৌফিক প্রদান করুন ; আমীন।২

যিক্‌র নং ৪৩ : মুয়াযযিনের শাহাদতের সময় অতিরিক্ত যিক্‌র :

أشهد [وأنا أشهد] أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا

উচ্চারণ : [ওয়া আনা] আশ্‌হাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু, লা- শারীকা লাহু, ওয়া আন্না মু'হাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। রাদ্বীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলা-মি দীনান, ওয়া বিমু'হাম্মাদিন নাবিয়্যান।

অর্থ : "এবং আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তুষ্ট ও সন্তুষ্ট আছি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদকে (ﷺ) নবী হিসাবে।"

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি মুআযযিনকে শুনে উপরের বাক্যগুলি বলবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে।"৩

যিক্‌র নং ৪৪ : আযানের পরে দরুদ পাঠ :

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যেরূপ বলে তদ্রূপ বলবে। এরপর আমার উপর সালাত পাঠ করবে ; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তাঁকে দশবার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন। এরপর আমার জন্য 'ওসীলা' চাইবে ; কারণ 'ওসীলা' জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান, আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাই এই মর্যাদা লাভ করবেন এবং আমি আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে, তাঁর জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হয়ে যাবে।"৪

যিক্‌র নং ৪৫ : আযানের পরে ওসীলার দু'আ চাওয়া :

'ওসীলা' শব্দের অর্থ নৈকট্য। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর যা আল্লাহর আরশের সবচেয়ে নিকটবর্তী তাকে 'ওসীলা' বলা হয়। এই স্থানটি

আল্লাহর একজন বান্দার জন্যই নির্ধারিত, তিনি নবীয়ে মুসতাফা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, তিনি আযানের পরে সালাত (দরুদ) পাঠের পরে তাঁর জন্য ওসীলা চেয়ে দু'আ করতে উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেজন্য মহান পুরস্কার – 'শাফায়াত' লাভের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। অন্যান্য হাদীসে 'ওসীলা' প্রার্থনার পদ্ধতি ও বাক্য তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। দু'আটি নিম্নরূপ :

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বা হা-যিহিদ দা'অ্ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস স্বালা-তিল ক্বা-য়িমাতি, আ-তি মু'হাম্মাদান আল-ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াব'আসহু মাকা-মাম মা'হমুদানিল্লাযী ও'য়াদতাহু।

অর্থ: "হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং আগত সালাতের মালিক, আপনি প্রদান করুন মুহাম্মাদকে (ﷺ) ওসীলা (নৈকট্য) এবং মহা মর্যাদা এবং তাঁকে উন্নীত করুন সম্মানিত অবস্থানে, যা আপনি তাঁকে ওয়াদা করেছেন।"

হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মুয়াযযিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি উপরের বাক্যগুলি বলবে, তাঁর জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত পাওনা হয়ে যাবে।"১

ওসীলার দু'আর দুটি অতিরিক্ত বাক্য

আযানের পরে ওসীলার দু'আর উপরের বাক্যগুলি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত আযানের দু'আর মধ্যে দুটি বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে, যা উপরের দু'আটিতে নেই। প্রথম বাক্যটিতে (**والفضيلة** : ওয়াল ফাদীলাতা)-র পরে **والدرجة الرفيعة** (এবং সুউচ্চ মর্যাদা) বলা হয়। দ্বিতীয় বাক্যটি দু'আর শেষে: ' **إنك لا تخلف الميعاد** ' (নিশ্চয় আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না) বলা। এই দ্বিতীয় বাক্যটি একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।২ আর প্রথম বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ) একেবারেই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীস নির্ভর।

ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, যারকানী, মুল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এই বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'য়াহ) বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মাসনূন দু'আর মধ্যে এই ভিত্তিহীন বাক্যটি বৃদ্ধি করা সুন্নাত বিরোধী ও অন্যায়।৩

মাইকে আযানের দু'আ পাঠ

আযানের পরবর্তী মাসনূন ইবাদত, দরুদ পাঠ, ওসীলার দু'আ পাঠ, নিজের জন্য দু'আ চাওয়া। এগুলি সবই ব্যক্তিগতভাবে মনে মনে আদায় করা সুন্নাত। এগুলি জোরে জোরে বা সমবেতভাবে আদায় করা খেলাফে সুন্নাত। বর্তমানে আমাদের দেশে রেডিও ও টেলিভিশনের প্রভাবে বিভিন্ন মাসজিদে আযানের পরে মাইকে ওসীলার দু'আ পাঠ করা হয়। এভাবে পাঠ করা সুন্নাত-বিরোধী। এভাবে দু'আ পাঠের অর্থ মিনারে দাঁড়িয়ে আযান দিয়ে আযানের পরে ঠিক আযানের মতো চিৎকার করে দু'আ পাঠ।

এভাবে দু'আ পাঠের রীতি প্রচলনের ফলে আযানের পরে দরুদ পাঠের সুন্নাত ও আযানের পরে ওসীলার দু'আ মনে মনে পাঠের সুন্নাতের মৃত্যু ঘটছে। সর্বোপরি একটি নতুন বিদ'আত জন্মগ্রহণ করবে। কিছুদিন পরে দেখা যাবে, যদি কেউ অবিকল বিলালের মতো ও অন্যান্য সাহাবীগণের মতো শুধুমাত্র আযান জোরে দেন এবং পরের দু'আ মনে মনে পাঠ করেন তখন মানুষে বলতে থাকবে, 'আহা, দু'আটা পড়ল না। একটু ঘাটতি থেকে গেল!' – এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কার আযান তাদের নিকট 'অসম্পূর্ণ আযান' বলে প্রতিপন্ন হবে।

আযান শেষে নিজের জন্য প্রার্থনা করা

দু'আ কবুলের সময় আলোচনাকালে আমরা এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করছি। এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আযান সংশ্লিষ্ট যিক্র শেষ করে নিজেদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এই সময়ের প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

৭. ইকামতের জবাব

ইকামতকেও হাদীস শরীফে 'আযান' বলা হয়েছে। এজন্য মুয়াযযিনকে ইকামত দিতে শুনলে আযানের মতো জবাব দেওয়া উচিত। মুয়াযযিন যা বলবেন, তাই বলতে হবে। "হাইয়া আলা ... "-এর সময় "লা হাওলা ... " বলতে হবে। উপরের হাদীসগুলির আলোকে "কাদ কামাতিস সালাহ" বাক্যদ্বয়ও মুয়াযযিনের অনুরূপ বলা প্রয়োজন। একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার মুয়াযযিনের "কাদ কামাতিস সালাহ" বলতে শুনে বলেছিলেন :

أقامها الله وأدامها

"আল্লাহ একে (সালাতকে) প্রতিষ্ঠিত করুন এবং স্থায়ী করুন।" বাকি জবাব আযানের জবাবের নিয়মে প্রদান করেন।৪

৮. সালাতই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র

মুমিন কিভাবে সারাদিন (২৪ ঘণ্টা) তাঁর মহান প্রভুর যিক্র করবেন তা আমরা আলোচনা করছি। ওযু, আযান ইত্যাদির পরেই সালাত। সালাতই মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও মহোত্তম যিক্র। ইতঃপূর্বে আমরা বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি আলোচনা করেছি। প্রত্যেক মুমিনের প্রধান দায়িত্ব সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল দু'আ-মুনাজাত, যিক্র ও তিলাওয়াত বিশুদ্ধ উচ্চারণে, অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব

বিনয়, মনোযোগ, আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে আদায় করা। আমি এখানে সংক্ষেপে সালাতের মধ্যকার কিছু যিক্‌রের আলোচনা করছি :

(ক). সানা বা শুরুর যিক্‌র

সালাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার পরেই যে দু'আ বা যিক্‌র পাঠ করা হয় তাকে আমরা সাধারণত 'সানা' বলি। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন আবেগময় মর্মস্পর্শী দু'আ ও যিক্‌র পাঠ করতেন। এগুলির মধ্য থেকে একটি মাত্র দু'আ আমরা সানা হিসাবে পাঠ করি। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ ফরয সালাতের ক্ষেত্রে এই 'সানা' ও দ্বিতীয় আরেকটি দু'আ পাঠ করতে বলেছেন। সুন্নাত-নফল সালাতের ক্ষেত্রে সকল মাসনূন 'সানা' পাঠ করা যায়। এ সকল মাসনূন সানা বা শুরুর দু'আ অর্থসহ মুখস্থ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দু'আ পাঠ করলে সালাতের মনোযোগ, বিনয় ও আন্তরিকতা বহাল থাকে। নইলে মুসল্লী অভ্যস্তভাবে খেয়াল না করেই কখন সানা পড়ে শেষ করেন তা টেরও পান না। এখানে সানার তিনটি দু'আ লিখছি :

যিক্‌র নং ৪৬ : সানার যিক্‌র-১

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

উচ্চারণ: সুব'হা-নাকাল্লা-হুম্মা, ওয়া বি'হামদিকা, ওয়া তাবা-রাকাসমুকা, ওয়া তা'আ-লা- জাদ্দুকা, ওয়া লা- ইলা-হা গ্বাইরুকা।

অর্থ: "আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ, এবং আপনার প্রশংসাসহ। আর মহাবরকতময় আপনার নাম, মহা-উন্নত আপনার মর্যাদা। আর কোনো মা'বুদ নেই আপনি ছাড়া।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শুরু করে এই তাসবীহ পাঠ করতেন।১

যিক্‌র নং ৪৭ : সানার যিক্‌র-২

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের শুরুতে বলতেন :

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك

উচ্চারণ: ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদা 'হানীফাও ওয়া মা- আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না স্বালা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়া-ইয়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন। লা- শারীকা লাহু, ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু, ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, ওয়া আনা 'আবদুকা। যালামতু নাফসী, ওয়া'অ-তারাফতু বিযানবী, ফাগ্বফিরলী যুনূবী জামিয়ান; ইন্নাহু লা- ইয়াগ্বফিরুয যুনূবা ইল্লা-আনতা। ওয়াহ্‌দিনী লিআহসানিল আখলা-ক; লা- ইয়াহ্‌দী লিআহসানিহা- ইল্লা- আনতা। ওয়াসরিফ 'আন্নী সাইয়িআহা- লা- ইয়াসরিফু 'আন্নী সাইয়িআহা- ইল্লা- আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা'অ্দাইকা। ওয়াল খাইরু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা। ওয়াশ-শাররু লাইসা ইলাইকা। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা। তাবা-রাকতা ওয়া তা'আ-লাইতা। আস্‌তাগ্বফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ: "আমি সুদৃঢ়ভাবে আমার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করেছি তাঁর দিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং আমি শিরকে লিপ্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ-উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্যই, তিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক প্রভু। তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং এই জন্যই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। এবং আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ, আপনিই সম্রাট। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাস। আমি অত্যাচার করেছি আমার আত্মার উপর এবং আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। আর আপনি পরিচালিত করুন আমাকে উত্তম আচরণে পথে, আপনি ছাড়া কেউ উত্তম আচরণের পথে পরিচালিত করতে পারে না। আর আপনি আমাকে খারাপ আচরণ থেকে দূরে রাখুন, আপনি ছাড়া আর কেউ খারাপ আচরণ থেকে দূরে রাখতে পারে না। আপনার ডাকে আমি সাড়া প্রদান করছি, আমি সানন্দে সাড়া প্রদান করছি। সকল কল্যাণ আপনার হাতে এবং অকল্যাণ আপনার দিকে নয়। আমি আপনারই সাহায্যে ও আপনারই দিকে। মহা বরকতময় আপনি এবং সুমহান আপনি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি (তাওবা করছি)।"২

হানাফী মযহাবের ইমাম ও ফকীহগণ ফরয সালাতের সানা এই দুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উত্তম বলে মতপ্রকাশ করেছেন। তবে হানাফী ফিকহের অধিকাংশ গ্রন্থে "আনা মিনাল মুসলিমীন" পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসূফ (রহ) দুটি সানা একত্রে প্রত্যেক সালাতের শুরুতে পাঠ করা উত্তম ও মুসতাহাব বলে উল্লেখ করেছেন।৩

জায়নামাযের দু'আ খেলাফে সুন্নাত

আমাদের দেশে দ্বিতীয় সানাটি জায়নামাযের দু'আ বলে অতি প্রচলিত। সালাত শুরু করার আগে সালাতে বা জায়নামাযে বা সালাতের স্থানে দাঁড়িয়ে এই দু'আটি পাঠ করার রীতি সুন্নাত বিরোধী। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটা তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ করেছেন। একদিনও

তিনি তাকবীরে তাহরীমার আগে তা পাঠ করেননি। আমাদের ইমামগণও তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ করা সুন্নাত বলেছেন। অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও ইমামগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে মনগড়াভাবে এই দু'আটিকে তাকবীরে তাহরীমার আগেই পড়ে নিচ্ছি।

পরবর্তী যুগের কোনো কোনো ফকীহ মনগড়াভাবে এই দু'আটিকে তাকবীরে তাহরীমার আগে পড়া যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, এই দু'আর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ করলে সালাতের মধ্যে 'আল্লাহর জন্যই সালাত পড়া'-এর দৃঢ় ইচ্ছা আরো দৃঢ়তর হয়। এইভাবে বানোয়াট যুক্তিতর্ক দিয়ে যদি আমরা সালাতের জন্য খেলাফে সুন্নাত রীতিনীতি তৈরি করতে থাকি তাহলে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতির সালাত অপরিচিত হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে শেষ বৈঠকে সালাত বা দরুদ পাঠের রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এখন আমরা কি সালাত কবুল হবে যুক্তি দিয়ে তা বাদ দিয়ে সালাতের তাকবীরে তাহরীমার আগে দরুদ পাঠের রীতি চালু করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ চোখ মেলে সালাত পড়ার রীতি চালু করেছেন। আমরা কি মনোযোগ বৃদ্ধির যুক্তিতে চোখবুজে সালাতের রীতি চালু করব?

কখন কোন্ দু'আ পড়লে সবচেয়ে বেশি ভালো হবে তা তিনিই জানতেন এবং শিখিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব অবিকল তাঁর অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদের সুন্নাতের মধ্যে তৃপ্ত থাকার তাওফীক দান করুন ; আমীন।

যিক্র নং ৪৮: সানার যিক্র-৩

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার পরে কেরা'আত (সূরা পাঠ) শুরু করার আগে অল্প সময় চুপ করে থাকতেন। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবনি হোক, আপনি তাকবীরে তাহরীমা ও সূরা পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে নীরব থাকেন, এ সময়ে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, আমি এ সময়ে বলি:

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা- বা-'আদ্তা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব। আল্লা-হুম্মা, নাক্কিনী মিনাল খাতা-ইয়া- কামা- ইউনাক্কাস সাওবুল আব্ইয়াদু মিনাদ দানাস। আল্লা-হুম্মাগসিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমা-ই ওয়াস সাল্জি ওয়াল বারাদ।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন আমার ও আমার পাপের মধ্যে যেমন দূরত্ব আপনি রেখেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে (আমাকে সকল প্রকার পাপ থেকে শত যোজন দূরে থাকার তাওফীক প্রদান করুন)। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করুন পাপ থেকে, যেমনভাবে পরিচ্ছন্ন করা হয় ধবধবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। হে আল্লাহ আপনি ধৌত করুন আমার পাপরাশী পানি, বরফ এবং শিল দ্বারা (আমার হৃদয়কে পাপমুক্তি ও অনন্ত প্রশান্তি প্রদান করুন)।"[১]

(খ). রুকুর যিক্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে বিভিন্ন যিক্র করতেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে, সোমবার ফজরের সালাতের সময়) তাঁর ঘরের পর্দা সরান। তখন মানুষেরা হযরত আবু বকরের (রা) পিছনে কাতারবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সালাতে রত ছিলেন। তিনি বলেন, হে মানুষেরা ... আমাকে রুকু ও সাজদার মধ্যে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই, তোমরা রুকুর মধ্যে প্রভুর তা'যীম-মহত্ব ঘোষণা করবে। আর সাজদার মধ্যে প্রাণপণে বেশি বেশি দু'আ করবে; এ সময়ে তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।"[২]

মহান প্রভুর তা'যীম প্রকাশের জন্য অনেক প্রকার বাক্য তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম:

যিক্র নং ৪৯ : রুকুর যিক্র-১ **سبحان ربي العظيم**

উচ্চারণ: সুব'হা-না রাব্বিয়াল 'আযীম। অর্থ: মহাপবিত্র আমার মহান প্রভু।

মনের আবেগ নিয়ে এই ঘোষণা বার বার দিতে হবে। কমপক্ষে ৩ বার বলার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

যিক্র নং ৫০ : রুকুর যিক্র-২

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ : সুব্বূ'হুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূ'হ।

অর্থ : "মহাপবিত্র, মহামহিম, ফিরিশতা গণের এবং পবিত্রাত্মার প্রভু।"

(পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখিত ৮ নং যিক্র)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু ও সাজদার মধ্যে এই তাসবীহ পাঠ করতেন।[৩]

যিক্র নং ৫১ : রুকুর যিক্র-৩

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي

উচ্চারণ: আল্ল-হুম্মা, লাকা রাকা'অ্তু, ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া লাকা আস্লামতু। খাশা'আ লাকা সাম'ই ওয়া বাসারী ওয়া মুখখী, ওয়া 'আযমী, ওয়া 'আসাবী।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনারই জন্য রুকু করেছি, এবং আপনার উপরেই ঈমান এনেছি এবং আপনারই কাছে সমর্পিত হয়েছি। ভক্তিতে অবনত হয়েছে আপনার জন্য আমার কর্ণ, আমার চক্ষু, আমার মস্তিষ্ক, আমার অস্থি ও আমার স্নায়ুতন্ত্র।"

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে এইগুলি বলতেন ।১

(গ). রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় যিক্র

যিক্র নং ৫২ : দাঁড়ানো অবস্থার যিক্র-১

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ : রাব্বানা- লাকাল 'হামদ ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু, আপনারই প্রশংসা ।

রুকু থেকে উঠে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পরে কয়েক মুহূর্ত পরিপূর্ণ সোজা দণ্ডায়মান থাকা ওয়াজিব। পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগেই সাজদায় চলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। এই সময়ে দাঁড়ানো অবস্থায় সকল ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সালাতী সকলের জন্যই সুন্নাত অন্তত একবার (রাব্বানা-, লাকাল 'হামদ) বলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ এই সময়ে অতিরিক্ত আরো কিছু বাক্য বলতেন। যেমন,–

যিক্র নং ৫৩ : দাঁড়ানো অবস্থার যিক্র-২

اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, রাব্বানা- লাকাল 'হামদু, মিলআস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা- বাইনাহুমা, ওয়া মিলআ মা- শি'তা মিন শাইয়িন বা'অ্দ ।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, আপনার জন্যই প্রশংসা, আকাশসমূহ পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী পরিপূর্ণ করে, উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব পরিপূর্ণ করে এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা পরিপূর্ণ করে প্রশংসা আপনার ।"

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আউফা, ইবনু আব্বাস, আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এই বাক্যগুলি বলতেন ।২

যিক্র নং ৫৪ : দাঁড়ানো অবস্থার যিক্র-৩

اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বানা- লাকাল 'হামদু, মিলআস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা- বাইনাহুমা, ওয়া মিলআ মা- শি'তা মিন শাইয়িন বা'অ্দ, আহ্লাস্ সানা-ই ওয়াল মাজ্দি। লা- মা-নি'আ লিমা- আ'অ্ত্বাইতা, ওয়ালা- মু'অ্ত্বিয়া লিমা- মানা'অ্তা, ওয়ালা- ইয়ান্ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু ।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, আপনার জন্যই প্রশংসা, আকাশসমূহ পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী পরিপূর্ণ করে, উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব পরিপূর্ণ করে এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা পরিপূর্ণ করে প্রশংসা আপনার। সকল মর্যাদা ও প্রশংসার মালিক আপনিই। আপনি যা প্রদান করেন তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর আপনি যা রোধ করেন তা কেউ প্রদান করতে পারে না। অধ্যবসায়ীর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম আপনার পরিবর্তে (আপনার ইচ্ছার বাইরে) তার কোনো উপকারে আসে না ।"৩

যিক্র নং ৫৫ : দাঁড়ানো অবস্থার যিক্র-৪

ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

উচ্চারণ: রাব্বানা- ওয়া লাকাল 'হামদু, 'হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবান মুবা-রাকান ফীহি ।

অর্থ: "হে আমাদের প্রভু, এবং আপনারই প্রশংসা, অশেষ প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা ।"

হযরত রিফাআহ ইবনু রাফি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একব্যক্তিকে এই সময়ে এই বাক্যগুলি বলতে শুনে খুব প্রশংসা করে বলেন: আমি দেখলাম ত্রিশের অধিক ফিরিশতা বাক্যগুলি লিখে নেওয়ার জন্য পাল্লা দিচ্ছে ।৪

(ঘ). সাজদার যিক্র :

ইতোপূর্বে বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, সাজদার মধ্যে আল্লাহর তাসবীহ ও মর্যাদা প্রকাশ এবং বেশি বেশি দু'আ করা প্রয়োজন ।

যিক্র নং ৫৬ : সাজদার যিক্র

সাজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার বলতে হবে :

سبحان ربي الأعلى

উচ্চারণ : সুব্‘হা-না রাব্বিয়াল আ‘অ্লা।

অর্থ : “মহাপবিত্র আমার প্রভু যিনি সর্বোচ্চ।”

অর্থের দিকে খেয়াল রেখে আবেগ ও ভক্তির সাথে এই তাসবীহগুলি বলতে হবে।

এছাড়া বিভিন্ন তাসবীহ ও দু‘আ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে সাজদার মধ্যে বলতেন ও বলতে শিখিয়েছেন। উপরে রুকুর তাসবীহের মধ্যে উল্লেখ করেছি যে তিনি “সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকতি ওয়ার রূহ” রুকু ও সাজাদায় বলতেন। সাজদার আরো দুটি দু‘আ আমি ইতোপূর্বে (২৪ ও ২৫ নং যিক্‌র) উল্লেখ করেছি।

(ঙ). দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের যিক্‌র

দুই সাজদার মাঝে পরিপূর্ণ স্থির হয়ে অন্তত কয়েক মুহূর্ত বসা ওয়াজিব। পরিপূর্ণ সোজা হয়ে বসার পূর্বেই দ্বিতীয় সাজদায় চলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। এই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন দু‘আ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

যিক্‌র নং ৫৭ : দুই সাজদার মাঝে বৈঠকের যিক্‌র-১

رب اغفر لي رب اغفر لي

উচ্চারণ : রাব্বিগ্‌-ফিরলী, রাব্বিগ্‌-ফিরলী।

অর্থ: “হে আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন, হে আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।”

হুযাইফা (রা) বলেন, “নবীজী ﷺ দুই সাজদার মাঝে বসে এই কথা বলতেন।”১

যিক্‌র নং ৫৮ : দুই সাজদার মাঝে বৈঠকের যিক্‌র-২

رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني [وارفعني]

উচ্চারণ: রাব্বিগ্‌-ফিরলী, ওয়ার‘হামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াহ্‌দিনী, ওয়ারযুকনী [ওয়ার ফা‘অ্নী]।

অর্থ: “হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, রহমত করুন, আমাকে পূর্ণতা দান করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে রিযিক দান করুন [এবং আমাকে সুউচ্চ করুন]।”

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই সাজাদার মাঝে বসে এই দু‘আ বলতেন।”২

(চ). তাশাহহুদ ও সালাত

তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) ও সালাত (দরুদ) আমরা সকলেই জানি। তবে অর্থ উল্লেখ করার জন্য এখানে তা লিখছি। একমাত্র আশা যে, কোনো আগ্রহী পাঠক অর্থ শিখে নিয়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তাশাহহুদ ও সালাত পাঠ করবেন।

যিক্‌র নং ৫৯ : তাশাহহুদ (আত-তাহিয়্যাত)

সাহাবীগণ বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহহুদ শিখাতেন ঠিক যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন সাহাবী থেকে তাশাহহুদ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মাস‘ঊদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছে সালাত আদায়ের সময় বসলে বলতাম: আল্লাহর উপর সালাম, ফিরিশতাগণের উপর সালাম, অমুকের উপর সালাম, ...। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদেরকে বললেন : আল্লাহই সালাম (কাজেই, আল্লাহকে সালাম প্রদান করা ঠিক নয়)। অতএব, তোমরা যখন সালাতের মধ্যে বসবে তখন বলবে :

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. (فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض) أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

অর্থ: “সকল মহান মর্যাদা জ্ঞাপন আল্লাহর জন্য এবং উপাসনা-আরাধনা ও প্রার্থনাসমূহ এবং পবিত্র বাক্য, কর্ম ও দানসমূহ। সালাম আপনার উপর, হে নবী; এবং আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ। সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেককার বান্দাগণের উপর। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এ কথা বললে আসমান ও জমিনে আল্লাহর সকল নেক বান্দাকেই সালাম দেওয়া হয়ে যাবে) আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও প্রেরিত বার্তাবাহক। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এরপর মুসল্লী নিজের জন্য পছন্দমতো প্রার্থনা বা দু‘আ করবে।)”৩

সালাতের শেষে নিজের জন্য প্রার্থনা শুরু করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ করা মাসনূন ইবাদত। ফুদালাহ ইবনু উবাইদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে দু‘আ করতে শুনতে পান, অথচ লোকটি আল্লাহর মর্যাদা ঘোষণা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরে সালাত পাঠ করেনি। তখন তিনি বলেন :

عجل هذا ... إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي صل الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء

“লোকটি তাড়াহুড়ো করেছে। যখন কেউ সালাত আদায় করে তখন যেন সে প্রথমে তার প্রভুর প্রশংসা ও মর্যাদা জ্ঞাপন করে।

এরপর সে নবীর (ﷺ) উপর সালাত পাঠ করবে। এরপর তার যা ইচ্ছা হবে তার-জন্য দু'আ করবে।" হাদীসটি সহীহ।১

এ সময়ে আমরা সবাই দরুদে ইবরাহীমি পাঠ করি। দরুদের অর্থ ইতঃপূর্বে ৩১ ও ৩২ নং যিক্‌রে আলোচনা করেছি। অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা ও হক্কের প্রতি আবেগ ও ভালবাসা নিয়ে তাশাহহুদের শেষে সালাত পাঠ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

(ছ). নিজের জন্য প্রার্থনা

উপরের হাদীস ও পূর্ববর্তী অনেক হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, সালাতের মধ্যে মুমিনের সর্বশেষ করণীয় নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। এই সময়ে পাঠ করার জন্য অনেক মুনাজাত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। একটি মাসনূন মুনাজাত ইতঃপূবে ২৬ নং যিক্‌রে উল্লেখ করেছি।

(জ). ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত

এই দুই রাক'আত সালাতকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। কখনোই কোনো অবস্থায় সফরে, বাড়িতে, ব্যস্ততা বা কোনো কারণে তিনি তা ছাড়তেন না। এজন্য কোনো কোনো আলিম এই দুই রাক'আত সালাতকে ওয়াজিব বলেছেন। এই দুই রাক'আত সুন্নাত সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত নিম্নরূপ

(১). তা ঘরে আদায় করা। তিনি সর্বদা (সফর ছাড়া) এই দুই রাক'আত সালাত তাঁর নিজ বাড়িতেই আদায় করতেন। কখনো আযানের পরেই এবং কখনো জামা'আত শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি নিজ বাড়িতে সুন্নাত সালাত আদায় করে এরপর মসজিদে যেয়ে জামা'আতে দাঁড়াতেন।

সাধারণভাবে সকল সুন্নাত ও নফল সালাত নিজ বাড়িতে বা নিজের ঘরে আদায় করা উত্তম এবং সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরয সালাতের আগের ও পরের সকল সুন্নাত সালাত ও অন্যান্য সুন্নাত-নফল সালাত ঘরে আদায় করতেন। তিনি এ সকল সালাত ঘরে আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন। ঘরে আদায় করলে সাওয়াব বেশি হয় বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন:

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة

"শুধু ফরয সালাত বাদে সকল সালাত নিজ বাড়িতে পড়া সর্বোত্তম।"২

তিনি আরো বলেন:

إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا

"মসজিদের (জামাতে) সালাত হয়ে গেলে তোমরা বাড়িতে কিছু সালাত আদায় করবে, কারণ বাড়িতে সালাত আদায়ের কারণে আল্লাহ সেই বাড়িতে কল্যাণ ও মঙ্গল (বরকত) দান করবেন।"৩

আবদ ইবনু সা'দ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে প্রশ্ন করলাম: কোন্‌টি **উত্তম, বড়িতে সালাত পড়া না মসজিদে সালাত পড়া ? তিনি বললেন :**

ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة

"তুমি তো দেখছ যে, আমার বাড়ি মসজিদ সংলগ্ন। তা সত্ত্বেও আমি মসজিদে সালাত না পড়ে বাড়িতে সালাত পড়া পছন্দ করি। শুধুমাত্র ফরয সালাত মসজিদে পড়ি।"৪

সুন্নাত-নফল সালাত ঘরে পড়ার ফযীলতে অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন:

فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع

"যেখানে মানুষ দেখতে পায় সেখানে সুন্নাত-নফল সালাত পড়ার চেয়ে নিজ বাড়িতে তা আদায় করার ফযীলত এত বেশি যেমন নফল সালাতের উপরে ফরয সালাতের ফযীলত।"৫

সর্বাবস্থায় সকল সুন্নাত-নফল সালাত সাধারণভাবে মসজিদে আদায় করা জায়েয, কিন্তু বাড়িতে পালন করা উত্তম। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ উল্লেখ করেছেন যে, বাড়ি যদি মসজিদ থেকে দূরেও হয় তাহলেও বাড়িতে এসে সুন্নাত আদায় করা উত্তম। পথ চলার কারণে সুন্নাত আদায়ে দেরি হলে কোনো অসুবিধা নেই।৬

(২). ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল তা সংক্ষেপে আদায় করা। সাধারণত তিনি প্রথম

রাক'আতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাস পাঠ করতেন। আবার কখনো কখনো তিনি ফাতেহার পরে প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার ১৩৬ আয়াত ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াত বা ৬৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করতেন।১

আযানের পরে সুন্নাত আদায় করে নিলে তিনি সাধারণত জামাত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলতেন, অথবা ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

(৩). ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরে এই দুই রাক'আত সুন্নাত ছাড়া কোনো প্রকার সালাত তিনি পড়তেন না এবং এই দুই রাক'আত ছাড়া অন্য কোনো সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এছাড়া ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো নির্দিষ্ট যিক্‌র ওযীফার কথা সুন্নাতে আছে বলে আমার জানা নেই।

(ঝ). ফজরের সালাত জামাতে আদায়

যাকির ও আল্লাহর পথের পথিককে অবশ্যই ফজরের সালাত ও অন্যান্য সকল সালাত জামাতে আদায় করতে হবে। অনেক যাকির ফজরের সালাত একাকী ঘরে আদায় করেন। এরপর অনেক সময় যিক্‌র ওযীফা করেন। অথচ সারা দিনরাত নফল যিক্‌র ওযীফা করার চেয়ে শুধুমাত্র ফরয সালাতগুলি জামাতে আদায় করা হাজার গুণ বেশি উত্তম। অন্য নফল যিক্‌র তো দূরের কথা মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় যিক্‌র ও বড় নফল ইবাদত তাহাজ্জুদের চেয়েও জামাতে সালাত আদায় করা বেশি ফযীলতের। হযরত উমার (রা) একদিন সুলাইমান ইবনু আবী হাসমা নামাক একজন সাহাবীকে ফজরের জামাতে উপস্থিত না দেখে তার বাড়িতে যেয়ে তার আম্মাকে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন রাত জেগে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে সে ক্লান্ত হয়ে যায়। এজন্য ফজরের সালাত ঘরে আদায় করেই ঘুমিয়ে পড়েছে। হযরত উমার (রা) বলেন:

لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم

"সারারাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করার চেয়ে ফজরের সালাত জামাতে আদায় করাকে আমি বেশি ভালবাসি ও ভালো বলে মনে করি।"২

প্রিয় পাঠক, নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করতে পারা মুমিনের অন্যতম কারামত। আওলিয়ায়ে কেরাম জামাতে সালাত আদায়কে বেলায়েতের পরিচয় বলে মনে করেছেন। তাঁরা বার বার বলেছেন: 'যদি কাউকে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বা বাতাসে উড়ে যেতে দেখ, তাহলে তাকে ওলী ভেব না, কিন্তু যদি কাউকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকমতো জামাতে আদায় করতে দেখ তাহলে তাঁকে ওলী জানবে।' কারণ বাতাসে উড়তে, পানিতে হাঁটতে, মনের কথা বলতে ঈমান বা বেলায়েতের দরকার হয় না। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, কাফির, মুশরিক সকলের মধ্যেই এরূপ মানুষ পাওয়া যায়। যা মুসলিম ও কাফির সবার মধ্যে পাওয়া যায় তা কখনো বেলায়েতের আলামত হতে পারে না। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক পেয়েছে তাঁকে ওলী জানতে হবে। তার সবচেয়ে বড় কারামত এই যে, তাঁর অন্তর ও প্রবৃত্তি সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গিয়েছে।

সকল ফরয সালাত মসজিদে জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব। "বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া" ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে জামাতে সালাতকে ওয়াজিবই লিখা হয়েছে। পরবর্তী কোনো কোনো গ্রন্থে সুন্নাত লিখা হলেও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা ওয়াজিবের পর্যায়ের। আবার সুন্নাতের বিষয়েও আমাদের ধারণা বড় অদ্ভুত। ফিকহের হিসাবে অনেক কাজই সুন্নাত। কিন্তু কোন্ সুন্নাতের কতটুকু গুরুত্ব তা হাদীসের আলোকে জানতে হবে। টুপি মাথায় দেওয়া একটি সুন্নাত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আগে ও পরে কিছু সালাত সুন্নাত, আবার জামাতে সালাতও সুন্নাত। কিন্তু সব সুন্নাত একই গুরুত্বের নয়। দেখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন্ সুন্নাতকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন। ততটুকু গুরুত্ব দিয়েই তা পালন করতে হবে। গুরুত্বের ক্ষেত্রে তাঁর রীতির ব্যতিক্রম করার অর্থ তাঁর সুন্নাতকে অবহেলা করা ও নিজের মনগড়া মতে চলা।

টুপি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ পরেছেন তাই সুন্নাত। কিন্তু তিনি তা পরার কোনো নির্দেশ দেননি। আবার সুন্নাতে মুআক্কাদা সালাতগুলি তিনি পড়েছেন এবং পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু না পড়লে কোনো ধমক বা শাস্তির কথা বলেননি। আর জামা'আতে সালাত তিনি আজীবন পালন করেছেন, পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং পালন না করলে কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন। অথচ আমাদের যাকিরীনদের মধ্যে অনেকে টুপির সুন্নাত বা অন্যান্য অনেক মুস্তাহাব, সুন্নাতে যায়েদা বাধ্য না হলে ত্যাগ করেন না বা করতে চান না, সুন্নাতে মুআক্কাদা সালাত ত্যাগ করেন না, অথচ অকাতরে জামাত ত্যাগ করেন। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের প্রবৃত্তি ও মনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুগত ও অনুসারী করে দেন।

অগণিত সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং সাহাবীগণ কখনোই কঠিন ওযর ছাড়া জামা'আত ত্যাগ করেননি। জামা'আতে অনুপস্থিত থাকাকে তাঁরা নিশ্চিত মুনাফিকের পরিচয় বলে জানতেন। অনেক সময় অন্ধ ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বলেছেন: "আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোনো মানুষ নেই আর পথও খারাপ। আমি কি জামাতে না এসে ঘরে সালাত আদায় করে নিতে পারব?" তিনি (নবী) অন্ধকেও জামা'আত ত্যাগের অনুমতি দেননি। বলেছেন: "আযান শুনলে হামাগুড়ি দিয়ে বা বুকে ছেচড়ে হলেও মসজিদে এসে তোমাকে জামাতে সালাত পড়তে হবে।" যারা জামাতে সালাতে শরীক হয় না, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি।

সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে জামাতে সালাতে শরীক না হয়ে ফরয সালাত ঘরে আদায় করাকে স্পষ্ট গোমরাহী বলে জানতেন। এ বিষয়ে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من ســـمـع الـنـــداء فــلـم يجـــب فلا صلاة له إلا من عــذر

"যে ব্যক্তি সালাতের আহ্বান (আযান) শুনতে পেল কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামাতে এলো না, তার সালাতই হবে না। তবে যদি ওযর থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।"১

অন্য হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে:

من ســمـع المنادي فلم يــمنــعه من اتباعه عذر قالوا: وما العــذر؟ قــال خـــوف أو مـــرض لــم تـــقـــبل منه الصلاة التي صلى

"যে ব্যক্তি ওযর ছাড়া আযান শুনেও সালাতের জামাতে এলো না, সে একা যে সালাত আদায় করল সেই সালাত কবুল হবে না। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: ওযর কি? তিনি বলেন: ভয় বা অসুস্থতা।"২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেছেন :

من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهــن فــإن الله شـــرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيـــوتكم كمـــا يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ... ولقد رأيتنـــا ومـــا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقـــام فـــي الصف

"যার ভালো লাগে যে, সে আগামীকাল মুসলমান হিসাবে আল্লহার সাথে দেখা করবে, সে যেন এই সালাতগুলিকে যে মসজিদে আযান দেওয়া হয় সেখানে নিয়মিত জামাতে আদায় করে। কারণ আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের সুন্নাত প্রচলন করেছেন। আর এসকল হেদায়েতের সুন্নাতের মধ্যে অন্যতম সালাতগুলিকে মসজিদে জামাতে আদায় করা। তোমরা যদি বাড়িতে সালাত পড় তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর (ﷺ) সুন্নাত ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দিলে তোমরা গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ... আমাদের সময়ে আমরা দেখেছি একমাত্র সুপরিচিত মুনাফিক যাকে সবাই মুনাফিক বলে চিনত এরাই শুধু জামাতে সালাতে হাজির হতো না। অসুস্থ মানুষও দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে জামাতে শরীক হয়ে কাতারে দাঁড়িয়ে যেত।"৩

জামাতে সালাত ত্যাগ করা যেমন ভয়ঙ্কর অপরাধ ও গোনাহের কাজ, তেমনি জামাতে সালাত আদায় অপরিমেয় সাওয়াব ও বরকতের কাজ। জামাতে সালাত আদায় করলে আল্লাহ ২৭ গুণ বেশি সাওয়াব দান করবেন, যারা সর্বদা জামাতে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে মন দিয়ে রাখেন তাঁদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাদের সাথে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, জামাতের অপেক্ষা করা জিহাদের সমতুল্য, ইত্যাদি বিভিন্ন মর্যাদার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت لـــه براءتـــان بـــراءة مـــن النـــار وبراءة من النفاق

"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইমামের সাথে প্রথম তাকবীরসহ পরিপূর্ণ সালাত জামাতে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ দুটি মুক্তি লিখে দিবেন : (১). জাহান্নাম থেকে মুক্তি ; ও (২). মুনাফিকী থেকে মুক্তি।"৪

ফজরের সালাতের জামা'আতের অতিরিক্ত গুরুত্ব ও ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কষ্টের সালাত ফজর ও ইশা'র জামা'আত।"৫

মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান মুসলমানদের জাগতিক লাভ অর্জনে আগ্রহ ও আল্লাহর রহমত, সাওয়াব ও আখেরাতের লাভ অর্জনে নিঃস্পৃহতার একটি চমৎকার উদাহারণ দিয়ে তিনি বলেন : "তারা যদি জানত যে, জামাতে সালাতে হাজির হলে একটি ভালো গোশতওয়ালা হাড় পাওয়া যাবে, তাহলে তারা হাজির হয়ে যাবে।"৬ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন : "আমরা যদি কাউকে ফজর ও ইশা'র জামাতে না দেখতে পেতাম তাহলে তার বিষয়ে ধারণা খারাপ করে ফেলতাম।"৭

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لــو يعــلــمون ما فــيـــهــما لأتـــوهما ولو حـــبـــوا

"ফজর ও ইশা'র সালাত জামাতে আদায় করলে কত ফযীলত তা যদি তারা বুঝত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এই দুই সালাতে উপস্থিত হতো।"৮

তিনি বলেছেন :

مـــن صلى الصـــبـــح في جماعة فهـــو في ذمـــة الله

“যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে, সে আল্লাহর জিম্মাদারীর মধ্যে প্রবেশ করবে।”১

অন্য হাদীসে তিনি বলেন :

من صلى العشاء في جماعة فـكـــأنـــما قام نصف اللـــيل، ومن صـــلى الصـــبـــح فـــي جماعـــة فكـــأنـــما صلى الليل كلـــه

“যে ব্যক্তি ইশা’র সালাত জামাতে আদায় করবে সে যেন অর্ধেক রাত্র (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাতও জামাতে আদায় করবে সে ব্যক্তি যেন সারা রাত (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করল (অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইশা ও ফজর জামাতে আদায় করবে, সে সারা রাত তাহাজ্জুদ আদায়ের সাওয়াব পাবে)।”২

৯. বাড়ি-মসজিদ গমনাগমনের যিক্র

মুমিনের জীবন তাঁর প্রভুর স্মরণ কেন্দ্রিক। সাধারণত তিনি সকালে প্রথমবার বাড়ি থেকে বের হন মসজিদে ফজরের সালাত জামাতে আদায়ের জন্য। এরপর সারাদিনের কর্মময় জীবনে আসা-যাওয়া চলতে থাকে। এখানে এ বিষয়ক কিছু যিক্র উল্লেখ করছি।

যিক্র নং ৬০ : বাড়ি থেকে বের হওয়ার যিক্র-১

بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি, তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লা-হি, লা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ।

অর্থ: “আল্লাহর নামে। আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম। কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।”

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এই কথাগুলি বলবে, তাঁকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হবে: তোমার আর কোনো চিন্তা নেই, তোমার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা হলো (তোমাকে সঠিক পথ দেখানো হলো) এবং তোমাকে হেফাযত করা হলো। আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।” অন্য বর্ণনায় : “এক শয়তান অন্য শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, সে ব্যক্তির সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, হেফাযত করা হয়েছে এবং পথ দেখানো হয়েছে, কিভাবে আমরা তার ক্ষতি করতে পারি ?” হাদীসটি হাসান।৩

যিক্র নং ৬১ : বাড়ি থেকে বের হওয়ার যিক্র-২

بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهـــل علينا

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি, তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা, ইন্না না‘উযু বিকা মিন আন নাযিল্লা, আও নাদ্বিল্লা, আও নাযলিমা আও নুযলামা, আও নাজহালা আউ ইউজহালা ‘আলাইনা।

অর্থ: “আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করছি, হে আল্লাহ আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি যে, আমরা পদস্খলিত হব বা বিভ্রান্ত হব, বা আমরা অত্যাচার করব বা অত্যাচারিত হব, অথবা আমরা কারো সাথে ক্রোধ ও মূর্খতাসুলভ আচরণ করব বা কেউ আমাদের সাথে এরূপ মূর্খতাসুলভ আচরণ করবে।”

হযরত উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাড়ি থেকে বাহির হওয়ার সময় এই দু‘আ পাঠ করতেন। হাদীসটি সহীহ।৪

দিনে রাত্রে যে কোনো সময় বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় মুমিনের উচিত এই যিক্রগুলি অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্তরকে আল্লাহর দিকে রুজু করে পাঠ করা।

যিক্র নং ৬২ (ক) : বাড়ি প্রবেশের যিক্র-১

আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়িতে প্রবেশের সময় আল্লাহর যিক্র করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, আল্লাহর যিক্র করে বাড়িতে প্রবেশ করলে শয়তান সেই বাড়িতে অবস্থান করতে পারে না। বাড়ি প্রবেশের মাসনূন যিক্র নিরূপ :

بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি ওয়লাজনা বিসমিল্লা-হি খারাজনা ওয়া ‘আলা রাব্বিনা- তাওয়াক্কালনা।

অর্থ: “আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামে বাহির হলাম এবং আমাদের প্রভুর উপর নির্ভর করলাম।”

হযরত আবু মালিক আশ’আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إذا ولـــج الرجل في بيته فلـــيقـــل ... ثم ليـــسلـــم على أهله

“যখন কেউ তার বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন যেন সে এই কথাগুলি বলে। এরপর সে যেন তাঁর স্ত্রী-পরিজনদেরকে সালাম

দেয়।"১

যিক্র নং ৬২ (খ) বাড়ি প্রবেশের যিক্র-২ (সালাম)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

উচ্চারণ: আস-সালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রা'হমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ।

অর্থ : আপনাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত।

বাড়িতে প্রবেশের সময় উপরের দু'আ পাঠের পরে বাড়ির যার সাথেই দেখা হবে তাকে সালাম দিতে হবে। উপরের হাদীসেই আমরা সেই নির্দেশনা পেয়েছি। সালাম ইসলামের অন্যতম ইবাদত। সালাম প্রদানকারী ও উত্তর প্রদানকারী উভয়েই অগণিত সাওয়াবের অধিকারী হন। উপরন্তু সালাম মানব জীবনের অন্যতম দু'আ। এতে শান্তি, রহমত ও বরকতের দু'আ করা হয়। একটিবারের সালমও যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে সেই ব্যক্তির জীবনে আর কিছুই অপূর্ণ থাকবে না। জীবনে শান্তি, রহমত ও বরকত পাওয়ার পর আর কী বাকি থাকে?

আমাদের সমাজে স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতাকে ও পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েকে সালাম দেন না। এক ধরনের শয়তানী ওয়াসওয়াসা মুসলিমগণকে এই অতুলনীয় কল্যাণকর ও অগণিত সাওয়াবের কর্ম থেকে বিরত রাখে, যে ওয়াসওয়াসাকে অনেকে 'লজ্জা' নাম দেন। সাধারণ জ্ঞানেই আমরা বুঝতে পারি যে, একজন মানুষের দু'আর সবচেয়ে বড় হকদার তার স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তানগণ। অথচ আমরা অন্যান্য মানুষকে সালাম প্রদান করি, তাদেরকে সাওয়াব অর্জনের সুযোগ ও দু'আ প্রদান করি কিন্তু আপনজনদেরকে বঞ্চিত করি।

সাধারণভাবে সবাইকে সালাম প্রদান সুন্নাত। আর স্বামী, স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যগণকে সালাম দেওয়া অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। হাদীস শরীফে বিশেষভাবে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য অতিরিক্ত ও বিশেষ সাওয়াব ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আবু উমামা (রা) বলেন, নবীয়ে মুসতাফা (ﷺ) বলেছেন :

ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل

"তিন ব্যক্তি আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের জামিন ও সংরক্ষক, যদি বেচে থাকে তাহলে তার সকল দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষা করা হবে এবং যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি সালাম প্রদান করে তার বাড়িতে প্রবেশ করল সে আল্লাহর জামিনদারীতে ও তার জিম্মায় চলে গেল ...।"২

অন্য হাদীসে হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إذا دخلت على أهلك فسلم فتكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. وفي لفظ: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك

"যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তোমার স্ত্রী-সন্তানগণকে সালাম দেবে। এই সালাম তোমার ও তোমার পরিবারের সদস্যগণের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি করবে।" হাদীসটি হাসান।৩

দিনে বা রাত্রে যে কোনো সময়ে বাড়ি প্রবেশের সময় এ সকল মাসনূন বাক্য দ্বারা আল্লাহর যিক্র করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য।

যিক্র নং ৬৩ : মসজিদে গমনকালীন সময়ের যিক্র

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাড়ি থেকে সালাতের জন্য মসজিদে গমনের সময়, তাহাজ্জুদের সালাতে সাজদা-রত অবস্থায়, তাহজ্জুদ সালাতের পরে ও অন্যান্য সময়ে নিম্নের বাক্যগুলি বলতেন:

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا، وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا، واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا، واجعل لي نورا واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ্-'আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়াফী লিসানী নূরান, ওয়াফী বাস্বারী নূরান, ওয়াফী সাম'য়ী নূরান, ওয়া 'আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া 'আন ইয়াসা-রী নূরান, ওয়া ফাওক্বী নূরান, ওয়া তা'হ্তী নূরান, ওয়া আমা-মী নূরান, ওয়া খালফী নূরান, ওয়া ফী 'আসাবী নূরান, ওয়াফী লা'হ্মী নূরান, ওয়াফী দামী নূরান, ওয়াফী শা'অ্রী নূরান, ওয়াফী বাশারী নূরান, ওয়াজ্-'আল ফী নাফসী নূরান, ওয়া আ'অ্যিম লী নূরান, ওয়া 'আয্যিম লী নূরান, ওয়াজ্-'আল লী নূরান, ওয়াজ্-'আলনী নূরান। আল্লাহুম্মা, আ'অ্তিনী নূরান।

অর্থ: "হে আল্লাহ আপনি প্রদান করুন আমার অন্তরে নূর, আমার জবানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার কানে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার স্নায়ুতন্ত্রে নূর, আমার মাংসে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার চুল-পশমে নূর, আমার চামড়ায় নূর, আপনি প্রদান করুন আমার নফসে নূর, আপনি বৃদ্ধি করুন আমার নূর, আপনি মহান করুন আমার নূরকে, আপনি প্রদান করুন, আপনি বানিয়ে দিন আমার মধ্যে নূর, আপনি আমাকে নূর বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে নূর প্রদান করুন।"৪

<u>যিক্র নং ৬৪ : মসজিদে প্রবেশের যিক্র-১</u>

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

উচ্চারণ: আ'উযু বিল্লা-হিল 'আযীম, ওয়া বি ওয়াজ্হিহিল কারীম, ওয়া সুলতা-নিহিল কাদীম মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ: "আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহর এবং তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর অনাদি ক্ষমতার, বিতাড়িত শয়তান থেকে।"

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন এই বাক্যগুলি বলতেন এবং তিনি বলেছেন, "যদি কেউ তা বলে তাহলে শয়তান বলে, সারাদিনের জন্য এই ব্যক্তিকে আমার খপ্পর থেকে রক্ষা করা হলো।" হাদীসটি সহীহ।১

<u>যিক্র নং ৬৫ : মসজিদে প্রবেশের যিক্র-২</u>

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি ওয়াস-স্বালা-তু ওয়াস-সালা-মু 'আলা- রাসূলিল্লাহ। আল্লা-হুম্মাফ্ তা'হ্ লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা।

অর্থ: "আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূলের উপর সালাত ও সালাম। হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলি খুলে দিন।"২

অন্য বর্ণনায় এই যিকরিটি নিন্মরূপ :

اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়াফতা'হ লী আবওয়া-বা রাহমাতিক।

অর্থ: "হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলি খুলে দিন।"

অন্য বর্ণনায় যিক্রটি নিন্মরূপ :

بسم الله، والحمد لله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي وسهل لي أبواب رحمتك

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হ, ওয়াল 'হামদুলিল্লাহ, আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি 'আলা- মু'হাম্মাদিন ওয়া স্বাল্লিম, আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়া সাহ্হিল লী আবওয়া-বা রা'হমাতিক।

অর্থ : আল্লাহর নামে, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর। হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম প্রদান করুন। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার করুণার দরজাগুলি সহজ করুন।" ৩

<u>যিক্র নং ৬৬ : মসজিদ থেকে বের হওয়ার যিক্র-১</u>

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি ওয়াস-স্বালা-তু ওয়াস-সালা-মু 'আলা- রাসূলিল্লাহ। আল্লা-হুম্মাফ্ তা'হ্ লী আবওয়া-বা ফাদ্বলিকা।

অর্থ : "আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূলের উপর সালাত ও সালাম। হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রিযিক-বরকতের দরজাগুলি খুলে দিন।"

দ্বিতীয় বর্ণনায় যিক্রটি নিম্নরূপ :

اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়াফতা'হ লী আবওয়া-বা ফাদ্বলিকা।

অর্থ : "হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রিযিক-বরকতের দরজাগুলি খুলে দিন।" তৃতীয় বর্ণনায় :

بسم الله، والحمد لله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي وسهل لي أبواب فضلك

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হ, ওয়াল 'হামদুলিল্লাহ, আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি 'আলা- মু'হাম্মাদিন ওয়া স্বাল্লিম, আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়া সাহ্হিল লী আবওয়া-বা ফাদ্বলিক।"

অর্থ : আল্লাহর নামে, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর। হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম প্রদান করুন। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রিযিক-বরকতের দরজাগুলি সহজ করুন।৪

<u>যিক্র নং ৬৭ : মসজিদ থেকে বের হওয়ার যিক্র-২</u>

اَللهمَّ، أَجِرْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আজির নী মিনাশ শায়তা-নির রাজীম।

অর্থ : "হে আল্লাহ আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করুন।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এই যিক্র পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

জামাতে সালাত আদায়ের কতিপয় অবহেলিত সুন্নাত

মসজিদে প্রবেশের পরে সেখানে পালনীয় অনেক সুন্নাত অজ্ঞানতা বা অবহেলার কারণে আমরা পরিত্যাগ করে থাকি। এ ধরনের মৃত ও পরিত্যক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সুন্নাত এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। আশা করছি অন্তত কিছু পাঠক এই সুন্নাতগুলি পালন করে মৃত সুন্নাত জীবিত করার অতুলনীয় সাওয়াব অর্জন করবেন এবং লেখকও তাঁদের সাথে সাওয়াবের অংশী হবেন।

(১). জামাতে গমন করার সময় তাড়াহুড়ো করা হাদীসে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, সালাতের ইকামত হওয়ার পরেও যদি তোমরা মসজিদে যাও তাহলে মানসিক অস্থিরতা বা দৌড়াদৌড়ি করে মসজিদে যাবে না। শান্তভাবে ও ধীরে ধীরে যাবে। যতটুকু সালাত ইমামের সাথে পাবে তা আদায় করবে, বাকিটা পরে নিজে আদায় করবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, ঘর থেকে সালাতের জন্য বাহির হওয়ার সময় থেকেই মুসল্লী সালাতের মধ্যেই থাকেন এবং আল্লাহর কাছে তিনি সালাতরত বলে গণ্য হন। যদি কেউ মসজিদে যেয়ে দেখেন যে পুরো জামাত শেষ হয়ে গিয়েছে তাহলেও তিনি জামাতের সাওয়াব পাবেন।

(২). মসজিদে প্রবেশ করার পর আগের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনের কাতারে দাঁড়নো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও গোনাহের কাজ। যথাসম্ভব ধীর স্থিরভাবে আগের কাতারে দাঁড়াতে হবে। এতে ইমাম এক রাক'আত শেষ করে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই। আমরা মসজিদে রাক'আত গণনা করতে যাই না, সাওয়াব অর্জন করতে যাই। তাড়াহুড়ো করলে, পিছনের কাতারে দাঁড়ালে গোনাহ হবে। আর শান্ত ভাবে আগের কাতারে দাঁড়ালে সাওয়াব বেশি হবে।

(৩). সালাতের কাতারে যথাসম্ভব গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াতে, মাঝের ফাঁক বন্ধ করতে ও কাতার সোজা করতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

(৪). মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে 'দুখুলুল মাসজিদ' বা 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' সালাত আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে অন্তত দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিতে বলেছেন। মসজিদে প্রবেশ করে যদি জামা'আত শুরু না হয় তাহলে বসার আগে সালাতে দাঁড়াতে হবে। যদি সুন্নাতে মু'আক্কাদা সালাত থাকে তাহলে তা আদায় করতে হবে। নইলে, মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে, অন্তত দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সুন্নাত সালাত আদায় করতে হবে। সরাসরি জামাতে দাঁড়িয়ে গেলেও তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুন্নাত আদায় হবে। কোনো সালাত না পড়ে মসজিদে বসে গেলে এই সুন্নাত পালনের সাওয়াব থেকে আমরা বঞ্চিত হব।

(৫). সালাতে দাঁড়ানোর সময় সামনে, তিন হাতের মধ্যে সুতরা বা আড়াল রাখা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নির্দেশিত ও আচরিত সুন্নাত।

(৬). সালাতের মধ্যে রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ও দুই সাজদার মাঝে অন্তত কয়েক মুহূর্ত পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো ও বসা ওয়াজিব। অনেকেই এতে অবহেলা করেন। এতে সালাত শুদ্ধ হবে না।

(৭). অনেক মুসল্লী সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাড়ানো, বসা, হাত উঠানো, হাত রাখা ইত্যাদির খুঁটিনাটি সুন্নাত না জানার ফলে অগণিত সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হন। এগুলি অভিজ্ঞ আলিমগণের নিকট থেকে ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা করা অতি প্রয়োজন।

(৮). ফরয সালাতের জামাতের শেষে সুন্নাত সালাত মসজিদে আদায় করলে ফরযের স্থান থেকে আগে-পিছে বা ডানে-বামে সরে সুন্নাত আদায় করা উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (রা) স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, ইমামের জন্য যে স্থানে দাঁড়িয়ে ফরয পড়েছেন সেই স্থানে দাঁড়িয়ে সুন্নাত আদায় করা মাকরুহ। মুক্তাদীদের জন্য স্থান পরিবর্তন উত্তম, তবে একই স্থানে সুন্নাত পড়লে মুক্তাদী গোনাহগার হবেন না।

সকালের যিক্র: দ্বিতীয় পর্যায়

সালাতুল ফজরের পরের যিক্র

উপরে আমরা সকালের যিক্রের প্রথম পর্যায় আলোচনা করলাম। আগেই বলেছি এখানে উল্লেখিত যিক্রগুলি মুলত সকল সময়ের জন্য। মুমিন ফজরের সালাতে এবং সকল সময় ওযু, গোসল, আযান, সালাত, মসজিদে গমন, ঘরে আগমন ইত্যাদি সময়ে এসকল মাসনূন যিক্র ও অন্যান্য সুন্নাত পালন করার চেষ্টা করবেন।

সকালের যিক্রের দ্বিতীয় পর্যায়: ফজরের ফরয সালাতের পর থেকে সূর্যোদয়ের আধাঘণ্টা বা আরো পরে সালাতুদ দোহা বা চাশ্‌তের সালাত আদায় পর্যন্ত সময়। হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, এই সময় যিক্রের অন্যতম সময়। এসময়ে প্রত্যেকেই সাধ্যমতো বেশি বেশি যিক্র করার চেষ্টা করবেন। সম্ভব হলে এই ঘণ্টাখানেক সময় সবটুকু, না হলে যতক্ষণ সম্ভব যিক্রে কাটাতে হবে।

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, সকল প্রকার ইবাদতই যিক্র। তবে বিভিন্ন প্রকার যিক্রের বিভিন্ন স্বাদ, উপকার ও আধ্যাত্মিক প্রভাব রয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাসবীহ, তাহলীল ও ওয়ায জাতীয় যিক্রের অন্যতম সময় সকাল ও বিকাল – ফজরের পরে ও আসরের পরে। কুরআন ও হাদীসে ফজর ও আসর সালাতের বিশেষ ফযীলত বলা হয়েছে এবং এই দুই সালাতের পরে যিক্র আযকারের বিশেষ ফযীলত ও সাওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে।

ফজরের পরে যিক্রের দুটি পর্যায়। প্রথম পর্যায় – সালাতের পরে বসে, বিশেষত চারজানু হয়ে বসে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত যিক্র করা, যখন মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হবে। দ্বিতীয় পর্যায়– মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হলে (সূর্যোদয়ের মোটামুটি আধাঘণ্টা পরে) অন্তত দুই রাক'আত 'দোহা' বা চাশতের সালাত আদায় করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ফজরের পরে চারজানু হয়ে সূর্য পুরোপুরি উঠা পর্যন্ত বসে থাকতেন। তিনি নিশ্চুপ বসে থাকতেন অথবা চুপে চুপে যিক্র আযকার করতেন। সাহাবায়ে কেরাম অনেকে তার চারিপার্শে বসতেন। তারা কখনো প্রত্যেকে নিজে নিজে চুপে চুপে যিক্র করতেন। কখনো কখনো তিনি ফজরের সালাম ফেরানোর পরে সাহাবীগণের সাথে কথাবার্তা বলতেন বা রাত্রে কে কী স্বপ্ন দেখেছে তা আলোচনা করতেন। অনেক সময় সাহাবীগণ বিভিন্ন গল্প, জাহেলী যুগের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করতেন। তারা অনেক সময় হাসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু মুচকি হাসতেন। সাধারণত সূর্য ওঠার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে তাঁর ঘরে আসতেন।

ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই যিক্রের সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে সমবেতভাবে বা শব্দ করে যিক্রের প্রচলন ছিল না। কোনো হাদীসে কোথাও নেই যে কখনো কোনো দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ সকলে সমবেতভাবে সমস্বরে বা একত্রে জোরে জোরে যিক্র করেছেন। এজন্য এ সময়ের যিক্রের সুন্নাত- প্রত্যেকে বসে বসে নিজের মতো যিক্র ও দু'আর মধ্যে সময় কাটান। বিভিন্ন হাদীসে যিক্র শেষে 'দোহার সালাত' পড়ে মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে 'দোহার সালাত' মসজিদে নিয়মিত পড়তেন বলে জানা যায় না। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

প্রথমত, ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যিক্রের ফযীলত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন :

كان رسول الله ﷺ إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة، وقال من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তখন (সূর্য পুরোপুরি উঠে মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হয়ে) সালাত জায়েয হওয়ার সময় পর্যন্ত তাঁর বসার স্থান থেকে উঠতেন না। তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করার পরে সালাত জায়েয হওয়ার সময় পর্যন্ত তাঁর বসার স্থানে বসে থাকবে সে একটি মাকবুল হজ্ব ও একটি মাকবূল উমরার সাওয়াব অর্জন করবে।" হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।১

হযরত জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন :

كان النبي ﷺ إذا صلى الفجر تربع في مجلسه (جلس في مصلاه) حتى تطلع الشمس حسنا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন সূর্য ভালোভাবে উঠে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর বসার স্থানে চারজানু হয়ে বসে থাকতেন।"২

অন্য বর্ণনায় সাম্মাক ইবনু হারব বলেন: আমি জাবির ইবনু সামুরাহকে (রা) বললাম, 'আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে বসতেন?' তিনি বললেন, 'হাঁ, অনেক,'

كان رسول الله ﷺ إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس [فإذا طلعت الشمس قام] فيتحدث أصحابه ويذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم ﷺ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যে স্থানে ফজরের সালাত আদায় করতেন সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের পরে তিনি উঠতেন। তাঁর বসা অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম কথাবার্তা বলতেন, জাহেলী যুগের কথা আলোচনা করতেন, কবিতা পাঠ করতেন এবং হাসতেন। আর তিনি শুধু মুচকি হাসতেন।"৩

হযরত উমার (রা) বলেন :

وكان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকতেন। মানুষেরা তাঁর চারিদিকে বসত। সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি এভাবে থাকতেন। এরপর তিনি একে একে তাঁর সকল স্ত্রীর ঘরে গিয়ে তাঁদেরকে সালাম দিতেন ও তাঁদের জন্য দু'আ করতেন।"

আল্লামা হাইসামীর বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।৪

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً.

"ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে রত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে রত কিছু মানুষের

সাথে বসে থাকা আমার কাছে চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়।" হাদীসটি হাসান।১

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে সাহাবীগণও সুযোগমতো ফজরের সালাতের পরে মসজিদে বা ঘরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে ব্যক্তিগতভাবে যিক্‌র ওযীফায় রত থাকতে ভালবাসতেন। তাবেয়ী মুদরিক ইবনু আউফ বলেন, আমি চলার পথে দেখলাম হযরত বিলাল (রা) ফজরের সালাত আদায় করে বসে রয়েছেন। আমি বললাম, "বসে রয়েছেন কেন?" তিনি বললেন : "সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করছি।"২

তাবেয়ী আবু ওয়াইল বলেন :

سألت ابن مسعود ذات يوم بعد ما انصرفنا من صلاة الغداة فاستأذنا عليه قال ادخلوا قلنا ننتظر هنية لعل بعض أهل الدار له حاجة فأقبل يسبح وقال لقد ظننتم يا آل عبدالله غفلة ثم قال يا جارية أنظري هل طلعت الشمس قالت لا ثم قال لها الثالثة أنظري هل طلعت الشمس قالت نعم قال الحمد لله الذي وهبنا هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا أحسبه قال ولم يعذبنا بالنار.

আমি একদিন ফজরের সালাতের পরে ইবনু মাস'উদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমরা তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন : "প্রবেশ কর"। আমরা বললাম: "কিছু সময় আমরা অপেক্ষা করি, হয়ত বাড়ির কারো কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে।" তখন তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসে তাসবীহ করতে থাকলেন। তিনি বললেন: "হে আব্দুল্লাহর বাড়ির মানুষেরা, তোমরা গাফলতির চিন্তা করেছিলে!" এরপর তিনি তার দাসীকে বললেন: "দেখ তো সূর্য উঠেছে কিনা।" সে বলল: " না।" পরে তৃতীয়বার যখন তিনি তাকে বললেন: "সূর্য উঠেছে কিনা দেখ।" তখন সে বলল: "হাঁ, সূর্য উঠেছে।" তখন তিনি বললেন: "আল্লাহর সকল প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এই দিনটিও উপহার দিলেন। তিনি এই দিনে আমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করেননি।" বর্ণনাটি সনদ সহীহ।৩

অন্য একটি দুর্বল সনদের বর্ণনায় হযরত ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদকে (রা) দেখেছেন এমন একজন আমাকে বলেছেন, তিনি একবার তাকে দেখেছেন যে, তিনি ফজরের সালাত আদায় করে বসে থাকলেন। তিনি যোহর পর্যন্ত আর উঠলেন না কোনো নফল সালাতও পড়লেন না। যোহরের আযান হলে তিনি উঠে (যোহরের সুন্নাত) চার রাক'আত আদায় করলেন।"৪

দ্বিতীয়ত, এ সময়ের যিক্‌র

ফজরের সালাতের পরে যিক্‌র-এর ফযীলত ও গুরুত্ব জানতে পেরেছি। এখন প্রশ্ন: এই সময়ে আমরা কোন যিক্‌র কী-ভাবে করব? এ সময়ের যিক্‌রের বিষয়ে সুন্নাতে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কোনো যিক্‌র করতেন কিনা? নাকি আমার ইচ্ছামতো যিক্‌র আযকার করব?

আমরা আগেই বলেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে উজ্জ্বল আলোকিত রাজপথে রেখে গিয়েছেন। কোনো প্রকার অস্পষ্টতা বা দ্বিধার মধ্যে রেখে যাননি। উম্মতকে সবকিছুই শিখিয়ে গিয়েছেন। উম্মতের কোনো কিছু বানানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু তার সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ।

এই সময়ে যিক্‌রের গুরুত্ব যেমন বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এই সময়ের যিক্‌র আযকারও বিভিন্ন হাদীসে সুনির্দিষ্টভাবে শেখানো হয়েছে। এই সময়ের মাসনূন যিক্‌রগুলি প্রথমত দুই প্রকার : নির্ধারিত ও অনির্ধারিত। নির্ধারিত যিক্‌রগুলি নির্ধারিত সংখ্যায় ফজরের পরে আদায় করতে হবে। এরপর বাকি সময় অনির্ধারিত যিক্‌রগুলি অনবরত বা যত বেশি সম্ভব পালন করতে হবে।

নির্ধারিত যিক্‌রগুলি নিম্নরূপ :

(১). যে সকল যিক্‌র ফজর সালাতের পরে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এগুলি দুই প্রকার : শুধুমাত্র ফজর সালাতের পরে পালনীয় যিক্‌র এবং ফজর ও মাগরিবের পরে পালনীয় যিক্‌র।

(২). যে সকল যিক্‌র পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পালনীয়। স্বভাবতই সেগুলিকে ফজর সালাতের পরে আদায় করতে হবে।

(৩). যে সকল যিক্‌র সকাল ও বিকালে বা সকাল ও সন্ধ্যায় পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুবহে সাদেক থেকেই সকাল শুরু, এজন্য এসকল যিক্‌র ফজর সালাতের আগেও আদায় করা যায়। তবে সাধারণত মুমিন ফজরের ফরয সালাত আদায়ের পরেই এ সকল যিক্‌র আদায় করেন।

আর অনির্ধারিত যিক্‌র হিসাবে তাসবীহ, তাহলীল, ওয়ায ইত্যাদি এই সময়ে পালনের জন্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

আমরা এখানে এ সকল যিক্‌রের আলোচনা করব। যাকির নিজের সময়, আবেগ ও প্রেরণা অনুযায়ী সকল যিক্‌র বা কিছু যিক্‌র পালন করবেন। কিছু যিক্‌র পালনের ক্ষেত্রে বাছাই করা ও ওযীফা তৈরি করার দায়িত্ব তিনি নিজে পালন করবেন বা কোনো নেককার আলিমের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, উপরে উল্লেখিত ও নিম্নে আলোচিত বিভিন্ন প্রকারের যিক্‌রের মধ্যে কোনো সুন্নাত-সম্মত ক্রম বা তারতীব নেই। কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে এমন কোনো বর্ণনা হাদীসে নেই। যিক্‌রের কোনো তরতীব বা ক্রম হাদীসে বর্ণিত হয়নি। যাকির নিজের সুবিধা, ক্বলবের হালত ও সময়-সুযোগ মতো যিক্‌র নির্বাচন করতে পারেন বা আগে পিছে করে সাজাতে পারেন। কোনো যিক্‌র আগে এবং কোনো যিক্‌র পরে করার মধ্যে কোনো সাওয়াব নেই। সাওয়াব যিক্‌র পালনের মধ্যে। সুন্নাতে নববীতে উল্লেখ করা হয়নি এমন কোনো নির্দিষ্ট তারতীব বা সাজানোকে অলঙ্ঘনীয় মনে করা বা এতে বিশেষ কোনো সাওয়াব আছে বলে মনে করা সুন্নাতের খেলাফ ও তা যাকিরকে

বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত করবে।

আমি এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য একটি তারতীবে যিক্‌রগুলি আলোচনা করছি। যাকির নিজের অবস্থা অনুসারে যিক্‌র নির্বাচন করবেন। প্রথমে আমি নির্ধারিত যিক্‌রগুলি আলোচনা করছি। এগুলি সুন্নাত নির্ধারিত সংখ্যা পালন করতে হবে। যেখানে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি সেখানে একবার পড়তে হবে।

তিন প্রকার নির্ধারিত যিক্‌র

প্রথম প্রকার যিক্‌র : ফজরের পরে পালনের জন্য নির্ধারিত

এই পর্যায়ে তিনটি যিক্‌র উল্লেখ করা হলো। একটি যিক্‌র শুধু ফজরের পরে ও অন্য দুটি ফজর ও মাগরিবের পরে পালনীয়।

যিক্‌র নং ৬৮ : ফজরের সালাতের পরের দু'আ: (১ বার)

اللهم إني أسألك علما نافعاً وعملا متقبلاً ورزقا طيباً

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকা 'ইল্‌মান না-ফি'আন, ওয়া 'আমালান মুতাক্বাব্বালান ওয়া রিয্‌ক্বান ত্বাইয়িবান।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাচ্ছি কল্যাণকর জ্ঞান, কবুলকৃত কর্ম ও পবিত্র রিযিক।" (১ বার)

উম্মু সালামা (রা) বলেন :

إن النبي ﷺ يقـــول في دبـــر الفجـــر إذا صلى.

"নবীয়ে আকরাম ﷺ ফজরের সালাতের শেষে, যখন সালাত আদায় হয়ে যেত তখন এই বাক্যগুলি বলতেন।"১

যিক্‌র নং ৬৯ : ফজর ও মাগরিবের পরের যিক্‌র-১

বিভিন্ন হাদীসে আমরা কিছু যিক্‌রের কথা জানতে পারি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর ও মাগরিবের সালাতের পরে পড়ার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। এ ধরনের যিক্‌রের মধ্যে অন্যতম ইতঃপূর্বে উল্লেখিত ৩ নং যিক্‌র:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت (بيده الخير) وهو على كل شـــيء قدير

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ইউ'হয়ী ওয়া ইউমীতু (বিইয়াদিহিল খাইরু) ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

বিভিন্ন হাদীসে ফজর সালাতের পরেই সালাতের অবস্থায় পা ভেঙ্গে বসে থেকেই ১০০ বার অথবা ১০ বার এই যিক্‌র করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে মাগরিব সালাতের পরেই না নড়ে এবং পা না গুটিয়ে ১০ বার বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবু যার (রা), আব্দুর রাহমান ইবনু গানম (রা), উমারাহ ইবনু শাবীব (রা), আবু আইউব আনসারী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি মাগরিবের সালাতের পর এবং ফজরের সালাতের পর, ঘুরে বসা বা নড়াচড়ার আগেই, পা গুটানো অবস্থাতেই, কোনো কথা বলার আগে এই যিক্‌রটি ১০ বার পাঠ করবে আল্লাহ তার প্রত্যেক বারের জন্য জন্য ১০ টি সাওয়াব লিখবেন, ১০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন, তাঁর ১০ টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, ঐদিনের জন্য তাকে সকল অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হবে, শয়তান থেকে পাহারা দেওয়া হবে। ঐদিনে শির্‌ক ছাড়া কোনো গোনাহ তাঁকে ধরতে পারা উচিত নয়। যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি বলবে সে ছাড়া অন্য সবার চেয়ে সে ঐ দিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমলকারী বলে গণ্য হবে।"

বিভিন্ন সহীহ ও হাসান সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত।২

আবু উমামাহ (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের পরেই তাঁর পা গুটানোর আগেই যিক্‌রটি ১০০ বার পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ঐ দিনের শ্রেষ্ঠ আমলকারী বলে বিবেচিত হবে। তবে যে ব্যক্তি তাঁর মতো বা তাঁর চেয়ে বেশি বলবে তাঁর কথা ভিন্ন।" হাদীসটির সনদ হাসান।৩

একটি দুর্বল সনদের হাদীসে এই যিক্‌রটি প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে সালাতের অবস্থায় পা ভাজ করে বসে থেকেই কথা বলার পূর্বে দশবার বলতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং তার বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।৪

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই যিক্‌রটির সাধারণ ফযীলত আলোচনা করেছি। পরবর্তীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরের যিক্‌রের মধ্যেও এই যিক্‌রটি উল্লেখ করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যিক্‌রটি খুব বেশি পালন করতেন ও শিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন হাদীসে প্রত্যেক সালাতের পরে, সকালে, সন্ধ্যায় বা সারাদিন এই যিক্‌রটি পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সকল সহীহ হাদীসের আলোকে প্রত্যেক মুসল্লীর উচিত কমপক্ষে সকল ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে অন্তত ১ বার, ফজর ও মাগরিবের পরে ১০ বার করে ও সারাদিনে ২০০ বার বা কমপক্ষে ১০০ বার এই যিক্‌রটি পাঠ করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন ; আমীন।

<u>যিক্‌র নং ৭০ : ফজর ও মাগরিবের পরের দু'আ-২</u>

اللهم أجـــــرني من الــنـــار

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আজিরনী মিনান না-র ।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন ।" ফজর ও মাগরিবের সালাতের পরে কোনো (দুনিয়াবী) কথা বলার পূর্বে ৭ বার ।

হারিস ইবনু মুসলিম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেছেন, তুমি ফজরের সালাতের পরেই (দুনিয়াবী) কথা বলার আগে এই দু'আ ৭ বার বলবে । যদি তুমি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন । অনুরূপভাবে, মাগরিবের সালাতের পরে কথা বলার আগেই এই দু'আ ৭ বার বলবে । তুমি যদি ঐ রাত্রে মৃত্যু বরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন ।" অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন ।১

দ্বিতীয় প্রকার যিক্‌র: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে আযকারে নববী

ফজরের ফরয সালাতের পরে পালনীয় দ্বিতীয় প্রকার নির্ধারিত যিক্‌র যা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পালনীয় বলে হাদীস থেকে জানা যায় । এগুলি স্বভাবত অন্যান্য সালাতের ন্যায় ফজরের সালাতের পরেও আদায় করতে হবে ।

ফরয সালাতের পরে যিক্‌র ও মুনাজাতের গুরুত্ব

সালাত মুমিনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র । আর যিক্‌রেই তো মুমিনের হৃদয়ে আসে প্রশান্তি । এজন্য সালাতের শেষে মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি আসে । আমরা সালাতে মনোযোগ দিতে পারি না বলে এই প্রশান্তি ভালোভাবে অনুভব করতে পারি না । তা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব মনোযোগ সহকারে, সালাতের সূরা-কিরাআত, তাসবীহ ও দু'আর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সালাত শেষ করলে মুসাল্লী নিজেই হৃদয়ের প্রশান্তি ও আবেগ অনুভব করবেন ।

এ সময়ে তাড়াহুড়ো করে উঠে চলে যাওয়া মুমিনের উচিত নয় । সালাতের পরে যতক্ষণ সম্ভব সালাতের স্থানে বসে দু'আ মুনাজাত ও যিক্‌রে রত থাকা উচিত । মুমিন যদি কিছু না করে শুধু বসে থাকেন তাও তাঁর জন্য কল্যাণকর । সালাতের পরে যতক্ষণ মুসল্লী সালাতের স্থানে বসে থাকবেন ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন ।আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إذا صلى المسلم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمــه مــا لــم يحدث أو يقوم

"যদি কোনো মুসলিম সালাত আদায় করে, এরপর সে তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকে, তবে ফিরিশতাগণ অনবরত তাঁর জন্য দু'আ করতে থাকেন: হে আল্লাহ একে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, একে রহমত করুন, যতক্ষণ না সে ওযু নষ্ট করে বা তাঁর স্থান থেকে উঠে যায় ।"২

সাহাবী-তাবেয়ীগণ প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে সাধ্যমতো বেশি সময় কোনো কথোপকথনে লিপ্ত না হয়ে যত বেশি সম্ভব তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিক্‌রে রত থাকতে পছন্দ করতেন ।৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরে বিভিন্ন যিক্‌র ও দু'আ পাঠ করেছেন এবং করতে শিখিয়েছেন । হাদীসের শিক্ষার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরে কিছু সময় বসে যিক্‌র ও দু'আ করা মাসনূন বা সুন্নাত সম্মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলদায়ক কর্ম । আমরা দেখেছি যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরের দু'আ কবুল হয় বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ।

যে সকল সালাতের পরে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ সালাত আছে, অর্থাৎ যোহর, মাগরিব ও ইশা'র সালাতের ক্ষেত্রে এ সকল যিক্‌র ও দু'আ সুন্নাতের আগে পালন করতে হবে না পরে– সে বিষয়ে হানাফী উলামাগণের কিছু মতভেদ আছে । কিন্তু ফজরের সালাতের ক্ষেত্রে স্বভাবতই কোনো সমস্যা নেই । সালাতের পরে এ সকল যিক্‌র ও দু'আ সম্ভব হলে সবগুলি, না হলে কিছু বেছে নিয়ে তা আদায় করতে হবে ।

ফরয সালাতের পরে পালনীয় ২৯ টি মাসনূন যিক্‌র ও মুনাজাত

<u>(১). যিক্‌র নং ৭১ : (৩ বার)</u> **أســتــغــفر الله**

(পূর্বোক্ত ১৫ নং যিক্‌র) (৩ বার ।)

<u>(২). যিক্‌র নং ৭২ : (সালাতের পরের যিক্‌র)</u>

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম ।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার থেকেই শান্তি, হে মহাসম্মানের অধিকারী ও মর্যাদা প্রদানের অধিকারী, আপনি বরকতময় ।" (এক বার)

সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে তিন বার ইস্তিগফার বলে এরপর "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ... " বলতেন ।৪ "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম..." সম্পর্কে আয়েশা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে অনেকেই

إليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دارك دار السلام

ইত্যাদি বলেন। এ সকল শব্দ কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। মুল্লা আলী কারী হানাফী (১০১৪ হি), আল্লামা আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ তাহতাবী হানাফী (১২৩১ হি) প্রমুখ আলিম উল্লেখ করেছেন যে, এই অতিরিক্ত বাক্যগুলি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। কিছু ওয়ায়েজ এগুলি বানিয়েছেন।১ আল্লাহই ভালো জানেন।

এই বাক্যগুলির অর্থে কোনো দোষ নেই। বলাও না-জায়েয নয়। তবে বলা কোনো অবস্থাতেই সুন্নাত না, বরং সুন্নাতের বাইরে ও সুন্নাতের অতিরিক্ত। মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত দু'আই উত্তম। এছাড়া সুন্নাতের বাইরে দু'আ জায়েয হলেও তা রীতিতে পরিণত করলে সুন্নাতের বিপরীতে বিদ'আতে পরিণত হবে। সর্বোপরি মাসনূন দু'আ ও যিক্‌রের মধ্যে মনগড়া বাক্যাদি সংযোগ করে তার বিকৃতি করা মোটেও ঠিক নয়। মাসনূন দু'আ ও যিক্‌রকে মাসনূন শব্দে হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো আদায় করা উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে শুধু সুন্নাতে পরিতৃপ্ত থাকার তাওফীক দিন।

(৪). যিক্‌র নং ৭৩ : (সালাতের পরের যিক্‌র)

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

উচ্চারন : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লা-হুম্মা, লা- মা-নি'আ লিমা- আ'অ্ত্বাইতা, ওয়ালা- মু'অ্ত্বিয়া লিমা- মানা'অ্তা, ওয়ালা- ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা দান করেন তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারো নেই। আর আপনি যা না দেন তা দেওয়ার ক্ষমতাও কারো নেই। কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম আপনার ইচ্ছার বাইরে কোনো উপকারে লাগে না।"

হযরত মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) বলেন :

إن رسول الله ﷺ كان إذا قضى صلاته فسلم قال... وفي رواية: كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক সালাতের সালামের পরেই এই যিক্‌রটি বলতেন।"২

(৫). যিক্‌র নং ৭৪ : (সালাতের পরের যিক্‌র)

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া'হ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল 'হামদু, ওয়া হুআ 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। লা- 'হাওলা ওয়ালা- ক্বুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ, লা- না'অ্‌বুদু ইল্লা- ইইয়া-হু। লাহুন নি'অ্‌মাতু, ওয়া লাহুল ফাদ্বলু, ওয়ালাহুস সানা-উল 'হাসান। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর দ্বারা ও আল্লাহর মাধ্যম ছাড়া কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই। আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করি না। নিয়ামত তাঁরই, দয়া তাঁরই এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আমাদের দ্বীন বিশুদ্ধভাবে শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, এতে যদিও কাফিরগণ অসন্তুষ্ট হয়।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) নিজে সর্বদা প্রত্যেক সালাতের পরে উক্ত যিক্‌রটি পাঠ করতেন এবং বলতেন :

كان رسول الله ﷺ يقول هؤلاء الكلمات دبر كل صلاة

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক সালাতের পরে এই কথাগুলি বলতেন।"৩

(৬). যিক্‌র নং ৭৫ : আয়াতুল কুরসী ১ বার :

হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাঁর জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না।"৪

অন্য হাদীসে হযরত হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى

"যে ব্যক্তি ফরয সালাতের শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে পরবর্তী সালাত পর্যন্ত আল্লাহর জিম্মায় থাকবে।"১

(৭). যিক্‌র নং ৭৬: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ১ বার:

উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক সালাতের পরে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে । দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক সালাতের পরে মু'আওয়িযাত, (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।২

এছাড়া অন্য হাদীসে এই তিনটি সূরা তিন বার করে সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা পরে আমরা আলোচনা করব ; ইন্‌শা আল্লাহ।

(৩). যিক্‌র নং ৭৭ : (১০০ বা ৪০০ তাসবীহ)

৩৩ বার "সুব'হানাল্লাহ" , ৩৩ বার "আল'হামদুলিল্লাহ" এবং ৩৪ বার "আল্লাহু আকবার"। – এই যিক্‌রগুলির বিষয়ে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা বলা হয়েছে। উপরের সংখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধ। সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪০০ বার ; ১০০ বার "সুবহানাল্লাহ", ১০০ বার "আলহামদুলিল্লাহ", ১০০ বার "আল্লাহু আকবার" এবং ১০০ বার "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। সর্বনিু সংখ্যা ৩০ বার ; ১০ বার "সুবহানাল্লাহ", ১০ বার "আলহামদুলিল্লাহ" এবং ১০ বার "আল্লাহু আকবার" ।

(৮). যিক্‌র নং ৭৮ : (সালাতের পরের দু'আ)

رب قني عذابك يوم تبعث [تجمع] عبادك

উচ্চারণ : রাব্বি ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আসু ইবা-দাকা।

অর্থ : "হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন আপনার শাস্তি থেকে যেদিন আপনি পুনরুত্থিত করবেন আপনার বান্দাগণকে।" (এক বার)

হযরত বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন :

كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺس أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول حين انصرف

"আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে সালাত পড়তাম তখন তাঁর ডান দিকে দাঁড়াতে পছন্দ করতাম। তিনি সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন। আমি শুনলাম তিনি সালাত শেষে ফেরার সময় উক্ত দু'আটি বললেন।"৩

(৯). যিক্‌র নং ৭৯ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল কুফ্‌রি ওয়াল ফাকরি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাব্‌রি।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রর্থনা করছি কুফরি থেকে ও দারিদ্র থেকে এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।"

আবু বাকরার (রা) ছেলে মুসলিম বলেন, আমার পিতা সালাতের পরে এই দু'আটি পাঠ করতেন এবং তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দু'আটি সালাতের পরে পাঠ করতেন। তিনি ছেলেকে আরো বলেন : তুমি এই দু'আটি নিয়মিত পড়বে।৪

(১০). যিক্‌র নং ৮০ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আ'ইননী 'আলা- যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিকা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিক্‌র করতে, শুকর করতে এবং আপনার ইবাদত সুন্দরভাবে করতে তাওফীক ও ক্ষমতা প্রদান করুন।"

হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার হাত ধরে বলেন, মু'আয, আমি তোমাকে ভালবাসি। ... মু'আয, আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি, প্রত্যেক সালাতের পরে এই দু'আটি বলা কখনো বাদ দিবে না।৫

(১১). যিক্‌র নং ৮১ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ

بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল বুখলি, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ'ঊযু বিকা আন উরাদ্দা ইলা-আরযালিল উমুরি, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া-, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাব্রি।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপমানকর অতি বৃদ্ধ বয়সে পৌছান থেকে, (যে বয়সে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে), আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিতনা থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।"

হযরত সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন :

إن رسول الله ﷺ كان يتـــعــوذ بهن بعد كل صلاة [دبر الصلاة]

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক সালাতের পরে এই বাক্যগুলি দ্বার দু'আ করতেন।"১

(১২). যিক্র নং ৮২ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنـــت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা- ক্বাদ্দামতু, ওয়ামা- আখখারতু, ওয়ামা- আসরারতু, ওয়া মা- আ'অ্লানতু, ওয়ামা- আস্রাফতু, ওয়ামা- আনতা আ'অ্লামু বিহী মিন্নী। আনতাল মুক্বাদ্দিমু, ওয়া আনতাল মুআখ্খিরু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য ক্ষমা করুন আমি আগে যা করেছি এবং আমি পরে যা করেছি, আমি গোপনে যা করেছি এবং আমি প্রকাশ্যে যা করেছি এবং আমি বাড়াবাড়ি করে যা করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়েও বেশি ভালো জানেন। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পিছিয়ে দেন। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।"

হযরত আলী (রা) বলেন :

كان رسول الله ﷺ إذا فـــرغ من الصلاة وســلـــم قال ...

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষে সালাম বলতেন তখন এ কথাগুলি বলতেন।"২

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত এই হাদীসের অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহ্হুদের শেষে সালামের পূর্বে এই দু'আটি পড়তেন। সনদের দিক থেকে দুটি বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য, তবে মুসলিমের বর্ণনা অধিক শক্তিশালী। সম্ভবত তিনি সাধারণত সালামের আগে ও কখনো পরে এই দু'আটি পড়তেন।৩

(১৩). যিক্র নং ৮৩ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي جعلت فيهـــا معاشـــي اللهـــم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك اللهـــم لا مـــانع لمـــا أعطيـــت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আস্বলি'হ লী দীনিয়াল লাযী জা'আলতাহু 'ইস্বমাতা আমরী। ওয়া আস্বলি'হ লী দুন্ইয়া-ইয়াল্ লাতী জা'আলতা ফীহা মা'আ-শী। আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'ঊযু বি রিদা-কা মিন সাখাত্বিকা, ওয়াবি 'আফ্বিকা মিন নাক্বামাতিকা, ওয়া আঊযু বিকা মিনকা। আল্লা-হুম্মা, লা- মা-নি'আ লিমা- আ'অ্ত্বাইতা, ওয়ালা- মু'অ্ত্বিয়া লিমা মানা'অ্তা, ওয়া লা- ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি আমার দ্বীনকে সংশোধিত-কল্যাণময় করুন, যাকে আপনি আমার রক্ষাকবজ বানিয়েছেন এবং আমার পার্থিব জীবনকে সংশোধিত করুন, যাতে আমার জীবন ও জীবিকা রয়েছে। হে আল্লাহ, আমি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আপনার সন্তুষ্টির নিকট, আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার নিকট এবং আপনার থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেন তা ঠেকানোর কেউ নেই। এবং আপনি যা প্রদান না করেন তা প্রদান করার ক্ষমতাও কারো নেই। এবং কোনো পারিশ্রমকারীর পরিশ্রম আপনার ইচ্ছার বাইরে তার কোনো উপকারে লাগে না।"

হযরত কা'ব বলেন : তাওরাতে আছে যে, হযরত দাউদ যখন সালাত শেষ করতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন। তখন হযরত সুহাইব (রা) বলেন:

إن رسول الله ﷺ كان يقـــولـــهن عند انصـــرافـــه من صلاته

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করার সময় এই দু'আ বলতেন।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।৪

অন্য একটি যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে :

كان ﷺ إذا صلى الصبح يرفع صوته حتى يسمع أصحابه يقول ... ثلاثاً

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ফজরের সালাত শেষ করতেন তখন জোরে শব্দ করে তাঁর সাহাবীগণকে শুনিয়ে এই দু'আটি তিন বার পাঠ করতেন।১

(১৪). যিক্র নং ৮৪ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم بك أحاول وبك أقاتل وبك أصاول

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বিকা উ'হা-বিলু, ওয়াবিকা উক্বা-তিলু, ওয়াবিকা উসা-বিলু।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার সাহায্যেই চেষ্টা করি, আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করি এবং আপনার সাহায্যে বীরত্ব প্রদর্শন করি ও বিজয়ী হই।"

হযরত সুহাইব (রা) বলেন :

كان رسول الله ﷺ إذا صلى همس شيئا [حرك شفتيه] لا نفهمه

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাত আদায় করতেন তখন তিনি ঠোঁট নাড়তেন বা বিড়বিড় করে কিছু বলতেন যা আমরা বুঝতাম না। তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করলে তিনি এই বলেন যে, তিনি এই দু'আটি পাঠ করেন। অন্য বর্ণনায় :

كان أيام حنين يحرك شفتيه بشيء بعد صلاة الفجر

"তিনি হুনাইনের যুদ্ধের সময় ফজরের সালাতের পরে কিছু বলে তাঁর ঠোঁট নাড়াচ্ছিলেন।" সাহাবীগণ তাঁকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন তিনি এই দু'আটি পাঠ করছেন।২

(১৫). যিক্র নং ৮৫ : (সালাতের পরের দু'আ-১০০ বার)

اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم [التواب الغفور]

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্ফির লী, ওয়াতুব্ 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত তাওয়া-বুর রাহীম (অন্য বর্ণনায়: [তাওয়াবুল গাফূর]) ।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল করুণাময় (অন্য বর্ণনায়: তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল)।"

একজন আনসারী সাহাবী বলেন :

سمعت رسول الله ﷺ يقول في دبر الصلاة

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের পরে এই দু'আ বলতে শুনেছি ১০০ বার।"

এই হাদীসের দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে:

صلى رسول الله ﷺ الضحى [ركعتي الضحى]، ثم قال..

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দোহার বা চাশতের [দুই রাক'আত] সালাত আদায় করেন। এরপর এই দু'আ ১০০ বার পাঠ করেন।

দুটি বর্ণনাই সহীহ। প্রথম বর্ণনা অনুসারে সকল সালাতের পরেই এই দু'আ মাসনূন বলে গণ্য হবে। তবে অন্তত 'সালাতুদ দোহার' পরে এই দু'আটি ১০০ বার পাঠ করার বিষয়ে সকল যাকিরের মনোযোগী হওয়া উচিত।৩

(১৬). যিক্র নং ৮৬ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্ফির্লী যুনূবী ওয়া খাত্বা-ইয়া-ইয়া কুল্লাহা, আল্লা-হুম্মা, আন'ইশ্নী, ওয়াজবুরনী, ওয়াহদিনী লিস্বা-লি'হিল আ'অ্মা-লি ওয়াল্ আখলা-ক, ইন্নাহু লা- ইয়াহদী লি স্বা-লি'হিহা-, ওয়ালা- ইয়াস্রিফু সাইয়িয়াহা ইল্লা- আনতা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি আমার সকল ভুল ও গোনাহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করুন, আমাকে পূর্ণ করুন এবং আমাকে উত্তম কর্ম ও আচরণের তাওফীক প্রদান করুন ; কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ উত্তম কর্ম ও ব্যবহারের পথে নিতে পারে না বা খারাপ কর্ম ও আচরণ থেকে রক্ষা করতে পারে না।"

হযরত আবু উমামা (রা) ও হযরত আবু আইউব (রা) বলেন : "ফরয ও নফল যে কোনো সালাতে তোমাদের নবীর (ﷺ) কাছে যখনই গিয়েছি, তখনই শুনেছি তিনি সালাত শেষে ঘুরার বা উঠার সময় এই দু'আটি বলেছেন।" হাফিয হাইসামী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।৪

(১৭). যিক্র নং ৮৭ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم أصلح لي ديني ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আস্বলি'হ লী দ্বীনী, ওয়া ওয়াস্সি'য় লী ফী দা-রী ওয়া বা-রিক লী ফী রিযকী।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি আমার ধর্মজীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে দিন, আমার বাড়িকে প্রশস্ত করে দিন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন ।"

হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওযুর পানি এনে দিলাম । তখন তিনি ওযু করেন, সালাত আদায় করেন এবং তিনি এই দু'আ পাঠ করেন । হাইসামী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন ।১

(১৮). যিক্র নং ৮৮ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حر النار وعذاب القبر

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বা জিবরীলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইসরা-ফীলা, আ'ইয্নী মিন হার্রিন না-রি ওয়া 'আযা-বিল ক্বাব্রি ।

অর্থ : "হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, আমাকে জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন ।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের শেষে সর্বদা এই দু'আ করতেন । হাইসামী ভাষ্যমতে হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ।২

(১৯). যিক্র নং ৮৯ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم إني أسألك من الخير كله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلـــه، مـــا علمـــت منه وما لم أعلم

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্আলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী, মা- 'আলিমতু মিনহু ওয়া মা- লা- আ'অ্লাম । ওয়া আ'উযু বিকা মিনাশ শাররি কুল্লিহী, মা- 'আলিমতু মিনহু ওয়া মা- লা- আ'অ্লাম ।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমার জানা ও অজানা সকল প্রকার কল্যাণ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি । এবং আমার জানা ও অজানা সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।"

হযরত জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন, "আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছেন । এরপর যখন সালাম ফেরালেন, সালামের পরে এই দু'আ বললেন ।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ।৩

(২০). যিক্র নং ৯০ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والذل والصغار والفواحش ما ظهـــر منهـــا وما بطن

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল 'হাযান, ওয়াল 'আজ্যি ওয়াল কাসাল, ওয়ায্ যুল্লি ওয়াস স্বাগা-র ওয়াল ফাওয়া-হিশা মা- যাহারা মিনহা- ওয়ামা- বাত্বান ।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি – দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা থেকে, বেদনা ও হতাশা থেকে, অক্ষমতা থেকে, অলসতা থেকে, অপমান থেকে, নীচতা থেকে, প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা থেকে ।"

ইবনু মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত শেষে আমাদের দিকে তাঁর আলোকিত চেহারা মুবারক ফিরিয়ে ঘুরে বসে এই দু'আ বলতেন । তিনি এত বেশি বার তা বলেছেন যে, আমরা তা শিখে নিয়েছি, যদিও তিনি আমাদেরকে তা শেখাননি ।" হাদীসটি তাবারানী তার "কিতাবুদ দু'আ"-য় সংকলন করেছেন । অন্য কোনো গন্থে এই হাদীসটি আমি দেখিনি । ইবনু হিব্বানের আলোচনা অনুযায়ী হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছে । আল্লাহই ভালো জানেন ।৪

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে যিক্র ও দু'আ সম্পর্কে সহীহ ও হাসান হাদীসগুলি লিখলাম । এ বিষয়ে দু'একটি দুর্বল হাদীস উল্লেখ করছি :

(২১). যিক্র নং ৯১ : সূরা ইখলাস ১০ বার

একটি অত্যন্ত যয়ীফ সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈমানসহ প্রত্যেক ফরয সালাতের পরেই ১০ বার সূরা ইখলাস (কুল হুআল্লাহু আহাদ্ ...) পাঠ করবে আল্লাহ তাঁকে অপরিমেয় পুরস্কার প্রদান করবেন ।"৫

তবে অন্য একটি সহীহ হাদীসে হযরত মু'আয ইবনু আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من قـــرأ [قل هو الله أحد] عشـــر مـــرات بـــنى الله له بيـــتا في الجنة

"যে ব্যক্তি ১০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানিয়ে রাখবেন ।"৬ এখানে ১০ বার সূরাটি

পাঠের কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়নি। এজন্য যাকির কোনো সময়ে এই ওযীফাটি পালন করতে পারেন।

(২২). যিক্‌র নং ৯২ : (সালাতের পরের দু'আ)

যাইদ ইবনু আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের পরে বলতেন:

اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض [رب السماوات والأرض] الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনিই প্রভু। আপনি একক। আপনার কোনো শরীক নেই। হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ আপনার বান্দা এবং রাসূল। হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, সকল বান্দা পরস্পর ভাই ভাই। হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিক্ষণে ও সকল মুহূর্তে আপনার জন্য মুখলিস ও আন্তরিক বানিয়ে দিন। হে মহাপরাক্রম ও সম্মানের অধিকারী, আপনি শুনুন এবং কবুল করুন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ, আসমান ও জমিনের আলো (অন্য বর্ণনায় : আসমান ও জমিনের প্রভু) আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।১

(২৩). যিক্‌র নং ৯৩ : (সালাতের পরের যিক্‌র)

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين

অর্থ : "পবিত্রতা আপনার প্রভুর, প্ররাক্রমের প্রভুর, তারা যা বলে তা থেকে (তিনি পবিত্র) এবং সালাম (শান্তি) প্রেরিত পুরুষগণের (রাসূলগণের) উপর এবং প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহর জন্য।"

যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো সালাতের শেষে, সালামের পূর্বে বা পরে এই আয়াতটি পাঠ করেছেন বা করতে উৎসাহ দিয়েছেন।২

(২৪). যিক্‌র নং ৯৪ : (সালাতের পরের দু'আ)

أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। হে আল্লাহ, আপনি আমার দুশ্চিন্তা ও বেদনা দূর করে দিন।"

একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করার পরে তাঁর ডান হাত দিয়ে তাঁর মাথা মুছতেন, অন্য বর্ণনায় তিনি ডান হাত দিয়ে তাঁর কপাল মুছতেন এবং এই দু'আ পাঠ করতেন।৩

(২৫). যিক্‌র নং ৯৫ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি আমার শেষ জীবনকে আমার জীবনের সর্বোত্তম অংশ, আমার শেষ কর্মগুলিকে জীবনের সর্বোত্তম কর্ম এবং যে দিন আমি আপনার সাক্ষাত করব সেই দিনটিকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন করে দিন।"

আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঠিক পিছনে দাঁড়াতাম। তিনি সালামের পরে এ কথাগুলি বলতেন। হাদীসটির সনদ যয়ীফ।৪

(২৬). যিক্‌র নং ৯৬ : (সালাতের পরের দু'আ)

اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزيني اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني اللهم إني أعوذ بك من صاحب يرديني اللهم إني أعوذ بك من أمر يلهيني اللهم إني أعوذ بك من فقر ينسيني

অর্থ: "হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন কর্ম থেকে যা আমাকে অপমানিত করবে। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরূপ ধনাঢ্যতা থেকে যা আমাকে অহংকারী করে তুলবে। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরূপ বন্ধু বা সঙ্গী থেকে যে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এরূপ সকল বিষয় থেকে যা আমাকে অপ্রয়োজনে ব্যস্ত করে তুলবে। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এরূপ দারিদ্রতা থেকে যা আমাকে (আপনার কথা) ভুলিয়ে দেবে।"

হযরত আনাস (রা) বলেন :

كان رسول الله ﷺ إذا صلى بأصحابه أقبل على القوم [بوجهه] فقال.. [ما صلى بنا صلاة مكتوبة قط إلا قال حين أقبل علينا بوجهه]

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন তখন সালাত শেষে তাঁদের দিকে ঘুরে বসে এই দু'আ বলতেন।" অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোনো ফরয সালাত পড়তেন, সালাত শেষে আমাদের দিকে ঘুরে এই দু'আ পাঠ করতেন।" হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল।১

এতক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ ও যয়ীফ সনদে বর্ণিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পালনীয় যিক্‌রগুলি আলোচনা করেছি। সাহাবীগণ এগুলি পালন করতেন। এছাড়া কিছু যিক্‌র ও দু'আ সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা তাঁরা পালন করতেন। সম্ভবত তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শিখে তা পালন করতেন। তবে এ সকল হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে তাঁরা এগুলি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। সর্বাবস্থায় সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসরণীয়। এখানে এরূপ কয়েকটি যিক্‌র উল্লেখ করছি।

(২৭). যিক্‌র নং ৯৭ : (সালাতের পরের দু'আ)

তাবেয়ী রাবীয় ইবনু আমীলাহ বলেন, উমার (রা) সালাত শেষে ঘুরে বলতেন:

اللهم استغفرك لذنبي وأستهديك لأرشد أمري وأتوب إليك فتب علي اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك واجعل غنائي في صدري وبارك لي فيما رزقتني وتقبل مني انك أنت ربي

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আস্‌তাগ্‌ফিরুকা লিযামবি, ওয়া আসতাহ্‌দীকা লি আরশাদি আমরি, ওয়া আতূবু ইলাইকা, ফাতুব 'আলাইয়্যা। আল্লা-হুম্মা আনতা রাব্বী, ফাজ্‌'আল রাগ্‌বাতী ইলাইকা, ওয়াজ্‌'আল গিনা-ঈ ফী স্বাদরী, ওয়া বা-রিক লী ফীমা- রাযাক্বতানী, ওয়া তাক্বাব্বাল মিন্নী। ইন্নাকা আনতা রাব্বী।

অর্থ :"হে আল্লাহ, আমি আমার গোনাহের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা (মাগফিরাত) প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করছি, আমি যেন সকল কাজে সর্বোত্তম কর্মটি বেছে নিতে পারি। আমি আপনার কাছে তাওবা করছি, আপনি আমার তাওবা কবুল করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি আমার চাওয়া পাওয়াকে আপনার-মুখী বানিয়ে দিন এবং আমার বক্ষের মধ্যে আমার ধনাঢ্যতা প্রদান করুন (আমার অন্তরকে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিন), আপনি আমাকে যে রিযিক প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন এবং আমার (কর্ম ও দু'আ) কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি আমার প্রভু।" হাদীসটি সহীহ।২

(২৮). যিক্‌র নং ৯৮ : (সালাতের পরের দু'আ)

হযরত আবু দারদা (রা) সালাত শেষ করে বলতেন :

بحمد ربي أنصرفت وبذنوبي أعترفت أعوذ بربي من شر ما اقترفت يا مقلب القلوب قلب قلبي على ما تحب وترضى

অর্থ : "আমার প্রভুর প্রশংসায় আমি সালাত শেষ করলাম। আমি আমার গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করছি। আর আমি যে কর্ম করেছি তার অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে আমি আমার প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে মন পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণকারী, আমার অন্তরকে পরিবর্তন করুন সেই বিষয়ের জন্য যা আপনি ভালবাসেন এবং যাতে আপনি খুশি হন।"৩

(২৯). যিক্‌র নং ৯৯ : (সালাতের পরের দু'আ)

যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে, ইবনু মাস'ঊদ (রা) সালাত শেষে বলতেন:

اللهم إني أسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم إني أسألك الفوز بالجنة والجواز من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনার রহমত লাভের নিশ্চিত কারণগুলি ও আপনার ক্ষমা লাভের নিশ্চিত বিষয়গুলি। আমি আপনার কাছে সকল নেক কাজের সম্পদ (নেক কাজ করার তাওফীক) ও সকল পাপ থেকে নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই – জান্নাত লাভের বিজয় ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ। হে আল্লাহ, আমাদের কোনো গোনাহ আপনি বাকি রেখেন না, সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন, কোনো দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা বাকি রেখেন না, সকল দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা আপনি দূর করে দিন এবং কোনো হাজত আপনি বাকি রেখেন না, সব হাজত আপনি পূরণ করে দিন।"

এই দু'আটি মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সাধারণ দু'আ হিসাবে বর্ণিত। ইবনু মাস'ঊদ (রা) তা সালাতের শেষে বা সালামের পরে পড়তেন বলে এই দুর্বল সনদের হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহই ভালো জানেন।৪

সালাতের পরে যিক্‌র-মুনাজাত আদায়ের মাসনূন পদ্ধতি

(১). আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরে অনেক মাসনূন যিক্র ও দু'আ রয়েছে, যেগুলি পালনের জন্য সকল মুসলিমের চেষ্টা করা উচিত। উপরের ঊনত্রিশটি যিক্রের মধ্যে কিছু রয়েছে শুধু যিক্র এবং কিছু দু'আ মিশ্রিত যিক্র। আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সকল যিক্র ও দু'আই মুনাজাত বা আল্লাহর সাথে চুপিচুপি কথা বলা। সকল মুসলিমের উচিত এসকল মুনাজাত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মনোযোগ, আন্তরিকতা ও আবেগের সাথে পালন করা। আরবী মুনাজাতগুলি মুখস্থ করা সম্ভব না হলে অন্তত সেগুলির মর্ম আমরা বাংলায় বলে মুনাজাত করব। আমাকে আমার জন্য চাইতে হবে। হৃদয় ও মন সমর্পণ করে আবেগ দিয়ে।

(২). উপরের যিক্র ও দু'আগুলির বিষয়ে স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলি সর্বদা একত্রে পাঠ করতেন না। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যিক্র পাঠ করেছেন। কখনো কখনো তিনি সালামের পরেই উঠে চলে গিয়েছেন। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, সাধারণত ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পরে তিনি কিছু যিক্র ও দু'আ পাঠ করতেন। আমাদের উচিত সুযোগ ও সময় অনুসারে এগুলির মধ্য থেকে কিছু বা সব যিক্র ও দু'আ পালন করা।

(৩). এসকল যিক্র ও দু'আ তিনি সাহাবীগণের দিকে ঘুরে বসার পরে পাঠ করতেন বলে কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখতে পেয়েছি। আবার কোনো কোনো হাদীসে সালাতের পরেই পাঠ করেছেন বলে বলা হয়েছে ; ঘুরে বসার পরে না আগে তা বলা হয়নি। বিষয়টি ইমামের সাথে সম্পৃক্ত। মুক্তাদীগণ সর্বাবস্থায় সালাতের পরে বসে বসে যিক্র ও দু'আগুলি পালন করবেন। ফজর ও আসরের সালাতের পরে ইমাম ঘুরে বসে যিক্র ও দু'আগুলি পালন করবেন। যোহর, মাগরিব ও ইশা'র সালাতের পরে ইমাম কী করবেন তা নিয়ে ইসলামের প্রসিদ্ধ ফকীহ, ইমাম ও আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ (রহ) ও অন্যান্য ইমামের মতানুসারে সকল সালাতের পরেই ইমাম "আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" বলা পর্যন্ত কিবলামুখী বসে থাকবেন। এরপরই ঘুরে বসে অন্যান্য যিক্র ওযীফা আদায় করবেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও অন্যান্য ইমামের মতে যে সালাতের পরে সুন্নাত সালাত আছে সেসকল সালাতের পরে ইমাম উঠে ঘরে চলে যাবেন বা মসজিদের অন্য কোনো স্থানে সুন্নাত আদায় করবেন। এরপর অন্যান্য যিক্র আদায় করবেন। ইমাম আবু হানীফার (রহ) মতানুসারে মুক্তাদীগণের জন্য যোহর, মাগরিব ও ইশা'র পরে দুটি বিকল্প রয়েছে: তাঁরা বসে সকল যিক্র ওযীফা পালনের পর সুন্নাত পড়তে পারেন, অথবা সুন্নাত আদায়ের পরে যিক্র ওযীফা পালন করতে পারেন।[১]

কোনো কোনো হানাফী আলিম উল্লেখ করেছেন যে, যে সকল ফরয সালাতের পরে সুন্নাত আছে সেসকল সালাতের পরেও ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্যই সুন্নাতের আগে মাসনূন যিক্রগুলি আদায় করে নেওয়া যাবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই।[২] ইমাম যদি সুন্নাতের আগে মাসনূন যিক্রগুলি পালন করেন তাহলে তাঁর উচিৎ কিবলা থেকে ঘুরে বসা বা সালাতের স্থান থেকে সরে বসা। কারণ, আমরা ইতঃপূবে দেখেছি যে, সালাম ফিরানোর পরে ইমামের জন্য কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা হানাফী মযহাবে বিদ'আত ও না-জায়েয বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

(৪). এসকল যিক্র ও অন্যান্য সকল যিক্রের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাধারণ সুন্নাত মনে মনে বা খুবই নিচুস্বরে বা বিড়বিড় করে তা পাঠ করা। তবে সালাতের পরের তাসবীহ, তাকবীর ও যিক্রের ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা শব্দ করে পাঠ করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই। আমরা উপরের হাদীসগুলিতে দেখেছি যে, কখনো কখনো তিনি ঠোঁট নেড়ে বা বিড়বিড় করে এমনভাবে দু'আ ও যিক্রগুলি পাঠ করেছেন যে, নিকটের সাহাবীগণও বুঝতে পারেননি। তাঁরা প্রশ্ন করে দু'আর শব্দ জেনে নিয়েছেন। কখনো কখনো নিকটবর্তী বা একেবারে কাছে বসে যে সাহাবী সালাত আদায় করেছেন তিনি দু'আ বা যিক্রের শব্দটি শুনতে পেয়েছেন। আবার কোনো কোনো দু'আ সাহাবীগণ শুনতে পান এরূপ শব্দে তিনি বলেছেন।

অন্য হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়ে ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদীগণ সকলেই মৃদু শব্দ করে যিক্র ও তাকবীর পাঠ করতেন। ইবনু আব্বাস (রা) সে সময়ে খুব অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি সাধারণত জামাতে শরীক হতেন না। মুসল্লীগণের সমবেত তাকবীরের শব্দে তিনি বুঝতে পারতেন যে, সালাত শেষ হয়েছে। যেমন, আমাদের সময়ে কুরবানির ঈদের দিনগুলিতে আমরা জামাতের সালাতে সালাম ফেরানো পরে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সামান্য উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করি, যাতে মসজিদের বাইরে অবস্থানরত কিশোরগণ সালাত শেষ হয়েছে বলে বুঝতে পারে। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন:

رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي ﷺ وقال بن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته... أعرف انقضاء صلاة النبي ﷺ بالتكبير

"নবীয়ে আকরাম ﷺ-এর যুগে ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে উচ্চৈঃস্বরে যিক্র করার প্রচলন ছিল। যিক্রের শব্দ শুনেই আমি বুঝতে পারতাম যে সালাত শেষ হয়েছে।" অন্য বর্ণনায়: "আমি তাকবীরের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারতাম যে সালাতের জামা'আত শেষ হয়েছে।"[৩]

এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সালাতের পরের তাকবীর, তাহলীল ইত্যাদি যিক্র কিছুটা শব্দ করে পাঠ করতেন। এ সকল হাদীসের আলোকে কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, সালাতের পরের তাকবীরগুলি সামান্য জোরে বলা সুন্নাত।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফি'য়ী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ অনুসরণীয় ইমাম (রাহ) একমত হয়েছেন যে, সকল প্রকার যিক্র ও দু'আর ন্যায় এ সকল যিক্র মনে মনে বা অত্যন্ত নিচুস্বরে পাঠ করাই সুন্নাত। কারণ, অন্যান্য হাদীসে জোরে যিক্র করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আস্তে যিক্রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সকল হাদীসের আলোকে তাঁরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা প্রদানের জন্য মাঝে মাঝে

কোনো কোনো যিক্‌র শব্দ করে উচ্চারণ করতেন। যেমন, তিনি যোহর ও আসর সালাতের কিরাআত ও সালাতের কোনো কোনো যিক্‌র ও দু'আ মাঝে মাঝে একটু জোরে উচ্চারণ করতেন শিক্ষা প্রদানের জন্য। এখানে জোরে বলার উদ্দেশ্য মূল যিক্‌র শিক্ষা দেওয়া, জোরে বলা শিক্ষা দেওয়া নয়। কাজেই, সকল হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরের যিক্‌রগুলি মনে মনে পালন করাই সুন্নাত। তবে কখনো যদি ইমাম মুক্তাদীগণকে শিক্ষা প্রদানের জন্য দুই একদিন জোরে পাঠ করেন তাহলে দোষ হবে না। নিয়মিত বা সাধারণভাবে জোরে বা শব্দ করে এ সকল যিক্‌র আদায় করা মাকরুহ বা নিষিদ্ধ। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) এ বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করেছেন।

ইমামগণের এই কড়াকড়ির কারণ, সাহাবী-তাবেয়ীগণ এ সকল যিক্‌রকে চুপেচুপে করাকেই সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। জোরে বলাকে তারা বিদ'আত মনে করতেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আবুল বাখতারী সাঈদ ইবনু ফাইরোয (৮৩ হি) বলেন, মুস'আব যুবাইরী ইমামরূপে সালাত শেষ করার পরে জোরে বলেন :

لا إلـــه ألا الله، والله أكـــبـــر

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার)। তখন তাবেয়ী শ্রেষ্ঠ হযরত আবীদাহ ইবনু আমর আস-সালমানী (৭০ হি), যিনি মসজিদে ছিলেন, বলেন:

قـــاتـــلـــه الله! نـــعـــار بالـــبـــدع

"আল্লাহ একে ধ্বংস করুন! বিদ'আতের জয়ধ্বনি দিচ্ছে।"১

সম্মানিত পাঠক, একটু ভেবে দেখুন! এই ইমাম কিন্তু মাসনূন যিক্‌র পাঠ করেছেন। তবুও তাবেয়ীগণ সুন্নাতের সামান্য ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারতেন না। আমাদের যুগের বিভিন্ন আলিম হয়ত শতাধিক অকাট্য দলিল পেশ করবেন যে, এই যিক্‌রটি মাসনূন এবং জোরে যিক্‌র জায়েয বা মুস্তাহাব। কাজেই, এভাবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার" – বলতে যে নিষেধ করে সে কাফির !!

কিন্তু সাহাবী-তাবেয়ীগণের নিকট এ সকল অকাট্য দলিলের কোনো মূল্য ছিল না। তাঁদের নিকট একমাত্র মূল্য সুন্নাতের। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যখন যেভাবে যিক্‌র করেছেন তার কোনোরূপ ব্যতিক্রম তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না।

(৫). উপরের হাদীসগুলি ও অনুরূপ সহীহ ও যয়ীফ সকল হাদীস থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল দু'আ-মুনাজাত পাঠের সময় কখনো হাত তুলতেন না। সালাতের পরে বসে বা সাহাবীগণের দিকে ঘুরে বসে এ সকল যিক্‌র ও দু'আ-মুনাজাত তিনি পাঠ করতেন। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন হাদীসে তিনি দু'আর সময় দুই হাত উঠানোর ফযীলত বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো দু'আর সময় তিনি হাত তুলেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেখানেই তিনি দু'আর সময় হাত তুলেছেন, সেখানেই সাহাবীগণ হাত উঠানোর বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি সালাতের পরে দু'আ বা মুনাজাতের সময় হাত তুলেছেন বলে একটি হাদীসও আমি খুঁজে পাইনি। সাহাবীগণও সালাতের পরে যিক্‌র, দু'আ ও মুনাজাত করতেন। তাঁরাও কখনো এ সময়ে হাত তুলে দু'আ বা মুনাযাত আদায় করেছেন বলে কোথাও একটি বর্ণনাও আমি দেখতে পাইনি।

সাধারণভাবে দু'আর জন্য দুহাত তুলে দু'আ করা একটি মাসনূন আদব। সালাতের পরে দু'আর জন্য হাত উঠানো না-জায়েয নয়। দু'আর সময় হাত উঠানোর ফযীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে যিনি এই ফযীলত বর্ণনা করেছেন, তিনিই এই সময়ে হাত উঠানো বর্জন করেছেন। এজন্য এ সময়ে সর্বদা হাত তুলে দু'আ করলে তাঁর রীতির বিপরীত রীতি হয়ে যাবে। অথবা এ সময়ে হাত না তুলে দু'আ করার চেয়ে হাত তুলে দু'আ করাকে উত্তম মনে করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতিকে হেয় করার পর্যায়ে চলে যাবে। এজন্য আবেগ ও অবস্থার উপর নির্ভর করে কখনো হাত তোলা এবং কখনো হাত না তুলেই স্বাভাবিক অবস্থায় বসে মুখে দু'আ-মুনাজাতগুলি পাঠ করা উত্তম বলে মনে হয়।

(৬). উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ কখনোই এ সকল যিক্‌র ও দু'আ জামাতবদ্ধভাবে বা সম্মিলিতভাবে আদায় করেননি। প্রত্যেকে যার যার মতো তা পাঠ করেছেন।

(৭) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামায পরবর্তী মুনাজাতগুলিতে আরো লক্ষণীয় যে, এ সকল মুনাজাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আমার', আমাকে' ইত্যাদি বলে, অর্থাৎ 'উত্তম পুরুষের একবচন' (واحد مـــتكلم) ব্যবহার করে শুধুমাত্র নিজের জন্য প্রার্থনা করেছেন। কাউকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে দু'আ করলে 'আমাদের', 'আমাদেরকে' ইত্যাদি বহুবচন ব্যবহার করা সকল ভাষার ন্যূনতম দাবি। একাকী মুনাজাত করার সময় এক বচন বা 'বহু বচন' উভয়ই ব্যবহার করা চলে। যে কেউ একাকী মুনাজাতের সময় বলতে পারেন 'আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন।' তবে সমবেত মুনাজাতের সময় 'এক বচন' ব্যবহার অসম্ভব। কারো সাথে একত্রে দু'আ করার সময় যদি কেউ 'আমি', 'আমার', 'আমাকে' ইত্যাদি একবচন ব্যাবাহার করেন তবে তা অশোভনীয় এবং একজন শিশু আরবও তার কথায় 'আমীন' বলবে না। কারণ তার অর্থ হবে, ইমাম বলছেন 'আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন' এবং মুক্তাদি বলছেন, হাঁ, হে আল্লাহ, আপনি ইমাম সাহেবকে ক্ষমা করুন'।

এছাড়া মুক্তাদিদের নিয়ে দু'আ করলে শুধু নিজের জন্য দু'আ করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لا يحل لإمرئ...ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونـهم فإن فعل فقد خانـهم

"কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, ... সে কিছু মানুষের ইমামতি করবে, অথচ তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য দু'আ

করবে। যদি সে তা করে তবে সে তাদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করল বা খিয়ানত করল।"১

আবূ উমামার (রা) সূত্রে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لا يؤمن أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم

"তোমাদের কেউ যদি ইমাম হয় তবে সে যেন কখনো তাদেরকে (মুক্তাদিগণকে) বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য খাস করে দু'আ না করে। যদি সে তা করে তবে সে তাদের খিয়ানত করল।"২

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যদি ইমাম তার ইমামতির মধ্যে দু'আ করেন বা দু'আতেও ইমামতি করেন, তবে শুধুমাত্র তার একার জন্য দু'আ করবেন না, বরং সকলের জন্য দু'আ করবেন। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, নামাযের মধ্যে মুক্তাদিদের নিয়ে আদায় কৃত 'কুনুতের দু'আয়, খুতবার মধ্যে দু'আয়, 'মাজলিসের দু'আয়' ও অন্যান্য সমবেত দু'আয়, এমনকি সালাতের মধ্যে সালামের আগের দু'আয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আমরা', 'আমাদের', 'আমাদেরকে' ইত্যাদি 'বহুবচন' ব্যবহার করেছেন ও করতে শিক্ষা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে নামাযের পরের দু'আগুলিতে তিনি 'আমি', 'আমাকে' ইত্যাদি একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, এ সকল মুনাজাত তিনি একান্তভাবে একাকীই করেছেন।

এক্ষেত্রে মূল বিষয় মুনাজাত বা যিক্র ও দু'আ। আর মুনাজাতের প্রাণ মনোযোগ ও আবেগ। হাত উঠানো বা না উঠানো, জোরে বা আস্তে, সমবেত বা একাকী ইত্যাদি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। আমরা অনেকেই গতানুগতিকভাবে সবার সাথে দু'হাত উঠাই এবং নামাই, হয়ত কিছুই বলি না, অথবা না বুঝে কিছু আউড়াই, অথবা ইমাম তার নিজের জন্য দু'আ চান এবং আমার আমিন বলি। এগুলি সবই যিক্র ও মুনাজাতের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা অপ্রয়োজনীয় বা অত্যন্ত কম প্রয়োজনীয় গুরুত্বহীন অসার আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব প্রদান করি, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে অবহেলা করি।

তৃতীয় প্রকার যিক্র : সকাল-বিকাল বা সকাল-সন্ধ্যার যিক্র

ফজরের সালাতের পরে যে সকল নির্ধারিত মাসনূন যিক্র আদায় করতে হবে তন্মধ্যে তৃতীয় প্রকার যিক্র যা রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে ও বিকালে বা সকালে ও সন্ধ্যায় আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রকার যিক্র ফজরের ফরয সালাতের আগে ও সুবহে সাদিকের পরে যে কোনো সময় পালন করা যায়। তবে সাধারণত মুমিন এই সময়েই যিক্রের জন্য বসেন বলে এখানে উল্লেখ করছি। এই পর্যায়ে ১৭টি যিক্র উল্লেখ করছি। তন্মধ্যে প্রথম যিক্রটি, যা অনেকগুলি যিক্রের সমষ্টি তা ফজর ও আসরের পরে আদায় করতে হবে। বাকিগুলো ফজর ও মাগরিবের পরে আদায় করতে হবে।

(১). যিক্র নং ১০০: চারটি মূল তাসবীহ একশতবার করে ৪০০বার :

১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০০ বার 'আল-হামদুলিল্লাহ', ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' ও ১০০ বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। ১০০ বার (লা ইলাহা ইল্লল্লাহু)-এর পরিবর্তে ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর' পড়া যাবে। ফজরের পরে ও আসরের পরে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে সে যেন একশতটি হজ্ব আদায় করল বা একশতটি উট আল্লাহর ওয়াস্তে দান করল। যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলল সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ১০০ টি ঘোড়ার পিঠে মুজাহিদ প্রেরণ করলো, অথবা আল্লাহর রাস্তায় ১০০ টি গাযওয়া বা অভিযানে শরীক হলো। আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলো, সে যেন ইসমাঈল বংশের একশত ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করলো। আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'আল্লাহু আকবার' বলল, ঐ দিনে তার চেয়ে বেশি আমল আর কেউ করতে পারবে না। তবে যদি কেউ তার সমান এই যিক্রগুলি পাঠ করে বা তার চেয়ে বেশি পাঠ করে তাহলে ভিন্ন কথা। (তাহলে সেই শুধু তার উপরে উঠতে পারবে।)

ইমাম নাসাঈর বর্ণনায় 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র পরিবর্তে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' ১০০ বার পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।৩

(২). যিক্র নং ১০১ : সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার (১ বার)

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাক্বতানী, ওয়াআনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা- 'আহদিকা ওয়াওয়া'অ্দিকা মাস তাতা'অ্তু। আ'উযু বিকা মিন শাররি মা- স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়াআবূউ লাকা বিযামবি। ফাগ্ফিরলী, ফাইন্নাহু লা- ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা।

আমি আপনার কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞার উপরে রয়েছি যতটুকু পেরেছি। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যে কর্ম করেছি তার অকল্যাণ থেকে। আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আপনি আমাকে যত নিয়ামত দান করেছেন তা-সহ এবং আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আমার পাপ-সহ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।"

শাদ্দাদ ইবনু আউস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "এই দু'আটি সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোওয়া,

ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالهـــا مـــن الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة

যে ব্যক্তি এই দু'আর অর্থের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে দিনের বেলায় তা পাঠ করবে সে যদি ঐ দিন সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতী হবে। আর যদি কেউ এই দু'আর অর্থে সুদৃঢ় একীন ও বিশ্বাস রেখে রাত্রে (সন্ধ্যায়) তা পাঠ করবে, সে যদি ঐ রাতেই সকালের আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতী হবে।"[১]

এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, এই দু'আর ক্ষেত্রে ও মাসনূন সকল দু'আর ক্ষেত্রে দু'আর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং দু'আ পাঠের সময় অর্থের দিকে মনোযোগ দিয়ে, হৃদয়কে অর্থের সাথে সাথে আলোড়িত করে দু'আ পাঠ করলেই আমরা এ সকল দু'আর পূর্ণ ফযীলত লাভ করতে পারব। আর যদি অর্থ না বুঝি, বা অর্থ বুঝা সত্ত্বেও অর্থের দিকে মনোযোগ না দিয়ে অভ্যাসমতো মুখস্থ পড়ে যাই, তাহলে আমরা এ সকল দু'আর ফযীলত ও উপকার পুরোপুরি লাভ করতে পারব না।

(৩). যিক্‌র নং ১০২ : আয়াতুল কুরসী- ১ বার।

উবাই ইবনু কা'ব (রা) বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বিন থেকে হেফাযতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত জ্বিন থেকে হেফাযতে থাকবে। হাদীসটি সহীহ।[২]

আমরা দেখেছি দ্বিতীয় প্রকারের যিক্‌রের মধ্যে আয়াতুল কুরসী রয়েছে। কাজেই, পৃথকভাবে তা পড়ার প্রয়োজন নেই। ফজরের সালাতের পরে একবার পাঠ করলেই যাকির সকালে পাঠের ফযীলত ও সালাতের পরে পাঠের ফযীলত, উভয় প্রকার ফযীলত লাভ করবেন ; ইন্‌শা আল্লাহ।

(৪). যিক্‌র নং ১০৩: (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ৩ বার করে।)

হযরত মু'আয ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء

"তুমি যদি সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে এই তিনটি সূরা পাঠ কর তবে তোমার আর কিছুরই দরকার হবে না।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

(৫). যিক্‌র নং ১০৪ : (পূর্বোক্ত ৫ ও ৭ নং যিক্‌র) ১০০/ ১০০০ বার:

'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' অথবা 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী'।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' বলে, তাহলে তার চেয়ে বেশি না বলে কেউ তার চেয়ে বেশি আমল নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হতে পারবে না।" অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, "ঐ ব্যক্তি গোনাহ যদি সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি হয়, তাহলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।" কোনো কোনো বর্ণনায় যিক্‌রের শব্দটি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'-র পরিবর্তে 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি সহীহ।[৪]

একটি যয়ীফ হাদীসে সকালে ১০০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পড়ার কথা আছে। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এই যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ১০০০ বার এই যিক্‌র পাঠ করবে সে ঐদিনের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে নিজেকে কিনে নিল। দিনের শেষ পর্যন্ত সে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি লাভ করল।[৫]

(৬). যিক্‌র নং ১০৫ : (তিন বার)

سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضى نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়াবি'হামদিহী, 'আদাদা খাল্‌ক্বিহী, ওয়ারিদ্বা- নাফ্‌সিহী, ওয়া যিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমাতিহী।

অর্থ: "পবিত্রতা আল্লাহর এবং প্রশংসা তাঁরই, তাঁর সৃষ্টির সম সংখ্যক, তার নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণে, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণে এবং তাঁর বাক্যের কালির সমপরিমাণ।"

উম্মুল মুমিনীন জুআইরিয়্যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতের পরে তাঁকে তাঁর সালাতের স্থানে যিক্‌র রত অবস্থায় দেখে

বেরিয়ে যান। এরপর তিনি অনেক বেলা হলে দুপুরের আগে ফিরে এসে দেখেন তিনি তখনও ঐ অবস্থায় তাসবিহ তাহলীলে রত রয়েছেন। তিনি বলেন : "তুমি কি আমার যাওয়ার সময় থেকে এই পর্যন্ত এভাবেই যিক্‌রে রত রয়েছ ?" তিনি বললেন: " হাঁ।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে চারটি বাক্য তিন বার করে বলেছি (উপরের বাক্যগুলি)। তুমি সকাল থেকে এই পর্যন্ত যত কিছু বলেছ সবকিছু একত্রে যে সাওয়াব হবে, এই বাক্যগুলির সাওয়াব সেই একই পরিমাণ হবে।"১

ইমাম তিরমিযী অনুরূপ ঘটনা উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। উক্ত বর্ণনায় সাফিয়্যাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে দেখেন আমার সামনে চার হাজার বিচি রয়েছে যা দিয়ে আমি তাসবীহ বা সুবহানাল্লাহর যিক্‌র করছি। তিনি বললেন : তুমি কি এতগুলির সব তাসবীহ পাঠ করেছ? আমি বললাম: " হাঁ।" তখন তিনি তাকে উপরের যিক্‌রের অনুরূপ বাক্য শিখিয়ে দেন।২

এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উপরের বাক্য চারটি তিনবার বলা এই দীর্ঘ সময়ব্যপী তাসবীহ, দু'আ ও কিরাআতের সমান সাওয়াবের। যিক্‌রের অর্থের প্রশস্ততা, ব্যপকতা ও গভীরতার কারণে এই সাওয়াব বৃদ্ধি। সর্বাবস্থায় মুমিনের অবসর ও ক্বালবী প্রস্তুতি থাকলে এ সকল যিক্‌রের সাথে সাথে অন্য সকল যিক্‌র এই সময় করবেন। এতে অতিরিক্ত সাওয়াব ছাড়াও মানসিক প্রশান্তি, বরকত ও সংঘাতময় কর্মজীবনে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় রাগ, হিংসা ও পাপের মধ্যে নিপতিত হওয়ার বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি অর্জিত হয়। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করে নিন।

(৭). যিক্‌র নং ১০৬ : দরুদ শরীফ ১০ বার

হযরত উম্মু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة

"যে ব্যক্তি সকালে দশ বার ও সন্ধ্যায় দশ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভ করবে। হাদীসটি সহীহ।"৩

যে কোনো শব্দে সালাত আদায় করা যেতে পারে। যেমন, –

اللهم صلِّ على محمد النبي الأمي وآله وسلم

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্ম সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ : "হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন উম্মী নবী মুহাম্মাদের উপর ও তাঁর বংশধর-অনুসারীদের উপর এবং আপনি সালামও প্রেরণ করুন।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক শেখানো সর্বোত্তম দরুদ 'দরুদে ইবরাহীমী'। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, প্রায় ১০ জন সাহাবী থেকে সহীহ সনদে 'দরুদে ইবরাহীমী' বর্ণিত হয়েছে। (২৩ নং যিক্‌র)

(৮). যিক্‌র নং ১০৭ : (সকাল-সন্ধ্যার যিক্‌র: ৩ বার)

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল লাযী লা- ইয়াদুরুরু মা'আ ইসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা- ফিস সামা-ই, ওয়া হুআস সামীউল 'আলীম।

অর্থ : "আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি), যাঁর নামের সাথে জমিনে বা আসমানে কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না।"

হযরত উসমান (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো বান্দা সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে এই দু'আটি পাঠ করে তবে ঐ দিনে ও ঐ রাতে কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।" হাদীসটি সহীহ।৪

(৯). যিক্‌র নং ১০৮ : (সকাল-সন্ধ্যার যিক্‌র: ৭ বার)

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লা-হু, লা- ইলাহা ইল্লা- হুআ, 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুআ রাব্বুল 'আরশিল আযীম।

অর্থ: "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, তিনি মহান আরশের প্রভু।"

হযরত উম্মু দারদা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ বার এই আয়াতটি পাঠ করবে আল্লাহ তাঁর সকল চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মিটিয়ে দেবেন।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।৫

(১০). যিক্‌র নং ১০৯ : (সকাল-সন্ধ্যার যিক্‌র: ৩ বার)

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا

উচ্চারণ: রাদীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলা-মি দীনান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যান।

অর্থ: "আমি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট ও খুশি

হয়েছি।”

মুনাইযির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সকালে এই বাক্যগুলি বলবে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করছি যে, তাঁর হাত ধরে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।” হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন।১

অন্য হাদীসে আবু সাল্লাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যদি কোনো ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় এই বাক্যগুলি বলে, তাহলে আল্লাহর উপর হক্ক (নিশ্চিত) হয়ে যায় যে, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট ও খুশি করবেন।” মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এই দু'আটি সকালে ৩ বার এবং বিকালে ৩ বার বলার নির্দেশ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইবনু আব্দিল বার, বুসীরী, হাইসামী প্রমুখ মুহাদ্দিস সনদটিকে সহীহ বলেছেন, বিশেষত মুসনাদে আহমাদের সনদ। কোনো কোনো আধুনিক মুহাদ্দিস ইবনু মাজাহর সনদকে যয়ীফ বলেছেন।২

একটি সহীহ হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من قال رضيت ... نبيا وجبت له الجنة

“যে ব্যক্তি (রাদীতু বিল্লাহি ...) বলবে তাঁর জন্য জান্নাত পাওনা হয়ে যাবে।” অন্য বর্ণনায় : “যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসাবে তুষ্ট থাকবে তাঁর জন্য জান্নাত পাওনা হয়ে যাবে।” এই হাদীসে এই বাক্যগুলি বলার জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সর্বদা বা যে কোনো সময় আমরা এই দু'আ পাঠ করতে পারব। যাকিরের উচিত সকালে ৩ বার এবং অন্যান্য সময়ে এই বাক্যগুলি বলা।৩

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, এই বাক্যগুলি বলার আরেকটি মাসনূন সময় আযানের সময়। প্রিয় পাঠক, উপরের এই বাক্যগুলি এখন মুমিনের সর্বদা বলা প্রয়োজন। একদিকে কাদীয়ানী, বাহাঈ ও অন্যান্য ভণ্ড নবীর কাফির উম্মতগণ – যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নবী হিসাবে পেয়ে তুষ্ট নয় – এরা উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে ঈমান বিধ্বংসী ফিত্না ছড়াচ্ছে। অপরদিকে পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলি আমাদের দেশের মানুষকে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে যথেষ্ট নয় বলে শেখাতে চেষ্টা করছে , অথবা অন্তত সব ধর্মই ঠিক এ কথা গেলাতে চেষ্টা করছে। এসময়ে আমাদের সর্বদা মুখে ও মনে এই বাক্যগুলি বলতে হবে।

<u>(১১). যিক্র নং ১১০: (সকালের যিক্র-১ বার)</u>

اللهم أني قد تصدقت بعرضي على عبادك

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী কাদ তাসাদ্দাকতু বি 'ইরদী 'আলা- 'ইবাদিকা।

অর্থ : “হে আল্লাহ, আমি আমার সম্মানকে আপনার বান্দাগণের জন্য দান করে দিলাম।” সকালে ১ বার।

তাবেয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু আজলান অথবা সাহাবী আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: “তোমরা কি আবু দামদামের মতো হতে পার না?” সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: “আবু দামদাম কে?” তিনি বলেন: “তোমাদের পূর্বের যুগের একজন মানুষ। তিনি প্রতিদিন সকালে এই বাক্যটি বলতেন।” অন্য বর্ণনায় : “তিনি বলতেন, আমাকে যে গালি দেয় আমি আমার সম্মান তাকে দান করে দিলাম।” (অর্থাৎ আমার সম্মান ইচ্ছামতো নষ্ট করার অধিকার আমি তাকে দিলাম) এরপর কেউ তাঁকে গালি দিলে তিনি তাকে কিছু বলতেন না। কেউ তাঁকে জুলুম করলে বা আঘাত করলে তিনি প্রতিশোধ নিতেন না। হাদীসটির সনদ সহীহ, তবে হাদীসটি মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।৪

প্রিয় পাঠক, আসুন আমরা সবাই আবু দামদামের মতো হতে চেষ্টা করি। যারা আমাদের গীবত করছেন, নিন্দা করছেন, গালি দিচ্ছেন তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দি। কী লাভ এগুলির প্রতিশোধ নিয়ে? অনেক অনেক ক্ষতি এগুলির জন্য রাগ বা হিংসা পুষে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রাখলে। আমরা ক্ষমা করি। তাহলে আমরা মহান প্রভুর ক্ষমা লাভ করব। মহান আল্লাহ কুরআনে আমাদের হৃদয়কে সকল বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে মুক্ত রাখতে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। ইরশাদ করা হয়েছে:

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

“হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আপনি মহা করুণাময় ও পরম দয়ার্দ্র।”

আসুন আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে এভাবে বারবার প্রার্থনা করে নিজেদের অন্তরগুলিকে সকল হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংবোধ থেকে পবিত্র করি।

প্রিয় পাঠক, নিজ অন্তরকে বিদ্বেষমুক্ত করলে আমরাই লাভবান হব। অন্তর হিংসার কঠিন ভার থেকে মুক্ত হবে, প্রশান্তি অনুভূত হবে, আল্লাহর যিক্রে মনোযোগ দিতে পারব, আল্লাহর রহমত, বরকত ও ক্ষমা লাভ করব এবং সর্বোপরি কম আমলেই জান্নাতের সুসংবাদ পেতে পারব। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ ও অন্যের অকল্যাণ চিন্ত থেকে পবিত্র রাখার অভাবনীয় সাওয়াবের কথা জানতে পেরেছি। আমরা দেখেছি যে, এভাবে হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও ঘৃণামুক্ত রাখা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সুন্নাত যা তিনি বিশেষভাবে পালন করার নির্দেশ

দিয়েছেন।

একটু চেষ্টা করলে আল্লাহর রহমতে আমরাও এই গুণ অর্জন করতে পারব। গালি শুনে, গীবতের কথা শুনে বা অন্য কোনো কারণে কারো বিরুদ্ধে মনের মধ্যে ক্রোধ, হিংসা বা বিদ্বেষ সঞ্চিত হলে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌রের মাধ্যমে মনকে যথাশীঘ্র শান্ত করার চেষ্টা করুন। কিছুটা শান্ত হওয়ার পরে নিজের জন্য ও উক্ত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রাণখুলে দোওয়া করুন, যেন আল্লাহ আপনাকে ও তাকে ক্ষমা করে দেন ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দেন। যেন আল্লাহ আপনাকে ও তাকে জান্নাতে একত্রিত করেন। যার বিরুদ্ধে রাগ বা বিদ্বেষ হয় তার জন্য দু'আ করুন অথবা তার বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিজের অন্তরকে পবিত্র করুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করুন ; আমীন।

(১২). যিক্‌র নং ১১১ : সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত (১ বার)

একটি দুর্বল সনদের অনির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি তিন বার বলবে :

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

"আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি" – এবং এরপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ তাঁর জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতাকে নিয়োজিত করবেন যারা তাঁর জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করবে। যদি সে ঐ দিনে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা বলবে সেও উপরিউক্ত মর্যাদা লাভ করবে।"

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সংকলিত করে হাদীসটির সনদ যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববীও দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন।১

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল-সন্ধ্যার যিক্‌রের মধ্যে অনেক দু'আ-মুনাজাত শিখিয়েছেন, যদ্দ্বারা মুমিন আল্লাহর কাছে নিজের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রার্থনা করবে। এগুলি সবই ১ বা ৩ বার করে পাঠ করার জন্য। তবে মুমিনের মনে আবেগ থাকলে এগুলি বারবার আউড়াতে পারেন। এই জাতীয় যিক্‌রের মধ্যে রয়েছে :

(১৩). যিক্‌র নং ১১২ : (সকাল-সন্ধ্যার দু'আ : ১ বার)

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

উচ্চারণ : ইয়া- হাইউ ইয়া কাইউমু, বিরাহমাতিকা আসতাগীসু, আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহু, ওয়া লা- তাকিলনী ইলা- নাফসী তারফাতা 'আইন।

অর্থ : "হে চিরঞ্জীব, হে মহারক্ষক ও অমুখাপেক্ষী তত্ত্বাবধায়ক, আপনার রহমতের ওসীলা দিয়ে ত্রাণ প্রর্থনা করছি। আপনি আমার সকল বিষয়কে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করুন। আর আমাকে একটি মুহূর্তের জন্যও, চোখের পলকের জন্যও আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না (সর্বদা আপনার তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখুন)।"

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা (রা)-কে বলেন, "আমি তোমাকে যে ওসীয়ত করছি তা গ্রহণ করতে তোমার অসুবিধা কি? আমি ওসীয়ত করছি যে, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় এই কথা বলবে।" হাদীসটি সহীহ।২

(১৪). যিক্‌র নং ১১৩ : (সকাল-সন্ধ্যার দু'আ : ৩ বার)

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা- 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা- 'আফিনী ফী সাম'য়ী, আল্লাহুম্মা-, 'আফিনী ফী বাসারী, লা- ইলাহা ইল্লা- আনতা। আল্লাহুম্মা- ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি, আল্লাহুম্মা-, ইন্নী আ'উযু বিকা মিন আযা-বিল কাবরি। লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমার দেহে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আমার শ্রবণযন্ত্রে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আমার দৃষ্টি শক্তিতে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন। আপনি ছাড়া কোনো মু'বুদ নেই। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট অবিশ্বাস ও দারিদ্র থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"

হযরত আবু বাকরা (রা) প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় উপরের দু'আগুলি ৩ বার করে পাঠ করতেন। তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন :

إني سمعت رسول الله ﷺ يدعو بهن فأنا أحب أن أستن بسنته

"আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দু'আগুলি বলতে শুনেছি। আমি তাঁরই সুন্নাত অনুসরণ করে চলতে পছন্দ করি।" হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।৩

(১৫). যিক্‌র নং ১১৪ : (সকাল-সন্ধ্যার দু'আ :১ বার)

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

উচ্চারণ: আসবা'হনা- ওয়া আসবা'হাল মুলকু লিল্লা-হ। আল'হামদু লিল্লা-হ। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু, লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল 'হামদু, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। রাব্বি, আসআলুকা খাইরা মা- ফী হা-যাল ইয়াওমি, ওয়া খাইরা মা- বা'দাহু। ওয়া আ'উযু বিকা মিন শার্‌রি মা- ফী হা-যাল ইয়াওমি, ওয়া শার্‌রি মা- বা'দাহু। রাব্বি, আ'উযু বিকা মিনাল কাসালি, ওয়া সূইল কিবার। ওয়া আ'উযু বিকা মিন 'আযা-বিন ফিন্না-রি, ওয়া 'আযা-বিন ফিল ক্বাব্‌র।

অর্থ: "সকাল হলো, আমাদের জীবনে, আমরা ও সকল বিশ্বরাজ্যে সবকিছু আল্লাহর জন্যই দিনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হে আমার প্রভু, আমি আপনার কাছে চাইছি এই দিবসের মধ্যে যত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে এবং এই দিবসের পরে যত কল্যাণ রয়েছে তা সবই। এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে যা এই দিবসের মধ্যে রয়েছে এবং এই দিবসের পরে রয়েছে। হে আমার প্রভু, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি অলসতা থেকে ও বার্ধক্যের খারাপি থেকে। হে আমার প্রভু, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে।"

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে ও সন্ধ্যায় উপরের দু'আটি বলতেন। সকালে উপরের মতো বলতেন। সন্ধ্যা (আসবাহনা) বা (সকাল হলো)-র স্থলে (আমসাইনা) বা (সন্ধ্যা হলো) বলতেন।১

(১৬). যিক্‌র নং ১১৫ : (সকাল-সন্ধ্যার দু'আ : ১ বার)

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি, ফা-তিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহু, আশহাদু আল্-লা ইলা-হা ইল্লা- আনতা, আ'উযু বিকা মিন শার্‌রি নাফসী, ওয়া মিন শার্‌রিশ শাইতা-নি ওয়া শিরকিহী, ওয়া আন আক্বতারিফা 'আলা- নাফসী সূআন আও আজুর্‌রাহু ইলা- মুসলিম)

অর্থ: "হে আল্লাহ, গোপন (গায়েব) ও প্রকাশ্য সকল জ্ঞানের অধিকারী, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, সকল কিছুর প্রভু ও মালিক, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার নিজের অকল্যাণ থেকে এবং শাইতানের অকল্যাণ ও তার শির্‌ক থেকে। আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আমি এমন কোনো কর্ম না করি যাতে আমার নিজের কোনো ক্ষতি বা অমঙ্গল হয়, অথবা কোনো মুসলমানের জীবনে ক্ষতি বা অমঙ্গল বয়ে আনে।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে বলেন, আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি সকালে ও সন্ধ্যায় বলব। তখন তিনি তাঁকে উপরের দু'আটি সকালে, সন্ধ্যায় ও বিছানায় শোয়ার পরে বলতে নির্দেশ দেন।২

(১৭). যিক্‌র নং ১১৬ : (সকাল-সন্ধ্যার দু'আ : ১ বার)

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়্যাতা ফিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ। আল্লাহুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আফ্‌ওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়্যাতা ফী দীনী ওয়া দুন্‌ইয়াই-য়া, ওয়া আহলী ওয়া মালী। আল্লা-হুম্মাস্-তুর 'আউরা-তী ওয়া আ-মিন রাউ'আ-তী। আল্লা-হুম্মাহ্ ফায্‌নী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমালী, ওয়া মিন ফাউক্বী। ওয়া আ'উযু বি'আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট চাই ক্ষমা ও সার্বিক সুস্থতা- নিরাপত্তা দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই ক্ষমা ও সার্বিক সুস্থতা-নিরাপত্তা আমার দ্বীনের মধ্যে, আমার দুনিয়াবী বিষয়ের মধ্যে, আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে ও আমার সম্পদের মধ্যে। হে আল্লাহ, আমার দোষক্রটিগুলি গোপন করুন এবং আমার ভয়ভীতিকে নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে হেফাযত করুন আমার সামনে থেকে, আমার পিছন থেকে, আমার ডান থেকে, আমার বাম থেকে, আমার উপর থেকে এবং আমি আপনার মহত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করছি যে, আমি আমার নি্ দিক থেকে আক্রান্ত হব।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺকখনোই সকাল হলে ও সন্ধ্যা হলে উপরের এই কথাগুলি বলতে ছাড়তেন না

(সর্বদা তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় এগুলি বলতেন) । হাদীসটি সহীহ ।১

সকালে ও সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (ﷺ) আরো অনেক দু'আ করতেন এবং অনেক দু'আ শিখিয়েছেন, যেগুলির ভাষা ও ভাব অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, আবেগময় এবং নবুয়্যতের নূরে ভরা । এসকল দু'আ মুমিনের কৃলবে অবর্ণনীয় প্রভাব বিস্তার করে । মুমিন তাঁর হৃদয় ভরে অনুভব করেন বরকত, রহমত ও প্রশান্তি ।

আরবী আমাদের জন্য বিদেশী ভাষা হওয়াতে আমাদের জন্য আরবী দোয়গুলি বিশুদ্ধভাবে অর্থসহ মুখস্থ করা একটু সময় ও শ্রম সাপেক্ষ বিষয় । আগ্রহ ও ভালবাসা থাকলে অবশ্য এতটুকু সময় ও শ্রম প্রদান করা কোনো সমস্যাই নয় । তবুও সাধারণ যাকির ও পাঠকগণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে আমি বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি না করে এখানেই এই পর্ব শেষ করছি । মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, উপরে যে সকল মাসনূন যিক্র উল্লেখ করলাম, সেগুলি পালন করার তাওফীক আমাকে ও পাঠকদেরকে দান করুন এবং দয়া করে কবুল করে নিন; আমীন ।

এ সময়ের অনির্ধারিত যিক্র

তাসবীহ, তাহলীল ও ওয়ায

ফজরের ফরয সালাতের পরে পালনীয় তিন পর্যায়ের নির্ধারিত যিক্র- আযকার উপরে আলোচনা করেছি । আমরা ফজরের পরে পালনের জন্য ৩ টি যিক্র, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পালনীয় ২৯ প্রকার যিক্র ও সকালে পালনীয় ১৭ প্রকার যিক্র, মোট ৪৯ প্রকার যিক্র উল্লেখ করেছি । আগ্রহী যাকির এগুলি সব বা আংশিক পালন করবেন । সংখ্যার চেয়ে আবেগ, মনোযোগ ও আন্তরিকতার মূল্য অনেক বেশি । এগুলি পালনের পরে মুমিন মনের আবেগ, আগ্রহ ও সুযোগ অনুসারের অনির্ধারিত যিক্র যত বেশি সম্ভব পালন করবেন ।

ফজরের পরে অনির্ধারিতভাবে যত বেশি সম্ভব তাসবীব, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীরের যিক্র আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ । এই অধ্যায়ের শুরুতে ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিক্রে রত থাকার ফযীলতের আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করেছি । আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে মহান আল্লাহর যিক্র, তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহমীদ (আল-'হামদলিল্লাহ), তাসবীহ (সুব'হানাল্লাহ) ও তাহলীল (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলা আমার নিকট ইসমাঈল (আ)-এর বংশের দুইজন বা আরো বেশি ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয় । অনুরূপভাবে আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এভাবে যিক্র করা আমার নিকট ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয় ।"

অন্য হাদীসে হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন :

خرج رسول الله ﷺ على قاص يقص فأمسك فقال رسول الله ﷺ قص فلأن أقعد (أقعد هذا المقعد) غدوة إلى أن تشرق الشمس (من حين تصلي الغداة إلى أن تشرق الشمس) أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب

"একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে দেখেন একজন ওয়ায়েয ওয়ায করছেন । তাঁকে দেখে ওয়াযকারী থেমে গেলেন । তিনি বললেন : তুমি বয়ান করতে থাক । ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এইরূপ একটি মাজলিসে বসা আমার নিকট চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয় । এবং আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এভাবে বসা আমার নিকট চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয় ।" হাইসামীর আলোচনা অনুসারে হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ।২

উপরের হাদীস দু'টি থেকে আমরা ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অনির্ধারিত যিক্রের বিবরণ পাচ্ছি । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সময়ে দুই প্রকারের যিক্রে অংশ গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন : (ক). তাসবীহ-তাহলীল বা চার প্রকার মূল জপমূলক যিক্র, এবং (খ). ওয়ায-আলোচনা ।

(ক). যিক্রের মূল চারটি বাক্য জপ করা

সুবাহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লহু আকবার, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর নাম জপ মূলক যিক্রের মূল চার প্রকার বাক্য, যেগুলি দ্বারা আল্লাহর মহত্ব, মর্যাদা, একত্ব ও প্রশংসা জপ করা হয় । অন্য সকল প্রকার মাসনূন যিক্রের বাক্য মূলত এগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত । এই চরটি বাক্য আল্লাহর নিকট প্রিয়তম বাক্য । পৃথকভাবে বা একত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা অনির্ধারিতভাবে যত বেশি সম্ভব এগুলি জপ করার অফুরন্ত মর্যাদা, সাওয়াব ও ফযীলত আমরা সেখানে জানতে পেরেছি ।

ফজরের সালাতের পরে 'সালাতুদ দোহা' বা চাশতের নামাযের প্রথম সময় পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা সময় । এছাড়া 'দোহা' বা চাশতের সালাত দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায় বলে যাকির সুযোগ থাকলে এই সময় বাড়াতে পারেন ।

যাকির প্রথমে উপরের তিন প্রকারের যিক্র আদায় করবেন । এরপর চাশ্ত বা দোহার সালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত বাকি সময়টুকু তিনি এই পর্যায়ের অনির্ধারিত যিক্রে রত থাকবেন । যথাসম্ভব মনোযোগ, আবেগ, বিনয়ের সাথে মনেমনে বা যথাসম্ভব মৃদুস্বরে যতক্ষণ সম্ভব এই চার প্রকার বাক্য দ্বারা একত্রে, বা পৃথকভাবে যিক্র করবেন । অন্তরকে সকল পার্থিব আকর্ষণ, জাগতিক চিন্তা ও ব্যস্ততা থেকে এই সময়টুকুর জন্য মুক্ত করে, আল্লাহর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে, যিক্রের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হৃদয়কে অর্থের সাথে আলোড়িত করে তিনি বারবার যিক্রের শব্দ উচ্চারণ করবেন: 'লা ইলাহা ইল্লল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ... । এভাবেই 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'আল-

হামদুলিল্লাহ'।

হৃদয়কে অবশ্যই নাড়াতে হবে। 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিক্রের সময় এর অর্থের দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ রাখতে হবে। হৃদয় থেকে আল্লাহ ছাড়া সকল অনুভূতি দূর করতে হবে। নেই, নেই, কেউ নেই, আমার ইবাদতের, প্রার্থনার, ভক্তির, ভয়ের, চাওয়ার, প্রার্থনার, আশার, ভয়ের জন্য কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।

এভাবে 'আল-হামদু লিল্লাহ' যিক্রের সময় মনকে সকল না-বাচক চিন্তা থেকে মুক্ত করে, আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে হৃদয়কে ভরে তুলে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বারবার বলতে হবে 'আল-হামদু লিল্লাহ'। 'সুবহানাল্লাহ' যিক্রের সময় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্বের দিকে হৃদয়কে পরিপূর্ণরূপে ধাবিত করতে হবে। সবকিছুই অসম্পূর্ণ; পরিপূর্ণ পবিত্রতা শুধুমাত্র আল্লাহর। সকল মানবীয় চিন্তার উর্ধ্বে তিনি মহান। আমার হৃদয় তাঁরই মহত্ত্বের ঘোষণা দেয়, তাঁরই পবিত্রতার জয়গান গায়। এভাবেই 'আল্লাহু আকবার' যিক্রের সময় মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। আর সবকিছুকে হৃদয় থেকে বের করে দিতে হবে। হৃদয়কে আলোড়িত, কম্পিত ও উদ্বেলিত করতে হবে যিক্রের অর্থের সাথে সাথে।

কখনো মনোযোগ পূর্ণ না হলে চিন্তিত না হয়ে যিক্রে রত থাকতে হবে। মনোযোগ ও আবেগের কম-বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে সর্বদা চেষ্টা করতে হবে পূর্ণতার জন্য।

(খ). কুরআন তিলাওয়াত, সালাত-সালাম ইত্যাদি

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, সাধারণ যিক্রের মধ্যে অন্যতম কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ-সালাম, দু'আ-ইস্তিগফার ইত্যাদি। এই সময়ে এ সকল যিক্র সময় ও সুবিধা অনুসারে করা যেতে পারে। যাকির নিজের সুবিধা ও অবস্থা অনুসারে এই সময়ের জন্য নির্ধারিত পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ পাঠ, ইস্তিগফার ইত্যাদি ওযীফা নির্ধারিত করে নেবেন বা সুযোগ থাকলে অনির্ধারিতভাবে তা পালন করবেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, হাদীস শরীফে এই সময়ে তাসবীহ তাহলীল জাতীয় যিক্রের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তিলাওয়াত, দরুদ ইত্যাদি যিক্রের কথা বলা হয়নি। অপরদিকে রাতের ওযীফার মধ্যে বেশি বেশি তিলাওয়াত ও দরুদ সালামের উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য অনেক তাবেয়ী সকাল-বিকালের যিক্রের সময়ে তাসবীহ তাহলীল জাতীয় যিক্রকে তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম বলে মনে করতেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ তাবে-তাবেয়ী ইমাম আব্দুর রাহমান ইবনু আমর, আবু আমর আল-আউযায়ীকে (মৃ. ১৫৭ হি) প্রশ্ন করা হয় : ফজর ও আসরের পরে যিক্রের সময়ে তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি জপমূলক যিক্র উত্তম না কুরআন তিলাওয়াত উত্তম ? তিনি বলেন : তাঁদের (সাহাবী-তাবেয়ীগণের) রীতি ছিল এ সময়ে যিক্রে রত থাকা। তবে তিলাওয়াত করাও ভালো।[১]

প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য প্রতিদিন কিছু পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করা। অন্তত একমাসে একবার খতম করা অর্থাৎ পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। যদি মুমিন বুঝতে পারেন যে, তিনি রাত্রে কিছু সময় তিলাওয়াতে কাটাতে পারবেন তাহলে সকালের এ সময়ে যিক্র করে রাতে তিলাওয়াত করা উচিত। না হলে এই সময়ের ওযীফার মধ্যে কিছু কুরআন তিলাওয়াত রাখা প্রয়োজন।

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয়: কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে নিয়মিত তিলাওয়াত ও নিয়মিত খতম করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসলিম কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন না। বেশি সূরা মুখস্থও নেই। যাদের পক্ষে সম্ভব হবে তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত শিখে নেবেন। না পারলে মুখস্থ সূরাগুলি বারবার তিলাওয়াত করতে পারেন।

আমাদের দেশে কুরআন কারীমের নির্দিষ্ট কতিপয় সূরার ফযীলতের কথা প্রসিদ্ধ। যেমন, – সূরা ইয়াসীন, সূরা রাহমান, সূরা মুলক, ইত্যাদি। এসকল ফযীলতের মধ্যে অল্প কিছু সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, বাকি অধিকাংশই দুর্বল, অথবা বানোয়াট, মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত কথা। সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের যে সকল মর্যাদা ও ফযীলত আমরা সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছি সেসকল ফযীলত ও সাওয়াব এসকল সূরা বা কুরআনের যে কোনো আয়াত পাঠে অর্জিত হবে। যেসকল যাকির এ ধরনের কিছু সূরা মুখস্থ করেছেন তাঁরা এ সময়ে, সকালে অথবা বিকালে অথবা যে কোনো অবসর সময়ে এ সকল মুখস্থ সূরা ওযীফা হিসাবে পাঠ করতে পারেন। তবে এর পাশাপাশি নিয়মিত কিছু পরিমাণ কুরআন দেখে তিলাওয়াত করা ও নিয়মিত কুরআন খতম করার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(গ). ওয়ায, আলোচনা, ইত্যাদি

উপরের দ্বিতীয় হাদীসে আমরা দেখেছি যে, সকালের এই সময়ে ওয়াজের যিক্রকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। যাকিরগণের জন্য সুযোগ থাকলে এই মুবারক সময়ে মাঝে মাঝে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) মহব্বত ও ঈমান বৃদ্ধিকারী, কুরআন সুন্নাহ নির্ভর ওয়ায ও আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। আল্লাহর জন্য ক্রন্দন, তাওবা ইত্যাদির জন্য এ সকল আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা যিক্রের মাজলিস অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্শা আল্লাহ।

'সালাতুদ দোহা' বা চাশ্তের সালাত

'দোহা' (الضحى) আরবী শব্দ। বাংলায় সাধারণত 'যোহা' উচ্চারণ করা হয়। এর অর্থ পূর্বাg Ask _Öc ib‡`ev w ý ycy‡ii `ev ýv¨ag K‡_† ic iq‡`v©h‡~m |ejv nq ÕZ&PvkÔmx fvlvq G‡K &dvi |(forenoon) |vnv ev †hvnv ejv nq`mgq‡K Aviex‡Z † —e© ch©š~c

সূর্য উদয়ের সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। সূর্য পরিপূর্ণ রূপে উদিত হওয়ার পরে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে প্রায় ২৫ মিনিট পরে দোহা বা চাশ্তের সালাতের সময় শুরু। এই সময় থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে এই সালাত আদায় করা যায়। 'দোহা'র সালাত দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত আদায় করা যায়। তাহাজ্জুদ সালাতের পরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন নফল সালাত দোহার সালাত। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এই সালাতকে 'সালাতুল আওয়াবীন' বা 'আল্লাহওয়ালাগণের সালাত' বলে

অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের দেশে এই সালাত 'ইশরাকের সালাত' বা 'সূর্যোদয়ের সালাত' বলে পরিচিত। অনেকে সূর্যোদয়ের পরের সালাতকে 'ইশরাকের সালাত' এবং পরবর্তী সময়ের সালাতকে 'দোহা' বা 'চাশ্‌তের সালাত' বলেন। হাদীস শরীফে 'সালাতুদ দোহা' বা 'দোহার সালাত' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে ; "ইশরাকের সালাত" শব্দটি হাদীসে পাওয়া যায় না। এছাড়া হাদীসে ইশরাক ও দোহার মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি। সূর্যোদয় থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় নফল সালাত আদায় করলে তা 'সালাতুদ দোহা' বা দোহার সালাত বলে গণ্য হবে।

যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা'র সালাতের মধ্যবর্তী সময় সীমিত। এক দুই ঘণ্টার বেশি নয়। কিন্তু ইশা ও ফজর এবং ফজর ও যোহর সালাতের মধ্যবর্তী সময় কিছুটা দীর্ঘ, প্রায় ৭/৮ ঘণ্টার ব্যবধান। এজন্য এই দুই সময়ে বিশেষভাবে নফল সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন মুমিনের হৃদয় বেশি সময় যিক্‌র থেকে দূরে না থাকে। এই দুই সময়ের সালাত– 'দোহার সালাত' ও 'তাহাজ্জুদ বা রাতের সালাত'। এই দুই প্রকার সালাতের বিশেষ গুরুত্ব, মর্যাদা ও সাওয়াবের বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।১

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة ... تامة تامة تامة

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করে বসে বসে আল্লাহর যিক্‌র করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত, এরপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে: পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে।)" হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।২

আবু উমামমাহ ও উতবাহ ইবনু আবদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করে বসে থাকবে দোহার (চাশ্‌তের) সালাত আদায় করা পর্যন্ত, সে একটি পূর্ণ হজ্ব ও একটি পূর্ণ ওমরার মতো সাওয়াব পাবে।" হাদীসটিকে মুনযিরী ও আলবানী হাসান বলেছেন।৩

এভাবে বসতে না পারলেও দোহার সালাত পৃথকভাবে আদায়ের জন্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অশেষ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে মাঝে মাঝে দোহার (চাশতের) সালাত আদায় করতেন। যে কোনো মুসলিম, ফজরের জামাতের পরে যিক্‌র করুন বা না করুন, সূর্যোদয়ের পর থেকে দ্বি-প্রহরের মধ্যে দুই/চার রাক'আত দোহার সালাত আদায় করলেই বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত অশেষ সাওয়াব ও বরকতের আশা করতে পারবেন।

আমরা জানি যে, যাবতীয় সুন্নাত-নফল সালাত ঘরে আদায় করা উত্তম। তবে দোহার সালাতের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম, তা মসজিদে আদায় করা ভালো বা ঘরে আদায় করার মতো একই ফযীলতের। যিনি ফজরের পরে যিক্‌রে লিপ্ত থাকবেন তিনি মসজিদেই দোহার সালাত পরবেন।

দোহা বা চাশ্‌তের সালাতের ফযীলতের বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া অনেক যয়ীফ হাদীসও এ বিষয়ে রয়েছে। এখানে কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি। এক হাদীসে আবূ যার গিফারী (রা) বলেন,

أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن أن لا أنام إلا على وتر وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر

"আমার প্রিয়তম বন্ধু (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন যেগুলি আমি কখনোই পরিত্যাগ করি না। (১) ঘুমানোর আগে বিত্‌র-এর সালাত আদায় করতে, (২) দুই রাক'আত যোহার বা চাশতের সালাত কখনো পরিত্যাগ না করতে; কারণ তা সালাতুল আওয়াবীন (আল্লাহওয়ালা তওবাকারীগণের সালাত) এবং (৩) প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতে।৪

হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং আবু দারদা (রা) একইভাবে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে উপরের তিনটি কাজের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন এবং তিনি জীবনে তা পরিত্যাগ করবেন না।৫

হযরত আবু যার (রা) বলেন, নবীয়ে আকরাম ﷺ বলেছেন, মানুষের দেহের প্রত্যেক জোড়া ও গিটের জন্য (শুকরিয়াস্বরূপ) প্রতিদিন সকালে দান করা তাঁর জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব। ... দুই রাক'আত দোহার সালাত আদায় করলে এই দানের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে।"৬

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, তারা খুব দ্রুত অনেক যুদ্ধলব্ধ মালামাল নিয়ে ফিরে আসে। মানুষেরা এদের অতি অল্প সময়ে এত বেশি সম্পদ লাভের বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة

الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة

"আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও নিকটবর্তী, বেশি সম্পদ লাভের ও দ্রুত প্রত্যাবর্তনের অভিযানের কথা জানিয়ে দেব না? যে ব্যক্তি ওযু করল, এরপর দোহার সালাত আদায় করতে মসজিদে গমণ করল সে ব্যক্তির অভিযান অধিকতর নিকটবর্তী, লব্ধ সম্পদ বেশি এবং ফিরেও আসল তাড়াতাড়ি।" হাদীসটি সহীহ।১

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, অনুরূপ একটি ঘটনায় যখন মানুষেরা এত অল্প সময়ে ও এত সহজে এত বেশি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের বিষয়ে বলাবলি করতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "এর চেয়েও দ্রুত ও বেশি লাভ ঐ ব্যক্তির যে, সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে ওযু করল, এরপর মসজিদে যেয়ে ফজরের সালাত আদায় করল এবং তারপর দোহার সালাত আদায় করল, – সেই ব্যক্তি এই অভিযানকারীগণের চেয়ে কম সময়ে বেশি সম্পদ লাভ করে ফিরে আসল।২

উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন:

يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك

"হে আদম সন্তান, তুমি তোমার দিনের প্রথমভাগে চার রাক'আত সালাত আমাকে প্রদান কর, দিনের শেষভাগ পর্যন্ত তোমার জন্য আমার কাছে তাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।" হাদীসটি সহীহ।৩

এই একই অর্থে আরো তিনটি সহীহ হাদীস হযরত আবু দারদা, আবু যার ও মুররা তায়েফী (রা) থেকে বর্ণিত আছে।৪

আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده وصدقة وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره

"যে ব্যক্তি দোহার সালাত দুই রাক'আত আদায় করল সে গাফিল বা অমনোযোগী বলে গণ্য হবে না। আর যে চার রাক'আত আদায় করল সে আবিদ বা বেশি বেশি ইবাদতকারী বলে গণ্য হলো। আর যে ছয় রাক'আত আদায় করল তার ঐ দিনের জন্য আর কিছু দরকার হবে না। আর যে ব্যক্তি আট রাক'আত আদায় করল, তাকে আল্লাহ 'কানিতীন' (উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ওলী) বান্দাগণের মধ্যে লিখে নিলেন। আর যে ১২ রাকা'আত আদায় করল আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ি বানিয়ে রাখলেন। প্রতি দিন প্রতি রাতেই আল্লাহ তাঁর বান্দাগণকে কিছু বিশেষ দয়া এবং বিশেষ অনুদান প্রদান করেন। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাগণকে যতপ্রকার দয়া ও অনুদান প্রদান করেছেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ অনুদান ও করুণা যে, তিনি বান্দাকে তাঁর যিক্‌র করার প্রেরণা ও তাওফীক প্রদান করবেন।" হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।৫

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب قال وهي صلاة الأوابين

"একমাত্র 'আউয়াব' [আওয়াবীন] বা বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌রকারী ও তাওবাকারী আল্লাহর বিশেষ ওলী ছাড়া কেউ দোহার সালাত নিয়মিত পালন করে না। এই সালাত 'সালাতুল আউয়াবীন' বা আউয়াবীনের সালাত।" হাদীসটি হাসান।

আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত 'আওয়াবীন' বা প্রিয় যাকিরগণের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন!

দ্বিতীয় পর্ব : দিবসের যিক্‌র-ওযীফা

(১) কর্মব্যস্ত অবস্থার যিক্‌র

উপরে আমরা সকালের যিক্‌রের আলোচনা করেছি। একজন মুমিন এভাবে আল্লাহর যিক্‌র ও দু'আর মাধ্যমে তার দিনের শুভ সূচনা করবেন। এরপর স্বভাবতই তাকে কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। সারাদিন ও রাত্রের কিছু অংশ আমাদের বিভিন্ন কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুসারে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, সকল ব্যস্ততার মধ্যেও যেন আমাদের জিহ্বা আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সর্বদা পালনের জন্য বিভিন্ন প্রকার মাসনূন যিক্‌র আলোচনা করেছি, যে সকল যিক্‌র বেশি বেশি পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন,– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'সুব'হানাল্লাহ', 'আল-'হামদু লিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', 'আসতাগফিরুল্লাহ', 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ', 'আল্লাহুম্মা আস'আলুকাল আফিয়্যাহ' ইত্যাদি বাক্য।

সকল কাজের ফাঁকে, বিশেষত যখন মুখের কোনো কাজ থাকে না তখন যথাসম্ভব মনোযোগ দিয়ে চুপি চুপি এ সকল যিক্‌রে আমাদের জিহ্বাগুলিকে আর্দ্র রাখা প্রয়োজন। এছাড়া নিজের জীবনে আল্লাহর অশেষ রহমতের ও নিয়ামতের কথা স্মরণ করা, মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলা, মনকে আল্লাহর দিকে রুজু করে মনে মনে আল্লাহর কাছে নিজের দুনিয়া বা আখেরাতের জন্য প্রার্থনা করা, আল্লাহর বিধান, জান্নাত, জাহান্নাম, মৃত্যু, আখিরাত, আল্লাহর মহান রাসূল (ﷺ), তাঁর সাহাবীগণ ও অন্যান্য নেককার বুজুর্গগণের কথা মনে মনে চিন্তা করাও আল্লাহর যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। অযথা নীরবে বসে আকাশ-কুসুম কল্পনা করা, মনের বিরক্তি, কষ্ট বা ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি উদ্দীপক চিন্তা করা, অন্যান্য মানুষের দোষত্রুটি নিয়ে চিন্তা করে নিজের মন, আত্মা ও আখেরাত নষ্ট করার চেয়ে এগুলি অনেক ভালো।

প্রিয় পাঠক, আমাদের মুখ ও বিশেষ করে মন কখনই চুপ থাকে না। কোনো না কোনো কিছু নিয়ে মন ব্যস্ত থাকে। সাধারণত ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা অবসর সময়ে, কখনো কখানো ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস চিন্তা করে থাকি। আর একটু সুযোগ পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ সকল বিষয় নিয়ে গল্প, আলোচনা বা বিতর্ক করে সময় নষ্ট করি। আমরা একটু ভেবে দেখি না যে, আমাদের এই অলস চিন্তা বা অর্থহীন আলোচনা, বিতর্ক আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক বা জাতীয় জীবনে কোনো উপকারেই লাগছে না। বরং এগুলি আমাদের প্রভূত ক্ষতি করে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি অপ্রয়োজনীয় চিন্তা, ব্যথা, বিরক্তি, ক্রোধ, জিদ, হিংসা ইত্যাদি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত ও কলুষিত করে। সাথে সাথে আমরা আল্লাহর যিক্‌র করে অগণিত সাওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই।

একটু চেষ্টা করলেই আমরা এই ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। মুখ বা মনের অবসর হলেই তাকে আল্লাহর যিক্‌রে রত করি। অনেক সময় বেখেয়ালে মন বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অলস চিন্তায় মেতে উঠে। যখনই খেয়াল হবে তখনই সেগুলিকে মন থেকে বের করে আল্লাহর যিক্‌রে মুখ ও মনকে বা শুধু মনকে নিয়োজিত করুন। যেমন, আপনি সকালে সংবাদ শুনেছেন বা পড়েছেন – অমুক স্থানে বোমাবর্ষণ হয়েছে বা অমুক ব্যক্তির মৃত্যু, শাস্তি, পদোন্নতি বা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার চিন্তা বা আলোচনা উক্ত বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আনবে না। তবুও ভাবতে ভালো লাগে। আপনি অফিসে, দোকানে, গাড়িতে, বাড়িতে বা পথে-ঘাটে নিজের অজান্তে ঐ বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবতে থাকবেন। এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় সাঁতার কাটতে থাকবেন। অর্থহীন সময় নষ্ট করবেন। একটু অভ্যাস করুন। বারবার মনকে আল্লাহর যিক্‌রের দিকে ফিরিয়ে আনুন। ইন্‌শা আল্লাহ, এক সময় আপনি আল্লাহর প্রিয় যাকিরে পরিণত হবেন।

একটি উদাহারণ বিবেচনা করুন – এক ব্যক্তি ঢাকায় থাকেন। তার গ্রামের বাড়ি খুলনা। গ্রামের বাড়িতে তার কোনো নিকট আত্মীয়ের কঠিন অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে দেশে ফিরছেন। ঢাকা থেকে খুলনা পৌঁছাতে তার ৮/৯ ঘণ্টা সময় লাগবে। এই দীর্ঘ সময় তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাবেন। সারা সময় তার মনে বিভিন্ন অমঙ্গল-চিন্তা ঘুরপাক খাবে। কথা বললেও তিনি এই বিষয়ে বিভিন্ন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে কথা বলবেন।

- কিন্তু তার এই উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, অমঙ্গল চিন্তা কি তার বা তার অসুস্থ আপনজনের কোনো উপকারে লাগবে? কখনোই না। তিনি মূলত পুরো সময়টি নেতিবাচক চিন্তা করে নষ্ট করছেন। তিনি নিজের মনকে নষ্ট করছেন। সর্বোপরি আল্লাহর যিক্‌রের অমূল্য সুযোগ তিনি নষ্ট করছেন। এই সময় যদি তিনি সকল দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহর যিক্‌রে কাটাতেন, অথবা দু'আর মধ্যে সময় অতিবাহিত করতেন, তাহলে তিনি সকলদিক থেকে লাভবান হতেন।
- আসলে আমরা অধিকাংশ সময় অলস বা অপ্রয়োজনীয় চিন্তা অথবা ভিত্তিহীন দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা বা অমঙ্গল-চিন্তা করে সময় নষ্ট করি। একটু অভ্যাস করলে আমরা এসকল মূল্যবান সময় আল্লাহর যিক্‌রে ব্যয় করে জাগতিক, মানসিক ও পারলৌকিকভাবে অশেষ লাভবান হতে পারি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক প্রদান করেন ; আমীন।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারংবার বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (**الـــذاكرين الله كثيـــرا والذكرات**) বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌রকারী পুরুষ ও নারীগণের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও পুরস্কারের ঘোষণা প্রদান করেছেন। দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করা মুমিনগণের বিশেষ পরিচয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেপরোয়াভাবে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌রকারীগণকে সবচেয়ে অগ্রগামী মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ বলে ঘোষণা করেছেন। আসুন আমরা সকলেই চেষ্টা করি এঁদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার।

- মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে আমাদের সকাতর আরজি যে, তিনি দয়া করে আমাদের অলসতা, অবহেলা ও দুর্বলতা ক্ষমা করেন এবং আমাদেরকে তাঁর নবীর (ﷺ) সুন্নাত অনুসারে বেশি বেশি যিক্‌র করার তাওফীক দান করেন; আমীন।

যিক্‌র নং ১১৭ : সদা সর্বদা পালনের একটি বিশেষ দু'আ

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني [وعافني] وارزقني

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী, ওয়ার'হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া 'আ-ফিনী, ওয়ারযুকনী ।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন ।"

সাহাবী আবু মালি.ক আশ'আরী (রা) তাঁর পিতা সাহাবী আসিম (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উপরের বাক্যগুলি দিয়ে বেশি বেশি দু'আ করতে শেখাতেন ।[১]

- মুহতারাম পাঠক, এই দু'আটি আমাদের জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া মিটিয়ে দেয় । মুমিনের উচিত সকল ব্যস্ততার মধ্যে এই মুনাজাতটি বলতে থাকা ।

<u>যিক্র নং ১১৮ : হাট, বাজার, শহর বা কর্মস্থলের বিশেষ যিক্র</u>

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير

উচ্চারণ ও অর্থ : (পূর্বোক্ত ৩ নং ও ৬৯ নং যিক্র দেখুন ।)

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি বাজারে (শহর, বন্দর বা কর্মস্থলে) প্রবেশ করে এই যিক্রগুলি বলবে, আল্লাহ তাঁর জন্য এক লক্ষ সাওয়াব লিখবেন, তাঁর এক লক্ষ (সাধারণ ছোটখাট) গোনাহ মুছে দিবেন এবং তাঁর এক লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন ।"

হাদীসটির সনদ দুর্বল । ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সংকলন করে এর সনদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন । তবে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা এসেছে বলে কোন কোন মুহাদ্দিস মতপ্রকাশ করেছেন ।[২]

- সাধারণত কোনো সহীহ হাদীসে কোনো যিক্র বা নেক আমলের এত অপরিমেয় সাওয়াবের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় না । এখানে পাঠক একটু চিন্তা করলেই এই অপরিমেয় সাওয়াবের কারণ বুঝতে পারবেন । যে স্থানে আল্লাহর স্মরণ ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেই স্থানে তাঁর যিক্রের সাওয়াবও বেশি । বাজার, ঘাট, শহর, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি স্থানে মানুষের দেহ ও মন স্বভাবতই বিভিন্নমুখী কর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে । এ সময়ে যে বান্দা নিজেকে আল্লাহর যিক্রে নিয়োজিত রাখতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে এই মহান পুরস্কারের অধিকারী হবেন ।

- প্রাচীন যুগে বাজারই ছিল সকল বাণিজ্যিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মের কেন্দ্রস্থল । বর্তমানে বাজার বলতে বৃহদার্থে 'শহর' বা 'কর্মক্ষেত্র' বুঝানো যায় । সকল মুমিনের উচিত বাজারে, হাটে, দোকানে, শহরে, অফিসে, কর্মস্থলে বা যে কোনো জাগতিক বা সামাজিক ব্যস্ততার স্থানে গমন করলে প্রবেশের সময় এবং যতক্ষণ সেস্থলে অবস্থান করবে ততক্ষণ মাঝে মাঝে সুযোগমতো এই যিক্রগুলি পাঠ করা ।

যদি মুখে যিক্র করতে না পরি তাহলে অন্তত মনে মনে আল্লাহর নিয়ামত, বিধান ইত্যাদি স্মরণ করা উচিত । তাবেয়ী হযরত আবু উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ বলেন: "কোনো ব্যক্তি বাজারে থাকে আর তাঁর মনের মধ্যে যদি আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তাহলে সে সালাতে রত আছে বলে গণ্য হবে । যদি সে মনের স্মরণের সাথে সাথে ঠোঁট নাড়াতে (মুখে উচ্চারণ করতে) পারে তাহলে তা হবে উত্তম ।"[৩]

(২) যোহর ও আসরের সালাত

- আল্লাহর স্মরণ মানব হৃদয়ের খাদ্য ও মানবাত্মার প্রাণের উৎস । কর্মময় ও সংঘাতময় দিনের ব্যস্ততায় ভারাক্রান্ত হয় মানব হৃদয় । হৃদয়ের মধ্যে জমতে থাকে উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, বিরক্তি, রাগ, হিংসা, ভয়, অনুরাগ, বেদনা, লোভ, কৃপণতা, হতাশা ইত্যাদি বিভিন্নমুখি অনুভুতি যা অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্বনের মতো আমাদের হৃদয়কে ক্রমান্বয়ে অসুস্থ করে তোলে এবং বিভিন্ন প্রকার অন্যায়, অনৈতিক বা ক্ষতিকর কাজে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে । এসকল ক্ষতিকর অনুভবে কঠিন ভার থেকে হৃদয়কে মুক্ত করার একমাত্র উপায় আল্লাহর স্মরণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে মনের আবেগকে তাঁর পবিত্র দরবারে সমর্পণ করা । আর এজন্য মহান আল্লাহ বান্দার জন্য ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় করেছেন যে, হৃদয়কে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম ও আহার দেবে সে সালাতের মাধ্যমে ।

- আমরা দেখেছি যে, সালাতই সর্বোত্তম যিক্র । পরিপূর্ণ আবেগ ও মনোযোগ সহকারে মুমিন তাঁর ব্যস্ততার ফাঁকে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করবেন । এরপর সামান্য কিছু সময় আল্লাহর জপমূলক যিক্র আদায় করবেন ।

- সাধারণত সালাত শেষ হওয়া মাত্র মুমিন হৃদয় ব্যস্ত হয়ে পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে কর্মে প্রবেশের জন্য । অনেক সময় সত্যিই কোনো জরুরি কাজ তাঁর থাকে । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালাতের পরেই সালাতের স্থান ত্যাগের এই অস্থিরতা শয়তানী প্রেরণা । অনেক সময় আমরা দ্রুত মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসি, কিন্তু মসজিদের বাইরে এসে কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে বা কোনো আকর্ষণীয় কথা বা দৃশ্য পেলে সেখানে অনেক সময় কাটিয়ে দিতে অসুবিধা হয় না । এজন্য মুমিনের উচিত সম্ভব হলে অস্থিরতা পরিত্যাগ করে প্রশান্ত হৃদয়ে কয়েক মিনিট আল্লাহর যিক্রে রত থাকা ।

<u>যোহরের সালাতের পরের যিক্র</u>

উপরে ফজরের সালাতের পরের যিক্‌রের দ্বিতীয় প্রকার নির্ধারিত যিক্‌র হিসাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরের যিক্‌র-সমূহের আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা ২৯ প্রকার মাসনূন যিক্‌র উল্লেখ করেছি। ৭১ নং থেকে ৯৯ নং যিক্‌র। যাকির যোহরের পরেও এই যিক্‌রগুলি পালন করবেন। সবগুলি যিক্‌র পালন সম্ভব না হলে কিছু যিক্‌র বেছে নিয়ে ওযীফা তৈরি করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ওযীফা তৈরির জন্য কোনো নেককার আলিম বা মুরশিদের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

আসরের সালাতের পরের যিক্‌র

আসরের সালাতের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় যিক্‌রের বিশেষ সময়। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন হাদীসে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যিক্‌রে রত থাকার অভাবনীয় ফযীলত ও মর্যাদার কথা আমরা দেখেছি। এ সময়ে তিন প্রকার যিক্‌র আদায় করতে হবে।

প্রথম প্রকার যিক্‌র যা সকল সালাতের পরে পালনীয়। আসরের সালাতের পরেও মুমিন যোহরের সালাতের মতো উপরিউক্ত ৭১ নং থেকে ৯৯ নং পর্যন্ত ২৯ প্রকার যিক্‌র বা সেগুলি থেকে বেছে কিছু যিক্‌র পালন করবেন।

দ্বিতীয় প্রকার যিক্‌র যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিশেষ করে ফজরের পরে ও আসরের পরে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পালনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। উপরে সকাল-বিকাল ও সকাল-সন্ধ্যার যিক্‌র আলোচনার সময় ১০০ নং যিক্‌রে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ও আসরের পরে চারটি মূল তাসবীহ একশতবার করে মোট ৪০০ বার যিক্‌র করার বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। **১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০০ বার 'আল-হামদুলিল্লাহ', ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' ও ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। ১০০ বার (লা-ইলাহা ইল্লল্লাহু)-র পরিবর্তে ১০০ বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর' পড়া যাবে**। এগুলি পালনে আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া দরকার।

তৃতীয় প্রকার যিক্‌র যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সময়ে গণনাহীনভাবে বেশি বেশি পালন করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। ফজরের সালাতের পরের অনির্ধারিত যিক্‌রের আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'সুবহানাল্লাহ', 'আল হামদু লিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' – এই চার প্রকার যিক্‌রে অবিরত রত থাকার উৎসাহ প্রদান করেছেন।

যাকির উপরের দুই প্রকার যিক্‌র পালনের পরে নিজের সময়, সুযোগ ও ক্বালবী হালত অনুযায়ী যতক্ষণ ও যত বেশি সম্ভব, মনে মনে বা মৃদুস্বরে, অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হৃদয়কে আলোড়িত করে এই চারটি বাক্য একত্রে বা পৃথকভাবে যিক্‌র করবেন। সুযোগ থাকলে মাগরিব পর্যন্ত যিক্‌র করবেন। বিশেষত শুক্রবারের দিন সূর্যাস্তের আগের সময়টুকু দু'আ-মুনাজাতে কাটানোর চেষ্টা করবেন।

তৃতীয় পর্বঃ রাতের যিক্‌র-ওযীফা

- আমরা সূর্যাস্ত থেকেই রাতের যিক্‌রের আলোচনা শুরু করব। রাতের প্রথম অংশ মূলত কর্মময় দিবসেরই অংশ। সাধারণত আমরা মাগরিব ও ইশার সালাত কর্মব্যস্ততার মাঝেই আদায় করি। কর্মব্যস্ততার মধ্যে পালিত যিক্‌র আযকারের দিকে আমাদের এ সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১) সালাতুল মাগরিব

মাগরিবের সালাতের সময় মুমিন চার প্রকার যিক্‌র আদায় করবেন :

প্রথম প্রকার : ফজর ও মাগরিবের পরে পালনীয় যিক্‌রগুলি। এই পর্যায়ে উপরে উল্লেখিত ৬৯ নং ও ৭০ নং যিক্‌র দু'টি পালন করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পালনীয়। পূর্বোক্ত ৭১ থেকে ৯৯ নং পর্যন্ত ২৯ প্রকার যিক্‌র বা সেগুলি থেকে বেছে কিছু যিক্‌র এই পর্যায়ে পালন করবেন।

তৃতীয় প্রকার : সকাল ও সন্ধ্যায় পালনীয় যিক্‌র। উপরে আলোচিত ১০১ থেকে ১১৬ নং পর্যন্ত ১৬ প্রকার যিক্‌র এই পর্যায়ে পালনীয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১১৪ নং যিক্‌র (সকাল-বিকাল-সন্ধ্যার ১৫ নং) সন্ধ্যায় পাঠ করার সময় (আসবা'হনা) বা (সকাল হলো)-র পরিবর্তে (আমসাইনা) বা (সন্ধ্যা হলো) বলতে হবে। এতে দু'আটি হবে নিম্নরূপ :

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

উচ্চারণ: (আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু ... ফী হা-যিহিল লাইলাতি, ...বা'দাহা, ...হা- যিহিল লাইলাতি, ... বা'দাহা, ..)।

অর্থ: সন্ধ্যা হলো, ...সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম। ...এই রাতের ...এই রাতের

চতুর্থ প্রকার : শুধুমাত্র সন্ধ্যায় পাঠের জন্য একটি যিক্‌র।

যিক্‌র নং ১১৯ : সাপ বিচ্ছুর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার যিক্‌র

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

উচ্চারণ : আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি, মিন শার্‌রি মা- খালাক্বা।

অর্থ : "আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, গত রাতে আমাকে একটি বিষাক্ত বিচ্ছু কামড় দিয়েছিল তাতে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। তিনি বলেন, "যদি তুমি সন্ধ্যার সময় এই কথা (উপরের দু'আটি) বলতে তাহলে তা (বিচ্ছু বা বিষধর প্রাণী) তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারত না।" অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন : "যদি কেউ সন্ধ্যায় তিন বার এই বাক্যটি বলে সেই রাতে কোনো বিষ বা দংশন তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।"[১]

এছাড়া হযরত খাওলা বিনত হাকীম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কেউ কোনো স্থানে গমন করতেন বা সফরে কোথাও থামে এবং উপরের দু'আটি বলে, তাহলে ঐ স্থান পরিত্যাগের আগে (ঐ স্থানে অবস্থান রত অবস্থায়) কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।[২]

মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত

সালাত মুমিনের অন্যতম ইবাদত ও যিক্‌র। নফল সালাত যত বেশি সম্ভব পড়া দরকার। দিনে রাত্রে যে কোনো সময় ,নিষিদ্ধ সময় ছাড়া, মুমিনের উচিত সাধ্যমতো বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা। হযরত সাওবান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, "কোন্ কর্ম করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন?" অথবা "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কি ?" তিনি বললেন :

عليك بكثرة السجود

"তুমি বেশি বেশি সাজ্‌দা করবে (বেশি বেশি সালাত আদায় করবে)।"[৩]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر

"সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, কাজেই যার পক্ষে সম্ভব হবে সে যেন যত বেশি পারে সালাত আদায় করে।" হাদীসটি হাসান।[৪]

নফল সালাত আদায়ের বিশেষ সময় রাত। মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত সময় রাত্রের অংশ। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে, মাগরিবের পর থেকে ইশা'র সালাত পর্যন্ত যে সালাত আদায় করা হয় তা 'সালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ 'বেশি বেশি তাওবাকারীগণের সালাত'। আমরা উপরের সহীহ হাদীসগুলিতে দেখেছি যে, দোহা'র সালাতকে 'সালাতুল আওয়াবীন' বলা হয়েছে। অর্থের দিক থেকে দুটি নামকরণের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। আওয়াব বা আল্লাহর বেশি বেশি যিক্‌রকারী ও তাওবাকারী আবিদ বান্দাগণ শুধু দোহার সালাত পড়েন, মাগরিবের পরে সালাত পড়েন না, এরূপ নয়। উভয় সময়েই তাঁরা নফল সালাত আদায় করেন।

হুযাইফা (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর কাছে এসে তাঁর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। তিনি মাগরিবের পরে ইশা'র সালাত পর্যন্ত নফল সালাতে রত থাকলেন।" হাদীসটি সহীহ।[২]

আনাস (রা) বলেন, "সাহাবায়ে কেরাম মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ে সজাগ থেকে অপেক্ষা করতেন এবং নফল সালাত আদায় করতেন।"[৩] হাদীসটি সহীহ।

হাসান বসরী বলতেন, মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ের সালাতও রাত্রের সালাত বা তাহাজ্জুদের সালাত বলে গণ্য হবে।[৪]

বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো সাহাবী তাবেয়ীগণকে এই সময়ে সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন।[৫]

এই সময়ে কত রাক'আত সালাত আদায় করতে হবে সে বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। উপরের সহীহ হাদীসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুমিন নিজের সুবিধা ও সাধ্যমতো এই সময়ে নফল সালাত আদায় করবেন। সম্ভব হলে মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত পুরো সময় সালাতে কাটাবেন। না হলে যত সময় এবং যত রাক'আত পারেন আদায় করবেন। ২, ৪, ৬, ৮ বা অনুরূপ নির্ধারিত রাক'আত ওযীফা হিসাবে নির্ধারিত করে নেওয়া উত্তম।

কিছু যয়ীফ বা দুর্বল সনদের হাদীসে এই সময়ে ৪ রাক'আত বা ৬ রাক'আত, ১০ বা ২০ রাক'আত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি এ সময়ে ৪ রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে এক যুদ্ধের পর আরেক যুদ্ধে জিহাদ করার সাওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কোনো কথা বলার আগে ৬ রাক'আত সালাত আদায় করবে তাঁর ৫০ বৎসরের গোনাহ ক্ষমা করা হবে। অথবা তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে। অন্য বর্ণনায় – সে ১২ বৎসর ইবাদত করার সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জন করবে। যে ব্যক্তি এই সময়ে ১০ রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে বাড়ি তৈরি করা হবে। যে ব্যক্তি এ সময়ে ২০ রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে বাড়ি তৈরি করবেন। এসকল হাদীস সবই বানোয়াট বা অত্যন্ত যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৬]

মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, যয়ীফ হাদীসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে বিশ্বাস না করে সাবধানতামূলকভাবে তা পালন করা যায়, যদি তা বেশি যয়ীফ না হয় এবং সাধারণ কোনো সহীহ হাদীসের আওতায় পড়ে। এখানে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যে, এই সময়ে নফল সালাত বেশি বেশি আদায় করা সুন্নাত। রাক'আত নির্ধারণের বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। এখন যাকির ৬ রাক'আত বা ১০ রাক'আত সালাত নিয়মিত আদায় করতে পারেন এই নিয়্যাতে যে, উপরিউক্ত যয়ীফ হাদীসের সাওয়াব না পেলেও এই সময়ে সালাত আদায়ের সাওয়াব তো পাব, ইন্‌শা আল্লাহ।

(২) সালাতুল ইশা

ইশার সালাত থেকে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত সময়ে পালনীয় যিক্‌রগুলি এই পর্যায়ে আলোচনা করব। প্রথমত, সালাতুল ইশার পরের ওযীফা এবং দ্বিতীয়ত, ইশার পর থেকে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের ওযীফা।

সালাতুল ইশার পরের যিক্‌র

ইশা'র সালাতের পরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে আদায়কৃত ওযীফাগুলি পালন করতে হবে। পূর্বোক্ত ৭১ থেকে ৯৯ নং পর্যন্ত ২৯ প্রকার যিক্‌র বা সেগুলি থেকে বেছে কিছু যিক্‌র এই পর্যায়ে পালন করবেন।

ইশার পরে রাতের ওযীফা : দরুদ ও কুরআন

মুমিনের নফল ইবাদতের মূল সময় রাত। সাহাবী - তাবেয়ীগণ রাতে তাহাজ্জুদের সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ পাঠ, দু'আ ইত্যাদির ওযীফা নির্ধারিত করে রাখতেন। এগুলি তাঁরা যত্নসহকারে নিয়মিত পালন করতেন।[৭]

ইশা'র সালাতের পরেই রাতের প্রথম অংশ। এ সময়ে যে ইবাদত করা হয় তা রাতের ইবাদত বলে গণ্য। কোনো যাকির যদি শেষ রাতে বেশি সময় পাবেন না বলে মনে করেন তাহলে তার ওযীফার একটি অংশ এই সময়ে পালন করতে পারেন। এতেও রাতের ওযীফার সাওয়াব পাওয়া যাবে। এ সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ কুরআন পাঠ, সালাত (দরুদ) পাঠ, দু'আ ও মুনাজাত ওযীফা

করে নিতে পারেন। উপরে আমরা বেশি বেশি পালন করার মতো যিক্‌রগুলি উল্লেখ করেছি। এসময়ে সেগুলি থেকে কিছু নির্ধারিত করে ওযীফা হিসাবে পালন করা উচিত।

সালাতুল বিতর ও আনুষঙ্গিক যিক্‌র

ইশা'র সালাত আদায়ের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিতির সালাতের সময়। বিতির সালাত আদায়ের সর্বোত্তম সময় শেষ রাত্র। শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ সালাতের শেষে বিতির আদায় করা বেশি সাওয়াবের এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরিত সুন্নাত। তবে কেউ শেষ রাতে উঠতে পারবেন না বলে সন্দেহ করলে তাঁর জন্য ঘুমানোর আগে বিতির আদায় করা ভালো।

আমরা সাধারণত ইশা'র সালাতের পরপরই বিতির আদায় করে নেই। এতে কোনো দোষ নেই, তবে আমরা দুটি উত্তম সময়ের কোনোটিরই বরকত অর্জন করতে পারলাম না। যারা শেষ রাতে উঠতে পারবেন না বলে ভয় পান তাদের উচিত রাত ১০ বা ১১ টা বা যখনই ঘুমাতে যাওয়ার সময় হবে, তখন ওযু করে সম্ভব হলে কয়েক রাক'আত নফল সালাত আদায় করে এরপর বিতির আদায় করে ঘুমাতে যাওয়া। এতে আমরা কয়েকটি অতিরিক্ত সাওয়াব ও ফযীলত অর্জন করতে পারি :

(ক) দ্বিতীয় উত্তম সময়ে বিতির আদায় : আমরা দেখেছি যে, ইশা'র পরে বিতির আদায় করা জায়েয, কোনো অসুবিধা নেই, তবে বিতিরের সর্বোত্তম সময় শেষ রাত্র এবং দ্বিতীয় উত্তম সময় ঘুমানোর পূর্বে।

(খ) তাহাজ্জুদের সালাতের আংশিক সাওয়াব : এ সময়ের সালাতও রাতের সালাত হিসাবে গণ্য। বিশেষত রাতের একতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে সালাত ও দু'আর বিশেষ ফযীলত আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

(গ) ওযু অবস্থায় ঘুমানোর ফযীলত : ঘুমের জন্য ওযু অবস্থায় শয়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এ জন্য বিশেষ দুটি পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। একটি হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا

"তোমরা তোমাদের দেহগুলিকে পবিত্র রাখবে, আল্লাহ তোমাদের পাবিত্র করুন। যদি কোনো বান্দা ওযু অবস্থায় ঘুমান, তাহলে তার পোশাকের মধ্যে একজন ফিরিশতা শুয়ে থাকেন। রাত্রে যখনই এই ব্যক্তি নড়াচড়া করে তখনই এই ফিরিশতা বলেন : হে আল্লাহ আপনি এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ সে ওযু অবস্থায় ঘুমিয়েছে।" হাদীসটি হাসান।[১] অন্য হাদীসে হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

ما من امرئ مسلم يبيت طاهرا [على ذكر الله] فيتعار من الليل فيسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه

"যে কোনো মুসলিম যদি ওযু অবস্থায় (আল্লাহর যিক্‌রের উপর) ঘুমায় ; এরপর রাত্রে কোনো সময় হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে (ঐ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে) আল্লাহর কাছে তাঁর জাগতিক বা পারলৌকিক কোনো কল্যাণ কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু দিবেনই।"[২]

যিক্‌র নং ১২০ : সালাতুল বিতরের পরের যিক্‌র :

হযরত উবাই ইবনু কা'ব বলেন , রাসূলুল্লাহ ﷺ ৩ রাক'আত বিতর আদায় করতেন, প্রথম রাক'আতে "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", দ্বিতীয় রাক'আতে "কাফিরূন" ও তৃতীয় রাক'আতে "ইখলাস" পড়তেন এবং রুকুর আগে কুনূত পাঠ করতেন। বিতির সালাত শেষ হলে তিনি বার বলতেন :

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।

অর্থ : "ঘোষণা করছি পবিত্রতা মহান মহা পবিত্র সম্রাটের।" তিনি শেষবারে লম্বা (জোরে শব্দ) করে বলতেন। হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩]

(৩) শয়নের যিক্‌র

যিক্‌রের একটি বিশেষ সময় ঘুমানের পূবে বিছানায় শুয়ে। আমরা ইতঃপূবে হাদীস শরীফে দেখেছি যে, কেউ যদি কখনো শয়ন করে সেই শয়নের মধ্যে আল্লাহর যিক্‌র না করে তাহলে সেই শয়ন তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। অন্য হাদীসে হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إن الرجل إذا آوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك: اللهم اختم بخير، فقال الشيطان: اختم بشر. فإن ذكر الله تعالى ثم نام، بات الملك يكلؤه

"যখন কোনো মানুষ বিছানায় শয়ন করে তখন একজন ফিরিশতা ও একজন শয়তান তার নিকট আসে। ফিরিশতা বলে : হে

আল্লাহ, কল্যাণ ও মঙ্গল দিয়ে এর দিনের সমাপ্তি করুন। আর শয়তান বলে : অমঙ্গলের সাথে এর সমাপ্তি হোক। যদি ঐ ব্যক্তি আল্লাহর যিক্র করে নিদ্রা যায় তাহলে সারারাত ঐ ফিরিশাত তাঁকে দেখাশুনা ও হেফাযত করেন।" হাদীসটি সহীহ।[১]

এই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন প্রকারের যিক্র করতেন এবং তিনি উম্মতকে বিভিন্ন যিক্র ও দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। দু'আগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কিন্তু আমাদের জন্য মুখস্থ করা বা পালন করা কষ্ট হবে মনে করে এখানে অল্প কয়েকটি দু'আ উল্লেখ করছি। এছাড়া কিছু মাসনূন যিক্র এখানে উল্লেখ করা হলো।

(১) যিক্র নং ১২১ : ১০০ তাসবীহ

৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' , ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ', ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার':

ফাতেমা (রা) নিজের হাতে যাতা ঘুরিয়ে ও সংসারের সকল কর্ম একা করতে কষ্ট পেতেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে পরামর্শ দেন যে, তোমার আব্বার নিকট যুদ্ধলব্ধ একটি দাসী চাও, যে তোমাকে সংসার কর্মে সাহায্য করবে। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সাথে দেখা করতে এসে তাঁকে না পেয়ে ফিরে যান। রাত্রে তাঁরা বিছানায় শুয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাছে আসেন। তিনি বলেন, "আমার আসহাবে সুফফার দরিদ্র সাহাবীগণকে বাদ দিয়ে তোমাকে কোনো দাসী দিতে পারব না। তবে দাসীর চেয়েও উত্তম বিষয় তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যখন বিছানায় শুয়ে পড়বে তখন ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' , ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।"[২]

অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোনো মুসলিম যদি দু'টি কাজ নিয়মিত করতে পারে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কাজ দু'টি খুবই সহজ কিন্তু করার মানুষ খুব কম। **প্রথমত,** প্রত্যেক সালাতের পরে ১০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও ১০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। এতে ১৫০ বার জিহ্বার যিক্র হবে এবং আল্লাহর কাছে আমলনামায় বা মীযানে ১৫০০ সাওয়াব হবে। **দ্বিতীয়ত,** বিছানায় শয়ন করার পরে ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার', ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। এতে মুখে ১০০ বার ও মীযানে ১০০০ বার হবে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুলে গুণে গুণে তা দেখান। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন : "এই দু'টি কর্ম সহজ হওয়া সত্ত্বেও পালনকারী কম কেন ?" তিনি উত্তরে বলেন : "কেউ শুয়ে পড়লে শয়তান এসে এগুলি বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সালাতের পরে এগুলি বলার আগেই তাকে তার বিভিন্ন কথা মনে করিয়ে দেয়।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

(২) যিক্র নং ১২২ : আয়াতুল কুরসী

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কেউ রাতে বিছানায় শয়ন করার পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সারারাত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে হেফাযত করা হবে এবং কোনো শয়তান তাঁর নিকট আসতে পারবে না।[৪]

(৩) যিক্র নং ১২৩ : সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

আবু মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কেউ রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে তাহলে তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে।[৫]

(৪) যিক্র নং ১২৪ : সূরা কাফিরূন

নাওফাল আল-আশজায়ী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি সূরা 'কাফিরূন' পড়ে ঘুমাবে, এ শির্ক থেকে তোমার বিমুক্তি। হাদীসটি হাসান। এই অর্থে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে আরেকটি হাদীস হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৬]

(৫) যিক্র নং ১২৫ : সূরা ইখলাস

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবীজী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন: তোমরা কি পারবে না রাতে কুরআনের একতৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে? বিষয়টি তাঁদের কাছে কষ্টকর মনে হলো। তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কে-ই বা তা পারবে? তখন তিনি বলেন: 'কুল হুআল্লাহু আহাদ্' সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।' আবু দারদা (রা) থেকে একই অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৭]

(৬) যিক্র নং ১২৬ :

সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একত্রে (তিন বার)

দুই হাত একত্র করে এই সূরাগুলি পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে হাত দু'টি যথাসম্ভব শরীরের সর্বত্র বুলানো। – এভাবে ৩ বার।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি রাতে বিছানায় গমনের পরে তাঁর মুবারক দু'টি হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং তাতে উপরের তিনটি সূরা পাঠ করতেন। এরপর শরীরের যতটুকু সম্ভব স্থান দুই হাত দিয়ে মোছেহ করতেন। মাথা, মুখ ও শরীরের সামনের দিক থেকে শুরু করতেন। – এভাবে ৩ বার করতেন।"[১]

(৭) যিক্‌র নং ১২৭ :

সূরা বনী ইসরাঈল (কুরআন কারীমের ১৭ নং সূরা)

(৮) যিক্‌র নং ১২৮ :

সূরা সাজদা, (কুরআন কারীমের ৩২ নং সূরা)

(৯) যিক্‌র নং ১২৯ :

সূরা যুমার (কুরআন কারীমের ৩৯ নং সূরা)

(১০) যিক্‌র নং ১৩০ :

সূরা মুলক (কুরআন কারীমের ৬৭ নং সূরা)

জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা বানী ইসরাঈল ও সূরা যুমার তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না। অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক রাতে সূরা সাজদাহ ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। হাদীসগুলি সহীহ।[২]

(১১) যিক্‌র নং ১৩১ : বিশেষ মুনাজাত :

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, রাব্বাস সামা-ওয়া-তি ওয়ারাব্বাল আরদ্বি ওয়ারাব্বাল 'আরশিল 'আযীম। রাব্বানা- ওয়ারাব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফা-লিকিল হাব্বি ওয়ান নাওয়া-। ওয়া মুনযিলাত তাওরা-তি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল ফুরকা-ন। আ'উযু বিকা মিন শার্‌রি কুল্লি শাইয়িন আনতা আ-খিযুম বিনা-সিয়্যাতিহী। আল্লা-হুম্মা, আনতাল আউআলু, ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আনতাল আ-খিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইউন। ওয়া আনতায যা-হিরু ফালাইসা ফাউক্বাকা শাইউন। ওয়া আনতাল বা-তিনু ফালাইসা দূনাকা শাইউন। ইকদ্বি আন্নাদ দাইনা ওয়া আগনিনা- মিনাল ফাক্বর।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আসমানসমূহ ও জমিনের প্রভু এবং মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রভু এবং সবকিছুর প্রভু, যিনি অঙ্কুরিত করেন শস্য বীজ ও আঁটি, যিনি নাযিল করেছেন তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান; আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আপনার কাছে আপনার নিয়ন্ত্রণে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই প্রকাশ্য, আপনার উপরে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই গোপন, আপনার নিম্নে আর কিছুই নেই। আপনি আমাদের ঋণমুক্ত করুন এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছলতা প্রদান করুন।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিছানায় শয়ন করার পরে (ডান কাতে শুয়ে) এই মুনাজাতটি পাঠ করতে শিক্ষা দিতেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে খাদিমা চাইলে তিনি তাঁকে দু'আটি শিখিয়ে দেন।[৩]

(১২) যিক্‌র নং ১৩২ :

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

উচ্চারণ: বিসমিকা রাব্বী ওয়াদ্বা'তু জানবী ওয়াবিকা আরফা'উহু। ইন আমসাকতা নাফসী ফার'হামহা-। ওয়াইন আরসালতাহা- ফা'হফাযহা বিমা- তা'হফাযু বিহী 'ইবা-দাকাস সালিহীন।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনার নাম নিয়ে আমার পার্শ্ব (বিছানায়) রাখলাম এবং আপনার নামেই তাকে উঠাব। আপনি যদি আমার আত্মাকে রেখে দেন (মৃত্যু দান করেন) তাহলে তাকে রহমত করবেন। আর যদি তাকে ছেড়ে দেন (ঘুমের পরে আবার জেগে উঠি) তাহলে আপনি তাকে হেফাযত করবেন যেভাবে আপনার নেককার বান্দাগণকে হেফাযত করেন।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন নিজের পোশাক দিয়ে হলেও বিছানাটি ঝেড়ে নেবে ... এরপর বলবে : (উপরের দু'আ) ।[৪]

<u>(১৩) যিক্‌র নং ১৩৩ : পূর্বোক্ত ৭৮ নং যিক্‌র (তিন বার)</u>

اللهم قــنـــي عــذابــك يــوم تــبــعــث عــبادك

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আসু ইবা-দাকা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমাকে রক্ষা করুন আপনার শাস্তি থেকে যেদিন আপনি পুনরুত্থিত করবেন আপনার বান্দাগণকে।"

উম্মুল মমিনীন হাফসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানর ইচ্ছা করলে তাঁর ডান হাত গালের নিচে রাখতেন। এরপর উপর্যুক্ত দু'আটি ৩ বার বলতেন। বারা ইবনু আযিব (রা) ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে একই অর্থে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসগুলির কোনোটি সহীহ কোনোটি হাসান।[১] ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতের পরেও এই দু'আটি বলতেন।

<u>(১৪) যিক্‌র নং ১৩৪ :</u>

باسمك ربي وضــعت جــنــبي فاغــفــر لي ذنــبي

উচ্চারণ : বিসমিকা রাব্বী, ওয়াদ্বা'অ্তু জানবী, ফাগফির লী যাম্বী।

অর্থ : "হে আমার প্রভু , আপনারই নামে শয়ন করলাম। আপনি আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন।"

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, নবীজী (ﷺ) যখন বিছানায় ঘুমের জন্য শয়ন করতেন, তখন উপরোল্লেখিত দু'আটি বলতেন। হাদীসটি হাসান।[২]

<u>(১৫) যিক্‌র নং ১৩৫ :</u>

باســمــك اللهم أمــوت وأحــيا

উচ্চারণ : বিসমিকা, আল্লা-হুম্মা, আমূতু ওয়া আ'হইয়া- ।

অর্থ: "আপনারই নামে, হে আল্লাহ, আমি মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত হই।"

হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুমানোর এরাদা করলে এই যিক্‌রটি বলতেন।[৩]

<u>(১৬) যিক্‌র নং ১৩৬ :</u>

الحمد لله الذي أطــعــمــنــا وســقانا وكــفانا وآوانا، فــكــم مــمــن لا كافــي له ولا مــؤوي

উচ্চারণ: আল'হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানা- ওয়া সাকা- না-, ওয়াকাফা-না- ওয়া আ-ওয়া- না-। ফাকাম স্মিান লা-কা-ফিয়া লাহু ওয়ালা- মু'ওয়ী।

অর্থ: "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাদ্য দান করেছেন, পানীয় দান করেছেন, সকল অভাব মিটিয়েছেন এবং আশ্রয় প্রদান করেছেন। কত মানুষ আছে, যাদের অভাব মেটানোর বা আশ্রয় প্রদানের কেউ নেই।"

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় শয়ন করতেন তখন এই দু'আটি বলতেন।[৪]

<u>(১৭) যিক্‌র নং ১৩৭ :</u>

(পূর্বোক্ত ১১৫ নং যিক্‌র, সকাল-সন্ধ্যা ১৬ নং)

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ...

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হযরত আবু বকরকে (রা) উপরের মুনাজাতটি সকালে, সন্ধ্যায় ও বিছানয় শোয়ার পরে পাঠের জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন।

<u>(১৮) যিক্‌র নং ১৩৮ :</u>

اللهم أمــتــعــني بسمعي وبــصري واجعــلــهما الوارث مني اللهم انصرني على عدوي وأرنــي فيه ثأري، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، ومن الجــوع فإنه بئس الضــجــيع

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আমতি'অ্নী বিসমা'ঈ, ওয়াবাসারী, ওয়াজ্-'আলহুমাল ওয়া-রিসা মিন্নী। আল্লা-হুমান্-সুরনী 'আলা-'আদুওঈ, ওয়া আরিনী ফীহি সা'রী। আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযু বিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি, ওয়া মিনাল জূ'ই, ফাইন্নাহু বি'সাদ্দ্বাজী'য়।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমরণ আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ন ও নিরাপদ রাখুন। হে আল্লাহ, আমাকে আমার শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করুন এবং তার জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমাকে দেখান। হে আল্লাহ, আমি ঋণের বোঝা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ক্ষুধা থেকে ; নিশ্চয় ক্ষুদা অত্যন্ত বাজে সঙ্গী।"

এই দু'আর বাক্যগুলি বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন সময়ে মুনাজাত করতেন বলে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নববী একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিছানায় শয়ন করার পরেও এই মুনাজাতটি বলতেন।[১]

(১৯). যিক্‌র নং ১৩৯ : (পূর্বোক্ত ১৮ নং যিক্‌র): ৩ বার

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্ 'আযীম, আল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা- হুআল 'হাইউল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ : "আমি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।"

আমরা এই বাক্যটির সাধারণ মর্যাদা ও গুরুত্ব আগেই জেনেছি। সাধারণভাবে সর্বদা এই যিক্‌রটি পালনীয়। ইমাম তিরমিযী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিছানায় শয়ন করার সময় এই কথাগুলি ৩ বার বলবে আল্লাহ তাঁর গোনাহসমূহকে ক্ষমা করবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়।" আল্লামা ইরাকীর বিবরণ অনুযায়ী হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[২]

(২০). যিক্‌র নং ১৪০ : ঘুমের আগে সর্বশেষ মুনাজাত :

اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াফাওআদ্বতু আমরী ইলাইকা,ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়ারাহবাতান ইলাইকা, লা- মালজাআ ওয়ালা- মানজা- মিনকা ইল্লা- ইলাইকা। আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা, ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি সমর্পণ করলাম আমাকে আপনার নিকট, দায়িত্বার্পণ করলাম আপনাকে আমার যাবতীয় কর্মের, আমার পৃষ্ঠকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পিত করলাম, আপনার প্রতি আশা ও ভয়ের সাথে। আপনার নিকট থেকে আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই ও কোনো মুক্তির স্থান নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর এবং আপনি যে নবী (ﷺ) প্রেরণ করেছেন তার উপর।"

হযরত বারা ইবনুল আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযুর মতো ওযু করবে। এরপর ডান কাতে শুয়ে বলবে : (উপরের বাক্যগুলি)। এই বাক্যগুলি তোমার শেষ কথা হবে (এর পরে আর কোনো কথাবার্তা বলবে না)। যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠের পরে সেই রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি ফিতরাতের উপরে (নিষ্পাপভাবে) মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে কল্যাণময় দিবস শুরু করবে।"[৩]

তাহাজ্জুদের নিয়্যাতসহ ঘুমাতে যাওয়া

ঘুমানোর সময় রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায়ের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে ঘুমাতে হবে। বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ তাহাজ্জুদ আদায়ের নিয়্যাতসহ ঘুমায় কিন্তু রাত্রে ঘুম থেকে উঠতে না পারে, তাহলেও সে তাহাজ্জুদের সাওয়াব লাভ করবে। এসকল হাদীসের একটি হাদীসে আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبت عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه

"যদি কেউ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করবে বলে নিয়্যাত করে ঘুমায়, কিন্তু তার ঘুমের আধিক্যের কারণে ভোরের আগে (ফজরের আগে) উঠতে না পারে, তাহলে তাঁর নিয়্যাত অনুসারে সাওয়াব তাঁর জন্য লিখা হবে, আর তাঁর ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য দান হিসাবে গণ্য হবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

রাত্রে ঘুম না হলে বা ঘুম ভেঙ্গে গেলে যিক্‌র

রাত্রে যে কোনো সময় ঘুম ভাঙ্গলে তাহাজ্জুদ আদায় করা যায়, তবে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায় উত্তম। রাতে ঘুম ভাঙ্গলে শোয়া অবস্থায় উপরে উল্লেখিত ৩৫ নং যিক্‌রটি (সকালের প্রথম যিক্‌র) পাঠ করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে নিজের জাগতিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় সকল বিষয়ে প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে শুয়ে শুয়ে যিক্‌র ও মুনাজাত করতে করতে আবার ঘুম এসে যাবে। আর তাহাজ্জুদের ইচ্ছা হলে তাহলে নিম্নলিখিতভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করতে হবে।

(৪) শেষ রাতের যিক্‌র

কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ও দরুদ পাঠ, দু'আ

হাদীস শরীফে ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, নফল ইবাদত ও ওযীফা পালনের অন্যতম সময় রাত।

বিশেষত কুরআন তিলাওয়াত, নফল সালাত, দরুদ পাঠ ও দু'আর অন্যতম সময় রাত। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এসকল ইবাদত রাত্রেই পালন করতেন, বিশেষত শেষ রাত্রে। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত রাতের কিছু সময়, বিশেষত শেষ রাতের কিছু সময় এ সকল ইবাদতে কাটানোর জন্য। প্রত্যেক যাকির নিজের সুবিধা ও অবস্থা অনুসারে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করবেন। কুরআন কারীম সম্পূর্ণ বা আংশিক মুখস্থ থাকলে তাহাজ্জুদের মধ্যেই বেশি বেশি তিলাওয়াত করে তাহাজ্জুদ আদায় করবেন। অন্যথায় তাহাজ্জুদের পরে কিছু সময় কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ পাঠ ও দু'আ করা উচিত। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম সময় রাত, বিশেষত রাতের শেষভাগ। এই সময়ে তাহাজ্জুদ ও দু'আর জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

কিয়ামুল্লাহই ও তাহাজ্জুদের গুরুত্ব ও মর্যাদা

'কিয়ামুল্লাইল' অর্থ রাতের কিয়াম বা রাত্রিকালীন দাঁড়ানো। সালাতুল ইশার পর থেকে ফজরের ওয়াক্তের উন্মেষ পর্যন্ত সময়ে যে কোনো নফল সালাত আদায় করলে তা 'কিয়ামুল্লাইল' বা 'সালাতুল্লাইল' অর্থাৎ রাতের দাঁড়ানো বা রাতের সালাত বলে গণ্য। 'তাহাজ্জুদ' অর্থ ঘুম থেকে উঠা। রাতে ঘুম থেকে উঠে আদায় করা সালাতকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। কেউ যদি ইশার সালাত আদায় করে রাত ৯টা বা ১০টায় ঘুমিয়ে পড়েন এবং ১১/১২টায় উঠে নফল সালাত আদায় করেন তবে তা 'কিয়ামুল্লাইল' ও'তাহাজ্জুদ' বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি ইশার পরে না ঘুমিয়ে রাত ১১/১২ টার দিকে কিছু নফল সালাত আদায় করেন তবে তা 'কিয়ামুল্লাইল' বলে গণ্য হলেও 'তাহাজ্জুদ' বলে গণ্য নয়।

ইসলামের অন্যতম নফল ইবাদত কিয়ামুল্লাইল। প্রথম রাতে বা শেষ রাতে, ঘুমানোর আগে বা ঘুম থেকে উঠে অন্তত কিছু নফল সালাত আদায় করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটু ঘুমিয়ে উঠে 'তাহাজ্জুদ'-রূপে কিয়ামুল্লাইল আদায় করলে তার সাওয়াব ও মর্যাদা বেশি। রাতের শেষভাগে তা আদায় করা সর্বোত্তম। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, রাতের শেষভাগ রহমত, বরকত ও ইবাদত কবুলের জন্য সর্বোত্তম সময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সাধারণত এ সময়েই কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন।

কুরআন কারীমে কোনো নফল সালাতের উল্লেখ করা হয়নি, এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতেরও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু তাহাজ্জুদের সালাতের কথা বারংবার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ও মুমিন জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, রাতের একাকী মুহূর্তে কিছু সময় আল্লাহর যিক্‌রে, তার সাথে মুনাজাতে এবং তাঁরই (আল্লাহর) ইবাদতে ব্যয় করা মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিয়ামুল্লাইল বা সালাতুল্লাইলের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এত বেশি নির্দেশনা দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলি একত্রিত করলে একটি বৃহদাকৃতি পুস্তকে পরিণত হবে। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দু'আ কবুলের সময়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আমর ইবনু আমবাসাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "মহান প্রতিপালক তাঁর বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন রাতের শেষ অংশে। কাজেই তুমি যদি সে সময়ে আল্লাহর যিক্‌রকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার তবে তা হবে।"

এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة (صلاة الليل) الصلاة في جوف الليل

"ফরয সালাতের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ সালাত রাতের সালাত বা রাতের গভীরে আদায়কৃত সালাত।"[১]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام

"হে মানুষেরা তোমরা সালামের প্রচলন কর, খাদ্য প্রদান কর, আত্মীয়তা রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় কর, তাহলে তোমরা শান্তিতে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" হাদীসটি সহীহ।[২]

আবূ উমামা বাহিলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسدز

"তোমরা অবশ্যই কিয়ামুল্লাইল পালন করবে। কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার মানুষদের অভ্যাস, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য, পাপের ক্ষমা, পাপ থেকে আত্মরক্ষার পথ এবং দেহ থেকে রোগব্যধির বিতাড়ন।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

সাহাবীগণ কিয়ামুল্লাইল পরিত্যাগ পছন্দ করতেন না। আয়েশা (রা) বলেছেন:

لا تدع قيام الليل فإن رسول الله (ﷺ) كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا

"কখনো কিয়ামুল্লাইল ত্যাগ করবে না ; কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো তা ত্যাগ করতেন না। যদি কখনো অসুস্থ থাকতেন অথবা

কিছুটা ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করতেন তাহলে তিনি বসে তা আদায় করতেন।"[১]

অনেক হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো সাহাবী তাহাজ্জুদ পালনে সামান্য অবহেলা করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপত্তি করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত 'বিত্র'-সহ মোট এগার রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি তাহাজ্জুদের আগে অনেক সময় কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন। কখনো কিছু তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিক্‌র করার পর তাহাজ্জুদ শুরু করতেন। তিনি তাহাজ্জুদের সালাতের তিলাওয়াত খুব লম্বা করতেন। এক রাক'আতে অনেক সময় ৪/৫ পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রুকু ও সাজদাও অনুরূপভাবে দীর্ঘ করতেন। যতক্ষণ তিনি তিলাওয়াত করতেন প্রায় ততক্ষণ রুকুতে ও সাজদায় থাকতেন। আর তিলাওয়াতের সময় তিনি কুরআনের আয়াতের অর্থ অনুসারে থেমে থেমে দু'আ করতেন। তাহাজ্জুদের সালাতের মধ্যে তিনি ক্রন্দন করতেন। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করার কারণে অনেক সময় তাঁর মুবারক পদযুগল ফুলে যেত। আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি যেন গোনাহগার লেখককে ও সকল পাঠককে তাঁর মহান রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত অনুসারে তাহাজ্জুদ আদায়ের তাওফীক দান করেন; আমীন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয় সংশ্লিষ্ট যিক্‌র ও দু'আ

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি আমরা দেখেছি যে, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি অধিকাংশ যিক্‌র উন্মুক্তভাবে সদা সর্বদা পালন করা যায়। এছাড় বিশেষ কিছু সময় নিরপেক্ষ যিক্‌র, সালাত বা দু'আ হাদীস শরীফে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যা যে-কোন সময়ে পালন করা যায়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে বিভিন্ন কর্ম ও ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্য বিভিন্ন রকম বিশেষ যিক্‌র শিক্ষা দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে এরূপ কিছু যিক্‌র, দু'আ ও সালাতের আলোচনা করতে চাই। আল্লাহই তাওফীক-দাতা।

প্রথমত, অতিরিক্ত কিছু নফল সালাত :

(ক). সালাতুত তাসবীহ :

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, যিক্‌রের মূল চারটি বাক্য হলে তাসবীহ 'সুবহানাল্লাহ' , তাহমীদ 'আল-হামদু লিল্লাহ' , তাহলীল 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং তাকবীর 'আল্লাহু আকবার'। যাকির এই বাক্যগুলি জপ করে বা যিক্‌র করে মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা, প্রশংসা, একত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করে। সালাতের মধ্যে এই যিক্‌রগুলি বিশেষ পদ্ধতিতে পালন করা হয় "সালাতুত তাসবীহ" নামাক সালাতে। চার রাক'আত সালাতে প্রতি রাক'আতে ৭৫ বার করে চার রাক'আতে মোট ৩০০ বার উক্ত যিক্‌রগুলি আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে সহীহ ও যয়ীফ অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবকে (রা) বলেন : "চাচাজি, আমি আপনাকে একটি বিশেষ উপহার ও বিশেষ অনুদান প্রদান করব, যা পালন করলে আল্লাহ আপনার ছোট, বড়, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, প্রকাশ্য, গোপন সকল গোনাহ ক্ষমা করবেন। – তা এই যে, আপনি চার রাক'আত সালাত আদায় করবেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো একটি সূরা পাঠ করবেন। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো সূরা পাঠের পর দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

উচ্চারণ : 'সুব'হা-নাল্লাহ, ওয়াল'হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লা-হু আকবার।' (পূর্বে উল্লেখিত ৪, ৯, ১ ও ১০ নং যিক্‌র একত্রে)।

এরপর রুকুতে যেয়ে রুকু অবস্থায় উপরের যিক্‌রগুলি ১০ বার, রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ১০ বার, সাজদা রত অবস্থায় ১০ বার, প্রথম সাজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে (বসা অবস্থায়) ১০ বার। এই মোট এক রাক'আতে ৭৫ বার (চার রাক'আতে মোট ৩০০ বার)। সম্ভব হলে আপনি প্রতিদিন একবার এই সালাত আদায় করবেন, না হলে প্রতি সপ্তাহে একবার, না হলে প্রতি মাসে একবার, না হলে প্রতি বৎসর একবার, না হলে অন্তত সারা জীবনে একবার এই সালাত আপনি আদায় করবেন।"

"সালাতুস তাসবীহ" সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীসই অত্যন্ত যয়ীফ সনদে বর্ণিত। একমাত্র এই হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[১]

ইমাম তিরমিযী প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক (১৮১ হি) থেকে "সালাতুত তাসবীহ" আদায়ের আরেকটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের মতে এই অতিরিক্ত যিক্‌র আদায়ের নিয়ম: নামায শুরু করে শুরুর দু'আ বা সানা পাঠের পরে ১৫ বার, সূরা ফাতেহা ও অন্য কোনো সূরা শেষ করার পরে ১০ বার, রুকুতে ১০ বার, রুকু থেকে উঠে ১০ বার, প্রথম সাজদায় ১০ বার, দুই সাজাদার মাঝে ১০ বার ও দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার মোট ৭৫ বার প্রতি রাক'আতে।

অর্থাৎ, এই নিয়মে কিরাআতের পূর্বে ও পরে দাঁড়ানো অবস্থায় ২৫ বার তাসবীহ পাঠ করা হয় আর দ্বিতীয় সাজাদার পরে বসা অবস্থায় কোনো তাসবীহ পড়া হয় না। পূর্বের হাদীসে বর্ণিত নিয়মে কিরাআতের পূর্বে কোনো তাসবীহ নেই। দাঁড়ানো অবস্থায় শুধু কিরাআতের পরে ১৫ বার তাসবীহ পড়তে হবে। প্রত্যেক রাক'আতে দ্বিতীয় সাজদার পরে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়তে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক বলেন, যদি এই সালাত রাত্রে আদায় করে তাহলে দুই রাক'আত করে পৃথকভাবে তা আদায় করবে। অর্থাৎ, দুই রাক'আত শেষে সালাম ফিরিয়ে আবার দুই রাক'আত পৃথকভাবে আদায় করবে। আর দিনের বেলায় এই সালাত পালন করতে ইচ্ছা করলে একত্রে চার রাক'আত আদায় করতে পারে, অথবা ইচ্ছা করলে পৃথকভাবে দুই রাক'আত করেও আদায় করতে পারে।

"সালাতুত তাসবীহ" আদায়ের সময় রুকু ও সাজদায় প্রথমে রুকু ও সাজদার মাসনূন তাসবীহ 'সুবহানার রাব্বিয়্যাল আযীম' ও 'সুবহানা রাব্বিয়্যাল আ'লা' নূন্যতম তিন বার করে পাঠ করার পরে অতিরিক্ত তাসবীহগুলি পাঠ করতে হবে।[২]

(খ). সালাতুত তাওবা

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে কোনো বান্দা যদি কোনো গোনাহের কর্ম করে সাথে সাথে সুন্দর করে ওযু করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন।"[৩]

(গ). সালাতুল ইস্তিখারা

ইস্তিখারার অর্থ কারো কাছে সঠিক বিষয় বেছে দেওয়ার প্রার্থনা করা। যে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা একাধিক বিষয়ের মধ্য থেকে

একটি বেছে নেওয়ার অবকাশ আছে সেখানে আল্লাহর সাথে পরামর্শ না করে কোনো কিছু বেছে নেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুমিনের উচিত নয়। ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করা, অর্থাৎ তাঁর মহান দরবারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক চাওয়া মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব।

যিক্‌র নং ১৪১ : ইস্তিখারার (সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের) দু'আ

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সকল বিষয়ে 'ইস্তিখারা' করতে শিক্ষা দিতেন, যেমন গুরুত্বের সাথে তিনি আমাদেরকে কুরআন কারীমের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন: যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ব্যাপারে মনের মধ্যে চিন্তা করবে তখন (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে) ফরয নয় এরূপ, অর্থাৎ নফল দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে অতঃপর বলবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ [يسمي حاجته] خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي [أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ] فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. [اللهم] وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي [أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ]فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আসতাখীরুকা বি'ইলমিকা, ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিক্বুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকাল 'আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু, ওয়ালা- আক্বদিরু, ওয়া তা'অ্লামু ওয়ালা- আ'অ্লামু, ওয়া আনতা 'আল্লা-মুল গুইউব। আল্লা-হুম্মা, ইন কুনতা তা'অ্লামু আন্না হা-যাল আমরা (উদ্দিষ্ট বিষয়ের নাম বলবে) খাইরুল লী ফী দীনী ওয়ামা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী ফাক্বদুরহু লী, ওয়া ইয়াসসিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহি। আল্লা-হুম্মা, ওয়া ইন কুনতা তা'অ্লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল লী ফী দীনী ওয়ামা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আমরী ফাস্বরিফহূ 'আন্নী, ওয়াস্বরিফনী 'আনহু ওয়াক্ব দুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না, সুম্মা আরদ্বিনী বিহী।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি আপনার জ্ঞান থেকে আমার জন্য সঠিক বিষয় নির্বাচন করবেন, আমি আপনার নিকট ক্ষমতা চাই আপনার ক্ষমতা থেকে এবং আমি আপনার নিকট চাই আপনার মহান করুণা ও বরকত থেকে। কারণ আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম, আপনি জানেন আর আমি জানি না, আর আপনি সকল গাইবের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ, যদি আপনি জানেন যে, এই বিষয়টি (নির্দিষ্ট বিষয়টির উল্লেখ করবে) কল্যাণ ও মঙ্গলময় আমার জন্য, আমার ধর্ম, আমার পার্থিব জীবন এবং আমার পরিণতির জন্য (অথবা বলেন : আমার নিকটবর্তী ও দূবরর্তী পরিণতির জন্য), তাহলে আপনি একে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন, সহজ করে দিন এবং আমার জন্য এতে বরকত প্রদান করুন। হে আল্লাহ, আর আপনি যদি জানেন যে, এই কর্মটি অমঙ্গলকর বা অকল্যাণকর আমার জন্য, আমার ধর্ম, জাগতিক জীবন ও আমার ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য (অথবা তিনি বলেন : আমার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী পরিণতির জন্য) তাহলে একে আমার নিকট থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে এর নিকট থেকে সরিয়ে নিন। আর যেখানেই কল্যাণ ও মঙ্গল থাকুক তাকে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন।"১

দ্বিতীয়ত, সালাতুল জানাযা ও তৎসংক্রান্ত কিছু যিক্‌র

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরেই অন্যতম ফরয ইবাদত জানাযার সালাত। আমাদের সমাজের অনেক ধার্মিক মুসলিমই এই ইবাদতের ক্ষেত্রে অবহেলা করেন। অনেকে মনে করেন, যেহেতু ফরযে কেফায়া সেহেতু কেউ পালন করলেই তো হলো। এ পলায়নী মনোবৃত্তি। মুমিনের এই দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। মুমিন দেখবেন, এই কর্মে আল্লাহ কত খুশি হবেন এবং কত সাওয়াব ও বরকত আমি লাভ করব।

জানাযার সালাতের জন্য অচিন্তনীয় সাওয়াব ও বরকতের কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর একটি কারণ এই ইবাদতটি সৃষ্টির সেবা কেন্দ্রিক, আর আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন তাঁর সৃষ্টির সেবাতে।

এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ

"কেউ যদি কারো জানাযার অনুগমন করে ও সালাতে অংশ গ্রহণ করে তবে সে এক 'কীরাত' সাওয়াব অর্জন করবে। আর যদি সে তার দাফনে (কবরস্থ করায়) উপস্থিত থাকে তাহলে সে দুই কীরাত সাওয়াব অর্জন করবে। এক কীরাত উহদ পাহাড়ের চেয়েও বড়।" হাদীসটি সহীহ।২

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বলেন :

من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر ﷺ أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله ﷺ ما اجتمعن في أمرىء إلا دخل الجنة

"তোমাদের মধ্যে আজ কে সিয়ামরত ছিলে? হযরত আবু বকর (রা) বলেন: আমি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রশ্ন করেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো জানাযায় শরীক হয়েছ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি প্রশ্ন করেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করেছ ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করেন: আজ তোমাদের কে অসুস্থ কোনো মানুষকে দেখতে গিয়েছ ? আবু বকর বলেন: আমি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই কর্মগুলি যদি কোনো মানুষের মধ্যে একত্রিত হয় তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতী হবেন।"১

পাঠক দেখতে পাচ্ছেন যে, এখানে চারটি ইবাদতের তিনটিই সৃষ্টির সেবা বিষয়ক। আল্লাহ আমাদেরকে এই গুণগুলি একত্রিত করার তাওফীক দান করেন।

অনেক ধার্মিক মুসলিম জানাযার সালাতের নিয়ম জানেন না বা ভয় পান। বস্তুত জানাযার সালাত অত্যন্ত সহজ ইবাদত। এর একমাত্র উদ্দেশ্য মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করা। মৃতের জন্য কিছু দু'আ ছাড়া অতিরিক্ত কোনো কিছু এতে নেই। আমাদের দেশে বানোয়াট একটি দীর্ঘ "নিয়্যাত" প্রচলিত আছে, যা একেবারেই ভিত্তিহীন ও খেলাফে সুন্নাত। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মৃতব্যক্তির জন্য জানাযার সালাত আদায় করছি, এই কথাটুকু মনের মধ্যে থাকাই যথেষ্ট।

৪টি তাকবীর ও সালামের মাধ্যমে এই সালাত আদায় করা হয়। ইমাম ও মুক্তাদীগণ সকলেই এই তাকবীরগুলি ও সালাম মুখে উচ্চারণ করবেন। প্রথমে মৃতের জন্য দু'আ করার আন্তরিক আবেগ ও নিয়্যাতসহ তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে সালাত শুরু করবেন। তাকবীরে তাহরীমার পরে আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সালাতের সানা (পূর্বোক্ত ৪৬ নং যিক্‌র) পাঠ করবেন। হাদীস শরীফে এ সময়ে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর দ্বিতীয় তাকবীরের পরে দরুদে ইবরাহীমী (পূর্বোক্ত ৩১ ও ৩২ নং যিক্‌র) পাঠ করবেন। এরপর তৃতীয় তাকবীরের পরে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবেন। এরপর ৪র্থ তাকবীর বলে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, জানাযার সালাত মূলত মৃতের জন্য দু'আ। বিভিন্ন হাদীসে জানাযার সালাতে মৃতের জন্য বেশি করে দু'আ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء

"যখন তোমরা মৃতের উপর (জানাযার) সালাত আদায় করবে তখন তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দু'আ করবে।"২

জানাযার সালাতের তৃতীয় তাকবীরের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দু'আ পাঠ করতেন। তিনি মৃতের জন্য এত দু'আ করতেন যে, পিছনের জীবিত সাহাবীগণ কামনা করতেন যে, আমরা যদি এই মাইয়েত হতে পারতাম তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই দু'আ আমরা পেতাম।

যে কোনো দু'আ পাঠ করলে, বা শুধুমাত্র (اللهم اغفر له) "আল্লাহ তাকে মাফ করে দিন" ইত্যাদি বাক্যের মাধ্যমে দু'আ করলেই দু'আর ন্যূনতম দায়িত্ব পলিত হবে। তবে মুমিনের উচিত একাধিক মাসনূন দু'আ মুখস্থ করে তা এই সময়ে পাঠ করা।

<u>যিক্‌র নং ১৪২ : জানাযার দু'আ-১</u>

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ]

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ, ওয়ার'হামহু, ওয়া'আ-ফিহী, ওয়া'অ্ফু 'আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহূ, ওয়া ওয়াসসি'য় মুদখালাহূ, ওয়াগসিলহু বিলমা-ই ওয়াস্‌সালজি ওয়াল বারাদি। ওয়া নাক্বক্বিহী মিনাল খাতা-ইয়া- কামা- নাক্বক্বাইতাস সাওবাল আবইয়াদ্বা মিনাদ দানাস। ওয়া আবদিলহূ দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহী, ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহী, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আ'ইযহু মিন আযাবিল ক্বাবরি (আযাবিন না-র)।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করুন, রহমত করুন, নিরাপত্তা দান করুন, তাকে মাফ করে দিন, তাকে সম্মানের সাথে আপনার কাছে স্থান দান করুন, তার প্রবেশস্থান (আবাসস্থান) প্রশস্থ করুন, তাকে পানি, বরফ ও শীল দিয়ে ধৌত করুন, তাকে পাপরাশি থেকে এমনভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করুন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে করেছেন। তাকে দান করুন তার (ফেলে যাওয়া) বাড়ির চেয়ে উত্তম বাড়ি, তার পরিজনের চেয়ে উত্তম পরিজন, তার দাম্পত্য সঙ্গীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী। তাকে আপনি জান্নাত প্রদান করুন এবং কবরের বা জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"৩

<u>যিক্‌র নং ১৪৩ : জানাযার দু'আ-২</u>

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলি 'হাইয়িনা- ওয়ামাইয়িতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়াগা-ইবিনা- ওয়া স্বাগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা-

ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসা-না। আল্লা-হুম্মা, মান আ'হইয়াইতাহূ মিন্না- ফাআ'হয়িহী 'আলাল ইসলা-ম। ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহূ মিন্না- ফাতাওয়াফফাহু 'আলাল ঈমা-ন। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বা'দাহু।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমাদের মৃতকে এবং জীবিতকে, উপস্থিতকে এবং অনুপস্থিতকে, ছোটকে এবং বড়কে, পুরুষকে এবং নারীকে। হে আল্লাহ, আমাদের মধ্য থেকে যাকে আপনি জীবিত রাখবেন, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাকে আপনি মৃত্যু দান করবেন, তাকে আপনি ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ তার (তার জন্য দু'আ করার বা সবর করার) পুরস্কার থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে ফিতনায় (পরীক্ষায় বা বিপদে) ফেলবেন না।"১

যিক্‌র নং ১৪৪ : জানাযার দু'আ-৩

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থ: "হে আল্লাহ, অমুকের সন্তান অমুক (মৃত ব্যক্তি ও তার পিতার নাম) আপনার যিম্মায় ও আপনার নৈকট্যের রশির মধ্যে। আপনি তাকে কবরের ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা পালন ও প্রশংসার অধিকারী। অতএব আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং রহমত করুন। নিশ্চয় আপনিই ক্ষমাশীল করুণাময়।"২

যিক্‌র নং ১৪৫: জানাযার দু'আ-৪

اللهم [أنت ربها، و]أنت خلقتها وأنت هديتها [للإسلام] وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বুহা-, ওয়া আনতা খালাক্বতাহা-, ওয়া আনতা হাদাইতাহা- লিল ইসলা-ম, ওয়া আনতা ক্বাবাদ্বতা রূহাহা-, তা'অ্লামু সিররাহা ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহা-, জিয়্না শুফা'আ-আ ফাগফির লাহা-।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি তার প্রভু, আপনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনিই তাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন, আপনিই তার রূহ গ্রহণ করেছেন, আপনি তার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। আমরা তার জন্য সুপারিশ (শাফা'আত) করতে এসেছি, অতএব আপনি তাকে ক্ষমা করে দেন।"৩

যিক্‌র নং ১৪৬: জানাযার দু'আ-৫

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হাসান বসরী (রাহ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন:

اللهم اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

উচ্চারণ : "আল্লা-হুম্মাজ'আলহূ লানা- ফারাত্বাও ওয়া সালাফাও ওয়া আজরান।"

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি একে আমাদের জন্য (জান্নাতের দিকে) অগ্রবর্তী, অগ্রগামী ও পুরস্কার হিসাবে সংরক্ষিত করুন।"৪

সালাতুল জানাযার পরে দু'আ মুনাজাত সুন্নাত বিরোধী

এক্ষেত্রেও অনেকে সুন্নাতের বিরোধিতা করেন। জানাযার সালাতের মধ্যে যে সময়ে মৃতের জন্য দু'আ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন ও যে সময়কে দু'আর জন্য নির্ধারণ করেছেন সে সময়ে মনদিয়ে মুনাজাত না করে, অনেকে জানাযার সালাতের সালাম ফেরানোর পরে সেখানে দাঁড়িয়ে আবারো দু'আ-মুনাজাত করি। জানাযার সালাতের সালামের পরের মুনাজাতের এই রেওয়াজটি আমাদের দেশের অনেক অঞ্চলেই ছিল না। কিন্তু এখন এই সুন্নাত বিরোধী কর্মটি ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে।

যারা একটির প্রচলন করছেন তারা এর পক্ষে অনেক যুক্তি প্রদান করেন। তাঁরা বলেন, মৃতের জন্য সাওয়াব রেসানীর নিয়্যাতে আমরা তা করি, জানাযার পরে একটি দেরি করা নিষিদ্ধ নয়... ইত্যাদি। অনেক হাদীস থেকে দলিল পেশ করেন। উপরে উল্লিখিত হাদীসে আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যখন তোমরা মৃতের উপর (জানাযার) সালাত আদায় করবে তখন তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দু'আ করবে।" তাঁরা বলেন যে, এ হাদীস থেকে মৃতের জানাযার পরে দু'আ করার নির্দেশ প্রমাণিত হয়। তাঁরা ভুলে যান অথব মনে করতে চান না যে, দু'আর ক্ষেত্রে ও সাওয়াব রেসানীর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণের সুন্নাতই সর্বোত্তম। তাঁরা কখনোই জানাযার সালাত আদায়ের পরে এভাবে সাওয়াব রেসানী করেন নি। একটি যয়ীফ বা মিথ্যা হাদীসও নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ বা পরবর্তী ইমামগণ কখনো একবারও জানাযার সালাতের সালাম ফেরানোর পরে আবার মৃতের জন্য মুনাজাত করেছেন। কখনোই তাঁরা জানাযার সালাম ফেরানোর পরে কাতার ভেঙ্গে বা কাতার ঠিক রেখে, অথবা কোনোভাবে দু'আ-মুনাজাত করেন নি। তাঁরা জানাযার সালাতের মধ্যে- সালামের পূর্বে- আন্তরিকতার সাথে মৃতের জন্য দু'আ করেছেন।

এ কারণে প্রাচীন যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ বারংবার বলেছেন যে, হাদীস নির্দেশিত এই দু'আর সময় জানাযার সালাতের মধ্যে তৃতীয় তাকবীরের পরে এবং জানাযার সালামের পরে আর কোনো দু'আ করা যাবে না।৫ কারণ এতে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো দু'আ-পদ্ধতির সাথে বৃদ্ধি ও সংযোগ করা হবে এবং তাঁর পদ্ধতি অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে। তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবূ বাকর ইবনু হামিদ বলেন:

إن الدعـــاء بعــد صـــلاة الجـــنـــازة مــكــروه

"সালাতুল জানাযার পরে দু'আ করা মাকরূহ'১

অনরূপভাবে হানাফী মাযহাবের অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহ ও ইমাম জানাযার সালাতের পরে দু'আ-মুনাজাত করা নিষেধ করেছেন এবং বিদ'আত বলে উল্লেখ করেছেন। দশম-একাদশ হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) তার প্রসিদ্ধ 'মিরকাত' গ্রন্থে বলেন:

لا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة؛ لأنه يشبه الزيادة على صلاة الجنازة

"সালাতুল জানাযার পরে মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করবে না; কারণ তা সালাতুল জানাযার সাথে অতিরিক্ত সংযোগ বলে গণ্য হবে।"২

বস্তুত, আমরা অনারব। আরবী ভাষায় সালাতুল জানাযার মধ্যে যে দু'আ আমরা পাঠ করি তাতে নিজেদের মনের আবেগ আসে না এবং মৃতের জন্য কী চাইলাম তা বুঝতে পারি না। আমাদের মনের মধ্যে আবেগ থাকে অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য। এজন্য আমরা এই খেলাফে সুন্নাত রীতিটি আমরা সহজেই গ্রহণ করি। একে হালাল করার জন্য অনেকে জানাযার কাতার ভেঙ্গে দেন, যেন জানাযার সাথে অতিরিক্ত সংযোগ বলে মনে না হয়। কিন্তু যেভাবেই আমরা তা করি না কেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের সাথে অতিরিক্ত সংযোজন হবেই। সালাতুল জানাযার সালামের পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত ছিল মৃতদেহ তুলে দাফনের জন্য অগ্রসর হওয়া। আর আমাদের সুন্নাত, মৃতদেহ রেখে দিয়ে কিছু সময় দু'আ করা। এখন অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতিতে কেউ জানাযার সালাত শেষে মৃতদেহ উঠিয়ে কবরের দিকে রাওয়ানা হলে আমাদের মনে হবে মৃতের জন্য দু'আ পুর্ণ হলো না। আর এভাবেই সকল বিদ'আতের উৎপত্তি।

এজন্য আমাদের দায়িত্ব হলো সুন্নাতের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখা। জানাযার মধ্যে যথাসম্ভব বুঝে ও মনোযোগের সাথে মৃতের জন্য দু'আ করা। যদি না বুঝতে পারি তবুও মনে করতে হবে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো ভাষায় মৃতের জন্য দু'আ করেছি। তার নাজাতের জন্য এই যথেষ্ট। এরপর মনের আবেগ দিয়ে দু'আ করার জন্য সারাটি জীবন আমাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

জানাযা বহনের সময় সশব্দে যিক্র করা মাকরুহ

জানাযার সালাতের পরে মৃতদেহের সাথে কবর পর্যন্ত গমন করা ও দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা মাসনূন ইবাদত। আমাদের দেশে অনেকে মৃতদেহ বহনের সময় মুখে শব্দ করে বিভিন্ন যিক্র করেন যা সুন্নাতের খেলাফ। আল্লামা কাসানী লিখেছেন :

ويطيل الصمت إذا أتبع الجنازة ويكره رفع الصوت بالذكر لما روي عن قيس بن عبادة أنــه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند ثلاثة عنـــد القتـــال وعنـــد الجنازة والذكر ولأنه تشبه بأهل الكتاب فكان مكروها.

জানাযার অনুসরণের সময় নীরবতাকে প্রলম্বিত করবে (পরিপূর্ণ নীরবতা পালণ করবে)। এ সময়ে সশব্দে যিক্র করা মাকরূহ। কারণ হযরত কাইস ইবনু উবাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তিন সময়ে শব্দ করা মাকরূহ জানতেন: যুদ্ধের সময়, জানাযার সময় ও যিক্রের সময়। এছাড়া এতে ইহুদী নাসারাদের অনুকরণ করা হয়, কাজেই তা মাকরূহ হবে।"৩

অসুস্থকে দেখতে যাওয়া

আমরা পূবের্র কোনো কোনো হাদীসে অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া, সান্ত্বনা প্রদান ও সেবা করার অফুরন্ত সাওয়াবের কথা জানতে পেরেছি। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন : যদি কোনো মুসলিম তার কোনো অসুস্থ ভাইকে দেখার জন্য পথ চলে তাহলে যতক্ষণ সে পথ চলে ততক্ষণ সে জান্নাতের বাগানের মধ্যে বিচরণ করতে থাকে। যখন সে উক্ত অসুস্থ মানুষের পাশে বসে তখন সে আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবে যায়। যদি সে সকালে অসুস্থকে দেখতে যায় তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকেন। আর যদি সে সন্ধ্যায় বের হয় তাহলে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে।" হাদীসটি সহীহ।৪

<u>যিক্র নং ১৫৭ : রোগী দেখার দু'আ-১</u>

لا بَـــأْسَ طَـــهُـــورٌ إِنْ شَـــاءَ اللَّهُ

উচ্চারণ : লা- বায়্সা, ত্বাহূরুন ইন শা- আল্লা-হ।

অর্থ : "কোনো অসুবিধা নেই, আল্লাহর মর্যিতে এই অসুস্থতা পাবিত্রতা (এর কারণে আল্লাহ আপনার পাপরাশি ক্ষমা করে আপনাকে পবিত্র করবেন)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো অসুস্থকে দেখতে গেলে এই কথাগুলি বলতেন।১

যিক্‌র নং ১৫৭ : রোগী দেখার দ'আ-২ (৭ বার)

أَسْــأَلُ اللَّهَ الْعَــظِـيمَ رَبَّ الْعَــرْشِ الْعَــظِيمِ أَنْ يَشْــفِيَــكَ

উচ্চারণ: আসআলুল্লা-হাল 'আযীম, রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম আইঁ ইয়াশফিইয়াকা

অর্থ: আমি প্রার্থনা করছি মহামর্যাদাময় আল্লাহর নিকট, যিনি মহামর্যাদাময় আরশের প্রভু, তিনি যেন তোমাকে সুস্থতা প্রদান করেন।

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কোনো মুসলিম কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেয়ে এই কথাগুলি ৭ বার বলেন তাহলে তার মৃত্যু উপস্থিত না হলে সে সুস্থতা লাভ করবেই।" হাদীসটি হাসান।২

তৃতীয়ত, সিয়াম ও আনুষঙ্গিক কিছু যিক্‌র

যিক্‌র নং : ১৫৮ নতুন চাঁদ দেখার যিক্‌র :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ [باليمن] وَالإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَــا يُحِــبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى رَبُّنَا [ربي] وَرَبُّكَ اللَّهُ

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবার। আল্লা-হুম্মা, আহিল্লাহু 'আলাইনা- বিলআমনি ওয়াল ঈমান, ওয়াস সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-ম। {ওয়াততাওফীক্বি লিমা- ইউ'হিব্বু রাব্বুনা- ওয়া ইয়ারদ্বা-।} রাব্বুনা- ওয়া রাব্বুকাল্লা-হু।

অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ, আপনি এই নতুন চাঁদের (নতুন মাসের) সূচনা করুন কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ঈমানের সাথে, শান্তি ও ইসলামরে সাথে {এবং আমাদের প্রভু যা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন তা পালনের তাওফীকসহ।} আমাদের ও তোমার হে নতুন চাঁদ) প্রভু আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলাল বা নতুন চাঁদ দেখলে (প্রথম ২/৩ দিনের চাঁদকে হেলাল বলা হয়) এই কথাগুলি বলতেন।৩ রমযান ও সকল মাসের নতুন চাঁদ দেখে এই দু'আ পাঠ করা মাসনূন। অনেকে চাঁদকে সালাম করে। কাজটি উদ্ভট ও বানোয়াট।

মুখে সিয়ামের নিয়্যাত পাঠ সুন্নাত বিরোধী

সিয়ামের শুরুতে কোনো মাসনূন যিক্‌র নেই। মুখে সিয়ামের নিয়্যাত পাঠ করা সুন্নাত বিরোধী কর্ম। "নাওয়াইতুআন" বলে যত প্রকার নিয়েত প্রচলিত সবই বানোয়াট কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ ও চার ইমামসহ কোনো ইমাম এগুলি বলেননি বা শেখাননি। সিয়াম পালনকারী সিয়াম অবস্থায় বেশি বেশি দু'আ করবেন ; কারণ সিয়াম অবস্থার দু'আ কবুল হয়, বিশেষত ইফতারের সময়। ইফতারের ২/১ টি মাসনূন যিক্‌র :

যিক্‌র নং ১৫৯ : ইফতারের দু'আ-১

ذَهَــبَ الظَّــمَأُ وَابْتَــلَّتِ الْعُــرُوقُ وَثَــبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

উচ্চারণ : যাহাবায যামাউ, ওয়াবতাল্লাতিল 'উরূকু, ওয়া সাবাতাল আজরু, ইন শা-আল্লা-হ।

অর্থ : পিপাসা চলে গেল, শিরা উপশিরা আর্দ্র হলো এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কার নিশ্চিত (পাওনা) হলো।"৪

যিক্‌র নং ১৬০ : ইফতারের দু'আ-২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) ইফতারের সময় বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

উচ্চারণ : "আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আসআলূকা বিরা'হমাতিকাল্লাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শাইয়িন আন তাগফিরালী।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনার সর্বব্যপী রহমতের ওসীলা দিয়ে আমি আপনার কাছে চাইছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।"৫

যিক্‌র নং ১৬১ : ইফতারের দু'আ-৩

একটি যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য হাদীসে নিম্নে দু'আটি বর্ণিত হয়েছে:

اللَّهُمَّ لَــكَ صُــمْــتُ وَعَلَى رِزْقِــكَ أَفْــطَــرْتُ [فــتــقــبل مــني إنــــك أنــت الســـــميع

العـــليم]

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনার জন্যই আমি সিয়াম পালন করেছি এবং আপনার রিযক দ্বারা ইফতার করেছি। অতএব আপনি আমার নিকট থেকে (আমার এই কর্ম) কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।" হাদীসটি যয়ীফ।১

যিক্‌র নং ১৬২ : খাবারের পূর্বের যিক্‌র

بِسْمِ اللَّهِ، بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন, খাদ্যগ্রহণের পূর্বে (বিসমিল্লা-হ), অর্থাৎ "আল্লাহর নামে" বলতে। যদি কেহ খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম বলতে ভুলে যায়, তাহলে বলবে : (বিসমিল্লা-হি ফী আউআলিহী ওয়া আ-খিরিহী), অর্থাৎ "আল্লাহর নামে এর প্রথমে এবং এর শেষে"।২

যিক্‌র নং ১৬৩ : খাবারের পরের যিক্‌র

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْـعَـمَـنِي هَـذَا الطَّـعَامَ وَرَزَقَـنِـيهِ مِنْ غَـيْـرِ حَـوْلٍ مِـنِّي وَلا قُـوَّةٍ

উচ্চারণ: আল'হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত'আমানী হা-যাত্ব ত্বা'আ-মা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি 'হাওলিম মিন্নী ওয়ালা-ক্কুওয়াহ।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এই খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমাকে তা প্রদান করেছেন, আমার কোনো অবলম্বন ও ক্ষমতা ছাড়াই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ খাদ্য গ্রহণ করে এই কথাগুলি বলে তাহলে তার পূর্বাপর সকল (সাধারণ সগীরা) গোনাহ ক্ষমা করা হবে।"৩

যিক্‌র নং ১৬৪ : গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-১

اللَّهُمَّ أَطْـعِـمْ مَنْ أَطْـعَـمَـنِي وَأَسْـقِ مَنْ أَسْـقَانِي

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী, ওয়াসক্বি মান আসক্বা-নী।

অর্থ : হে আল্লাহ, যে আমাকে খাইয়েছে তাকে আপনি খাদ্য প্রদান করুন এবং যে আমাকে পান করিয়েছে তাকে আপনি পানীয় প্রদান করুন।৪

যিক্‌র নং ১৬৫ : গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-২

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ

উচ্চারণ: আফত্বারা 'ইনদাকুমুস স্বা-ইমূন, ওয়া আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-র, ওয়া স্বাল্লাত 'আলাইকুমুল মালা-ইকাহ।

অর্থ: তোমাদের কাছে রোযাদারগণ ইফতার করুন, তোমাদের খাদ্য নেককার মানুষেরা ভক্ষণ করুন এবং তোমাদের জন্য ফিরিশতাগণ দু'আ করুন।

কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইফতার করালে বা সিয়াম ছাড়া অন্য সময়ে কোনো খাদ্য খাওয়ালে তিনি এ কথা বলে তার জন্য দু'আ করতেন।৫

যিক্‌র নং ১৬৬ : গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-৩

اللهم بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

"হে আল্লাহ, আপনি এদের যে রিয্‌ক প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে রহমত করুন।"

আব্দুল্লাহ্ বিনু বিশ্‌র বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিতার বাড়িতে আগমন করেন। তিনি তার সামনে কিছু খাদ্য পেশ করেন। তিনি তা থেকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করেন। আমার পিতা তাঁর নিকট দু'আ চান। তখন তিনি এ কথাগুলি বলেন।৬

চতুর্থত, আরো কিছু সাধারণ যিক্‌র :

যিক্‌র নং ১৬৭ : ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের যিক্‌র

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ : আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ : আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এই কথাগুলি বললে ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ক্রোধ দূরীভূত হবে।১

ইতোপূর্বে আমরা ক্রোধের ক্ষতি এবং ক্রোধ দমনের পুরস্কারের বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ক্রোধের সময় ক্রোধ দমন করা এবং যার উপরে রাগ হয়েছে তাকে ক্ষমা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহর রহমত, ক্ষমা ও জান্নাত লাভের অন্যতম পথ। কাজেই মুমিনের উচিত ক্রোধ অনুভব করলে অর্থের দিকে লক্ষ্য করে এই বাক্যটি বারবার বলা। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের অশুভ প্ররোচনা থেকে রক্ষা করেন।

যিক্‌র নং ১৬৮ : বিপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ

ইতোপূর্বে দুশ্চিন্তা ও বিপদ থেকে মুক্তির বিভিন্ন দু'আ আলোচিত হয়েছে: (১৯, ২৯ ও ৩০ নং যিক্‌র)। যে কোনো বিপদে, উৎকণ্ঠায় মুমিনের উচিত এগুলি বেশি বেশি করে পাঠ করা।

যিক্‌র নং ১৬৯ : ঋণমুক্তির দু'আ-১

আলীর (রা) নিকট এক ব্যক্তি ঋণমুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন, আমি তোমাকে তা শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমার যদি পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকে তাহলেও আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দেবেন এবং তোমাকে ঋণমুক্ত করবেন। তুমি বলবে:

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আ'গনিনী বিফাদলিকা 'আম্মান সিওয়াকা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি আপনার হালাল প্রদান করে আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার দয়া ও বরকত প্রদান করে আমাকে আপনি ছাড়া অন্য সকলের অনুগ্রহ থেকে বিমুক্ত করে দিন।" হাদীসটি সহীহ।২

যিক্‌র নং ১৭০ : ঋণমুক্তির দু'আ-২

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি বেশি নিম্নের দু'আটি বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল 'হাযানি ওয়াল 'আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া দিলা'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল।

অর্থ : "হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি দুশ্চিন্তা , দুঃখ-বেদনা, মনোকষ্ট, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের প্রাধান্য বা প্রভাবের অধীনতা থেকে।"৩

যিক্‌র নং ১৭১ : ঋণমুক্তির দু'আ-৩

(৩). হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হযরত মু'আযকে (রা) বলেন, যদি তুমি এই দু'আটি বলে প্রার্থনা কর তাহলে তোমার পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তা তোমার পক্ষ থেকে আদায় করে দেবেন :

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, মা-লিকাল মুলকি, তু'তিল মুলকা মান তাশা-উ ওয়া তানযি'উল মুলকা মিম্মান তাশা-উ। ওয়াতু'ইয্যু মান তাশা-উ ওয়া তুযিল্লু মান তাশা-উ বিইয়াদিকাল খাইরু, ইন্নাকা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। রাহমা-নাদ দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরাতি ওয়া রাহীমাহুমা-, তু'অতিহিমা- মান তাশা-উ ওয়া তামনা'উ মিনহুমা- মান তাশা-উ। ইর'হামনী রাহামতান তুগনীনী বিহা- 'আন রা'হ্‌মাতি মান্ সিওয়া-কা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, রাজাধিরাজ সকল রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব প্রাদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ের উপর শক্তিমান। পার্থিব জগৎ এবং পারলৌকি জগতের মহাকরুণাময় ও অপার দয়াশীল। আপনি যাকে ইচ্ছা এই করুণারাজী প্রদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। আপনি আমাকে এমন রহমত প্রদান করুন যে রহমত আমাকে আপনি ছাড়া অন্য কারো করুণা থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেবে।"৪

যিক্‌র নং ১৭২ : ব্যর্থতার যিক্‌র

قَـــدَرُ اللَّـهِ وَمَا شَـــاءَ فَعَلَ

উচ্চারণ : ক্বাদারুল্লা-হি ওয়ামা- শা-আ ফা‘আলা।

অর্থ : আল্লাহর নির্ধারণ এবং আল্লাহর যা ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে বেশি প্রিয় ও বেশি ভালো, যদিও সকল মুমিনের মধ্যেই ভালো রয়েছে। তোমার জন্য কল্যাণকর বিষয় অর্জনের জন্য তুমি ঐকান্তিক আগ্রহ ও সুদৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে চেষ্টা করবে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। কখনোই দুর্বল হবে না বা হতাশ হবে না। যদি তুমি কোনো সমস্যায় নিপতিত হও (তুমি ব্যর্থ হও বা তোমার প্রচেষ্টার আশানুরূপ ফল না পাও) তাহলে কখনই বলবে না যে, যদি আমি ঐ কাজটি করতাম! যদি আমি অমুক তমুক কাজ করতাম। বরং বলবে: (উপরের বাক্যটি); কারণ, অতীতের আফসোস মূলক (যদি করতাম) ধরনের বাক্যগুলি শয়তানের কর্মের পথ খুলে দেয়।”১

মুমিন কখনো দুর্বল, আশাহত, হতাশ হন না। ব্যর্থতার জন্য তিনি হাহুতাশ না করে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ সমর্পণ ও আস্থা নিয়ে পূর্ণোদ্যমে সামনে এগিয়ে চলেন। আল্লাহ তা‘লা আমাদেরকে দেহ, মন, ঈমান ও কর্ম সকল বিষয়ে শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তাওফীক দান করেন ; আমীন!

যিক্‌র নং ১৭৩ : কঠিন কর্মকে সহজ করার দু‘আ

اَللهم، لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, লা- সাহলা ইল্লা- মা- জা‘আলতাহূ সাহলান। ওয়া আনতা তাজ‘আলুল হাযনা ইযা- শিয়্তা সাহলান।

অর্থ : হে আল্লাহ আপনি যা সহজ করেন তা ছাড়া কিছুই সহজ নয়। আর আপনি ইচ্ছা করলে সুকঠিনকে সহজ করেন।২

যিক্‌র নং ১৭৪ : হাঁচির যিক্‌রসমূহ

(ক). কারো হাঁচি হলে তিনি বলবেন:

الحمد لله على كل حال

উচ্চারণ : আল-‘হামদু লিল্লা-হি ‘আলা- কুল্লি ‘হাল।

অর্থ : সকল অবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

(খ). হাঁচি প্রদানকারীকে (আল্-‘হামদু লিল্লা-হ) বলতে শুনলে শ্রোতা বলবেন:

يرحمك الله

উচ্চারণ : ইয়ার‘হাম্‌কাল্লা-হু। অর্থ : আল্লাহ আপনাকে রহমত করেন।

(গ). হাঁচিদাতাকে কেউ (ইয়ারহামুকাল্লাহ) বললে তিনি উত্তরে বলবেন:

يــــهــديــكــم الله ويـــصلـــح بالـــكم

উচ্চারণ : ইয়াহদিকুমুল্লা-হু ওয়া ইউস্বলিহু বা-লাকুম।

অর্থ : “আল্লাহ আপনাদেরকে হেদায়েত প্রদান করেন এবং আপনাদের অবস্থাকে ভালো ও পরিশুদ্ধ করেন।”

হাঁচি দিলে সুন্নাত– ‘আল‘হামদু লিল্লাহ’, ‘আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ বা ‘আল-হামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল’ বলা। হাঁচি-দাতা এই যিক্‌র করলে তাঁর পাওনা যে, যিনি উক্ত যিক্‌র শুনবেন তিনি তাঁকে (হাঁচি প্রদানকারীকে) দু‘আ করে বলবেন: ইয়ার‘হামুকাল্লা-হু। এই দু‘আর উত্তরে হাঁচি প্রদানকারী বলবেন : ইয়াহদিকুমুল্লা-হু, অথবা ইয়াহদিকুমুল্লা-হু ওয়া ইউস্বলিহু বা-লাকুম।

সালামের উত্তর প্রদানের ন্যায় হাঁচির দু‘আর উত্তর প্রদানের জন্য হাদীসে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সমাজে এই সুন্নাতগুলি অবহেলিত।

যিক্‌র নং ১৭৫ : পোশাক পরিধানের দু‘আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَـــسَانِي هَـــذَا الـــثَّـــوْبَ وَرَزَقَـــنِـــيهِ مِنْ غَـــيْـــرِ حَـــوْلٍ مِنِّي وَلا قُـــوَّةٍ

উচ্চারণ: আল‘হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যাসসাওবা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি ‘হাওলিম মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ।

অর্থ: প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমাকে তা প্রদান করেছেন, আমার কোনো অবলম্বন ও ক্ষমতা ছাড়াই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যদি কেউ পোশাক পরিধানের সময় এই কথাগুলি বলে তাহলে তার পূর্বাপর সকল (সাধারণ সগীরা) গোনাহ ক্ষমা করা হবে।”৩

যিক্‌র নং ১৭৬ : নতুন পোশাক পরিধানের দু‘আ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَــرِّهِ وَشَــرِّ مَــا صُنِعَ لَهُ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকাল ‘হামদু, আনতা কাসাওতানীহি। আসআলুকা খাইরাহু ওয়া খাইরা মা স্বুনি‘আ লাহু, ওয়া আ‘ঊযু বিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররি মা স্বুনি‘আ লাহূ।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনারই সকল প্রশংসা। আপনি আমাকে এইটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এর কল্যাণ এবং এর উৎপাদনের কল্যাণ। আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অকল্যাণ এবং এর উৎপাদনের অকল্যাণ থেকে।১

যিক্‌র নং ১৭৭ : নতুন পোশাক পরিহিতেরে জন্য দু‘আ

تُــبْــلَى وَيُــخْــلِــفُ اللَّهُ تَعَالَى

উচ্চারণ : তুবলা- ওয়া ইউখলিফুল্লা-হু তা‘আ-লা।

অর্থ : “এই পোশাক অতি ব্যবহ্যারে নষ্ট হোক এবং আল্লাহ এর বদলে অন্য পোশাক প্রদান করুন। (আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন যাতে আপনি এই নতুন পোশাক ব্যবহার করে নষ্ট করে নতুন পোশাক ব্যবহারের সুযোগ পান)।”

সাহাবীগণ কাউকে নতুন পোশাক পরতে দেখলে এই দু‘আ করতেন।২

যিক্‌র নং ১৭৮ : কারো ক্ষতির আশঙ্কা করলে আত্মরক্ষার দু‘আ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْــعَــلُــكَ فِي نُحُــورِهِمْ وَنَــعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্না- নাজ‘আলুকা ফী নু‘হূরিহিম ওয়া না‘ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ আমরা আপনাকে তাদের কণ্ঠদেশে রাখছি এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি তাদের অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে।৩

যিক্‌র নং ১৭৯ : প্রশাসনের জুলুমের ভয় পেলে আত্মরক্ষার দু‘আ

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان بن فلان وأحزابه مــن خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا اله الا أنت

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাব‘ই ওয়া রাব্বাল ‘আরশিল ‘আযীম, কুন লী জা-রান মিন ফুলা-ন ইবনু ফুলা-ন (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম) ওয়া আ‘হযা-বিহী মিন খালা-ইক্বিকা আইঁ ইয়াফরুত্বা ‘আলাইয়্যা আ‘হাদুম মিনহুম আও ইয়াত্বগা-, ‘আযযা জা-রুকা ওয়া জাল্লা সানা-উকা, ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ, সাত আসমানের প্রভু ও মহান আরশের প্রভু, আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করেন অমুকের পুত্র অমুক (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম) থেকে এবং আপনার সৃষ্টির মধ্য থেকে যারা তার দলবলে রয়েছে তাদের থেকে, তাদের কেউ যেন আমার বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করতে না পারে বা আমার উপর অত্যাচার বা বিদ্রোহ করতে না পারে। আপনি যাকে আশ্রয় দেন সেই সম্মানিত। আপনার প্রশংসা মহিমামণ্ডিত। আপনি ছাড়া কোনো মা‘বুদ নেই।” হাদীসটি সহীহ।৪

যিক্‌র নং ১৮০ : শিশুদের হেফাজতের দু‘আ

أُعِيذُكُمْ [أَعُوذُ] بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ

উচ্চারণ : উ‘ঈযুকুম {অথবা: আ‘ঊযু } বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিওঁ ওয়া হা-ম্মাহ, ওয়া ‘আইনিল লা-ম্মাহ।

অর্থ : আমি তোমাদেরকে আশ্রয়ে রাখছি (অথবা, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি) আল্লাহর পরিপূর্ণ কথাসমূহের, সকল শয়তান থেকে, সকল ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও প্রাণি থেকে এবং সকল ক্ষতিকারক দৃষ্টি থেকে।

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বাক্যগুলি দ্বারা হযরত হাসান ও হুসাইনকে (রা) হেফাজত করাতেন। তিনি বলতেন, হযরত ইবরাহীম (আ) এই বাক্যদ্বারা তার দুই সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাককে (আ) হেফাজত করাতেন।৫

সকল মুমিন পিতা ও মাতার উচিত সকাল ও সন্ধ্যায় এই বাক্যগুলি পাঠ করে সন্তানদের ফুঁক দেওয়া ও দু‘আ করা।

যিক্‌র নং ১৮১ : বিপদ-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তির দু‘আ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُــرْنِي فِي مُــصِــيــبَــتِي وَأَخْــلِــفْ لِي خَيْــرًا مِنْهَا

উচ্চারণ: ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রা-জিঊন। আল্লা-হুম্মাঅ্‌ জুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খাইরাম মিনহা-।

অর্থ: নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব। হে আল্লাহ আপনি আমাকে এই বিপদ মুসিবতের পুরস্কার প্রদান করুন এবং আমাকে এর পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম কিছু প্রদান করুন।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (ﷺ) বলতে শুনেছি, যদি কোনো মুসলিম বিপদগ্রস্ত হয়ে এই কথাগুলি বলে তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই উক্ত ক্ষতির পরিবর্তে উত্তম বিষয় দান করে ক্ষতিপূরণ করে দিবেন। উম্মু সালামাহ বলেন, আমার স্বামী আবু সালামাহর মৃত্যুর পরে আমি চিন্তা করলাম, আবু সালামার চেয়ে আর কে ভালো হতে পারে! ... তারপরও আমি এই কথাগুলি বললাম। তখন আল্লাহ আমাকে আবু সালামার পরে রাসূলুল্লাহকে (ﷺ) স্বামী হিসাবে প্রদান করেন।১

যিক্‌র নং ১৮২ : স্ত্রীকে গ্রহণের দু'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বাসর ঘরে নতুন স্ত্রীকে গ্রহণের সময় নিম্নের দু'আ বলতে শিখিয়েছেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা- ওয়া খাইরা মা- জাবালতাহা- 'আলাইহি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা- জাবালতাহা- 'আলাইহি।

অর্থ : হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে চাই, এই নারীর কল্যাণ এবং যা কিছু কল্যাণ এর প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে আপনি একে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই এই নারীর অকল্যাণ থেকে এবং যা কিছু অকল্যাণকর বিষয় এর প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে আপনি একে সৃষ্টি করেছেন।২

যিক্‌র নং ১৮৩ : সালাতের মধ্যে ওয়াসওয়াসা বন্ধের যিক্‌র :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

পূর্ববর্তী ১৫৪ নং যিক্‌র দেখুন।

উসমান ইবনু আবীল আস (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, শয়তান আমার ও আমার সালাতের (মনোযোগ আনয়নের) মধ্যে বাধ সাধে এবং আমার কিরাআত এলোমেলো করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : ঐ শয়তানের নাম : খিনযিব। যখন এরূপ অনুভব করবে তখন (আউযু বিল্লাহ ... উপরের যিক্‌র) পাঠ করে তোমার বাম দিকে থুথু ফেলবে। তিনবার করবে। উসমান (রা) বলেন : আমি এরূপ করলাম, ফলে আল্লাহ উক্ত শয়তানকে আমার থেকে দূর করে দিলেন।৩

যিক্‌র নং ১৮৪ : উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশক দু'আ

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

উচ্চারণ: জাযা-কাল্লা-হু খাইরান। অর্থ: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, মুমিন কাউকে উপকরার করলে কখনোই তার থেকে কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদানের আশা করে না। পক্ষান্তরে উপকৃত মুমিনের দায়িত্ব, উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তার প্রশংসা করা, তার উপকারের কথা অকপটে স্বীকার করা এবং তার জন্য দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ কারো উপকার করলে সে যদি উপকারীকে এই কথা বলে কৃতজ্ঞতা জানায় তাহলে তা সর্বোত্তম প্রশংসা করা হবে। হাদীসটি হাসান।৪

যিক্‌র নং ১৮৫: কাউকে প্রশংসা করার মাসনূন যিক্‌র

কোন মানুষের পিছনে নিন্দা ও সামনে প্রশংসা করা অপরাধ। অপরদিকে কারো ঢালাও প্রশংসা করা, বিশেষত আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা নেক আমলের ক্ষেত্রে কাউকে নিশ্চিতরূপে প্রশংসা করতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনার সময় তার সম্পর্কে নিজের ধারণা বলতে হবে এবং তার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহরই আছে বলে উল্লেখ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের যদি কখনো কাউকে প্রশংসা করতেই হয় তাহলে বলবে :

أَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا

"আমি অমুককে এইরূপ মনে করি, আল্লাহই তাকে ভালো জানেন (তার পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষক), আল্লাহর উপরে আমি কাউকে ভালো বলছি না। আমি তাকে অমুক অমুক গুণের অধিকারী বলে মনে করি।৫

যিক্‌র নং ১৮৬ : প্রশংসিতের দু'আ

সাহাবী-তাবেয়ীগণের রীতি ছিল, কেউ তাঁদেরকে পরহেযগার বা ধার্মিক বললে বা প্রশংসা করলে তাঁরা কষ্ট পেতেন। কেউ তাঁদের ভালো বললে তারা বলতেন:

اللهم لا تـــؤاخـــذني بما يقولون واغــفر لي ما لا يعـــــلمون واجـــعـــــلني خيـــــرا ممـــا يـــظـــنون

অর্থ : হে আল্লাহ, এরা যা বলছে এজন্য আমাকে দায়ী করবেন না, আর তারা যা জানে না, আমার সে সব পাপ আপনি ক্ষমা করে দিন এবং তারা যেরূপ ধারণা করছে আমাকে তার চেয়েও উত্তম বানিয়ে দিন ।১

পঞ্চম অধ্যায়

মাজলিসে যিক্‌র ও যিক্‌রের মাজলিস

মুমিনের জীবনে যিক্‌রের গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা আমরা শেষ করেছি। আল্লাহর দরবারে আর্জি জানাই, তিনি আমাদেরকে তা পালন করার তাওফীক প্রদান করবেন এবং দয়া করে কবুল করে নেবেন। সবশেষে যিক্‌রের মাজলিস, মুমিনের জীবনে তার গুরুত্ব, ফযীলত ও সাওয়াব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর রহমত ও তাওফীকের আশা করছি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করছি।

'মাজলিস' শব্দের অর্থ বৈঠক, বসা, council, assembly ইত্যাদি। এক ব্যক্তি একাকী কোথাও সামান্য সময়ের জন্য বসলেও তাকে আরবীতে 'মাজলিস' বলা হবে। অনুরূপভাবে দুই বা ততোধিক মানুষ একত্রে কিছুক্ষণের জন্য বসলে তাকেও মাজলিস বলা হবে। সাধারণভাবে 'মাজলিস' বলতে অল্প বা বেশি সময়ের জন্য একাধিক ব্যক্তির একত্রে বসাকে বুঝানো হয়।

ক. মাজলিসে আল্লাহর যিক্‌র

মাজলিসে আল্লাহর যিক্‌র দুই প্রকারে হতে পারে। প্রথম প্রকার– মাজলিস, সমাবেশ বা বৈঠকটি জাগতিক কোনো বিষয় কেন্দ্রিক হবে, তবে মাজলিসের মধ্যে মুমিন মাঝে মধ্যে আল্লাহর স্মরণ করবেন। দ্বিতীয় প্রকার – যে মাজলিসটি মূলতই আল্লাহর যিক্‌র-কেন্দ্রিক হবে।

প্রথম প্রকারের মাজলিসে বা সমাবেশে মুমিন দুইভাবে আল্লাহর যিক্‌র করতে পারেন: একাকী নিজের মনে বা সশব্দে আল্লাহর যিক্‌র করা এবং অন্যদেরকে যিক্‌রের কথা স্মরণ করানো। মুমিনের উচিত কোনো অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র থেকে মনকে বিরত না রাখা। বিশেষত যখন কয়েকজন বন্ধুবান্ধব বা কিছু মানুষের সাথে বসে কথাবার্তা বলবেন তখন মাঝে মাঝে আল্লাহর যিক্‌র করা খুবই প্রয়োজনীয়।

মানুষ সামাজিক জীব। কর্মস্থলে, চায়ের দোকানে, বাজারে, বাড়িতে বা অন্য কোথাও আমরা দুই বা ততোধিক মানুষ একত্রিত হলে কখনোই চুপ থাকতে পারি না। 'টক অব দা সিটি', 'টক অব দা কান্ট্রি' , 'টক অব দা ডে' বা এই জাতীয় বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিভিন্ন কথাবার্তায় আমারা মেতে উঠি। এ সকল কথাবার্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক এবং আখিরাত ধ্বংসকারী হয়, কারণ আমাদের কথাবার্তা অধিকাংশ সময় পরচর্চা, পরনিন্দা, হিংসা, ঘৃণা বা বেদনা উদ্রেককারী হয়ে থাকে।

যদি আমরা এসকল ক্ষতিকারক বিষয়াদি পরিহার করে শুধুমাত্র জাগতিক 'নির্দোষ' বিষয়; যেমন, - দ্রব্যমূল্য, নিজনিজ স্বাস্থ্য, পরিবার, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করি তাহলেও তা আমাদের জন্য কিছু ক্ষতি বয়ে আনে। তিনটি কারণে এই প্রকারের 'নির্দোষ' কথাবার্তার 'বৈঠক' আমাদের ক্ষতি করে:

প্রথমত, এ ধরনের 'নির্দোষ' কথাবার্তা সর্বদাই 'দোষযুক্ত' পরচর্চা বা হিংসা বিদ্বেষ উদ্রেককারী আলোচনায় পর্যবসিত হয়। অনুপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তির কথা আলোচনার মধ্যে চলে আসবেই এবং কোনো না কোনোভাবে আমরা গীবত ও বান্দার হক্ক নষ্ট করার মত কঠিন কবীরা গোনাহসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ি।

দ্বিতীয়ত, এ সকল 'নিদোর্ষ' আলোচনায় যদি মাঝে মাঝে আমরা আল্লাহর যিক্‌র-মূলক কোনো বাক্য না বলি তবে এই মাজলিস, বৈঠক বা আলোচনা কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। ইতঃপূর্বে আমরা এ বিষয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করেছি। উক্ত হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, যদি একাধিক মুসলিম কোথাও একত্রে কিছু সময়ের জন্যও বসেন এবং কিছু কথাবার্তা বলে উঠে যান, কিন্তু তাদের কথার মধ্যে আল্লাহর যিক্‌র ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর সালাত জ্ঞাপক কোনো কথা না থাকে, তবে কিয়ামতের দিন এই বৈঠকটি তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, কোনো ব্যক্তি যদি একাকী বা সমাবেশে কোথাও কিছু সময়ের জন্যও দাঁড়ায়, বসে, হাঁটে বা শয়ন করে, কিন্তু সেই বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা বা শোয়া অবস্থায় সে আল্লাহর যিক্‌র না করে, তবে তা তার জন আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة

"যদি কিছু মানুষ এমন কোনো বৈঠক শেষ করে উঠে, যে বৈঠকে তারা আল্লাহর যিক্‌র করেনি, তবে তারা যেন একটি গাধার মৃতদেহ (ভক্ষণ করে বা ঘাটাঘাটি করে) রেখে উঠে গেল। আর এই বৈঠক তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।"[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله عز وجل إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة

"কিছু মানুষ যদি একটি বৈঠকে বসে এবং এরপর তারা বৈঠক ভেঙ্গে চলে যায়, কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে তারা আল্লাহর যিক্‌র না করে তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ বৈঠক তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২]

তৃতীয়ত, এই প্রকারের 'নির্দোষ' গল্পগুজব বা আলোচনার 'মাজলিস' আমাদের কল্বগুলিকে শক্ত করে দেয়। দীর্ঘসময় এ সকল আলোচনা আমাদের মনকে কঠিন করে তোলে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى

"তোমরা আল্লাহর যিক্র ছাড়া বেশি কথা বলবে না; কারণ আল্লাহর যিক্র ছাড়া বেশি কথা হৃদয়কে কঠিক করে তোলে। আর আল্লাহর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মানুষ কঠিন হৃদয়ের মানুষ।"[১]

উপরের হাদীসগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যে, মুমিনের দায়িত্ব, যে কোনো বৈঠক, গল্পগুজব, আলোচনা বা কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মহান প্রভুর যিক্র করবেন। মাজলিসের অন্য কেউ যদি আল্লাহর যিক্র না করে, বা গরম গরম আবেগী কথায় মেতে থাকে তাহলেও মুমিন নিজের মনে মাঝে মাঝে আল্লাহর যিক্র করবেন। আর জনসমক্ষে, মাজলিসে, গাফিলদের মধ্যে মুমিনের এই প্রকার একাকী যিক্র অত্যন্ত ফযীলত, মর্যাদা ও সাওয়াবের বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. আল্লাহর যিক্রের মাজলিস

আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি যে, দ্বিতীয় প্রকারের মাজলিস আল্লাহর যিক্র কেন্দ্রিক। এগুলিকে 'যিক্রের মাজলিস' বলা হয়। 'যিক্রের মাজলিস' ঐ মাজলিস যেখানে কয়েকজন মুমিন একত্রিত হয়ে আল্লাহর গুণাবলী, নিয়ামত, বরকত, তাঁর দ্বীন, রাসূল (ﷺ)-এর বিধান, পুরস্কার, তাঁর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ইত্যাদির আলোচনা করেন; আল্লাহর প্রশংসা, মর্যাদা, মহত্ব, প্রবিত্রতা ও একত্ব উল্লেখ করেন; তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন বা তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে প্রার্থনা করেন। এক মাজলিসে সকল প্রকারের যিক্র একত্রিত হতে পারে বা কিছু কিছু যিক্রও হতে পারে।

ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর ও আসরের পরে কিছু মানুষের সাথে বসে আল্লাহর যিক্রে রত থাকার উৎসাহ প্রদান করেছেন। এছাড়া যিক্রের মাজলিসের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা এখানে এসকল হাদীস আলোচনা করব। সাথে সাথে এ সকল হাদীস থেকে জানতে চেষ্টা করব যে, যিক্রের মাজলিসের মাসনূন পদ্ধতি কি ? কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ যিক্রের মাজলিস করতেন ? তাঁরা এ সকল মাজলিসে কী যিক্র পালন করতেন এবং কিভাবে? যেন আমরা বিশুদ্ধভাবে অবিকল তাঁদের মতো যিক্রের মাজলিসে আল্লাহর যিক্র করে অগণিত পুরস্কার লাভ করতে পারি। সাথে সাথে যিক্রের মাজলিসের নামে খেলাফে সুন্নাত কর্মে নিপতিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি।

গ. সমাবেশে আল্লাহর যিক্রের ফযীলত

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন:

أنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ هم خير منهم

"আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাঁর সাথে থাকি। যদি সে আমাকে তাঁর মনের মধ্যে স্মরণ করে, তবে আমিও তাঁকে আমার মধ্যে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোনো সমাবেশে বা কিছু মানুষের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাঁকে স্মরণ করি তাঁর সমাবেশের চেয়ে উত্তম সমাবেশে।"[২]

"সমাবেশে আল্লাহর যিক্রের" – এই ফযীলত বান্দা দুভাবে লাভ করতে পারেন। তিনি দুভাবে সমাবেশে আল্লাহর যিক্র করতে পারেন।

প্রথমত, সমাবেশে বা মানুষের মধ্যে বসে মুমিন বান্দা তাঁর মনকে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ রেখে নিজের মনে আল্লাহর যিক্রে রত থাকবেন। এ সমাবেশে একাকী যিক্র। হাদীস শরীফে এই প্রকারের যিক্রের বিশেষ মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। এই পর্যায়টি উপরে আলোচিত "মাজলিসে আল্লাহর যিক্রের" অন্তর্গত।

দ্বিতীয়ত, সমাবেশে অন্যদের সাথে তিনি আল্লাহর যিক্র করবেন। এই পর্যায়টি উপরে উল্লেখিত "যিক্রের মাজলিস" পর্যায়ের। এই ধরনের সমাবেশ বা মালিস "আল্লাহর যিক্র" কেন্দ্র করেই সংঘটিত ও আবর্তিত হয়। পরবর্তী আলোচনায় দেখব এই প্রকারের মাজলিস বা সমাবেশে কোন্ কোন্ প্রকারের যিক্র কী-ভাবে পালন করা হয়। তার আগে আমরা এই দ্বিতীয় প্রকারের সমাবেশ বা যিক্রের মাজলিসের ফযীলত আলোচনা করব।

ঘ. যিক্রের মাজলিসের ফযীলত

সাধারণভাবে যিক্রের মাজলিসের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا حَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ

السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) বসে মহা মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণ (যিক্র) করে, তখনই ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আবৃত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাদের স্মরণ (যিক্র) করেন তাঁর (আল্লাহর) নিকট যারা আছেন তাদের মধ্যে।"[১]

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل [لا يريدون بذلك إلا وجهه] إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات

"যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিক্রে রত হয়, এদ্বারা তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই চায় না, তখনই আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী তাঁদেরকে ডেকে বলেন, তোমরা পরিপূর্ণ ক্ষমাপ্রাপ্ত-গোনাহমুক্ত হয়ে উঠে যাও, তোমাদের পাপগুলিকে পুণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে।"[২]

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, আজ জমায়েতের দিনে সবাই জানবে কারা সম্মানের অধিকারী। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, সম্মানের অধিকারী কারা? তিনি বলেন:

مجالس الذكر في المساجد

"মসজিদের ভিতরের যিক্রের মাজলিসগুলি।"[৩]

আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه

"কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে উঠাবেন যাঁদের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত থাকবে। তাঁরা মুক্তাখচিত মিম্বরের উপর থাকবে। সকল মানুষ যাঁদের নিয়ামত দেখে নিজেদের জন্য এই নিয়ামত কামনা করবে। তাঁরা নবী নন বা শহীদও নন।" তখন একজন বেদুঈন হাঁটু গেড়ে বসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাঁদের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যেন আমরা তাঁদের চিনতে পারি। তিনি বলেন : "তাঁরা ঐসব মানুষ যাঁরা একে অপরকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠী ও বিভিন্ন এলাকা বা দেশ থেকে এসে তাঁরা আল্লাহর যিক্রের জন্য একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিক্র করবে।" হাদীসটি হাসান।[৪]

আমর ইবনু আনবাসাহ (রা) থেকে বর্ণিত এই অর্থের অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসকল মহান সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত মানুষদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন :

هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه

"এরা হলেন বিভিন্ন গোত্র, দেশ বা এলাকা থেকে আগত মানুষ, যাঁরা আল্লাহর যিক্রের জন্য সমবেত হন এবং সুন্দর ও পবিত্র বাক্যসমূহ চয়ন করেন, যেমনভাবে খেজুর ভক্ষণকারী ভালো ভালো খেজুর বেছে বেছে নেয়।"[৫]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যিক্রের মাজলিসের গনীমত (লাভ) কী ? তিনি বলেন :

غنيمة مجالس الذكر الجنة

"যিক্রের মাজলিসসমূহের গনীমত বা লাভ জান্নাত।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৬]

৬. যিক্রের মাজলিসের যিক্রসমূহ

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা কিছু মানুষ একত্রিত বসে আল্লাহর যিক্র করলে কী মহান মর্যাদা ও অভাবনীয় পুরস্কারের লাভ করবেন তা জানতে পারছি। এখন প্রশ্ন: একত্রে বসে যিক্রের নিয়ম, পদ্ধতি ও কর্মাবলি কী কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি যিক্রের মাজলিসের যিক্র ও কর্মের বর্ণনা দিয়েছেন? দিলে আমরা ঠিক সেই কাজগুলিই করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কি যিক্রের মাজলিসে বসতেন? বসলে কিভাবে বসতেন? আমরা ঠিক তাঁদের মতো বসার চেষ্টা করব। কারণ, আমরা জানি যে, যে কোনো ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে তাঁরাই পূর্ণাঙ্গ আদর্শ।

<u>১. কুরআন তিলাওয়াত ও আলোচনা</u>

কুরআনী যিক্রের আলোচনার সময় আমরা যিক্রের মাজলিসের একটি স্পষ্ট বিবরণ পেয়েছি। আমরা দেখছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন: "যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে ও পরস্পরে তা শিক্ষা ও আলোচনা করতে থাকে, তখনই তাঁদের উপর প্রশান্তি নাজিল হতে থাকে, আল্লাহর রহমত তাঁদের আবৃত করে নেয়, ফিরিশতাগণ তাঁদের ঘিরে ধরে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থদের নিকট তাঁদের যিক্র করেন।"

যিক্রের মাজলিসের ফযীলতে উপরে উল্লেখিত হাদীসগুলির সাথে এই হাদীস একত্রিত করে আমরা জানতে পারি যে, যিক্রের মাজলিসে সমবেত মুমিনগণের অন্যতম একটি যিক্র কুরআন তিলাওয়াত ও আলোচনা করা।

২. আল্লাহর নিয়ামত আলোচনা ও হামদ-সানা পাঠ

সাহাবীগণের যিক্রের মাজলিসের অন্য একটি বিশেষ দিক ছিল আল্লাহর নিয়ামতের কথা পরস্পরে আলোচনা করা, আল্লাহর প্রশংসা করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বেরিয়ে সাহাবীগণের একটি বৃত্তে (কয়েকজন সাহাবী বৃত্তাকারে বসে ছিলেন সেখানে) উপস্থিত হন। তিনি বলেন, তোমরা কিজন্য বসেছ? তাঁরা বললেন: আমারা বসে বসে আল্লাহর যিক্র করছি এবং তাঁর হামদ বা প্রশংসা করছি, কারণ তিনি আমাদেরকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং ইসলামের মাধ্যমে আমাদের উপর তিনি করুণা করেছেন। তিনি বললেন: আল্লাহর নামে প্রশ্ন করছি, সত্যিই কি তোমরা শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে বসেছ? তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা একমাত্র এই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে বসিনি। তিনি বলেন: আমি তোমাদের প্রতি সন্দেহবশত তোমাদেরকে শপথ করাইনি। বরং জিবরীল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ফিরিশতাগণের কাছে তোমাদের জন্য গৌরব প্রকাশ করছেন। (এই সুসংবাদ প্রদানের জন্যই শপথ করিয়েছি)।"[১]

সুবহানাল্লাহ! কত বড় মর্যাদা। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে নিয়ে গৌরব প্রকাশ করেন। কারণ তাঁরা জাগতিক বিষয়াদি আলোচনার জন্য নয়, বরং আল্লাহর নিয়ামত আলোচনা, তাঁর প্রশংসা করা ও তাঁরই কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সমবেত হয়েছে। জাগতিক ব্যস্ততা, প্রয়োজন, লোভ, মোহ বা অন্য কোনো কিছুই তাঁদেরকে প্রভুর স্মরণ ও তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এভাবে তাঁরা ফিরিশতাগণের উর্ধ্বে উঠেছেন।

এই হাদীস থেকে আমরা সাহাবীগণ কিভাবে যিক্রের মাজলিস করতেন তা বুঝতে পারি। তাঁরা একত্রে বসে আল্লাহর নিয়ামতের কথা আলোচনা করতেন এবং আলোচনার সাথে সাথে তাঁর হামদ, সানা, ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

৩. তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ, ইস্তিগফার, দু'আ

অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা মাজলিসের যিক্রের আরো বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلائكَةً سَيَّارَةً فُضُلا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْر فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لا أَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.

"আল্লাহর কিছু অতিরিক্ত পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছেন (যারা বিশ্বে ঘুরে) যিক্রের মাজলিসগুলির খোঁজ করেন। যদি কোনো যিক্রের মাজলিস পেয়ে যান, তারা সেখানে তাঁদের সাথে বসে পড়েন এবং তাঁদের একে অপরকে পাখা দিয়ে ঘিরে ধরেন। এভাবে তারা প্রথম আসমান পর্যন্ত পূর্ণ করেন। যখন মাজলিসের মানুষেরা বিচ্ছিন হয়ে যান (মাজলিস শেষে চলে যান) তখন তারা উর্ধ্বে উঠেন। মহান আল্লাহ যিনি সবই জানেন, তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: তোমরা কোথা থেকে আসছ? তাঁরা বলেন: আমরা দুনিয়ায় আপনার কিছু বান্দার নিকট থেকে এসেছি যাঁরা আপনার 'তাসবীহ' (সুব'হানাল্লাহ) বলেছেন, 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার) বলেছেন, 'তাহলীল' (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলেছেন, 'তাহমীদ' (আল 'হামদু লিল্লাহ) বলেছেন এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করেছেন। মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন: তাঁরা কী প্রার্থনা করেছে? তাঁরা বলেন: তাঁরা আপনার জান্নাত (বেহেশত) প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা বলেন: তারা কি জান্নাত দেখেছে? তারা বলেন: হে প্রভু, না, তাঁরা জান্নাত দেখেনি। তিনি বলেন: যদি তাঁরা জান্নাত দেখত তাহলে কী হতো? ফেরেশতারা বলেন: তাঁরা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। তিনি বলেন: তারা আমার কাছে কী থেকে আশ্রয় চেয়েছে? তাঁরা বলেন: হে প্রভু, তাঁরা আপনার জাহান্নাম থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছে। তিনি বলেন: তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা উত্তরে বলবেন: না, হে প্রভু। তিনি

বলেন: যদি তাঁরা আমার জাহান্নাম দেখত তাহলে কী অবস্থা হতো? তাঁরা বলেন: এছাড়া তাঁরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তিনি বলেন: আমি তাঁদের ক্ষমা করলাম, তাঁদের প্রার্থনা কবুল করলাম, তাঁরা যা থেকে আশ্রয় চায় তা থেকে তাঁদেরকে আশ্রয় প্রদান করলাম। ফিরেশতাগণ বলেন: হে প্রভু, তাঁদের মধ্যে একজন অন্যায়কারী-গোনাহগার বান্দা আছে যে, মাজলিস অতিক্রম করে যাচ্ছিল তাই একটু বসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি তাঁকেও ক্ষমা করলাম, তাঁরা এমন সম্প্রদায় যাঁদের সাথে কেউ বসলে সে দুর্ভাগা হবে না।"[১]

৪. সালাত বা দরূদ পাঠ ও দু'আ

উপরের হাদীসে আমরা দেখছি যে, যিক্‌রের মাজলিসে উপস্থিত মুমিনগণ সাতটি কর্ম করেন: **(১).** তাসবীহ বা 'সুব'হানাল্লাহ' বলা, **(২).** তাকবীর বা 'আল্লাহু আকবার' বলা, **(৩).** তাহলীল বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, **(৪).** তাহমীদ বা 'আল হামদু লিল্লাহ' বলা, **(৫).** দু'আ করা বা জান্নাত প্রার্থনা করা, **(৬).** জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, এবং **(৭).** ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা।

কোনো কোনো অপ্রসিদ্ধ বর্ণনায় ৮ম কাজ হিসাবে সালাত (দরূদ) পাঠের কথা বলা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إن لله سيارة من الملائكة، إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدوا، فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم، فإذا صلوا على النبي ﷺ صلوا معهم، حتى يفرغوا، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء، يرجعون مغفورا لهم.

"মহান আল্লাহর কিছু পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছেন যাঁরা যিক্‌রের মাজলিস দেখলে একে অপরকে বলেন: বসে পড়। যখন মাজলিসের মানুষেরা দু'আ করে তখন তারা তাঁদের দু'আর সাথে 'আমীন' বলেন। আর যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) উপর সালাত পাঠ করে তখন তারাও (ফিরিশতাগণ) তাঁদের সাথে সালাত পাঠ করেন। শেষে যখন মজলিস ভেঙ্গে সবাই চলে যায় তখন তারা একে অপরকে বলেন: এই মানুষগুলির জন্য কত বড় সুসংবাদ! কত বড় সৌভাগ্য !! তাঁরা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে।" হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে।[২]

অন্য একটি গ্রহণযোগ্য হাদীসে সালাত (দরূদ) পাঠ ছাড়া আরো ৩ টি আমলের কথা বলা হয়েছে : (১). কুরআন তিলাওয়াত, (২). আল্লাহর নিয়ামতের মহত্ত্ব বর্ণনা ও (৩). দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করা ; – যে বিষয়ে অন্যান্য হাদীস ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر ... ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلائك ويتلون كتابك، ويصلون على نبيك محمد ﷺ، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم، فيقول تبارك وتعالى: غشوهم رحمتي، فيقولون: يا رب، إن فيهم فلانا الخطاء، إنما اعتنقهم اعتناقا، فيقول تبارك وتعالى: غشوهم رحمتي، فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم.

"মহান আল্লাহর কিছু পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছেন যাঁরা যিক্‌রের মাজলিস অনুসন্ধান করেন। ...তাঁরা যিক্‌রের মাজলিস সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে বলেন: হে প্রভু, আমরা আপনার এমন কিছু বান্দার নিকট থেকে এসেছি যাঁরা আপনার নিয়ামতসমূহের মহত্ত্ব বর্ণনা করেছে, আপনার গ্রন্থ কুরআন করীম তিলাওয়াত করেছে, আপনার নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর সালাত পাঠ করেছে এবং তাঁদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ বলেন : তাঁদেরকে আমার রহমত দিয়ে আবৃত করে দাও। তারা বলবেন : ইয়া রাব, তাঁদের মধ্যে একজন পাপী মানুষ আছে, যে হঠাৎ করে তাঁদের মাঝে এসে বসেছে। আল্লাহ বলবেন : তাঁদেরকে আমার রহমত দিয়ে ঢেকে দাও, কারণ তাঁরা এমন সাথী, তাঁদের সাথে যে বসবে সে আর দুর্ভাগা থাকবে না (সেও রহমত পাবে, যদিও সে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের সাথে বসেছে)।"[৩]

৫. সাহাবীগণের যিক্‌রের মাজলিসের আরেকটি উদাহরণ

উপরের হাদীসগুলিতে আমরা যিক্‌রের মাজলিসের ফযীলত ও মাজলিসে কী কী যিক্‌র পালন করতে হবে তার বিবরণ দেখতে পেয়েছি। আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ সুযোগমতো একত্রিত হয়ে এভাবে পরস্পরে আল্লাহর নিয়ামত আলোচনা করতেন এবং আল্লাহ্র তাসবীহ, তাহমীদ করতেন। তাবিয়ী আবু সাঈদ মাওলা আবী উসাইদ বলেন, উমর (রা) রাত্রে মসজিদে নববীর মধ্যে ঘুরে ফিরে দেখতেন। সালাতরত ব্যক্তিগণকে ছাড়া সবাইকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। তিনি একদিন এভাবে মসজিদ ঘুরে দেখার সময় কয়েকজন সাহাবীকে একত্রে বসা অবস্থায় দেখতে পান, যাঁদের মধ্যে উবাই ইবনু কা'ব (রা) ছিলেন। উমর (রা) বলেন: এরা কারা? উবাই (রা) বলেন: হে আমীরুল মুমিনীন, এরা আপনারই পরিবারের কয়েকজন। তিনি বলেন: আপনারা সালাতের পরে বসে আছেন কী জন্য? উবাই বলেন: আমরা আল্লাহর যিক্‌র করতে বসেছি। তখন উমর (রা) তাঁদের সাথে বসলেন। এরপর তাঁর সবচেয়ে কাছের ব্যক্তিকে বললেন : শুরু কর। তখন সেই ব্যক্তি দু'আ করলেন। এরপর উমর (রা) একে একে প্রত্যেককে দিয়ে দু'আ করালেন এবং শেষে আমার পালা এসে গেল। আমি তাঁর পাশেই ছিলাম। তিনি বললেন : শুরু কর। কিন্তু (উমরের উপস্থিতিতে) আমি একদম আটকে গেলাম ও কাঁপতে লাগলাম। আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না। তিনি আমার কাঁপুনি অনুভব করতে লাগলেন। তখন বললেন: কিছু অন্তত বল, নাহলে অন্তত বল :

اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, আমাদেরকে রহমত করুন ।"

আবু সাঈদ বলেন: এরপর হযরত উমর শুরু করলেন, তখন সমবেত মানুষদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ কাঁদল না । সবার চেয়ে বেশি ক্রন্দন করলেন এবং বেশি অশ্রুপাত করলেন তিনি নিজে । এরপর তিনি সবাইকে বললেন : মাজলিসের শেষ । তখন সবাই যার যার পথে চলে গেলেন ।"[১]

এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, ইস্তিগফার ও দু'আ যিক্‌রের মাজলিসের অন্যতম বিষয় । আমরা সাহাবীগণের যিক্‌রের মাজলিসের প্রকৃতিও জানতে পারছি । তাঁরা প্রত্যেকে পালা করে আলোচনা ও দু'আ করতেন । আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটি করতেন ।

৬. জান্নাতের বাগানে বিচরণ : তাসবীহ, তাহলীল, ওয়ায ও ইল্‌ম

কয়েকটি হাদীসে যিক্‌রের মাজলিসকে জান্নাতের বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে । এসকল হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে । তবে একই অর্থে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ফলে হাদীসটির গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে । এজন্য এখানে তা উল্লেখ করছি । আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر

"যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে গমন করবে তখন বিচরণ ও ভক্ষণ করবে । সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন : জান্নাতের বাগান কি ? তিনি বলেন : যিক্‌রের বৃত্তসমূহ (মাজলিসসমূহ) ।"[২]

কী এই যিক্‌র? এই যিক্‌র কিভাবে করতে হবে? কোথায় এবং কিভাবে জান্নাতের বাগানে বিচরণ করতে হবে? অন্যান্য হাদীসে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে । আল্লাহর যিক্‌রের মাজলিসের জন্য সর্বোত্তম স্থান আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহ । এজন্য মসজিদকে বিশেষভাবে জান্নাতের বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে । আর অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, জান্নাতের বাগানে আল্লাহর যিক্‌র বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়েছেন – মসজিদে বসে তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর ও ওয়ায বা ইল্‌মী আলোচনা ।[৩] আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت يا رسول الله وما رياض الجنة قال المساجد قلت وما الرتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

"যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে গমন করবে তখন সেখানে মনভরে বিচরণ ও ভক্ষণ করবে । আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগান কী? তিনি বলেন: মসজিদগুলি । আমি বললাম: বিচরণ ও ভক্ষণ করা কী ? তিনি বলেন: 'সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ।"[৪]

হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة قال مجالس العلم

"তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে গমন করবে, তখন বিচরণ ও ভক্ষণ করবে । সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: জান্নাতের বাগান কী? তিনি বলেন: ইল্‌মের মাজলিসসমূহ ।"[৫]

সাহাবীগণ এই ধরনের ঈমান বৃদ্ধিকারক ইল্‌ম ও ওয়াজের মাজলিস খুবই পছন্দ করতেন । আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা) কোনো সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন: আসুন কিছুক্ষণের জন্য আমরা আমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনি (অর্থাৎ, তাঁর প্রতি ঈমান বৃদ্ধি করি) । একদিন তিনি এই কথা বলাতে একব্যক্তি রেগে যান । তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর কাছে এসে বলেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার আচরণ দেখছেন না! তিনি আপনার ঈমান ফেলে রেখে কিছু সময়ের ঈমান তালাশ করছেন । তখন নবীউল্লাহ (ﷺ) বললেন :

يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة

"আল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে রহমত করেন! সে তো ঐসব মাজলিস পছন্দ করে যে মাজলিস নিয়ে ফিরিশতাগণ গৌরব করেন ।"[৬]

এ সকল মাজলিসে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ঈমান বৃদ্ধিকারক ওয়ায করতেন । ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা) তাঁর সঙ্গীগণকে ওয়ায করছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের নিকট গমন করেন । তিনি বলেন, "তোমরাই সেই সম্প্রদায় যাঁদের সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন ... ।"[৭]

ইল্‌ম, ওয়ায ও আলোচনাই ছিল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে যিক্‌রের মাজলিসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । মু'আয ইবন জাবাল (রা) ইন্তিকালের পূর্বে বলেন যে, "হে আল্লাহ আপনি জানেন যে, আমি পার্থিব কোনো কারণে দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসিনি, কিন্তু আমার

আনন্দই ছিল সিয়াম পালন করে দিনে পিপাসার্ত থাকা, রাত জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আর যিক্‌রের হালাকায় (মাজলিসে) আলিমদের সাথে বসে আলোচনা করা।[১]

প্রখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনু আবী মুসলিম খুরাসানী (৫০-১৩৫ হি) বলেন:

مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا

"যিক্‌রের মাজলিস হালাল হারাম আলোচনার মাজলিস। কিভাবে বেচাকেনা করবে, কিভাবে ব্যবসা করবে, কিভাবে সালাত আদায় করবে, কিভাবে সিয়াম পালন করবে, কিভাবে বিবাহ করবে, কিভাবে তালাক দিবে, কিভাবে হজ্ব পালন করবে এবং অনুরূপ সকল বিষয় আলোচনার মাজলিসই যিক্‌রের মাজলিস।"[২]

চ. যিক্‌রের মাজলিস: আমাদের করণীয়

উপরের আলোচনা থেকে আমরা যিক্‌রের মাজলিসের গুরুত্ব, মর্যাদা, সাওয়াব, প্রভাব, পদ্ধতি ও যিক্‌রের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি। ঈমান বৃদ্ধি, ইল্‌ম বৃদ্ধি, যিক্‌রের আনন্দ বৃদ্ধি, আন্তরিকতা বৃদ্ধি, মাগফিরাত লাভ, আল্লাহর পথে চলার প্রেরণা ও জ্ঞান লাভের জন্য যিক্‌রের মাজলিস মুমিনের জীবনে অপরিহার্য।

আমাদের দৈনন্দিন সাংসারিক ও জাগতিক কাজকর্ম, সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে আমাদের সংমিশ্রণ, লেনদেন ও কথাবার্তা আমাদের হৃদয়গুলিকে কঠিন করে তোলে। মৃত্যুর চিন্তা, আখিরাতের চিন্তা, তাওবার চিন্তা ইত্যাদি কল্যাণময় অনুভূতি একটু দূরে সরে যায়। নিয়মিত ও সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত যিক্‌রের পাশাপাশি যিক্‌রের মাজলিস আমাদের হৃদয়গুলিকে পবিত্র ও আখিরাতমুখী করার জন্য খুবই উপকারী। হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করতে, হৃদয়কে আখিরাতমুখী করতে, আল্লাহ তা'লা ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ-এর মহব্বত দিয়ে হৃদয়কে পূর্ণ করতে, আল্লাহর স্মরণের ও তাঁর ভয়ে চোখের পানি দিয়ে হৃদয়কে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে যিক্‌রের মাজলিস অতীব প্রয়োজনীয়। যিক্‌রের মাজলিসে একজন পরিচালক বা আলোচক থাকতে পারেন। আবার মাজলিসের প্রত্যেকেই কিছু কিছু আলোচনা করতে পারেন।

'যিক্‌রের মাজলিসের' ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলির লক্ষণীয়:

১. যিক্‌রের মাজলিসের সাথী ও নেতা

(ক). নেককার মানুষদের সাহচার্য দীনের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে বেলায়াতের পথে পীর-মুরিদীর সুন্নাত-সম্মত গুরুত্ব ও পদ্ধতি আলোচনা করেছি। সকল মুমিনেরই প্রয়োজন এমন কিছু মানুষের সাহচার্য গ্রহণ করা যাঁদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ও তাকওয়া আছে। যাঁদের মধ্যে ইল্‌ম ও আমলের সমন্বয় আছে। যাঁদেরকে দেখলে ও যাঁদের কাছে বসলে আল্লাহর পথে চলার, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পথে চলার এবং তাঁর সুন্নাত অনুসরণের প্রেরণা পাওয়া যায়।

(খ). এ ধরনের সঙ্গী নির্বাচনে সুন্নাতের দিকে খুবই লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। পূর্ববর্তী সকল বুজুর্গই 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বা সুন্নাত প্রেমিক মানুষদের সাহচার্য গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে সকলেই 'আহলুস সুন্নাত' বা সুন্নী বলে দাবি করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপরে রয়েছি, তার উপরে যারা থাকবে তারাই' মুক্তিপ্রাপ্ত দল। কাজেই যারা তাঁদের অন্তরকে মহিমান্বিত আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ-কে প্রদান করেছেন, যাঁরা নিজেদের প্রবৃত্তি ও পছন্দ অপছন্দকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অধীন করে দিয়েছেন, যাঁরা তাঁর সুন্নাতের জন্য অন্য সবকিছু ত্যাগ করতে রাজি, তাঁদেরকে সঙ্গী হিসাবে নির্বাচিত করুন। যারা সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) ও সুন্নাতে সাহাবার বাইরে কর্ম করতে পছন্দ করেন, সুন্নাতের মধ্যে থেকে বেলায়াত অর্জন সম্ভব নয় বলে মনে করেন, বিভিন্ন অজুহাতে, ওসীলায়, যুক্তিতে যারা বিদ'আত বহাল রাখতে আগ্রহী হন, যারা বিদ'আতে হাসানার নামে সুন্নাত-বিরোধী কাজ করতে চান বা যারা সুন্নাতের চেয়ে বিদ'আতে হাসানাকে বেশি মহব্বত করেন তাঁরা নিজেদেরকে 'আহলুস সুন্নাত' বলে দাবি করলেও তাদের কর্ম তাদের কথা মিথ্যা বলে প্রমাণ করে। এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর উম্মাতের মধ্যে এরূপ মানুষ আসবে, যারা মুখে যা দাবি করবে কর্মে তা করবে না, আর এমন কর্ম করবে যে কর্ম করতে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না।

(গ). এভাবে নির্বাচিত আলিম, পথপ্রদর্শক বা সঙ্গীকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসুন। তাঁদের সাথে নিয়মিত যিক্‌রের মাজলিসে বসার ব্যবস্থা করুন। সপ্তাহে বা মাসে নির্ধারিত বা অনির্ধারিতভাবে মাঝে মাঝে এঁদের সাথে বসে নির্ধারিত বা অনির্ধারিত সময় ইলম ও ঈমান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর যিক্‌রে রত থাকুন।

২. যিক্‌রের মাজলিসের বিষয় ও যিক্‌র-আযকার

(ক). উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, যিক্‌রের মাজলিস মূলত ঈমান ও ইল্‌ম বৃদ্ধির মাজলিস। এই মাজলিসের মূল বিষয় আলোচনা ও ওয়ায। আমরা সাধারণত মনে করি যে, যিক্‌রের মাজলিস অর্থ একাকী পালনীয় যিক্‌র আযকারগুলি একত্রে পালন করার মাজলিস। ধারণাটি ভুল ও সুন্নাতের খেলাফ।

আমরা দেখেছি যে, যিক্‌র মূলত দুই প্রকার – **প্রথমত,** স্মরণ করা এবং **দ্বিতীয়ত,** স্মরণ করানো। যিক্‌রের মাজলিসের অন্যতম প্রধান যিক্‌র স্মরণ করানো বা ওয়ায আলোচনা। আমাদের বুঝতে হবে যে, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিক্‌র মুমিন একাকী

পালন করতে পারেন। কিন্তু ইল্‌ম, তাকওয়া ও আল্লাহর পথে চলার আগ্রহ বৃদ্ধিমূলক আলোচনা একা করা যায় না বা করতে অসুবিধা। যিক্‌রের মাজলিসে এই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যিক্‌রের মাজলিসে ঈমান ও ইলম বৃদ্ধিমূলক আলোচনা করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে তাসবীহ, তাহলীল, সালাত, সালাম ইত্যাদি যিক্‌র পালন করতে হবে।

আলোচক মানুষের জীবনে আল্লাহর অগণিত নিয়ামত, বিশেষ করে হেদায়াতের নিয়ামত আলোচনা করে উপস্থিতির মনের মধ্যে হামদ ও শুকুরের অনুভূতি জাগ্রত করলেন। উপস্থিত সকলে আবেগ ও ভালবাসার সাথে কিছুক্ষণ আল্লাহর হামদ ও সানা করবেন ও কিছুক্ষণ প্রত্যেকে নিজে নিজে মনে মনে বা মৃদু স্বরে "আল-'হামদু লিল্লাহ" ও আল্লাহর প্রশংসা ও মর্যাদা প্রকাশক অন্যান্য মাসনূন বাক্য দ্বারা যিক্‌র করবেন। তিনি মানুষের পরিণতি, মৃত্যু ও আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করবেন। দুনিয়ার জীবনের অনিশ্চয়তা, ক্ষণস্থায়িত্ব, আখিরাতের স্থায়িত্ব, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর আগমন, পাপের পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে হৃদয়গুলিকে আখিরাতমুখী করবেন।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের কিভাবে ভালবাসেন, আর বান্দা তাঁকে ভালবেসে কী মহান নিয়ামত পেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন। হৃদয়কে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য পার্থিব বিষয়ের লোভ ও ভালবাসায় জড়ানোর পরিণতি আলোচনা করবেন। আল্লাহর দ্বীন জানতে, পালন করতে, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও এর সুমহান পুরস্কার বিষয়ে আলোচনা করবেন। আলোচক ও উপস্থিতি আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে মনের আবেগ অনুসারে "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" ও অন্যান্য মাসনূন যিক্‌র পালন করবেন। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে।

পাপের ক্ষতি ও ভয়াবহতা, তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রয়োজনীয়তা, ফযীলত, গুরুত্ব ইত্যাদি আলোচনা করে হৃদয়ের মধ্যে তাওবার প্রেরণা সৃষ্টি করবেন। সবাই নিজের মতো আবেগ সহকারে তাওবা করবেন ও ইস্তিগফারের যিক্‌র করবেন। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন তাওবার ঘটনা এবং এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস আলোচনা ও চিন্তা করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দিলেন, তিনি (নবী ﷺ) আমাদের জন্য কত কষ্ট করলেন, আমাদেরকে কত ভালবসাতেন এবং তাঁর প্রতি আমাদের কত বেশি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন তা আলোচনা করবেন। এ বিষয়ক কুরআন ও হাদীস আলোচনা করবেন। আলোচনার মধ্যে সকলে আবেগ, ভক্তি ও ভালবাসার সাথে প্রত্যেকে নিজের মতো মনে মনে বা মৃদুস্বরে সালাত ও সালাম পাঠ করবেন।

আলোচক ও উপস্থিতি কুরআনের বিভিন্ন আয়াত আলোচনা ও তার অর্থ চিন্তা করবেন। এ সকল আয়াতের, ভাব ও মর্মকে হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। পূর্ববর্তী যুগের নেককার বুজুর্গগণ, বিশেষত সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত নবীগণ ও পূর্ববর্তী যুগের বুজুর্গগণের আল্লাহর প্রেম, তাওবা, জিহাদ, যুহদ, তাকওয়া, সবর ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করবেন। এ সকল আলোচনার ফাঁকে মনের আবেগ ও প্রেরণা অনুসারে মাসনূন বাক্যদ্বারা মাসনূনভাবে আল্লাহর যিক্‌র করবেন। সকল মুসলমানের জন্য প্রাণখুলে দু'আ করবেন। পূর্ববর্তী সকল মুসলিম, বিশেষত নেককার বান্দাদের জন্য মাগফিরাত ও মহব্বত প্রার্থনা করবেন। উম্মতে মুহাম্মাদীর হেদায়াত, বিজয় ও দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করবেন।

(খ). বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, এ সকল মাজলিসের আলোচনা যেন মহান আল্লাহর দিকে প্রেরণাদায়ক, আখিরাতমুখী, নিজেদের গোনাহ ও অপরাধের স্মারক ও ক্রন্দন উদ্দীপক হয়। বিতর্ক, উপস্থিত বা অনুপস্থিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমালোচনা, অহঙ্কার, বিদ্বেষ ইত্যাদি কেন্দ্রিক সকল আলোচনা পরিহার করা প্রয়োজন।

(গ). সকল প্রকার আলোচনা কুরআন কারীম ও শুধুমাত্র সহীহ হাদীস কেন্দ্রিক হতে হবে। মিথ্যা, বানোয়াট, অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা, গল্প, কাহিনী ইত্যাদি সতর্কতার সাথে পরিহার করতে হবে।

(ঘ). সকল আলোচনা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কেন্দ্রিক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বানোয়াট, অনির্ভরযোগ্য ঘটনা বা কাহিনী অথবা পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের জীবনী আলোচনা না করে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত নির্ভযোগ্য গন্থ থেকে সংগৃহীত সীরাত, সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবনী, তাঁদের বুজুর্গী, কারামত, তাকওয়া, বেলায়াত ইত্যাদি আলোচনা করা উচিত। এতে দ্বিবিধ উপকার হয়।

প্রথমত, আমাদের অন্তরগুলি ক্রমান্বয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মহব্বত বেশি বেশি অর্জন করতে থাকে। আর তাঁদের মহব্বত যেমন ঈমানের অংশ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত, তেমনি সকল বেলায়াত, কামালাত ও বুজুর্গীর অন্যতম মাধ্যম।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে তাঁর সাহাবীগণ আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ। তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষদের প্রশংসা তিনি নিজে করেছেন। এদের পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের কাহিনী আলোচনা করলে অনেক সময় ভুল বুঝার অবকাশ থাকে। এ সব যুগের অনেক বুজুর্গ তাঁদের বুজুর্গী সত্ত্বেও ভুলবশত বিভিন্ন বিতর্কিত বা সুন্নাত বিরোধী কর্মে নিপতিত হয়েছেন। – কেউ সামা কাওয়ালী করেছেন, কেউ খেলাফে সুন্নাতভাবে নির্জনবাস করেছেন। কেউ কেউ খেলাফে সুন্নাত বিভিন্ন আবেগী কথা বিভিন্ন হালতে বলেছেন। এ সব কথা সাধারণ শ্রোতা বুঝতে নাও পারেন। এজন্য সর্বদা নবীজী ﷺ-এর জীবন কেন্দ্রিক ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবন কেন্দ্রিক আলোচনা করা উচিত।

<u>৩. কুরআন কেন্দ্রিক যিক্‌র</u>

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন কারীম তিলাওয়াত ও আলোচনা যিক্‌রের মাজলিসের অন্যতম যিক্‌র। কুরআন কেন্দ্রিক 'যিক্‌রের মাজলিস' বা 'হালকায়ে যিক্‌র' বিভিন্ন রকম হতে পারে। **প্রথম প্রকার যিক্‌র** – একজন তিলাওয়াত করবেন আর অন্য যাকিরগণ মহব্বতের সাথে শুনবেন। এ ধরনের 'হালাকায়ে যিক্‌র'-এ কোনো ভালো নেককার হাফিজকে কুরআন তিলাওয়াতের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। না হলে যাকিরগণের মধ্য থেকে যিনি আলিম বা ভালো ক্বারী তিনি তিলাওয়াত করবেন। কুরআন কারীম তিলাওয়াত ও শোনা উভয়ই অত্যন্ত বড় ইবাদত ও যিক্‌র। তবে যতক্ষণ মহব্বত ও আবেগ থাকবে ততক্ষণ এভাবে যিক্‌র করতে হবে। মাইকে তিলাওয়াত করানো, যাদের কুরআন শোনার মহব্বত ও আবেগ নেই তাদেরকে শোনানো, রাতারাতি খতম করা ইত্যাদি কর্মগুলি সুন্নাতের খেলাফ ও কুরআনের

সাথে বেয়াদবীমূলক কর্ম। প্রয়োজনে মাজলিসের উপস্থিত ব্যক্তিগণের জন্য মাইক বা সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা যাবে।

কুরআন কেন্দ্রিক যিক্‌রের মাজলিসের **দ্বিতীয় প্রকার** – অর্থ আলোচনা করা। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করে তার অর্থ ও শিক্ষা আলোচনা করে ঈমান ও মহব্বত বৃদ্ধি করতে হবে। কুরআন কেন্দ্রিক যিক্‌রের মাজলিসের **তৃতীয় প্রকার–** হৃদয়ে অর্থ অনুধাবন ও অর্থ অনুসারে হৃদয়কে আলোড়িত করার চেষ্টা। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বারবার পাঠ করে এগুলির অর্থ 'মুরাকাবা' বা হৃদয়ের মধ্যে জাগরুক করে অর্থের আলোকে ও অর্থের প্রেরণা অনুসারে আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা, ইস্তিগফার ইত্যাদি করা। এ সময়ে প্রত্যেকে নিজের অন্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে আদবের সাথে নিজের মতো যিক্‌র করতে হবে।

৪. রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জীবন কেন্দ্রিক যিক্‌র

যিক্‌রের মাজলিসের অন্যতম একটি বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ সীরাত, শামায়েল ও তাঁর জীবন ও কর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়। আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, সাহাবীগণের যিক্‌রের মাজলিসের মূল বিষয়গুলির অন্যতম ছিল ঈমান বৃদ্ধিকারক ও আল্লাহর নিয়ামত সংক্রান্ত আলোচনা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন্দ্রিক যে কোনো আলোচনা তাঁর প্রতি আমাদের মহব্বত বৃদ্ধি করবে, যা আমাদের ঈমানের অন্যতম অংশ। এছাড়া আমাদের জীবনে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত তাঁর মহান নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য। এগুলি সর্বদা আলোচনা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁদের জীবনের অধিকাংশ মাজলিসই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন্দ্রিক। বিভিন্ন কাজে তাঁর সুন্নাত, তাঁর রীতি, তাঁর কর্ম, তাঁর জীবনী, তাঁর বাণী, তাঁর শিক্ষা, তাঁর মুবারাক আকৃতি, তাঁর উঠা-বসা, শোওয়া, তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ, তাঁর জন্ম, তাঁর ওফাত, তাঁর পরিবার পরিজন ইত্যাদি তাঁদের সকল মাজলিসের অন্যতম বিষয় ছিল। এগুলি আলোচনা করতে তাঁরা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছেন, আবেগ ও মহব্বতে হৃদয়কে পূর্ণ করেছেন। আমাদের জীবনের নিয়মিত যিক্‌রের মাহফিলের অন্যতম বিষয় এগুলি হতে হবে। এ সকল আলোচনার সময় স্বভাবতই বারবার তাঁর উপর প্রত্যেক যাকির নিজনিজভাবে মহব্বত ও আবেগসহ সালাত ও সালাম পাঠ করবেন। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, সালাত-সালাম যিক্‌রের মাহফিলের অন্যতম যিক্‌র।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে এই ধরনের যিক্‌রের মাহফিল সাধারণভাবে মীলাদ মাহফিল নামে পালিত ও পরিচিত। মীলাদ মাহফিলের পরিচয়, উদ্ভাবন ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমি "এহ্‌ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি যে, মীলাদ অনুষ্ঠানে অনেকগুলি মাসনূন ইবাদত পালন করা হয়, যেগুলির মধ্যে রয়েছে উপরের মাসনূন যিক্‌র : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেলাদাত, ওফাত, জীবনী, কর্ম ইত্যাদি আলোচনা, সালাত, সালাম, তাঁর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি ইত্যাদি। অপরদিকে এগুলি পালনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে আমরা কিছু খেলাফে সুন্নাত কাজ করি।

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং পরবর্তী যুগে সাহাবী-তাবেয়ীগণ এসকল ইবাদতকে 'যিক্‌রের মাহফিল', 'সুন্নাতের মাহফীল', 'হাদীসের মাজলিস', 'সীরাতের মাজলিস' ইত্যাদি নামে করতেন। "মীলাদ" নামে কোনো মাহাফিল, অনুষ্ঠান আচার, উদযাপন তাদের মধ্যে ছিল না। নাম বা পরিভাষার চেয়ে বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবুও নাম ও পরিভাষার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মধ্যে প্রচলিত নাম ও পরিভাষা ব্যবহার উত্তম। বাধ্য না হলে কেন আমরা তাঁদের রীতি, নীতি বা সুন্নাতের বাইরে যাব?

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র মীলাদ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম আলোচনা ও উদ্‌যাপনের জন্য মাজলিস করা, সালাত বা সালাম পাঠের জন্য উঠে দাঁড়ানো, সমস্বরে ঐক্যতানে সালাত বা সালাম পাঠ করা ইত্যাদি সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সুন্নাতে সাহাবার খেলাফ। এই প্রকারের যিক্‌রের মাজলিসে আলোচক সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে আদব ও মহব্বতের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক আকৃতি, কর্ম ও জীবনীর বিভিন্ন দিক, তাঁর প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহর মহান নিয়ামতের আলোচনা করবেন। আলোচনার মধ্যে তিনি এবং যাকিরগণ যিক্‌রের সকল আদবসহ পরিপূর্ণ মহব্বত, ভয়, ভক্তি ও বিনয়ের সাথে অনুচ্চস্বরে প্রত্যেকে নিজের মতো করে সালাত ও সালাম পাঠ করতে হবে। আর এই 'মীলাদ'-এর সুন্নাত সম্মত রূপ।

তৃতীয়ত, খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতির সবচেয়ে মারাত্মক দিক দলাদলি ও হানাহানি। বস্তুত, মুসলিম উম্মাহর সকল দলাদলি-হানাহানির অন্যতম কারণ মাসনূন ইবাদতের জন্য 'খেলাফে সুন্নাত' পদ্ধতির উদ্ভাবন। সাহাবীগণের যুগ থেকে প্রায় ৬০০ বৎসর মুসলিম উম্মাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম, জীবনী, শিক্ষা, মহব্বত ইত্যাদি আলোচনা করেছেন এবং সালাত-সালাম পাঠ করেছেন। কখনোই এ বিষয়ে মতভেদ ঘটেনি। কারণ বিষয়টি উন্মুক্ত ছিল, প্রত্যেকেই তাঁর সুবিধামত তা পালন করেছেন। যখনই এ সকল ইবাদত পালনের জন্য 'মীলাদ' নামক পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটল তখনই মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা শুরু হলো। এরপর প্রায় ৪০০ বৎসর পরে যখন 'কিয়াম'-এর উদ্ভাবন ঘটল তখন আবার 'মীলাদ'-এর পক্ষের মানুষদের মধ্যে নতুন করে মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা শুরু হলো। ক্রমান্বয়ে 'পদ্ধতি'ই ইবাদতে পরিণত হলো। এখন যদি কেউ সারাদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম, জীবনী, মুজিযা, মহব্বত ইত্যাদি আলোচনা করেন এবং সালাত-সালাম পাঠ করেন, কিন্তু মীলাদের পদ্ধতিতে কিয়াম না করেন, তবে মীলাদ-কিয়ামের পক্ষের মানুষেরা তাকে পছন্দ করবেন না। এই পর্যায় থেকে আমাদের অবশ্যই আত্মরক্ষা করতে হবে।

৫. যিক্‌রের মাজলিসের বিদ'আত ও পাপ

যিক্‌রের মাজলিসের প্রকার, প্রকৃতি, পদ্ধতি ও শব্দাবলী সবকিছু সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সকল প্রকার বিদ'আত, বিশেষত আমাদের দেশে 'যিক্‌রের মাজলিস' নামের অনুষ্ঠানের বিদ'আতগুলি বর্জন করতে হবে। এ সকল খেলাফে সুন্নাত কর্মের মধ্যে রয়েছে: সমবেতভাবে ঐক্যতানে যিক্‌র, উচ্চৈঃস্বরে যিক্‌র, বিশেষ পদ্ধতিতে শব্দ করে যিক্‌র, যিক্‌রের নিয়্যাত, 'ইল্লাল্লাহ' যিক্‌র, 'ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন' ইত্যাদি বাক্যের যিক্‌র, গজল বা গান গেয়ে বা গানের তালে যিক্‌র, শরীর দুলিয়ে, হেলেদুলে, লাফালাফি করে বা নাচানাচি করে যিক্‌র ইত্যাদি অগণিত খেলাফে সুন্নাত, বিদ'আত বা শিরকমূলক শব্দ, বাক্য ও পদ্ধতি আমাদের দেশে যিক্‌র নামে

পরিচিত।

আমারা যিক্র বলতে এসকল খেলাফে সুন্নাত ও বিদ'আত কর্মগুলিই বুঝি। যে যত বেশি খেলাফে সুন্নাত বা বিদ'আতভাবে যিক্র করছে সেই ততবড় যাকির ও তত বেশি মারেফাতের অধিকারী। আর যে যত সুন্নাত অনুসারে সাহাবীগণের মতো যিক্র করছে সে 'ওহাবী' অথবা নীরস আলিম; কোনো মারেফাত তার নেই। যত মারেফাতের উৎস মনে হয় বিদ'আত। দেখে শুনে মনে হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের কোনো মারেফাতই ছিল না। বিদ'আত উদ্ভাবনের পরেই মারেফাতের সুভ সূচনা এবং বিদ'আতেই সকল মারিফাত! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন !!

মুহতারাম পাঠক, এ সকল বড় বড় ফাঁকা বুলিতে ধোঁকাগ্রস্ত হবেন না। উপরে একাধিকবার আমরা আলোচনা করেছি যে, 'ইত্তেবায়ে সুন্নাত' বা সুন্নাতের অনুসরণ ছাড়া কোনো ইবাদত হয় না, বেলায়েত হয় না, মারেফত হয় না। সুন্নাতের বাইরে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নেই, তা যতই চকচক করুক বা চমকদার হোক।

যিক্র সংক্রান্ত খেলাফে সুন্নাত কর্ম দুই প্রকারের: যিক্রের শব্দের মধ্যে উদ্ভাবন ও যিক্রের পদ্ধতিতে উদ্ভাবন। পদ্ধতিগত খেলাফে সুন্নাত কর্মের মধ্যে রয়েছে – বিশেষ পদ্ধতিতে বসে, মাথা বা শরীর ঝাঁকিয়ে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে যিক্রের শব্দ দ্বারা ধাক্কা বা আঘাতের কল্পনা করে, বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে, গান বা গজলের তালে তালে, সমস্বরে ঐক্যতানে, উচ্চৈঃস্বরে বা চিৎকার করে, লাফালাফি করে বা নেচে নেচে যিক্র করা।

এগুলি সবই খেলাফে সুন্নাত। কেউ কোনোভাবে একটি হাদীসও খুঁজে পাবেন না যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা তাঁর সাহাবীগণ এভাবে যিক্র করেছেন। বিভিন্ন সাধারণ যুক্তি ও বিশেষভাবে মনোযোগ সৃষ্টির যুক্তিতে এগুলি করা হয়। আমরা ইতঃপূর্বে এ সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, শিক্ষা, অনুশীলন বা মনোযোগের জন্য কোনো জায়েয পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে কিছু সময়, প্রয়োজনমতো বা মাঝে মাঝে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এগুলিকে নিয়মিত রীতিতে পরিণত করলে বা ইবাদতের অংশ হিসাবে গ্রহণ করলে তা সুন্নাতের বিপরীতে বিদ'আতে পরিণত হয় এবং এর ফলে মূল সুন্নাত পদ্ধতি 'মৃত্যুবরণ করে' বা সমাজ থেকে উঠে যায়।

পদ্ধতিগত খেলাফে সুন্নাতের চেয়েও মারাত্মক শব্দগত খেলাফে সুন্নাত যিক্র। একজন যাকির মাসনূন শব্দে যিক্র করতে করতে আবেগে হয়ত মাথা নাড়াতে পারে বা যিক্রের আবেগ তার নড়াচড়ায় প্রকাশ পেতে পারে। ব্যক্তিগত ও সাময়িকভাবে তা অনেক সময় জায়েয, যদিও সুন্নাত নয়। কিন্তু একজন মুমিন কেন এমন শব্দ ব্যবহার করে যিক্র করবেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবহার করেননি? এ ক্ষেত্রে ওযর খুঁজে বের করা আরো কষ্টকর। কী প্রয়োজন আমার বিভিন্ন যুক্তি ও 'অকাট্য দলিল' দিয়ে কষ্ট করে এমন একটি যিক্র পালন করা এবং প্রচলন করা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি এবং যা করলে কী পরিমাণ সাওয়াব হবে তা আমাদের মোটেও জানা নেই ?

ছ. কারামত, হালাত ও ওলীআল্লাহগণ

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আপনি যে সকল কাজকে বিদ'আত বা খেলাফে সুন্নাত বলছেন যুগযুগ ধরে আল্লাহর ওলীগণ তো সে কাজই করে আসছেন। এ সকল কাজের মাধ্যমেই তারা বেলায়াত, কারামত, হালাত ও ফয়েযের উচ্চমার্গে আরোহণ করেছেন। এখনো দেশে দেশে এ সকল কর্মের মাধ্যমে অগণিত মানুষ বেলায়াত, কারামত, হালাত, ফয়েয ইত্যাদি লাভ করছেন। আপনার কথা ঠিক হলে তা কিভাবে সম্ভব হলো? এগুলি কি প্রমাণ করে না যে, আপনার কথা ভুল?

নিম্নের বিষগুলি পাঠককে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে সাহায্য করবে:

<u>১. সকল বুজুর্গই মাসনূন ইবাদত পালন ও প্রচার করেছেন</u>

যুগ যুগ ধরে আল্লাহর ওলীগণ কখনোই এ সকল সুন্নাত বিরোধী কাজ করেন নি। সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগের আবিদ, যাকির ও সূফী-দরবেশগণের জীবনের কর্ম, যিক্র ও যিক্রের মাজলিসের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বেলায়াত ও তাযকিয়ার পথে তাঁদের কর্মগুলি ছিল একান্তই মাসনূন কর্ম। এই গ্রন্থে যা কিছু লিখা হয়েছে তা তাঁদের জীবনী ও কর্মের আলোকেই লিখা হয়েছে। ৫ম হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও সূফী আল্লামা আবু নু'আইম ইসপাহানী (৪৩০ হি) "হিলয়্যাতুল আউলিয়া" গ্রন্থে সাহাবীগণের যুগ থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সূফী, দরবেশ, বুজুর্গ ও যাহিদগণের জীবনী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাদের যিক্র ও যিক্রের মাজলিসের আলোচনা করেছেন। এ সকল আলোচনায় আমরা দেখছি যে, তাঁদের যিক্রের মাজলিস ছিল ঈমান বৃদ্ধিকারক, দুনিয়ার মোহ, লোভ, লালসা, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত-করা বিষয়ক ও হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর ভয়, তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রেরণা-দানকারী আলোচনা ও আলোচনা সাথে ইস্তিগফার, ক্রন্দন ইত্যাদি। পাঠককে অনুরোধ করছি "হিলয়্যাতুল আউলিয়া", "সিফাতুস সাফওয়া", "সিয়ারু আ'লামিন নুবালা" ইত্যাদি প্রথম যুগের ও নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থে তাঁদের জীবনী পাঠ করতে।

বস্তুত, ওলী-আল্লাহদের নামে অগণিত মিথ্যা কথা সমাজে প্রচলিত। মুহাদ্দিসগণের অতন্দ্র প্রহরা ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় কঠিন শাস্তি সত্ত্বেও হাদীসের নামে অগণিত মিথ্যা ও জাল কথা প্রচার করেছে জালিয়াতগণ। ওলীদের নামে জাল কথা প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো প্রহরা ও শাস্তির ব্যবস্থাই ছিল না। একারণে জালিয়াতগণ এ ক্ষেত্রে বেশি সফল হয়েছে। আমি 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী, ঈনুদ্দীন চিশতী, নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রাহ) প্রমুখ বুজুর্গের নামে লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে এমন সব তথ্য বিদ্যমান যা নিশ্চিত করে যে, তাঁদের যুগের পরে জালিয়াতগণ তাদের নামে এ সকল পুস্তক রচনা করেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের রচিত পুস্তকাদির মধ্যে অনেক মিথ্যা কথা ঢুকিয়েছে।

এর পরেও আমরা এ সকল বুজুর্গের লেখা পুস্তকাদির মধ্যে মাসনূন ইবাদত ও যিক্রের কথাই দেখতে পাই। শাইখ আব্দুল

কাদির জীলানীর (রাহ) গুনিয়াতুত তালিবীন ও অন্যান্য গ্রন্থ, শাইখ মুঈনুদ্দীন চিশতীর (রাহ) আনিসুল আরওয়াহ, মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মাকতুবাত ও অন্যান্য গ্রন্থ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর হুজ্জাতুল্লাহির বালিগার 'ইহসান ও তাসাউফ' অংশ, তাঁর রচিত কাশফুল খাফা গ্রন্থের উমার (রা)-এর তরীকা ও তাসাউফ বিষয়ক অংশ, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর 'সেরাতে মুস্তাকিম' গ্রন্থ পাঠ করতে পাঠককে অনুরোধ করছি। এই পুস্তকে পাঠক যা কিছু দেখেছেন উপর্যুক্ত পুস্তকগুলিতে প্রায় তাই দেখতে পাবেন।

২. নিয়মিত ইবাদত বনাম সাময়িক অনুশীলন

আমরা দেখেছি যে, খেলাফে সুন্নাত সকল কর্মই বিদ'আত বলে গণ্য হয় না। বরং খেলাফে সুন্নাত কর্মকে দীনের অংশ মনে করলে, সাওয়াবের মূল উৎস মনে করলে বা সুন্নাতের মত রীতিতে পরিণত করলে তা বিদ'আতে পরিণত হয়। জায়েয বিষয় কিভাবে বিদ'আতে পরিণত হতে পারে তার একটি উদাহারণ এই বই থেকে প্রদান করছি। সকাল সন্ধ্যার যিক্‌র আলোচনার সময়ে আমি অনেক প্রকারের যিক্‌র উল্লেখ করেছি। এগুলি সবই মাসনূন যিক্‌র। এগুলিকে লিখার জন্য স্বভাবতই আমাকে একটির পরে একটি লিখতে হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে সাজাতে হয়েছে। এই ক্রমানুসারে সাজানোটা সুন্নাত নয়, আমার নিজের তৈরি। সুন্নাত এই যিক্‌রগুলি পালন করা। যিক্‌র পালন করতে গেলে অবশ্যই একটি ক্রম প্রয়োজন। একটির পর একটি তো করতে হবে। সাজানোর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। যাকির নিজের সুবিধামতো যিক্‌রগুলি সাজিয়ে নেবেন। আমার ক্রমটিও এই প্রকারের। এই সাজানো নিঃসন্দেহে জায়েয ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি কোনো যাকির সুন্নাতের নির্দেশনা ছাড়া মনে করেন যে, এই যিক্‌রটি আগে ও এই যিক্‌রটি পরে দিতেই হবে, বা এই নির্দিষ্ট ক্রমান্বয় মেনে চলাটা একটি ইবাদত, বা এই নিয়মের মধ্যে বিশেষ সাওয়াব আছে তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

যিক্‌র বিষয়ক অধিকাংশ বিদ'আত এইরূপ ভুল ধারণা থেকে এসেছে। পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন আলিম ও নেককার মানুষ তাঁদের ছাত্র বা মুরীদকে সুন্নাতের আলোকে কিছু যিক্‌র বেছে দিয়েছেন, সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ক্বলবের অমনোযোগিতা বা আলসেমী দূর করতে বা মনোযোগ অর্জনের জন্য কিছু সাময়িক নিয়মকানুন বলে দিয়েছেন। যেমন, কাউকে জোরে যিক্‌র করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাউকে নির্জনবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যিক্‌র করার নিয়ম করেছেন। কেউ নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে বসে পায়ের নির্দিষ্ট রগ চেপে ধরে অথবা দেহের নির্দিষ্ট স্থানে আঘাতের কল্পনা করে যিক্‌র করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলি সবই ছিল সাময়িক ও বিশেষ পরিস্থিতির আলোকে তাদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ মাত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই সেগুলি দীনের অংশ মনে করেছেন। কেউ ভেবেছেন, এভাবে বসা বা এভাবে যিক্‌র করা একটি বিশেষ ইবাদত। এভাবে না বসলে বা এভাবে যিক্‌র না করলে সাওয়াব বা বরকত কম হবে। কেউ ভেবেছেন, এই পদ্ধতিতে না হলে আজীবন মাসনূন যিক্‌র করলেও বেলায়াত বা তাযকিয়া অর্জন হবে না। এভাবে তাঁরা বিদআতের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।

৩. ক্রমান্বয় অবনতি ও সংশোধন

বুজুর্গদের শেখানো ইবাদত ও রিয়াযতের পদ্ধতিও তাঁদের মৃত্যুর পরে অনুসারীদের হাতে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই সানী (৯৭১-১০৩৪হি)-র মাকতূবাত শরীফ অধ্যয়ন করলে বিষয়টি ভালভাবে অনুভব করা যায়। তাঁর মাত্র ২০০ বৎসর পূর্বে বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (৭৯১ হি) নকশবন্দীয়া তরীকার উদ্ভাবন করেন। এই ২০০ বৎসরের মধ্যে নকশবন্দীয়া তরীকার মধ্যে অনেক বিদ'আত প্রবেশ করে বলে তিনি তাঁর মাকতূবাতের বিভিন্ন পত্রে আফসোস করেছেন।

আমাদের সমাজের দিকে তাকালেও আমরা তা বুঝতে পারব। কাদিরীয়া , চিশতীয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দিদীয়া ইত্যাদি তরীকার দাবিদার বিভিন্ন দরবারে গেলে আপনি দেখবেন যে, একেক দরবারের যিক্‌র, ওযীফা ও কর্ম-পদ্ধতি একেক রকম, অথচ সকলেই একই তরীকা দাবি করছেন। আবার এদের অনেকেই মাত্র দুই বা তিন ধাপ পূর্বে একই পীর বা উস্তাদের শিষ্যত্ব দাবি করছেন, অথচ তাদের কর্ম পদ্ধতি এক নয়।

৪. তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে

একজন বুজুর্গ বেলায়াত অর্জন করেন তার সামগ্রিক কর্মের ভিত্তিতে। হাজার হাজার নেক আমলের পাশে দু-একটি ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের বুজুর্গী নষ্ট করে না। বরং কুরআনের বাণী অনুসারে অনেক নেকীর কারণে এ সকল ভুল বা অন্যায় ক্ষমা হয়ে যায়। পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের মধ্যে বিভিন্ন ভুলত্রুটি রয়েছে। কখনো বিশেষ হালতে, কখনো অনুশীলনের জন্য, কখনো ব্যক্তিগত ইজতিহাদে তাঁরা ভুল কর্ম করেছেন। এ সকল কর্মের ফলে যেমন তাদের বুজুর্গী নষ্ট হয় না, তেমনি তাঁরা করেছেন বলে এগুলি আমাদের জন্য করণীয় আদর্শ হতে পারে না। কোনো বুজুর্গ গান-বাজনা করেছেন এবং নেচেছেন, কেউ বা ধুমপান করেছেন, কেউ পীরকে সাজদা করেছেন এরূপ অগণিত বিষয় রয়েছে। এজন্য সুন্নাতে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ বুজুর্গদের নামে অনেক কিছুই দাবি করা হচ্ছে, কোনটি সঠিক তা বাছাই করার কোনো সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। অনুরূপভাবে কোন্ কর্মটি তাঁরা ইবাদত হিসেবে করেছেন এবং কোন্‌টি সাময়িক অনুশীলন অথবা ব্যক্তিগত ইজতিহাদের কারণে করেছেন তাও স্পষ্টরূপে জানার কোনো উপাই নেয়। পক্ষান্তরে সুন্নাতের ক্ষেত্রে সহীহ ও বানোয়াট জানার মাপকাঠি রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল কিছুই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। বুজুর্গগণের বুজুর্গী ও বেলায়াতের জন্য তাঁদেরকে সম্মান করতে হবে এবং ভালবাসতে হবে। কিন্তু অনকরণীয় পূণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। তাঁর সুন্নাত অনুসরণের পুর্ণাঙ্গ আদর্শ সাহাবীগণ। বুজুর্গগণকে নির্ভুল, নিষ্পাপ ও সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের মতের অযুহাতে সহীহ সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবী অস্বীকার বা অমান্য করার পরিণতি কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বুজুর্গগণের কর্ম অনুসরণ করে আমরা সাওয়াব ও বেলায়াত আশা করি। আর সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করলে পঞ্চাশ জন সাহাবীর সমান মর্যাদা ও পুরস্কার পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলেনঃ "তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, এখন তোমরা যে কর্মের উপর আছ সে সময়ে যে ব্যক্তি অবিকল তোমাদের পদ্ধতি আকড়ে ধরে থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না

তাদের মধ্যকার?" তিনি বলেন, "না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব।"[১]

৫. কারামত, হালাত, ফয়েয বনাম বেলায়াত ও তাযকিয়া

এর চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো বুজুর্গ কে? কে কতবড় আল্লাহর ওলী তা কিভাবে আমরা জানতে পারব? ইরানে, আরবে ও অন্যান্য দেশে শিয়াদের মধ্যে অগণিত পীর-দরবেশ বিদ্যমান যাদের কারামত ও কাশফের কথা লক্ষকোটি মানুষের মুখে মুখে। অথচ সুন্নীগণ তাদের মুসলমান বলে মানতেই নারায। এভাবে প্রত্যেক দলই দাবি করছেন যে, তাদের নেতৃবৃন্দ সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওলীআল্লাহ। তাদের কাশফ, কারামত ও ফয়েযের অগণিত গল্প তাদের মুখে মুখে। পক্ষান্তরে অন্য দল এদেরকে কাফির, ফাসিক, ওহাবী, বিদ'আতী ইত্যাদি বলে গালি দিচ্ছে।

বস্তুত, বুজুর্গী চেনার জন্য কাশফ, কারামত ইত্যাদির উপর নির্ভর করাই সকল বিভ্রান্তির মূল। মুসলিম উম্মাহর সকল বুজুর্গই বলেছেন যে, বুজুর্গী চেনার জন্য এগুলির উপর নির্ভর করা যাবে না, বরং সুন্নাতের উপরে নির্ভর করতে হবে। সুন্নাতের অনুসরণের পূর্ণতার উপরেই বুজুর্গীর পূর্ণতা নির্ভর করবে। সাহাবীগণের মত যিনি সকল ইবাদত বন্দেগি পালন করতে চেষ্টা করেন, তাঁদেরই মত হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, গীবত, গালাগালি ইত্যাদি পরিহার করেন, তাঁদেরই মত বিনয় ও সুন্দর আচরণ করেন, তাকে আপনি বুজুর্গ বলে মনে করতে পারেন। সুন্নাতের অনুসরণ যত বেশি হবে বুজুর্গীও তত বেশি হবে।

অলৌকিক কর্ম করা, মনের কথা বলা ইত্যাদি কাশফ-কারামত হতে পারে, আবার শয়তানী ইসতিদরাজ হতে পারে। কোন্‌টি রাব্বানী এবং কোন্‌টি শয়তানী তা চেনার একমাত্র উপায় সুন্নাতের অনুসরণ। মুজাদ্দিদে আলফে সানী, সাইয়িদ আহমদ ব্রেলবী ও অন্যান্য বুজুর্গ উল্লেখ করেছেন যে, কাফির-মুশরিকও রিযয়াত-অনুশীলন করলে কাশফ, কারামত ইত্যাদি অর্জন করতে পারে। এছাড়া শিরক বা বিদ'আতে লিপ্ত করতে শয়তান মানুষকে স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নে, কাশফে বা জাগ্রত অবস্থায় সে আল্লাহকে বা ওলীদেরকে বারংবার দেখতে পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল, সে প্রকৃতই আমাকে দেখল, কারণ শয়তান আমার রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে না।"[২] এ জন্য মুসলিম উম্মাহ একমত যে, শয়তান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না। তবে অন্য কোনো আকৃতিতে এসে নিজেকে নবীজি বলে দাবি করতে পারে কি না সে বিষয়ে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, শয়তান যেমন তাঁর রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে না, তেমনি সে অন্য রূপে এসেও নিজেকে নবীজি বলে দাবি করতে পারে না। অন্য অনেকে বলেন যে, শয়তানের জন্য অন্য আকৃতিতে এসে নিজেকে নবীজি বলে দাবি করা অসম্ভব নয়; কারণ কোনো হাদীসে তা অসম্ভব বলা হয় নি। উপরন্তু মানুষ শয়তান যেমন জাল হাদীস বানাতে পারে, তেমনি জিন শয়তানও স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জালিয়াতি করতে পারে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবী ইবনু আব্বাস অনুরূপ মত পোষণ করতেন। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ও স্বপ্ন-বিশারদ মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনও (১১০হি) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন।[৩]

বাস্তব অনেক ঘটনা দ্বিতীয় মতটি সমর্থন করে। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের ভাই 'মারফতী নাড়ার ফকীর' দলে যোগ দেন। তিনি তার বাড়িতে রাতভর গানবাজনা করে যিক্‌রের আয়োজন করেন। এতে গ্রামবাসীরা আপত্তি করলে তিনি দাবি করেন যে, তিনি যখন এভাবে গানবাজনাসহ যিক্‌রের মাজলিসে বসেন, তখন তার মৃত পিতামাতা কবর থেকে উঠে তাদের মাজলিসে যোগ দেন। উপরন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে তাকে এভাবে গানবাজনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গ পীর সাহেব ধুমপান করতেন। তাঁর নিকটতম একজন খলীফা জানান যে, স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়েই তিনি ধুমপান করতেন। আগের যুগের কোনো কোনো গ্রন্থেও অনুরূপ ঘটনার কথা পাওয়া যায়। এরা ভুল দেখেছেন, মিথ্যা বলেছেন, না বাস্তবেই শয়তান এরূপ স্বপ্ন দেখিয়েছে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

সর্বোপরি কাশফ, ফয়েয, হালাত ইত্যাদি ইবাদত কবুল না হওয়ার লক্ষণ হতে পারে। সহীহ সুন্নাত-সম্মত ইবাদতে লিপ্ত হলে শয়তান আবিদের মনে ওয়াসওয়াসা দিয়ে মনোযোগ নষ্ট করতে চেষ্টা করে। যেন মুমিন ইবাদতে মজা না পেয়ে ইবাদত পরিত্যাগ করে বা অন্ত ত সাওয়াব কম পায়। পক্ষান্তরে ইবাদতের নামে বিদ'আতে রত থাকলে শয়তান কখনোই মনোযোগ নষ্ট করে না, বরং তার মনোযোগ ও হালত বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। কারণ উক্ত মুমিন তো সাওয়াব পাচ্ছেই না, বরং গোনাহ অর্জন করছে, কাজেই তাকে যত বেশি উক্ত কর্মে রত রাখা যায় ততই শয়তানের লাভ। এজন্যই অনেকে ধার্মিক মানুষকে দেখবেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর সালাত আদায়ে তাড়াহুড়ো করছেন। অথচ বিদ'আত মিশ্রিত যিক্‌র-ওযীফার মধ্যে মহা আনন্দে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন। তাহাজ্জুদে বা কুরআন তিলাওয়াতে ক্রন্দন আসছে না। কিন্তু বিদ'আত মিশ্রিত যিক্‌র বা দু'আয় অঝোরে কাঁদছেন। অনেকে সালাতের মধ্যে কিছু খেলাফে সুন্নাত নিয়ম পদ্ধতি বা যিক্‌র যোগ করে সালাতে মনোযোগ ও মজা পাচ্ছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ সুন্নাত-সম্মতভাবে সালাত আদায় করলে সেরূপ মজা পাচ্ছেন না। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কাশফ, ফয়েয, হালাত, মজা, ক্রন্দন, স্বপ্ন এগুলি কোনোটিই ইবাদত কবুলের আলামত নয়, বেলায়াতের আলামত হওয়া তো দূরের কথা।

৬. বেলায়াত-তাযকিয়ার দাবি-দাওয়া বনাম বাস্তবতা

বেলায়াত ও তাযকিয়ার দাবি সকলেই করছে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখতে পাই? হিংসা, ঘৃণা, বিচ্ছিন্নতা, লোভ, অহঙ্কার, ক্রোধ, অসদাচরণ, গালাগালি, বান্দার হক্ক বিনষ্ট করা ইত্যাদি অগণিত কর্মে লিপ্ত দেখতে পাই এ সকল মানুষদের। অথচ তাঁরা তাহাজ্জুদ,

তিলাওয়াত, যিক্র ও অন্যান্য তাযকিয়ার কর্মে লিপ্ত! এর কারণ ঔষধের বিকৃত প্রয়োগ। তাযকিয়া ও বেলায়াতের নামে ইসলামের আংশিক কিছু শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অর্জনের ক্ষেত্রে কাশফ, কারামত, হালাত ইত্যাদিকে মানদণ্ড হিসেবে পেশ করা হচ্ছে। ফলে সত্যিকার তাকওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে না। উপরন্তু অগণিত হারামে লিপ্ত থেকেই 'ওলী' হয়ে গিয়েছি বলে আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার হৃদয়কে গ্রাস করছে।

৭. নবীপ্রেম ও ওলীপ্রেমের দাবি-দাওয়া বনাম বাস্তবতা

নবীপ্রেম বা আশেকে রাসূল (ﷺ) হওয়ার দাবি অনেকেই করছেন। ওলীআল্লাহগণের মহব্বত ও অনুসরণের দাবি করছেন সকলেই। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? এ সকল প্রেমিককে যেয়ে বলুন, আপনার মতামত, পোশাক, যিক্র, মীলাদ, দরুদ ইত্যাদির সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণের পুরো মিল হচ্ছে না, একটু মিলিয়ে নিন। তাঁরা ঠিক এভাবে যিক্র করেছেন, এভাবে মীলাদ পড়েছেন, অমুক বিষয়ে ঠিক একথা বলেছেন, কাজেই আপনি ঠিক অবিকল তাঁদের মত চলুন। আপনি দেখবেন যে, সেই প্রেমিক আপনার কথা মানছেন না। আপনার কথাগুলি বাতিল বা হাদীসে নেই সেকথা তিনি দাবি করবেন না। আপনার কথাগুলির বিপরীতে তার মতের পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট সহীহ হাদীসও তিনি পেশ করতে পারবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করবেন না। বিভিন্ন ওযুহাত দেখাবেন। একেবরে অপরাগ হলে বলবেন, এগুলি ওহাবী মত বা বিভ্রান্ত মত! তিনি যে কর্ম বা মতামত পোষণ করছেন সেটিই একমাত্র সঠিক বা সুন্নী মত। কাজেই কোনো দলিল ছাড়াই সকল হাদীস ও সুন্নাত বাতিল হয়ে গেল।

অনেকের কাছেই নবীর (ﷺ) সুন্নাত এভাবে উড়িয়ে দেওয়া সহজ, তবে ওলী-আল্লাহগণের মতামত উড়িয়ে দেওয়া অনেক কঠিন! রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন বা বলেছেন বললে তাঁরা সহজেই একটি ব্যাখ্যা দিয়ে বা বিনা ব্যাখ্যাতেই তা উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু বুজুর্গদের কথা বা কর্ম অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারেন না। তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, অবস্থার পরিবর্তন হয় না। উক্ত ওলী-প্রেমিককে বলুন, আপনি যে, কাজটি করছেন তার বিরুদ্ধে বা যাকে আপনি নিন্দা করছেন তার পক্ষে শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী, মুঈন উদ্দীন চিশতী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (রাহিমাহুমুল্লাহ) বা অন্য অমুক বুজুর্গ অমুক গ্রন্থে লিখেছেন, তখন একই ভাবে তিনি বিভিন্ন অযুহাতে তা মানতে অস্বীকার করবেন। কোনো অবস্থাতেই তিনি তাঁর মত বা কর্ম পরিবর্তন করতে রাযি হবেন না! যে বুজুর্গের নামে তিনি চলছেন স্বয়ং সেই বুজুর্গের মতামতও যদি তার মতের বিরুদ্ধে পেশ করা হয় তবুও তিনি তার একটি ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু নিজের মত বা কর্ম পরিবর্তন করবেন না।

অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ এটি। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নিকট হক্ক এবং বাতিলের একটিই মাপকাঠি রয়েছে, তা হলো তার নিজের পছন্দ। হাদীস-কুরআন বা বুজুর্গদের মতামত তার পছন্দকে প্রমাণ করার জন্য, পছন্দকে উল্টানোর জন্য নয়। যা তার পছন্দ হয় না তা বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন। আরবীতে এই মাপকাঠিটির নাম (هوى)। বাংলায় প্রবৃত্তি বা 'ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ' বলা হয়। কুরআন-হাদীসে বারংবার এই ভয়ঙ্কর রোগ সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এক স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে: "আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তাঁর নিজের পছন্দ অপছন্দ বা নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? আপনি কি তার উকিল হবেন?"[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে: অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, নিজ প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার আনুগত্য, মানুষের তার নিজ মতামতের প্রতি তৃপ্তি ও আস্থা।"[২]

এই রোগ থেকে মুক্তির একটিই পথ, নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভাললাগা ও মন্দলাগাকে সুন্নাতের অধীন করা। ব্যাখ্যা দিয়ে সুন্নাতকে বাতিল না করে ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের মত বা বুজুর্গদের মতকে বাতিল করে সুন্নাতকে হুবহু গ্রহণ করা। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শেষ কথা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের খেদমতে এই বইটি আমার অতি নগণ্য একটি প্রচেষ্টা। চেষ্টার মধ্যে যদি কিছু মাত্র কল্যাণকর থেকে থাকে তা শুধুমাত্র মহান প্রভু আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর দয়া ও তাওফীক। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুল, ভ্রান্তি আছে সবই আমার অযোগ্যতার কারণে এবং শয়তানের কারণে। আমি রাব্বুল আলামীনের দরবারে সকল ভুল, অন্যায় ও বিভ্রান্তি থেকে তাওবা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহর দরবারে সকাতর প্রার্থনা যে, তিন দয়া করে এই অযোগ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেবেন। আল্লাহর কত প্রিয় বান্দা কতভাবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য মহান কাজ করে চলেছেন। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। না পারলাম ব্যক্তিগত জীবনে ভালো ইবাদত করতে। না পারলাম উম্মতের কোনো কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ দয়া করে কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, যাদেরকে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি ও যারা আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসেন তাঁদের সকলের এবং পাঠক-পাঠিকাগণের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেবেন এই দু'আ করেই শেষ করছি। আমিন! আল্লাহর মহান রাসূলের জন্য সালাত ও সালাম এবং প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালন আল্লাহর নিমিত্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

এই গ্রন্থ রচনায় মূলত হাদীসগ্রন্থ ও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছি। এছাড়া মাঝেমধ্যে দুই একটি তাফসীর ও ফিকহ বিষয়ক বই থেকে তথ্য গ্রহণ করেছি। যে সকল গ্রন্থ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটি তালিকা এখানে গবেষক পাঠকদের সুবিধার্থে প্রদান করা হলো। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলোঃ

১. কুরআন কারীম
২. ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) কিতাবুয যুহদ, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।
৩. মালিক বিন আনাস (১৭৯ হি), আল-মুয়াত্তা (কাইরো, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৫১)
৪. কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম আল-আনসারী, (১৮২ হি), কিতাবুল আসার, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৫ হি.।
৫. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হি), কিতাবুল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩)
৬. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, কিতাবুল আসল বা আল-মাবসূত, করাচি, ইদারাতুল কুরআন
৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-হুজ্জাত, বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১৪০৩, ৩য় প্রকাশ।
৮. মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল দাব্বী (১৯৫ হি), কিতাবুদ দু'আ (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯, ১ম প্রকাশ)
৯. আব্দুর রাজ্জাক সানআনী (২১১ হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
১০. আল-ফাররা, আবু যাকারিয়া (২১১ হি), মায়ানীল কুরআন, বৈরুত, আলম আল-কুতুব।
১১. ইবনে হিশাম (২১৩ হি), আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র, ১৯৭৮)
১২. সাঈদ ইবনু মানসূর (২২৭ হি), আস-সুনান, রিয়াদ, দারুল উসাইমী, ১৪১৪ হি., ১ম।
১৩. ইবনে সা'দ, মুহাম্মাদ (২৩০ হি), আত-তাবাকাতুল কুবরা, (বৈরুত, দার সাদির)
১৪. ইবনে আবী শাইবা (২৩৫ হি), আল- কিতাবুল মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫)
১৫. আহমদ ইবনু হাম্বল (২৪১ হি), মুসনাদে আহমদ (কাইরো, দারুল মাআরিফ, ১৯৫৮)
১৬. দারেমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি), আস-সুনান (দামেশক, দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১)
১৭. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬ হি), আস সহীহ, ফতহুল বারী সহ, (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৮. ইমাম বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ, বৈরুত, দারুল বাশাইর, ১৯৮৯, ৩য় প্রকাশ।
১৯. ইমাম বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, রিয়াদ, দারুল মাআরিফ, ১৯৭৮।
২০. ইবনুল জারূদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী (৩০৭ হি) আল-মুনতাকা, (বৈরুত, সাকাফিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৮)
২১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি), আস-সহীহ, (কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবুল আরাবিয়্যাহ)
২২. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআস (২৭৫ হি), আস-সুনান (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮)
২৩. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি), আস-সুনান (ইস্তাম্বুল, মাকতাবাহ ইসলামিয়্যাহ)
২৪. তিরমিযী, আবু ইসা মুহাম্মাদ (২৭৯ হি), আস- সুনান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
২৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু হাম্বল (২৯০ হি), আস-সুন্নাহ, (দাম্মাদ, দারু ইবনিল কাইয়িম, ১ম, ১৪০৬হি)
২৬. আল-বাযযার, আবু বকর আহমদ ইবনু আমর (২৯২ হি), আল-মুসনাদ (মদীনা মুনাওয়ারাহ, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪০৯ হি., ১ম প্রকাশ)
২৭. নাসাঈ, আহমাদ ইবনু শুআইব (৩০৩ হি), আস-সুনান, (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২)
২৮. নাসঈ, আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১)
২৯. নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৪০৬ হি, ২য় প্রকাশ)
৩০. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী (৩০৭ হি), মুসনাদে আবী ইয়ালা (দেমাশক, দারুস সাকাফাহ আল- আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৩১. তাবারী, ইবনু জারীর (৩১১হি), জামেউল বাইয়ান/তাফসীরে তাবারী, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮)
৩২. ইবনু খুযাইমা (৩১১হি), সহীহ ইবনে খুযাইমা (সৌদী আরব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২য় প্রকাশ ১৯৮১)
৩৩. আবু উ'আনাহ, ইয়াকূব ইবনু ইসহাক (৩১৬হি) আল-মুসনাদ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৮, ১ম)
৩৪. আবু জাফর তাহাবী (৩২১হি), শরহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭)
৩৫. আকু জাফর তাহাবী, শারহু মুশকিলিল আসার, বৈরুত, রিসালাহ, ১৯৯৪, ১ম প্রকাশ।
৩৬. ইবনে দুরাইদ (৩২১হি) জামহারাতুল লুগাত (হায়দ্রাবাদ, দাইরাতিল মাআরিফ উসমানিয়্যাহ, ১৩৪৫হি)
৩৭. উকাইলী, মুহাম্মাদ ইবনু উমর (৩২২হি), আদ-দু'আফা আল-কাবীর, বৈরুত, দারুল মাকতাবাতিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪।
৩৮. ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি), সহীহ ইবনে হিব্বান, তারতীব ইবনে বালবান (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৭)
৩৯. তাবারানী, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি), আল- মু'জাম আল- কাবীর (ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ)
৪০. তাবারানী, আল- মু'জামুল আওসাত (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৪১. তাবারানী, আল-মু'জামুস সাগীর, জর্দান, আম্মান, দারু আম্মার, ১৯৮৫, ১ম প্রকাশ।
৪২. তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়্যীন, বৈরুত, রিসালাহ, ১৯৮৪, ১ম প্রকাশ।
৪৩. তাবারানী, কিতাবুদ দু'আ, বৈরুত, ইলমিয়্যাহ।
৪৪. আবু বকর জাস্‌সাস (৩৭০হি), আহকামুল কুরআন (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি.)
৪৫. দারাকুতনী, আলী ইবনু উমর (৩৮৫হি) আস-সুনান, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৬৬।
৪৬. আল:জাওহারী, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (৩৯৩হি), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯)
৪৭. ইবনে ফারিস (৩৯৫হি), মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাত (ইরান, কুম, মাকতাবুল ইলাম আল:ইসলামী, ১৪০৪)
৪৮. হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি), আল- মুস্তাদরাক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র.)
৪৯. আবু নুআইম আল-ইসবাহানী (৪৩০ হি), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৫, ৪র্থ)
৫০. আল-কুদায়ী, মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ (৪৫৪ হি) মুসনাদুশ শিহাব, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৯৮৬, ২য়)
৫১. বাইহাকী (৪৫৮হি), শুআবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
৫২. বাইহাকী, আস- সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪)

৫৩. বাইহাকী, হায়াতুল আনবিয়া, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ।
৫৪. ইবনু আব্দিল বার, ইউসুফ ইবনু আব্দিল্লাহ (৪৬৩ হি), আত-তামহীদ, মরোক্কো, ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৩৮৭ হি.।
৫৫. খাতীব বাগদাদী, আহমদ ইবনু আলী (৪৬৩ হি), তারীখ বাগদাদ, বৈরুত, ইলমিয়্যাহ।
৫৬. আবু বকর সারাখসী (৪৯০ হি), আল:মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯)
৫৭. আবু হামিদ আল:গাজালী (৫০৫ হি), ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
৫৮. আলাউদ্দীন সামারকান্দী (৫৩৯ হি), তুহফাতুল ফুকাহা (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
৫৯. আবু বকর ইবনুল আরাবী (৫৪৩ হি), আহকামুল কুরআন বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী
৬০. আল-কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭ হি), বাদাইউস সানায়ে', বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ
৬১. ইবনুল আসীর মুবারাক ইবনে মুহাম্মাদ (৬০৬ হি), জামেউল উসূল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭১)
৬২. ইবনুল আসীর, আন- নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৬৩. আল-মাকদীসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি), আহাদীসুল মুখতারাহ, মাক্কা মুকাররামাহ, মাকতাবাতুন নাহদাতিল হাদীসাহ, ১৪১০হি., ১ম প্রকাশ।
৬৪. মুনযিরী, আব্দুল আযীম (৬৫৬ হি), আত- তারগীব ওয়াত তারহীব (কায়রো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪)
৬৫. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১হি), আল-জামিয় লিআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী), কাইরো, দারুশ শা'ব, ১৩৭২ হি., দ্বিতীয় প্রকাশ।
৬৬. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি), শারহু সহীহ মুসলিম, সহীহ মুসলিম সহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১)
৬৭. নাবাবী, আল-আযকার, (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাত)
৬৮. নাবাবী, রিয়াদুস সালেহীন, (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ)
৬৯. ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম (৭১১ হি), লিসানুর আরব (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৭০. খাতীব তাবরীযী (৭৩০ হি) মেশকাতুল মাসাবীহ, (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য়, ১৯৮৫)
৭১. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৭৪৮ হি), মীযানুল ইতিদাল, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, ১ম)
৭২. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৪১৩, ৯ম সংস্করণ)
৭৩. যাহাবী, আল-কাবাইর, (মদীনা মুনাওয়ারা, দারুত তুরাস, ১৯৮৪, দ্বিতীয় প্রকাশ)
৭৪. ইবনুল কাইয়েম (৭৫১ হি), আল- মানারুল মুনীফ (হালাব, মাকতাবুল মাতবুআতুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৭০)
৭৫. ইবনুল কাইয়েম, হাশিয়াতু ইবনুল কাইয়েম আলা আবী দাউদ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, ২য় প্রকাশ)
৭৬. ইবনুল কাইয়েম, জালাউল আউহাম (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৭৭. যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (৭৬২ হি), মিশর, দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি.।
৭৮. আল-ফাইউমী, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ (৭৭০ হি), আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৭৯. ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি), তাফসীরুল কুরআনিল কারীম (কাইরো, দারুল হাদীস, ২য় প্রকাশ ১৯৯০)
৮০. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬)
৮১. ইবনু রাজাব (৭৯৫ হি), জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, (মক্কা মুকাররামা, বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৮২. উমর ইবনু আলী ওয়াদীইয়াশী আনদালুসী (৮০৪হি), তুহফাতুল মুহতাজ, (মক্কা মুকাররামা, দারু হেরা, ১৪০৬, ১ম প্রকাশ)
৮৩. নূরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭হি), মাওয়ারিদুয যামআন বি যাওয়াইদি ইবনে হিব্বান (বৈরুত, দারুস সাকাফাতিল আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯০)
৮৪. নূরুদ্দীন হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২)
৮৫. আল-ফাইরোজআবাদী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব (৮১৭ হি) আল:কামূসুল মুহীত (বৈরুত, মুআস্সাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ ১৯৮৭)
৮৬. আল বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বকর (৮৪০হি) মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাতিল মাহারাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৮৭. আল বূসীরী, যাওয়ায়িদু ইবনি মাজাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
৮৮. আল বূসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ, (বৈরুত, দারুল আরাবিয়্যাহ, ১৪০৩ হি., দ্বিতীয় প্রকাশ)
৮৯. আহমদ ইবনু আলী আল-মাকরীযী (৮৪৫হি), মুখতাসারু কিতাবিল বিতর, (জর্দান, যারকা, মাকতাবাতুল মানার, ১৪১৩, ১ম)
৯০. ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি), ফাতহুল বারী, (বরুত, দারুল ফিকর, তারীখ বিহীন)
৯১. ইবনে হাজার, আল ইসাবাহ, (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৯২, ১ম প্রকাশ)
৯২. ইবনু হাজার, বুলুগুল মারাম, (বৈরুত, তারীখ ও তথ্য বিহীন)
৯৩. ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর, (মাদীনা মুনাওয়ারা, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিম, ১৯৬৪)
৯৪. সান'আনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (৮৫২ হি), সুবুলুস সালাম, (বৈরুত, তুরাস আরাবী, ১৩৭৯, ৪র্থ প্রকাশ)
৯৫. সাখাবী, শামসুদ্দীন (৯০২ হি), আল- মাকাসিদুল হাসানা, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭)
৯৬. সাখাবী, আল-কাওলুল বাদী' (মদীনা মুনাওয়ার, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৭, ৩য়)
৯৭. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (৯১১ হি), তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাওসার, ৪র্থ প্র, ১৪১৮হি)
৯৮. সুয়ূতী, ফাদ্দুল ওয়া' ফী আহাদীসি রাফইল ইয়াদাইনি ফিদ দু'আ (জর্দান, যারকা, মাকতাবাতুল মানার, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫)
৯৯. সুয়ূতী ও মাহাল্লী, তাফসীরে জালালাইন, (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ)
১০০. ইবনু ইরাক, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৯৬৩ হি), তানযীহুশ শরীয়াহ, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১, ২য়)
১০১. ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি), আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, (মক্কা মুকাররামা, মুসতাফা বায, ১৯৯০)
১০২. মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল- আসরারুল মারফুয়া, (লেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫ ইং)
১০৩. মুল্লা আলী কারী, আল-মাসনূ'য়, (হলব, মাকতাব আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১৯৬৯, ১ম)
১০৪. মুল্লা আলী কারী, মিরকাত, (বৈরুত, মুআস-সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ)
১০৫. মুজাদ্দিদে আলফে সানী (১০৩৪ হি), মাকতুবাত শরীফ (বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী (ঢাকা, আফতাবীয়া খানকাহ শরীফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৪০৬ বাং)
১০৬. আল-যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২হি), মুখতাসারুল মাকাসিদিল হাসানা (সিরিয়া, আল মাকতাব আল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৩),

১০৭. যারকানী, শারহুয যারকানী আলাল মুআত্তা, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৪১১, ১ম প্রকাশ)
১০৮. সিনদী, নূরুদ্দীন (১১৩৮ হি), হাশিয়াতুস সিনদী আলান নাসাঈ, (হালাব, মাতবূআত ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬, ২য় প্রকাশ)
১০৯. আজলূনী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (১১৬২ হি), কাশফুল খাফা, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৪০৫, ৪র্থ)
১১০. মুহাম্মাদ আল- কাত্তানী (১২৪৫ হি), আর- রিসালাতুল মুসতাতরাফা (লেবানন, বৈরুত, দারুল বাশাইর আল ইসলামিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৬ ইং)
১১১. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি) নাইলুল আউতার, বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩ ।
১১২. শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি উদ্দাতি হিসনিল হাসীন, (বৈরুত, দারু সাদির, তা. বি.)
১১৩. আব্দুর রাউফ মুনাবী, ফাইযুল কাদীর শারহু জামিয়িস সাগীর (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৩৫৬ হি, প্রথম প্রকাশ)
১১৪. মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান মুবারাকপুরী (১৩৫৩ হি), তুহফাতুল আহওয়াযী, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ)
১১৫. তাহতাবী, হাশিয়াতুত তাহতাবী, (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ)
১১৬. শামসুল হক আযীমআবাদী, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.)
১১৭. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সাহীহুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮)
১১৮. আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮)
১১৯. আলবানী, সাহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২০. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ,১৯৯৭)
১২১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাঈফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
১২২. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ)
১২৩. আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (বিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৯৮৮)
১২৪. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১ম প্রকাশ)
১২৫. আলবানী, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ, (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ)
১২৬. আলবানী, যায়ীফুল আদাবিল মুফরাদ, (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ)
১২৭. ড. সাঈদ কাহতানী, হিসনুল মুসলিম, (রিয়াদ, মুআসসাসাতুল জুরাইসী, ১৭ম প্রকাশ, ১৪১৬হি)
১২৮. মাওলানা মুহাম্মাদ সারফারায খানসাহেব সাফদার, রাহে সুন্নাত: আল-মিনহাজুল ওয়াদিহ (ভারত, দেওবন্দ, মাকতাবাতু দানেশ, তা. বি)
১২৯. যাকারিয়্যা ইবনু গোলাম কাদির, আল-ইখবার ফীমা লা ইয়াসিহহু মিনাল আযকার, (জেদ্দা, দারুল খাররায, ১ম প্রকাশ, ২০০১)
১৩০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, "এহ্ইয়াউস সুনান" সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ২০০২) ।
১৩১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৬) ।